প্রসঙ্গ

হাজার বছরের বাংলা কবিতা

যুগ্ম সম্পাদনা

ড. ছন্দা রায়

(রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

(রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক ঃ
অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল ঃ
২৩. ০৮. ২০০১

প্রচ্ছদ ঃ
তপন কর

অক্ষর বিন্যাস ঃ
প্রিন্ট লাইন
পূর্বাচল, সল্টলেক সিটি,
কলকাতা-৭০০০৯৭
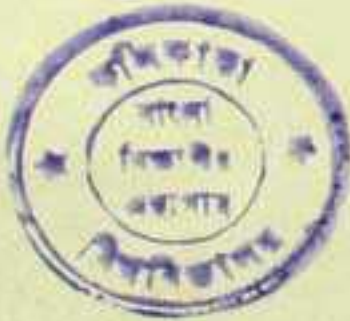
অলঙ্করণ ও চিত্রাবলী ঃ
বাসুদেব মোশেল-এর সৌজন্যে

মুখবন্ধ

কবিতা। হাজার বছরের বাংলা কবিতা। বড় দীর্ঘ পথ। তবু দুঃসাহসিক পরিক্রমায় প্রাণিত হওয়া গেল কবিতার হাত ধরে — কবিতার প্রেমে। কবিতার জন্য একজন সৎ কবি অমরাবতীও তুচ্ছ করতে পারেন। একজন সহৃদয় পাঠক বলতে পারেন, কবিতার জন্যই বেঁচে থাকা এবং বাঁচতে পারা।

উজ্জীবনী পাঠমালার অঙ্গ হিসেবেই আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের সহায়তায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুমোদন ও অনুদানে তিন সপ্তাহব্যাপী (১-২৩ আগস্ট, ২০০১) এক কর্মযজ্ঞের আয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা সর্বভারতীয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। পাঠমালা গ্রন্থনার উদ্দেশ্য তাঁদের পেশাগত যান্ত্রিকতার মধ্যে মনের খানিকটা হাওয়া বদল।

বাংলা বিভাগে নবাগত আমরা ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালার দায়িত্ব পেয়ে অবশ্যই শঙ্কিত ছিলাম এবং দ্বিধাগ্রস্ত। ভার গ্রহণ সহজ। ভার বহন করা কঠিন। কাঠিন্যকে সহজ করতে সহযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হলেন আমাদের অগ্রজ ও অনুজ সহকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় নেপোলিয়নের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, অসম্ভব শব্দটাই অবাস্তব। উপদেশ ও উদ্দীপনায় আমাদের প্রতি মুহূর্তে সঞ্জীবিত রাখলেন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ এবং অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদার। বিভাগীয় প্রধানের আসন থেকে আমাদের অনুক্ষণ আনুকূল্য করলেন অধ্যাপক ডঃ মণিলাল খান। বারবার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ সনৎ নস্কর। পূর্ববর্তী পাঠমালা সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে উজাড় করে দিলেন ডঃ বিশ্বনাথ রায়। নির্দেশকের ভূমিকায় রইলেন অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ডঃ বিনয়কান্তি দত্ত, যাঁকে ছাড়া কর্মযজ্ঞটি অসম্পন্ন থাকত। প্রসারিত দাক্ষিণ্য আমরা পেলাম আমাদের বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক এবং অতিথি-অধ্যাপকদের কাছেও। তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উজ্জীবনী পাঠমালার মূল হোতা যাঁরা, অর্থাৎ বক্তারা, তাঁদের মধ্যে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকেরাই শুধু নেই, আছেন প্রতিষ্ঠিত নবীন এবং প্রবীণ কবিরা। তাঁরা সকলেই আমাদের ডাকে সানন্দে সাড়া দিয়ে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তাঁদের দিয়ে কথা বলানোরই কথা— যে রীতি এতকাল চলে এসেছে। কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে মুদ্রণের ভাবনায় আমাদের ভাবিত করেছেন আমাদের সহকর্মী বন্ধু ডঃ বিশ্বনাথ রায়। "প্রসঙ্গ ঃ হাজার বছরের বাংলা কবিতা" যে রূপমূর্তি পেল, সেজন্য তাঁর কথা মনে রাখতেই হবে। সহস্রাব্দকে একটি কাঠামোয় ধরার সাধ্যাতীত পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক, অনেক অপূর্ণতা আছে আমরা জানি। অঙ্গীকার করেও কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়েছেন নিজেদের অন্যতর কর্মের দায়বদ্ধতায়। সেখানে ফাঁক ভরাট করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন থেকে মধ্য, মধ্য থেকে আধুনিক এবং আধুনিক থেকে

উত্তর-আধুনিকতায় পা ফেলেছে বাংলা কবিতা। পাঠমালার নিয়ন্ত্রিত সময়-শাসনে তার প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর ভেদ করা যায়নি। তবু যাঁদের নির্মাণ-দক্ষতায় বাংলা কবিতার আদি থেকে ইদানীন্তন রূপ ভাবনার একটি সজ্জিত অবয়ব পেয়েছে সেই কবি-সমালোচকদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য রইল। যাঁরা নিজেদের কথাকে লেখায় রূপ দেবার অবকাশ পাননি, বক্তার ভূমিকায় তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আমাদের পাঠমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য যে শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতার্থ বোধ করছি। আমাদের গ্রন্থ-প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের সহ-উপাচার্যের (শিক্ষা) শুভকামনাও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

যাঁরা এখানে উজ্জীবিত হতে এসেছেন, তাঁদের নিজেদের ভিতরকার সঞ্চয়ও সামান্য নয়। আলোচনাচক্রে তাঁদের যোগদান এবং সচেতন প্রশ্নমনস্কতা আমাদেরও নতুন করে ভাবিয়েছে। চিন্তার আদান-প্রদান উজ্জীবনী পাঠমালার একটি বড় প্রাপ্তি। এই সুযোগে তাই অংশগ্রহণকারীদেরও আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। কয়েকদিনের একটানা কার্যক্রমে আমাদের অক্লান্তভাবে সহায়তা করেছে আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং অশিক্ষক কর্মীরা। তাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের অংশীদার।

বিষয় যেহেতু কবিতা, তাই উজ্জীবনী পাঠমালার অঙ্গ হিসেবে আমরা একটি কবিসম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। সেখানে যাঁরা কবিতা পাঠ করেছিলেন তাঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী হয়ে রইলাম। বাংলার কবি মহাদেব সাহার কবিতা পাঠ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের স্মারক বলেই আমরা মনে করি।

আলোচনাকে লিখিত আকার দেওয়া, পাওনাদারের তাগাদায় সেগুলি সংগ্রহ ও ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদনা করা — সব কাজেরই সফলতা শেষ শর্ত মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ। আমাদের গবেষণা পরিষদের গবেষক বাসুদেব মোশেল দ্রুততম গতিতে এই সংকলন ছাপা ও প্রকাশের কাজ যে সাহসিক চ্যালেঞ্জে সমাপ্ত করেছেন, তার জন্য কোন ধন্যবাদই বোধহয় যথেষ্ট নয়। তবু সময়সীমা পার হওয়ার পর অনেক দেরীতে যাঁদের লেখা পৌঁছেছে, তাঁদের শ্রদ্ধেয় অবস্থানের কথা মনে রেখেও যদি লেখা ছাপা সম্ভব না হয়, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা অগ্রিম মার্জনা চেয়ে রাখছি।

সংকলনটির ত্রুটি, অসংগতি ও অপূর্ণতার দায় একান্ত ভাবেই আমাদের। সমাদরের কোন যোগ্যতা যদি অর্জন করা সম্ভব হয়, তার কৃতিত্ব আমরা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

ছন্দা রায়
তরুণ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সঞ্চালক
ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালা

২৩ আগস্ট, ২০০১।
বঙ্গভাষা সাহিত্য বিভাগ।
কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়।

ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালা
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অংশগ্রহণকারীদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আলোচনাচক্রে আলোচিত বিষয়
অভীক লাহিড়ী	শহীদ অনুরূপচন্দ্র মহাবিদ্যালয় (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)	প্রযুক্তি, বিচ্ছিন্নতা, কবিতা
অরুণ কুমার মণ্ডল	রাণাঘাট কলেজ, নদীয়া	কবি সুনির্মল বসু : শতবর্ষ স্মরণে
অসীম কুমার অধিকারী	পানিহাটি মহাবিদ্যালয়, সোদপুর	স্বভাবকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত
অর্পিতা রায়চৌধুরী	রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ উত্তর দিনাজপুর	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আধুনিকতা : ভাবে ও আঙ্গিকে
ইন্দ্রাণী মজুমদার	বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ	জীবনানন্দ :তমসা থেকে আলোকতীর্থে
উমা ভাদুড়ী	নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া	রবীন্দ্র-কবিতা : বিদেশী কবির দৃষ্টিতে
উমা ভট্টাচার্য	নিস্তারিনী কলেজ, পুরুলিয়া	আধুনিকতার নান্দীকার : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
উর্মি রায়চৌধুরী	মৌলানা আজাদ কলেজ, কোলকাতা	কাব্যে নারীবাদ
কল্পনা বসু	মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ, কোলকাতা	অমিয় চক্রবর্তীর প্রকৃতি চেতনা
কবিতা চন্দ	গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোলকাতা	২২শে শ্রাবণ
কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক	কে. ডি. কলেজ অফ কমার্স মেদিনীপুর	রবীন্দ্র-কাব্যে লোকসংস্কৃতি
কুন্তল কুমার রুদ্র	বোলপুর কলেজ, বীরভূম	বলাকা : রবীন্দ্র-সৃষ্টির নতুন উপকূল
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য	কুলটি কলেজ, বর্ধমান	মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ও মঙ্গলকাব্য
কেশবচন্দ্র খাঁড়া	ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ হাওড়া	বাংলা ছন্দের বিবর্তন
গোঁড়াচাঁদ মণ্ডল	কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, নদীয়া	পদ্যে উপেক্ষিতা : লিমেরিক
চন্দনা মজুমদার	উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ, কোলকাতা	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : স্বতন্ত্র ধারার কবি
জগৎরঞ্জন পাল	সেবায়তন শিক্ষা মহাবিদ্যালয় মেদিনীপুর	রবীন্দ্রনাথের খেয়া
জবা চট্টোপাধ্যায়	ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি	আধুনিক কবিতা : অনুষঙ্গ রূপকথা
জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি	ব্যক্তি অনুভবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত	প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলেজ, গৌহাটি	দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
ঝর্ণা মিত্র	ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ, কোলকাতা	মানসী কাব্যে প্রেমচেতনা
তপন গোস্বামী	কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, বীরভূম	কবিতা ও পাঠক : সম্পর্ক ও স্তরবিন্যাস
তপতী দাসঠাকুর	নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নদীয়া	রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনা (পুনশ্চ থেকে শেষলেখা)
তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়	ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন, কোলকাতা	বাংলা কবিতার ধারা : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন
দীপান্বিতা ঘোষ	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	গৌড়ীয় ভক্তিসাহিত্য : একটি প্রস্তাব

দিলীপ কুমার মণ্ডল	বড়জোড়া কলেজ, বাঁকুড়া	দুই কবি—পরস্পরের চোখে (রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ)
নন্দিনী মুখোপাধ্যায়	হুগলি উইমেন্স কলেজ	'ভাষা খুঁজে নিতে হবে আমাদের'
প্রবীর সরকার	নিস্তারিনী কলেজ, পুরুলিয়া	বাংলা কবিতায় ভ্রমণ উপাদান
প্রভাস রায় চৌধুরী	রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিমনন
বসুমিতা তরফদার	পি. এন. দাশ কলেজ, ২৪ পরগণা	উত্তর কালের কাব্যে প্রাচীন পুরাণের অনুবর্তন
বিজিত ঘোষ	শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি	'বীরাঙ্গনা ছুঁয়ে দু'চার কথা
মহঃ সামসুল হক	রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স, মুর্শিদাবাদ	বাংলা ভাষা সমস্যা ও বাঙালি মুসলমান কবি
মাধবী বিশ্বাস	বাগনান কলেজ, হাওড়া	বিদ্রোহ-বর্জিত নজরুল
মানসী সেনগুপ্ত	উইমেন্স কলেজ, কোলকাতা	সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'
মালবিকা মণ্ডল	কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর	রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্য : আজকের যুগে প্রাসঙ্গিকতা।
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	চমৎকার চন্দ্রিবার চমৎকারিত্ব
রবীন্দ্রনাথ মৈশাল	হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়	রবীন্দ্রকবিতায় বাস্তব অনুষঙ্গ
রাখী মুখোপাধ্যায়	নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, হুগলি	সত্তরের সন্ধিপর্ব : আধুনিক বাংলা কবিতা
লীনা সেন	বেথুন কলেজ, কোলকাতা	আনন্দস্বরূপিনীর পূর্বকথা
শম্পা ঘোষ	ড. গৌরমোহন রায় কলেজ, বর্ধমান	বাংলা মঙ্গলকাব্যে উপন্যাসের উপাদান
শঙ্কর কুমার নন্দী	সীতানন্দ কলেজ, মেদিনীপুর	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় লোকভাষার ব্যবহার
শাশ্বতী সাহা চক্রবর্তী	গঙ্গারামপুর কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর	বাংলা গীতিকাব্যের সূচনা পর্যায়
শেলী ভট্টাচার্য	বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রকৃতিচিত্র
শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ, বীরভূম	'যে রবির পাখি মোরা'
শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কোলকাতা	কবিতার ভাষা : ধ্বনির নন্দনতত্ত্ব
শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়	সরোজিনী কলেজ, কোলকাতা	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্র
স্বপন কুমার দে	বাগনান কলেজ, হাওড়া	১৯ শতকের বাংলা কাব্যে গার্হস্থ্য জীবন
স্বপন কুমার পাণ্ডা	গুরুদাস কলেজ, কোলকাতা	বিপনন, বিজ্ঞাপন ও বাংলা কবিতা
সাধন কুমার দাস	ডি. এন. সি. কলেজ, ঔরঙ্গাবাদ মুর্শিদাবাদ	জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় অন্তর্জগৎ
স্বাতী দত্ত	লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, কোলকাতা	বৈষ্ণব পদাবলীতে নিসর্গ চেতনা
সীমা ঘোষ	লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, কোলকাতা	প্রেম ও বর্ষার অন্তরঙ্গতা (প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যে)
সুস্মিতা ঠাকুর	কান্দী রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ	'আপন আমার কোনখানে' : একটি অন্বেষণ

লেখক-লেখিকা পরিচিতি

১। অরুণ কুমার বসু	প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। অলোক রায়	প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
৩। অভিজিৎ মজুমদার	লেক্‌চারার তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। কাননবিহারী গোস্বামী	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়	রীডার, ইংরাজি বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।
৭। গণেশ বসু	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।
৮। গৈরিকা ঘোষ	রীডার, বাংলা বিভাগ, হাওড়া গার্লস কলেজ।
৯। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। জ্যোতির্ময় ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১১। ঝর্ণা স্যান্যাল	অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২। তপোধীর ভট্টাচার্য	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩। তরুণ স্যান্যাল	প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
১৪। তরুণ মুখোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের অধিকর্তা।
১৬। দীপেন্দু চক্রবর্তী	অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭। নির্মল দাশ	অধ্যাপক, বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮। নির্মলেন্দু ভৌমিক	প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গভাষা, সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯। পবিত্র সরকার	ভাষাতত্ত্ববিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান, উচ্চশিক্ষা সংসদ
২০। প্রশান্তকুমার পাল	প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, রবিজীবনীকার, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
২১। বরুণ চক্রবর্তী	অধ্যাপক, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
২২। বিমল মুখোপাধ্যায়	রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ডীন (ক.বি.)
২৩। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪। বিপ্লব চক্রবর্তী	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫। বিশ্বনাথ রায়	রীডার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬। মঞ্জুভাষ মিত্র	রীডার, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
২৭। মীনাক্ষী সিংহ	অধ্যাপিকা, মঞ্চ থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।
২৮। সত্যবতী গিরি	অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯। সনৎ নস্কর	লেক্‌চারার। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩০। সুমঙ্গল রাণা	বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী।
৩১। সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩২। সুমিতা চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৩। সন্দীপ দত্ত	লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক।
৩৪। সুতপা ভট্টাচার্য	রীডার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী।
৩৫। সৌমিত্র বসু	রীডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৬। শক্তিনাথ ঝা	প্রাক্তন বাংলা বিভাগের প্রধান, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
৩৭। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

Prof. Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR

Telephone Nos. : 241-3288, 241-0071, 241-4984
Fax No. : 91-33-241-3222
SENATE HOUSE
CALCUTTA-700 073

তারিখ — ১৬-৮-১৯৯৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ-আয়োজিত 'অধ্যাপক উষীবনী - পাঠমালা' সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হতে চলেছে। এবারকার পাঠমালার বিষয় — 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'।

অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনীতি পড়িয়ে থাকি। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি আমার আগ্রহ অপার। প্রশাসনিক কাজ আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। এটা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। তাই একটু দূরে থেকেই আপনাদের এবারকার আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রীতিনন্দন সহ —
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
(আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)
উপাচার্য

UNIVERSITY OF CALCUTTA

DR. HIRON KUMAR BANERJEE
Pro-Vice-Chancellor
for Business Affairs and Finance
Calcutta University

Senate House
87/1 College Street
Calcutta-700073
Phone : 241-0071 (6 lines), 241-4984 (7 lines)
Fax : 91-033-241-3222
Telex : 021-2752 cuniv in
E-Mail : hkb @ cucc. ernet. in
provcfba @ cucc. ernet. in

No. ____________ Dated ____________ 200

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের' অর্থানুকূল্যে এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের সহযোগিতায় ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই উপলক্ষে বিভাগের দুই নবাগত শিক্ষক তাঁদের সামর্থ্যের ও উৎকর্ষের বিশেষ পরিচয় দিলেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিন। তাঁরা প্রায় চারশ' পৃষ্ঠার একখানি বই-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন সম্মিলিত প্রয়াসে। প্রকাশিত বইখানির শিরোনাম, 'প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা'।

আশা করি মনীষী-অধ্যাপকদের চিন্তাঋদ্ধ এই প্রবন্ধ-সংকলন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী-সম্পদরূপে গণ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ থেকেও এই ধরনের আয়োজন হলে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের আগ্রহী ব্যক্তিগণ গবেষণার জগতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

হিরণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.৮.২০০১

সহ-উপাচার্য
(অর্থ ও বাণিজ্য)

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের
অবৈতনিক অধিকর্তার
শুভেচ্ছা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের আনুকূল্যে আয়োজিত উজ্জীবনী পাঠমালার ধারাবাহিকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে একটা বিষয় অনুভব করেছি, পাঠমালায় আমন্ত্রিত বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্যগুলি গ্রন্থাকারে সংকলন ও প্রকাশ করাটা নিতান্তই জরুরি। শুধু অংশগ্রহণকারীদের কাছে নয়, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছেও তা মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সঞ্চালকদ্বয় এ-বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় আমি আনন্দিত। তাঁদের সঙ্গে সহযোগী ভূমিকায় থেকে আমি সংকলনটির সাফল্য ও সমাদর কামনা করি।

শুভেচ্ছাসহ,
ডঃ বিনয়কান্তি দত্ত
অবৈতনিক অধিকর্তা,
অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮ আগষ্ট, ২০০১

চর্যাপদের পুথির একটি পৃষ্ঠা

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এর একটি পাতা

বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত ভাষায় রচিত।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

College of Fort William
1825

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের আখ্যানপত্র

কবিতার মাসিক পত্র

সম্পাদক সুশীল রায়

ভাদ্র ১৩৬১ বর্ষ ১ সংখ্যা ৫

সূচীপত্র

কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৫

কবি সমর সেন

কবি বিষ্ণু দে
(১৯০৯-১৯৮২)

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

(১৮১২-১৮৫৯)

কবি মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৯৭৩)

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪২)

কবি জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৩-১৯৯৫)

কবি শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩২)

কবি জয় গোস্বামী

(১৯৫৩)
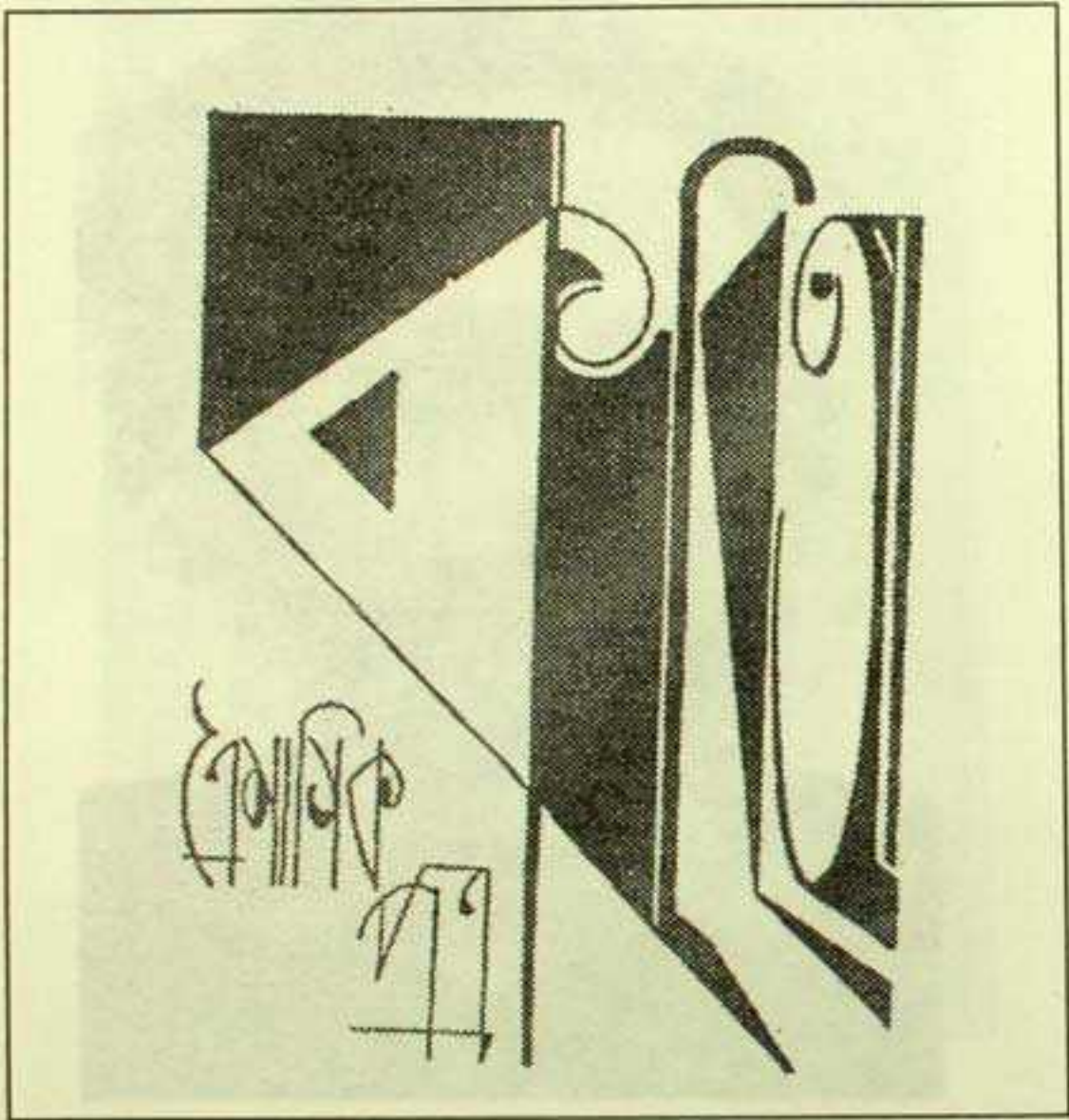
কবি নজরুল ইসলাম

(১৮৯৮-১৯৭৬)
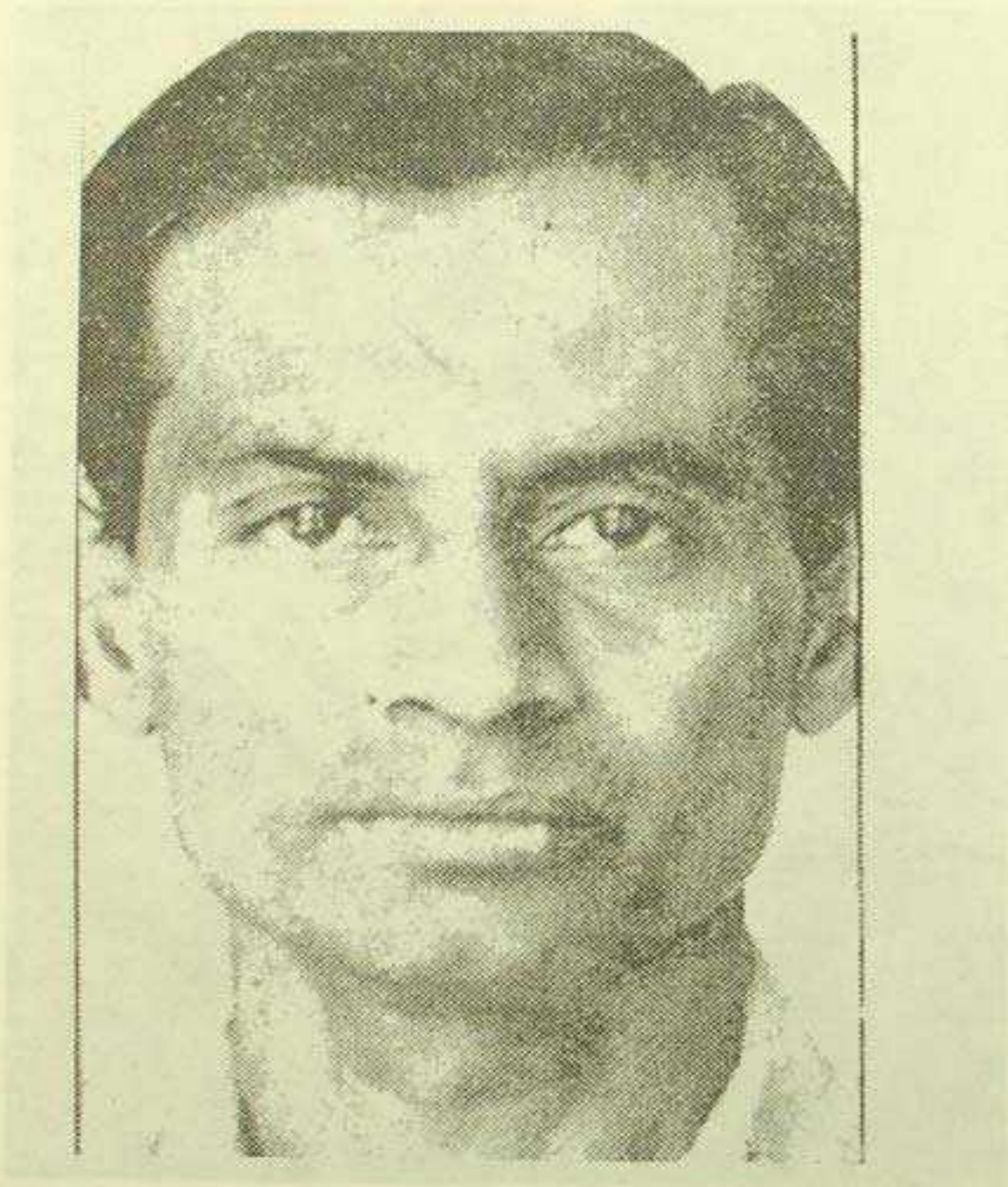
কবি বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮-১৯৭৪)

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯)

বাংলা কাব্যের আদিপর্ব

নির্মল দাশ

১.

অঙ্কের হিসাব অনুসারে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে যে খ্রিষ্টোত্তর দ্বিতীয় সহস্রাব্দের অবসান হয় তার শেষ দুশো বছর বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের বাকি সবটাই কাব্য-কবিতার দখলে। ঐ সময়ের গদ্য লিখনের কিছু কিছু প্রকীর্ণ উদাহরণ নাছোড়বান্দা ঐতিহাসিকেরা উদ্ধার করলেও কাব্যচর্চার ধারাবাহিক বিপুলতার কাছে সে সব উদাহরণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অন্যদিকে বিগত সহস্রাব্দের শেষ দুশো বছরে কবিতা ছাড়া আরও কিছু সাহিত্য-উপাদান দেখা দিলেও কাব্যচর্চার দিন এ দুশো বছরে ফুরিয়ে যায় নি, বরং কাব্যচর্চায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সুতরাং বিগত দ্বিতীয় সহস্রাব্দকে এক কথায় বলা যেতে পারে কবিতার সহস্রাব্দ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অগ্রণী সাহিত্য বিভাগের পক্ষে হাজার বছরের বাংলা কবিতা নিয়ে উজ্জীবনী পাঠমালার আয়োজন একটি সময়োপযোগী সারস্বত অনুষ্ঠান।)

হাজার বছরি বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা স্বভাবতই শুরু হওয়া উচিত হাজার বছর আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে বাংলায় যেসব কবিতা লেখা হয়েছিল তা নিয়ে, এবং সেক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই চর্যাপদের কথা এসে পড়ে, কারণ ঐতিহাসিকেরা আমাদের জানিয়েছেন যে ঐ সময়ের বাংলায় কাব্যচর্চার একমাত্র নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদগুলি। কিন্তু ইতিহাসের এই অকাট্য প্রমাণ মেনে নিতে গিয়েও মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করতে থাকে, শুধুই চর্যাপদ? কাছাকাছি আশপাশে আর কিছু নেই? মনের এই অতৃপ্ত কৌতূহল দূর করার জন্য ঐতিহাসিকেরা দু'ধরনের থিওরি তৈরি করে রেখেছেন। একটি হল 'অন্ধকার যুগে'র থিওরি। অন্যটি 'বন্ধ্যা যুগে'র থিওরি। 'অন্ধকার যুগে'র থিওরির মূল কথা হল, লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কি আক্রমণ হয়েছিল, তার ফলে মুসলিম আক্রমণকারীরা হিন্দু-বৌদ্ধদের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলে, জনজীবনে নানাদিক থেকে অন্ধকার নেমে আসে। তাই ঐ সময়ের বা তার আগেপিছের বাংলার সমস্ত সাহিত্যকীর্তির নিদর্শনও ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, 'বন্ধ্যা যুগে'র মূল কথা হচ্ছে, তুর্কি আক্রমণের ফলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মানুষজন আত্মরক্ষায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, সাহিত্য চর্চার ফুরসত তখনকার মানুষ পায়নি। এই যুগ সৃষ্টিহীন, তাই 'বন্ধ্যা'। কিন্তু এই দুই থিওরির কোনটাই মেনে নিতে মন সায় দেয় না। 'অন্ধকার যুগে'র থিওরি মানতে হলে একথাও মানতে হয় যে, মুসলমান হামলাকারীরা তাহলে একাধারে বহুভাষাবিদ ও বাংলা ভাষা-বিদ্বেষী ছিল, তাই তারা মঠ-মন্দিরের সংগ্রহশালা থেকে শুধু বাংলা পুথিগুলো বেছে

নিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে, সংস্কৃত বা অপভ্রংশে লেখা পুথিগুলোতে তারা হাত দেয় নি; তা যদি না হবে তবে ঐ যুগের সংস্কৃত ও অপভ্রংশের বইগুলি রক্ষা পেল কীভাবে? কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে তো এই সম্ভাব্যতা একেবারে অবাস্তব ও হাস্যকর। সুতরাং অন্ধকার যুগের থিওরি খারিজ না করে উপায় নেই। অন্যদিকে, একই কারণে বন্ধ্যা যুগের থিওরিও মেনে নেওয়া যায় না। ঐ যুগে যদি সাহিত্যচর্চা বা লেখাপড়া চর্চা করার ফুরসত না থেকে থাকে তবে ঐ যুগের সংস্কৃত বা অপভ্রংশ রচনাগুলি পাওয়া গেল কীভাবে। এমন তো নয় যে, সংস্কৃতের চেয়ে বাংলা লিখতে বেশি সময় লাগে। আসলে দেখতে হবে, ঐ সময়ের সমাজ বাংলার লিখিত চর্চায় কতটা অভ্যস্ত ছিল। এ ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সময়ে লেখা ও পড়ার বিষয়টা মূলত সমাজের উচ্চ বর্ণ বা উচ্চ বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই উচ্চবর্গীয়দের মাতৃভাষা বাংলাই ছিল, কিন্তু নিতান্ত ঘরোয়া প্রসঙ্গ ছাড়া বাইরের লেখাপড়ার কাজে তাঁরা সংস্কৃত অথবা শৌরসেনী বা অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করতেন। লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত হবার মতো সামাজিক মর্যাদা তখন বাংলা ভাষার ছিল না। এই অবস্থা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলা ভাষা সম্পর্কে উচ্চবর্গের এই সংকোচ ও অবহেলা দূর হয়। এই কারণেই পঞ্চদশ শতকে যে সব উচ্চবর্গীয় কবি বাংলায় লিখেছেন তাঁরা সকলেই বাংলায় লেখার জন্য কৈফিয়ত দিয়েছেন ('লোক নিস্তারিতে কহি লৌকিকের ভাষে' ইত্যাদি)। মঙ্গলকাব্যে যে কাব্যরচনার পেছনে স্বপ্নাদেশের প্রেরণার কথা বলা হয়েছে তার পেছনেও একই হীনম্মন্যতাবোধ—পাছে সমাজের মাথায় যাঁরা আছেন তাঁরা বাংলায় লেখা কাব্যকে অবহেলা করেন, তাই স্বপ্নাদেশের কথা শুনিয়ে তাঁদের এ ব্যাপারে শ্রদ্ধালু হতে বাধ্য করা। সমাজের উচ্চবর্গে বাংলা ভাষার এই অনাদরের জন্যই বাংলায় তখন ব্যাপকভাবে কিছু লেখা হয়নি। আর সেই কারণেই ঐ যুগের বাংলা রচনার এত দুষ্প্রাপ্যতা।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। সমাজের অন্য কেউ যখন বাংলা লিখতে রাজি নয়, তখন চর্যার কবিরা বাংলায় লিখলেন কেন? সেকি উচ্চবর্গের প্রতি বিদ্রোহবশত, না মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত? আসল কারণ এ দুটোর কোনোটাই নয়। সে-কথায় পরে আসছি। আসলে তখনকার সময়ে সমাজে ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে বাংলা লেখার চল না থাকলেও প্রয়োজন মতো মুখের ভাষা লিখে রাখা বা লিখে দেখানোর চল ছিল।[১] এ প্রয়াসগুলো অবশ্যই পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং সেইজন্য এগুলি নিয়ে কোনো ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার প্রথা শুরু হয় নি। এই সব বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের বিস্তৃত পরিচয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার ওপর তাঁর সুবিপুল গবেষণা-গ্রন্থে (পরিপূরক ৩য় খণ্ড, ১৯৭২, সহ) এবং সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে তার দু-একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। সুনীতিবাবু

দেখিয়েছেন যে, ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' নামক বিশ্বকোষ জাতীয় মহাগ্রন্থের 'গীতবিনোদ' শীর্ষক অধ্যায়ে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও কন্নড় ভাষার ছোট কবিতার সঙ্গে কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার রচনাও সংকলিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তার মধ্যে একটি অবশ্যই বাংলা ভাষার নমুনা:

'ছাংডু ছাংডু মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলন .... নারায়ণু জগহকেরু গোসাংবী'— ছাড়ো (আমাকে) ছাড়ো (আমাকে), আমি জগতের স্বামী গোবিন্দ ..... নারায়ণের সঙ্গে খেলতে যাব।

মানসোল্লাসের পুথিতে বিভিন্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় রচিত বিষ্ণুর দশাবতার বন্দনা আছে, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তার মধ্যে ষষ্ঠ গানটি অবশ্যই বাংলায় রচিত :

জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কাতবীর্য জেণে বাহু-ফরসে খণ্ডিয়া।
পরশরামু দেউ সে মাহর মঙ্গল করউ[১]

যিনি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মে বাহুর স্পর্শে কার্তবীর্যকে খণ্ডিত করেছিলেন
সেই দেবতা পরশুরাম আমার মঙ্গল করুন।

'মানসোল্লাসে'র 'গীতবিনোদ' অধ্যায়ে সেকালে প্রচলিত নানা গান ও সংগীতের বিবরণ ও উদাহরণ দেওয়া আছে। তাতে চর্যারও পরিচয়সহ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। সুকুমারবাবুর সাহিত্যের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া আছে :

সংসার সাঅর উত্তরে চড়িয়া।
কোহ লোহ মোহ বন্ধকেন ভরিয়া।।
ইন্দিয় পবণ খর বেগ বহন্তে।
দুক্কিয় লহরী হণিয় ন পাঅন্তে।

সংসার সাগর পার হইবার জন্য চড়া হইয়াছে,
ক্রোধ-লোভ-মোহ দ্বারা প্রযুত ভরা হইয়াছে,
ইন্দ্রিয় পবন খরবেগে বহিতেছে,
দুষ্কৃত লহরী ধ্বংস করিতে পারিতেছে না।।

(সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

এই চর্যা শাস্ত্রী-সংগৃহীত চর্যাসংকলনের বহির্ভূত, কিন্তু এই চারটি পঙ্‌ক্তিকেই দু-বার উল্লেখ করে মানসোল্লাসের রচয়িতা বলেছেন :

ঈদৃক্ পদানি চত্বারি দর্শিতানি ময়াধুনা।
অধ্যাত্মকার্যযুক্তানি[২] চর্যানাম্নি প্রবন্ধকে।।

এই যে চারি পদ আমি এখন দেখাইলাম, (তাহা)
অধ্যাত্মকার্যযুক্ত হয় চর্যানামক প্রবন্ধে।।

(সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

'মানসোল্লাসে'র উদাহরণ ছাড়াও সুকুমারবাবু তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের আরও প্রকীর্ণ রচনার উদাহরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে মুম্বইয়ের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে রক্ষিত মধ্যপ্রদেশের ধার-শিলালিপিতে প্রাপ্ত অবহট্‌ঠ প্রভাবিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার একটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শিলালিপিটি ভেঙে যাওয়ায় সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায় নি। সুকুমারবাবু লিপিছাঁদ থেকে অনুমান করেছেন : 'লিপির (এবং রচনার) কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দ। রচনাটি একটি কবিতা।' রচনাটির প্রসঙ্গ নির্দেশ করে সুকুমারবাবু বলেছেন : 'রাজকুলের পরিগ্রহণের জন্য নানাস্থান হইতে রূপসী আনা হইয়াছে। তাহাদের রূপগুণের স্পর্ধা (beauty competition) হইতেছে। তরুণীরা নির্বাক প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দালালেরা নিজের দেশের সুন্দরীর বেশ-ভূষার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে যথাসম্ভব নিজের নিজের ভাষায়। (তবে কবির নিজ-ভাষা—অন্য সব ভাষাছাঁদকে আচ্ছাদন করিয়া আছে)।' শিলালিপির পঞ্চম কবিতাটিতে বাংলা দেশ থেকে আগত মেয়ের রূপের তুলনামূলক বর্ণনা করা হয়েছে। রচনায় অবহট্‌ঠের গভীর প্রভাব থাকলেও সুকুমারবাবুর মতে 'ইহার ভাষাছাঁদ প্রত্ন-বাঙ্গালা।' ঐ যুগের রচনায় অবহট্‌ঠের প্রভাব তো অনিবার্য, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে প্রত্ন তথা প্রাচীন বাংলার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট নয়। এই প্রত্ন-বাংলায় যে ভঙ্গিতে সে যুগের বাঙালি মেয়ের রূপবর্ণনা করা হয়েছে তার কবিত্বগুণ উপেক্ষা করা যায় না:

তঁই কী কত হু বেশ রে দীঠে
জেহর তেহর বানসি ধেঠে।। ....
তেডেন্‌হ বাধেন্‌হ কেসঁ জে লড়হি বঁ ....
খোম্পহি উপরঁ অম্বেঅল কইসে
রবি জনি রাহুঁ ঘেতলে জইসে। ....
রে রে বর্বর দেখু রে তুঁ চান্‌হ
তারি নিলাড়ী সরিণী কান্‌হ। .....
কানন্ হু পত্রিলে তাড়র পাত .....
সুতের হার রোমাবলি কলিঅউ
জনি গাঙ্গহি জলু জউণহি মিলিঅউ। ....
রূউ দেখি তারউ সব জনু খীজই।
ধবল রে কাপড় উঢ়িঅল কইসে
মুহসসি জোন্‌হ পসারেল জইসে। ....
অইসি গউড়ি জ রাউলেঁ পইসই
সো জনু লাছি মাংডেউ দীসই।।

তুই কত বেশ (ভূষা) দেখিয়াছিস যে যাহার তাহার বর্ণনা করিতেছিস ধৃষ্টতা করিয়া?....

তেড়ি করিয়া যে সুন্দরভাবে কেশ বন্ধন হইয়াছে ......
খোঁপার উপরে কেমন আমলা (অলঙ্কার), যেন রাহুর দ্বারা রবি গ্রস্ত হইয়াছে।....
অরে রে বর্বর, তুই চাহিয়া দেখ। তাহার ললাটের মত কাহার আছে?....
কানে পরিয়াছে তাড়িপাত ......
সুতার হার রোমাবলীতে লাগিয়া আছে, যেন গঙ্গা হইতে জল (ধারা) যমুনায় মিলিয়াছে।....
তাহার রূপ দেখিয়া সকলে খেদ করে।
শাদা কাপড় কেমন পরিয়াছে। যেন মুখশশী জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়াছে।.....
এমন গৌড়দেশী কন্যা যে রাজকুলে প্রবেশ করে
সে (রাজকুল) যেন লক্ষ্মীর দ্বারা মণ্ডিত দেখায়। (সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

তবে আগেই বলা হয়েছে, এই সব রচনা ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষের সঙ্গে যুক্ত, তাই এদের কোনো ধারাবাহিক অনুগামিতা নেই। এইখানেই এই সব রচনার সঙ্গে চর্যাগানের প্রধান পার্থক্য। চর্যাগানগুলি ধারাবাহিকভাবে কয়েকশো বছর ধরে রচিত হয়েছে সংগঠিত অনুশীলনের অঙ্গ হিসাবে। এই সংগঠিত অনুশীলনের পেছনে আছে ধর্মীয় সংগঠনের সুপরিকল্পিত প্রভাব ও প্রেরণা। এই সাংগঠনিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিবিড় লক্ষ্যদল-সাপেক্ষতা। বস্তুত চর্যাগান যে-ধর্মীয় সংগঠনের রচনা সেই সংগঠনের নেতারা ছিলেন অত্যন্ত লক্ষ্যসচেতন বা target-sensitive। তাঁরা জানতেন ধর্মীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে তার জনসমর্থনের ভিত্তিটাও বিস্তৃত করা দরকার। সেজন্য তাঁদের অনেকেই তাঁদের রচনার লক্ষ্যদলের (target group) প্রকৃতি অনুসারে রচনার ভাষারও পরিবর্তন করেছেন। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ কাহ্নপাদ। কাহ্নপাদের রচনা সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ ও কথ্য ভাষা—এই তিন ভাষারূপেই পাওয়া যায়। যেখানে রচনার লক্ষ্যদল দার্শনিক ও সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতের দল, সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন 'হেব্রজ-পঞ্জিকাযোগরত্নমালা', যেখানে তাঁর লক্ষ্যদল পণ্ডিত নয় অথচ সাধারণভাবে শিক্ষিত, সেখানে তাদের জন্য তিনি সেকালের শিক্ষিত লোকের সামাজিক ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশে লিখেছেন দোহা, আর যেখানে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজের নিম্নস্তরের লেখাপড়া না-জানা অগণিত নিরক্ষর মানুষ, সেখানে তাদের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত গানের রীতিতে কথ্য ভাষায় চর্যাগান লিখেছেন। এই কৌশল একা শুধু কাহ্নপাদেই অবলম্বন করেন নি, তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের এটা ছিল একটা সাধারণ সাংগঠনিক কৌশল। আর এই কৌশলের অঙ্গ হিসাবেই তাঁরা গানের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা থেকে উপমান সংগ্রহ করেছেন, যাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা গানের মধ্যে তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে তার সম্পর্কে কৌতূহল ও একাত্মতাবোধ করেন। চর্যার টীকাকার আচার্য মুনিদত্ত (আনুমানিক জীবৎকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী)-ও বলেছেন চর্যাগানগুলি 'প্রাকৃতভাষয়া' অর্থাৎ প্রকৃতি বা জনগণের

কথ্য ভাষায় রচিত। তবে এখানে আবার আর একটা প্রশ্ন উঠে আসে। তখন তো দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও অন্যান্য আরও ধর্মীয় সংগঠন ছিল। বিশেষত পালযুগে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে নাথ ধর্মও বেশ শক্তিশালী ছিল। নাথ ধর্মের সংগঠকরা কি এই প্রচার-কৌশল অবলম্বন করেন নি? তাঁরা কি নাথ ধর্ম প্রচারে কথ্য ভাষায় কিছু লেখেন নি? এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের এখনো অভাব আছে, তবে শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর লোকসাহিত্যের ধারায় গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয় যে একাল পর্যন্ত মুখে মুখে চলে এসেছে তাতে বোঝা যায় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ায় বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি নাথ ধর্মও জনজীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এ বিষয়ে কিছু রচনাও প্রচারিত ছিল। এই সব রচনার অধিকাংশই অলিখিত হলেও লিখিত রচনাও যে তখন প্রচলিত ছিল তার আভাস সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের আলোচনায় নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। সুনীতিবাবু তাঁর OBDL-এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দী ভাষায় 'গোরখবোধ' নামে যে নাথপন্থী গ্রন্থ রচিত হয়েছে রাজস্থানে তার পুথি রক্ষিত আছে। এই পুথিতে যে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে তা থেকে বোঝা যায় যে 'গোরখবোধে'র উৎস হচ্ছে প্রাচীন বা প্রত্ন-বাংলার কোনো প্রাচীন নাথপন্থী রচনা। এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে 'গোরখবোধে'র পুথিতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত কিছু বিচ্ছিন্ন রচনা, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যা নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বা প্রত্নবাংলার নিদর্শন :

> ইহাঁ হী আছই ইহাঁ হী অলোপা
> ইহাঁ হী রচিলই তীনি ত্রিলোক
> আছই সঙ্গই রহই জুয়া
> তা কারনি অনন্ত সিধা জোগেশ্বর হুয়া।।...
> দৃষ্ঠি অগ্রে দৃষ্ঠি লুকাইবা সুরতি লুকাইবা কানম্
> নাসিকা অগ্রে পবন লুকাইবা তব রহি গয়া পদ নিরবাঁণম্।।....
> আয়ো দেবী পইসো দ্বাদস আঁগুল পইঁসো
> পৈসতা পৈসতা হোই সুখ তব জনম মরন কা দুখ।।.....
> আপা ভাঞ্জিবা সত-গুরু খোজিবা জাই জোগপন্থ ন করিবা হেলা
> ফিরি ফিরি মনিখা-জনম ন পাইবা হরি লই সিধ-পুরি স্যূঁ মেলা।।

এখানেই আছে, এখানেই অলোপ (= প্রকাশ)
এখানেই তিন ত্রিলোক রচিত হল।
সঙ্গেই আছে যুক্ত থেকে,
তার কারণে অনন্ত সিদ্ধ যোগেশ্বর হয়েছে।
দৃষ্টির অগ্রে দৃষ্টি লুকাবে, সুরতি (?) কান লুকাবে
নাসিকার অগ্রে পবন লুকাবে, তবেই নির্বাণ পদ থেকে যায় (পাওয়া যায়?)

এসো দেবী, প্রবেশ করো, দ্বাদশ অঙ্গুলিতে প্রবেশ করো।
প্রবেশ করতে করতে, প্রবেশ করতে করতে সুখ হয়, তবে জন্ম-মরণের কী দুঃখ?
নিজেকে ভঞ্জন (=বিশ্লেষণ) করতে হবে, সৎগুরু খুঁজতে হবে, যোগপন্থকে হেলা করবে না।
মনুষ্য-জন্ম ফিরে ফিরে পাবে না,
সিদ্ধ পুরুষের কাছ থেকে মুক্তি (আ)হরণ করে নিতে হবে।"

এই রচনায় কাব্যরস নেই বটে, তবে বাংলা কাব্যের প্রাগাধুনিক পর্বের একটা অভ্রান্ত কাঠামো এখানে পাওয়া যায় যার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাপদ ও আরো পরবর্তী কালের সহজিয়া ও বাউল গানের গভীর সাদৃশ্য। চর্যাগানগুলি যখন রচিত হচ্ছিল, তখন নাথপন্থী ধর্মগুরুরাও যে লিখিতভাবে পদরচনা করতেন তারও নিশ্চিত প্রমাণ আছে, এবং সে প্রমাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাপুথিতেই। ঐ পুথিতে ২১ নং চর্যার টীকায় মুনিদত্ত নাথধর্মগুরু মীননাথের একটি ছোট রচনা উদ্ধৃত করেছেন। মীননাথ যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নন মুনিদত্ত সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই টীকায় মীননাথের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'তথা চ পরদর্শনে মীননাথ' ঃ অর্থাৎ মীননাথ বৌদ্ধ ভিন্ন অপর দর্শনের অনুগামী। মুনিদত্তের টীকায় উদ্ধৃত মীননাথের রচনাটি নিম্নরূপ ঃ

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ সমাধিকপাট।
কমল বিকশিল কহিহ্ ন জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।।

গুরু কহেন পরমার্থের বর্ত্ম, কর্মরূপ কুরঙ্গের খেদার কপাট। কমল ফুটিলে শামুক কহিবে না; কমলমধু পান করিতে ভ্রমর ভুলে না। (সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এটি প্রত্ন বা প্রাচীন বাংলাতেই রচিত। তবে সুকুমার সেন একে বলেছেন দোহা, হয়ত এর আকার-হ্রস্বতার জন্যই এই নামকরণ। কিন্তু চর্যার প্রাচীন সংজ্ঞা অনুসারে তো চর্যা চার লাইনেরও হতে পারে। মানসোল্লাসে উদ্ধৃত চর্যাটি চার লাইনের এবং তাতে ভণিতাও নেই। সুতরাং মীননাথের এই রচনাটিকে 'চর্যা' বলে ধরতে অসুবিধা কোথায়? এই অনুমান যথার্থ হলে বলতে হয় চর্যা শুধু তান্ত্রিক বৌদ্ধরাই লেখেন নি, নাথযোগীরাও বাংলায় চর্যা লিখেছিলেন। তবে নাথযোগীদের এই শ্রেণীর লিখিত রচনার আরও নিদর্শন আমাদের জ্ঞানের বাইরে। অতীতের কোনো তালিবানি হামলায় বা অন্য কোনো কারণে তা যদি ইতিমধ্যেই নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আগামী দিনের কোনো আবিষ্কারকের অপেক্ষায় তা হয়ত কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

যাই হোক, এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তাতে বোঝা গেল, বাংলা কবিতার আদি পর্বে বা গোড়ার দিকে বাংলা কাব্যভাষার তথা সাধারণভাবে বাংলা ভাষার কোনো মান্য

লেখ্যরূপ ছিল না। তাতে একদিকে যেমন ছিল শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি ছিল মাগধী অপভ্রংশ-জাত নানা স্থানীয় কথ্যভাষার আঞ্চলিক ভিত্তি। এই পর্বের ভাষিক কাঠামোয় কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাদেশিক ভাষালক্ষণ ফুটে ওঠে নি, তার বদলে দেখা দিয়েছে ভাষাগত প্রত্ন-লক্ষণ। এই প্রত্ন-লক্ষণগুলির মধ্যে পরবর্তী কালে সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে-ওঠা বাংলা ভাষার উপাদনগত প্রাধান্য থাকায় আদিযুগের রচনাগুলিকে প্রত্ন-বাংলায় রচিত বলে চিহ্নিত করা ভাল। এ পর্যন্ত যে আলোচনা হল তাতে দেখা গেল এই যুগের সবচেয়ে বড়ো কাব্যনিদর্শন শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলি। তাই বাংলা কবিতার আদি পর্বের আলোচনায় চর্যাগানগুলিই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

২.

তবে চর্যাগানগুলির কবিত্ব সম্পর্কে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে দু-একটি জরুরি কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার। এই জরুরি কথা চর্যার যথার্থ পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ নিয়ে। কারণ ১৯১৬ সালে চর্যাগানগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চর্যার উপর নানারকম হস্তাবলেপ ঘটেছে। পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, পাঠকর্তা যেখানেই অর্থবোধে অসুবিধা অনুভব করেছেন, সেখানেই তিনি নিজের অর্থবোধের পক্ষে সুবিধাজনক পাঠ চাপিয়ে দিয়ে পুথির পাঠ 'সংশোধন' করেছেন। যেমন, ৩ নং চর্যার অষ্টম পঙ্ক্তি হিসাবে পুথিতে লেখা আছে 'পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা', কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাঠ সংশোধন করে পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন 'গরাহকের পর একটি বৃথা দাঁড়ি আছে' অর্থাৎ তাঁর মতে শুদ্ধ পাঠ 'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা' অর্থাৎ এটি দুটি সরল বাক্য (পইঠেল গরাহক = গ্রাহক প্রবেশ করল + নাহি নিসারা = নাই নিঃসরণ বা নির্গমন) যোগে গঠিত একটি যৌগিক বাক্য। কিন্তু চর্যাভাষার সামগ্রিক ব্যাকরণ মাথায় রাখলে 'গরাহক'-এর সঙ্গে যুক্ত 'আ'-কারকে কি বৃথা বলা যায়? চর্যাভাষার অন্যতম সম্বন্ধ-বিভক্তি 'আ'। অন্যান্য চর্যাতেও দেখা যায় সম্বন্ধে-'আ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে, যেমন—৬ নং চর্যায় মূঢ়া হিঅহি = মূঢ়ের হৃদয়ে; ১৫ নং চর্যায় 'মাআমোহাসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি' = ওরে, মায়ামোহসমুদ্রের অন্ত বুঝিস না। অন্যদিকে 'পইঠেল' ক্রিয়াপদ নয়, ইল-অন্ত কৃদন্ত বিশেষণ যার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত চর্যাভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত পঙ্ক্তির আক্ষরিক অর্থ = প্রবিষ্ট গ্রাহকের নিঃসরণ নেই। কাজেই এটি একটি মাত্র কর্তৃপদ ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত 'সরল'বাক্য, একে কাঠামোর দিক থেকে যৌগিক বাক্য বলে ধরার কোনো কারণ নেই। কিন্তু শাস্ত্রীর পর আর যাঁরা পাঠবিচার করেছেন, তাঁরা সকলেই শাস্ত্রীর 'পাঠসংশোধন'কে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে চর্যার অর্থভেদ বা অর্থবোধের ক্ষেত্রেও একই রকম বিশৃঙ্খলা। যিনি যেমনভাবে পেরেছেন পুথির পাঠের যৌক্তিকতা গভীরভাবে বিবেচনা না করেই অর্থ নির্দেশ করেছেন। এই অর্থগত বিশৃঙ্খলার একটি ভালো উদাহরণ ৩৩ নং চর্যা ও তার প্রচলিত নানা পাঠান্তর ও অর্থভেদ। এই

বিশৃঙ্খলার শুরু একেবারে পদকর্তার নাম থেকেই। শাস্ত্রী কবিনামের পাঠোদ্ধার করেছিলেন ঢেণ্‌ঢণপাদ, তাঁর অনুসরণে অন্যেরাও পাঠ নিয়েছেন ঢেণ্‌ঢণপাদ। কিন্তু এখানে ভাবা দরকার 'ঢেণ্‌ঢণ' শব্দের অর্থ কী? কারণ চর্যায় প্রাপ্ত আর ২২জন কবির নামেরই অর্থ আছে। 'ঢেণ্‌ঢণ' শব্দের তেমন কোনো আপাতগ্রাহ্য অর্থ নেই। এখানে দেখা দরকার 'ঢেণ্‌ঢণ'—এই পাঠ গ্রহণ ঠিক আছে কিনা, কারণ চর্যার পুথিতে 'ট' ও 'ঢ' বর্ণ একই হরফ বা ছাঁদে লেখা হয়েছে (মধ্যযুগের নানা পুথিতে যেমন 'ন' হরফ দিয়ে 'ন' ও 'ল' দুটি হরফকেই বোঝানো হয়েছে, প্রসঙ্গ ধরে ঠিক করতে হবে বর্ণটি দন্ত্য'ন' না 'ল'), প্রসঙ্গ ধরে বর্ণটির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রীর পাঠোদ্ধার-পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায়, তিনি এই ব্যাপারে প্রতিক্ষেত্রেই যেখানে হরফটি 'ট' পড়া উচিত, সেখানে তাকে 'ঢ' বলে ধরেছেন, আর যেখানে 'ঢ' ধরা উচিত সেখানে তাকে 'ট' ধরেছেন। তাই 'ঢেণ্‌ঢণ' শব্দের অর্থ পাওয়া না গেলে 'ঢ'-এর বদলে ঐ জায়গায় 'ট' ধরে 'টেণ্‌টণ' পাঠ নিলে কোনো অর্থ হয় কিনা দেখা দরকার। পাঠ 'টেণ্‌টণ' নিলে দেখা যাচ্ছে হাজার বছর ধরে প্রাকৃত, মৈথিলী ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন রচনায় 'টেন্টন' শব্দটি কোথাও 'জুয়াড়ি' অর্থে, কোথাও 'ধূর্ত' অর্থে, কোথাও-বা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে, এমন কি আধুনিক বাংলাতেও ক্রূর বা শঠ স্বভাবের মানুষকে 'ট্যাটন' বা 'টৈটিয়া' বলা হয়। এ গানের বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের ধূর্ততা বা চালাকি আছে। মনে হয় কবি এই ধরনের পদ লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন, তাই ছদ্মনাম হিসাবে তিনি 'টেন্টন' নাম ব্যবহার করতেন।'

বিভ্রান্তি অর্থবোধ নিয়েও : 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী'—কেউ কেউ 'টাল' শব্দের অর্থ করেছেন পাহাড়ের টিলা, কিন্তু এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে এই অর্থে গানের মূল রচনাভঙ্গি paradox বা বিরোধাভাসটি ফুটে ওঠে না। পাহাড়ের উঁচু টিলায় বাস, সেখানে তো প্রতিবেশী না থাকারই কথা। এতে বিরোধাভাস কোথায়? আসলে টাল < টাড় = ডাঙ্গা জায়গা = ডাঙ্গা জায়গায় স্থাপিত পাড়া বা লোকালয়। সুতরাং এই পঙ্‌ক্তির প্রকৃত অর্থ 'পাড়ায় আমার বাড়ি, (কিন্তু) প্রতিবেশী নেই'। অনুরূপ বিভ্রান্তি 'বেগ (বেংগ) সংসার বড়হিল জাঅ' পঙ্‌ক্তিটিকে নিয়েও। কেউ কেউ 'বেগ' পাঠ ধরে অর্থ করেছেন 'বেগে সংসার বেড়ে যায়', কেউ বা 'বেঙ্গ' পাঠ ধরে অর্থ করেছেন 'ব্যাঙের সংসার বেড়ে যায়'। কেউ কেউ এই পাঠের উপর ভিত্তি করেই আরো অনেক দূরে এগিয়ে বলেছেন সংসারে ব্যাঙাচির মতো প্রচুর সন্তান থাকায় ঘরে নিরন্তর অন্নাভাব (হাড়ীত ভাত নাহি) কিন্তু 'বেগ' বা 'বেঙ্গ' যে পাঠই নেওয়া হোক না কেন তাতে মূল বাগ্‌ভঙ্গি বিরোধাভাস কোথায়? এক্ষেত্রে টীকা ও তিব্বতি অনুবাদের সাহায্য নিলে দেখা যায়, প্রকৃত পাঠ 'বেগ' নয়, 'বেঙ্গ', তবে তার সঙ্গে 'সংসার'-এর 'সঁ' (চর্যার পুথিতে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুর হরফ একই—সংশ্লিষ্ট বর্ণের উপর গোল (০) চিহ্ন) জুড়তে হবে। সঁ < সম বাংলা বিভক্তি নয়, মধ্য মৈথিলীতে 'সঁ' একটি করণ-বিভক্তি, বেঙ্গসঁ = ব্যাঙের দ্বারা। সার = সাপ, পুথিতে

এক্ষেত্রে 'র' হরফটি অন্য জায়গার 'র' থেকে ঈষৎ পৃথক দেখায়, এতে 'প'-এর আবছা over-writing থাকতে পারে। আর 'বড়হিল' পদের অর্থের সঙ্গে 'বেড়ে যাওয়া' বা 'বৃদ্ধি পাওয়া'র কোনো সম্পর্ক নেই। 'বড়হিল' পদটি উদ্ভূত হয়েছে বড় (= কাটা, ছেঁড়া, টুকরো করা ইত্যাদি) ধাতু থেকে। সুতরাং পঙ্‌ক্তিটির প্রকৃত পাঠ : বেঙ্গসঁ সাপ বড়্হিল জাঅ। এর প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ : ব্যাঙের দ্বারা সাপ কাটা পড়ে, অর্থাৎ ব্যাঙ সাপকে কাটে। এই অর্থে ঈপ্সিত বিরোধাভাস সুস্পষ্ট। চর্যার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধারে পণ্ডিতেরা টীকা ও তিব্বতি অনুবাদের সাহায্য অবশ্যই নিয়েছেন, কিন্তু এ কাজ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করা হয়নি। আগামী দিনে যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করবেন, তাঁদের এ ব্যাপারে আরও সজাগ থাকতে হবে। সেই সঙ্গে আগামী দিনের চর্যা-গবেষকদের আরো একটি দুষ্প্রাপ্য পুথির সাহায্য নিতে হবে। এটি হল চর্যাগানগুলি ও তার মুনিদত্ত-কৃত টীকার তিব্বতি অনুবাদের মোঙ্গোলীয় অনুবাদ। এই অনুবাদ পিকিঙে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে করা হয়েছিল। এই অনুবাদ মোঙ্গোলীয় তাঞ্জুরে সংকলিত হয়েছে। মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে ঐ তাঞ্জুরের একটি পুথি রক্ষিত আছে।[৮] এই পুথির পুনরনুবাদের মাধ্যমে হয়ত চর্যার পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে। ভবিষ্যতেও চর্যার কাব্যরস বিচারের আগে পাঠবিচারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ পাঠোদ্ধারে ভ্রান্তি থাকলে রসোদ্ধারেও তার জের চলবে।

৩.

বাংলা কবিতার আদি পর্বের একমাত্র বড়ো নিদর্শন চর্যাপদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবে তার তাত্ত্বিক বা ধর্মীয় পটভূমির কথা মনে আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তা বাদ দিয়েই চলব। কারণ সেই তত্ত্বের সঙ্গে গানগুলির কাব্যিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বলতে হয় বিরোধিতা বা অসামঞ্জস্যই আছে। কারণ তত্ত্বের দিক থেকে চর্যাকারেরা জীবন ও জগৎকে অলীক ও অসত্য বলেছেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে কৌতুককর অসঙ্গতির বিষয় হচ্ছে এই যে, জগৎ ও জীবনের অসত্যতা উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তাঁরা তথাকথিত অসত্য জগৎ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। যেমন, ৪১ নং চর্যায় ভুসুকু বলেছেন : 'আইএ অইঅনা এ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই' = এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নি, ভ্রান্তিবশতই তা (সত্য বলে) প্রতিভাত হয়। কিন্তু দেখার ভুলে অসত্য যে সত্য হয় না তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে কবি পরের পঙ্‌ক্তিতে 'অসত্য' জগৎ থেকেই মোক্ষম উপমান দিয়েছেন : 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই' = (দেখার ভুলে) যে রজ্জু দেখে (তাকে) সাপ মনে করে চমকে ওঠে, তাকে সত্যিই কি বোড়া (সাপে) কামড়ায়? সুতরাং চর্যার বাচ্য ও বচনের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটুকুতেই আমাদের মতো রসপিপাসু পাঠকদের লাভ, কারণ উপমানের ভেতরের অর্থ যাই-ই হোক তার বাচ্যার্থে যে জীবন ও জগৎকে

পাওয়া গিয়েছে তাতেই আমাদের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ হতে পারে।

তাই তত্ত্বের কথা একেবারে বাদ দিয়ে, এমন কি চর্যার ছন্দ-অলঙ্কারের বহু-আলোচিত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে একেবারে সরাসরি রসের উৎস সন্ধানে নামা যাক। চর্যার সর্বত্র রসের ছড়াছড়ি না থাকলেও তার যতটুকু উৎসার ঘটেছে তাতে দেখা যায় চর্যায় তিনটি রসের প্রাধান্য : শৃঙ্গার, করুণ ও হাস্য। শৃঙ্গার রসের কবিতাগুলি প্রধানত দুটি প্রণয়ীযুগলকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে। একটি যুগলের নায়ক-নায়িকা কাহ্ন ও ডোম্বী; আর অপর যুগলের নায়ক-নায়িকা শবর-শবরী। কাহ্ন ও ডোম্বী শেষ পর্যন্ত দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করেছে (চর্যা ১৯), কিন্তু বিয়ের আগেই তাদের প্রণয়-জীবন বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। কাহ্ন ইতিপূর্বেই বিবাহিত, সংসারে তার মা, শাশুড়ি, ননদ (তিব্বতি অনুবাদ অনুসারে পিসিমা বা মাসিমা) ও শালী ছিল। কিন্তু তাদের মেরে ফেলে সে গৃহত্যাগী হয়েছে (চর্যা ১১)। এখন সে ডোমনির প্রেমে মাতোয়ারা। ডোমনিকে সে সাঙা করতে চায়।' ডোমনির প্রতি তার ভালবাসা ঐকান্তিক। তার জন্য সে তার বহুরূপীর পেশাও ছেড়েছে (চর্যা ১০), কিন্তু ডোমনির আচরণ সন্দেহজনক; সে কাহ্নের কাছে ধরা দিলেও পাশাপাশি অন্য কুলীনকেও সে ছাড়ে না (চর্যা ১৮)। তাকে আবার অন্যের নৌকাতেও যাতায়াত করতে দেখা যায় (চর্যা ১০)। কাহ্ন বুঝতে পারে 'ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী' (চর্যা ১৮) (= ডোমনির বাড়া ছিনাল নেই)। কিন্তু সে ডোমনিকে ছাড়তে পারে না। তাই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ডোমনিকে জিজ্ঞাসা করে :

হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ। (চর্যা ১০)

ওলো ডোমনি, তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তুই আসিস যাস্ কার নৌকায়!

ডোমনির এই স্বৈচারিতায় সে প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে :

মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ। (চর্যা ১০)
ডোমনি, তোকে মারব, তোকে খুন করব।

বিগত এক হাজার বছরে প্রেমের কবিতা অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রেমানুভূতির সঙ্গে এমন ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার জ্বালা-মিশ্রিত বিচিত্র মনস্তত্ত্ব আর ক'টি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে? মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমমনস্তত্ত্ব অনেক সূক্ষ্মতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু রক্তমাংসের এমন উত্তাপ সেখানে কোথায়? এ গানের তাত্ত্বিক অর্থ যাই-ই হোক, এর বাচ্যার্থের বিরল ব্যঞ্জনায় আমাদের রসবোধ তৃপ্ত না হয়ে পারে না।

অন্যদিকে, শবর-শবরী বিবাহিত দম্পতি হলেও তাদের পরিচিত দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও আছে অপরিচয়ের আলোছায়া। শবরী মেয়েটি ময়ূরের পালক পরে গলায় গুঞ্জাফুলের টকটকে লাল মালা দুলিয়ে একলা একলা পাহাড়ি পথে চলেছে। এত সুন্দর হয়েছে তার সাজগোজ যে, তাকে দেখে তার স্বামী শবর তাকে চিনতেই পারল না, সে

ভাবল এ অন্য কোনো রূপসী। সে মেয়েটির জন্য পাগল হয়ে উঠল। শবরী তখন স্বামীকে শান্ত করার জন্য বলল :

উমতো সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী।। (চর্যা ২৮)
উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, তুমি ভুল কোরো না, দোহাই তোমার।
(আমি) সহজসুন্দরী নামে তোমার নিজেরই ঘরনি।

শবর শান্ত হল। তারপর সে শবরীকে গলায় জড়িয়ে ধরে মিলনশয্যায় সারা রাত কাটিয়ে দিল। এইরকম প্রগাঢ় মিলনের আরো ছবি আছে চর্যাসংকলনের শেষ গানটিতে। এটিও শবরপাদের রচনা :

হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
ষুকড় এসেঁ রে কপাসু ফুটিলা।।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিঅ।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিন সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।। (চর্যা ৫০)

আকাশের মতো উঁচু তৃতীয় (নাকি তেতলা?) বাড়ি, তার পাশেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত আর একটি বাড়ি। জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক ভরে গিয়েছে, আঁধার দূর হয়েছে, আকাশে ফুটেছে (তারার) ফুল। জ্যোৎস্নার মধ্যে ফুটে আছে শাদা শাদা কাপাস ফুল। বাতাসে ভেসে আসছে পাকা ধানের গন্ধ। এর মধ্যে শবর-শবরী মিলনমত্ত হল। দিনের পর দিন শবরের কোনো চেতনা রইল না, সুখের আবেশে সে বিবশ। —এমন সব পঙ্ক্তি যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে, পেশাগত কারণে তিনি জগৎ-বিমুখ যোগীপুরুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি যেখানে নরনারীর জীবনের মধ্যে প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন সেখানে তাঁকে প্রকৃতিচেতন, মানবপ্রেমিক এবং কবি বলব না কোন্ যুক্তিতে? তবে চর্যায় শুধু দাম্পত্য মিলনের ছবিই নেই, দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে রিরংসাতপ্ত নরনারীর বিশিষ্ট মিলনমত্ততার ছবিও পাওয়া যায়। 'সাসুঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল' (চর্যা ৪)—শাশুড়ির ঘরে তালাচাবি পড়ল। কামক্ষিপ্ত যোগিনী এবার জঘন চেপে যোগীকে আলিঙ্গন করে। কমল (= স্ত্রীলিঙ্গ) ও কুলিশের (= পুংলিঙ্গ) যোগাযোগে বিকাল গড়িয়ে এল :

তিঅড্ডা চাপী জোইণি দেই অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।। (চর্যা ৪)

এই আবিষ্ট মিলনের মুহূর্তে প্রেমিক যোগীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

যোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।।

যোগিনী, তোকে ছেড়ে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। তোর মুখচুম্বন করে কমলমধু পান করি। —এই যোগী-যোগিনী কি নিতান্তই শুধু হঠযোগের সাধক-সাধিকা? এখানেও কি বলতে ইচ্ছা করে না 'সত্য করে কহ মোরে হে (সাধক)-কবি। কোথা তুমি পেয়েছিলে এ প্রেমচ্ছবি?' এ প্রেমচ্ছবি যদি কোনো নরনারীর হয় তবে একে কবিতা বলতে দোষ কোথায়? এ কবিতায় রিরংসার উষ্ণতা আছে, কিন্তু কোনো বিকৃতি নেই। তাই এটি অশ্লীল নয়। হাজার বছর আগেকার একজন কবির মধ্যে এমন জীবনসংরাগ সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে।

চর্যায় করুণরসের বিধুরতায় অন্তত দুটি রচনা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। একটি কবিতায় এক পোয়াতি মেয়ের আত্মকথনে তার অস্ফুট অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েটি নবযৌবনা, বিবাহিত; কিন্তু তার স্বামী তার প্রতি উদাসীন। তার সন্তান প্রসবের সময় হয়েছে, কিন্তু আঁতুড় ঘরের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। তাই তার বাসনার পুঁটুলি যে প্রথম সন্তান, নাড়ি কাটতে না কাটতেই সে হাওয়া হল :

পহিল বিআণেঁ মোর বাসনযুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া।। (চর্যা ২০)

উদাসীন স্বামীর প্রতি অভিমানের সঙ্গে সন্তানহারা তরুণী মায়ের অপূর্ণ বাৎসল্য-বোধ মিশে গিয়ে এই পঙ্‌ক্তিদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। এর তাত্ত্বিক অর্থ যাই-ই থাক, এর বাচ্যার্থের মানবিক রস উপভোগ করতে বাধা কোথায়? এই রকম বিমর্ষতার আর একটি কবিতা পাই ভুসুকুপাদের হাতে (চর্যা ৪৯)। পদ্মানদীতে ভুসুকুর নৌবহর চলছে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং সোনা-রূপা ও চার কোটি টাকার ভাণ্ডার। হঠাৎ নৌবহরে ডাকাত পড়ল। হিংস্র ডাকাতেরা সোনাদানা টাকা-পয়সা সব লুঠে নিল। এমন কি তাঁর স্ত্রীকেও তুলে নিয়ে গেল। চাঁড়ালের হাতে পড়ে তাঁর স্ত্রী কুলভ্রষ্ট হল। এই সর্বাঙ্গীণ নিঃস্বতার মুহূর্তে কবির মনে হল জীবন এখন অর্থহীন :

চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।। (চর্যা ৪৯)

বলা বাহুল্য, এই রিক্ততার মধ্য দিয়ে সাধক-কবি আসলে তত্ত্বকথাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তত্ত্বের পাটাতন ভেসে ওঠার আগে তো এক হৃতসর্বস্ব রিক্ত মানুষ—যার সোনাদানা এমন কি স্ত্রী-ও ডাকাতের হাতে লুঠ হয়ে গিয়েছে, তার হতাশ ও বিধুর স্মৃতিটিই তো আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এমন মর্মস্পর্শী কবিতা হাজার বছর আগে আর ক'জন লিখেছেন?

চর্যার আর একটি কাব্যিক উপাদান হাস্যরস। তবে চর্যার মধ্যে হাস্যরস কখনো উচ্ছসিত হয়ে ওঠে নি। কখনো pun-এর বাক্‌চাতুর্যে, কখনো-বা ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম টিপ্পণীতে

তা এক অপরূপ বাক্‌শিল্পে পরিণত হয়েছে। চর্যায় pun-এর উদাহরণ তার সন্ধ্যাভাষার বাক্যাবলীতে, যার মধ্যে আছে সন্ধ্যাশব্দের চতুর গাঁথুনি। ইংরেজিতে যা pun, বাংলা বা ভারতীয় মতে তা শ্লেষ অলঙ্কার। শ্লেষ দু'রকম—সভঙ্গ ও অভঙ্গ। pun দুরকমেরই হয়, কিন্তু সন্ধ্যা শব্দ শুধু সভঙ্গ শ্লেষ, এখানে শব্দটি ভেঙ্গে তার দ্বিতীয় অর্থ উদ্ধার করা হয়। কবি ঢেণ্টনপাদ যখন বলেন 'বলদ বিআনল গবিয়া বাঁঝে' (চর্যা ৩৩)। (= বলদ বিয়োল, গাইগোরু বাঁজা) তখন অসম্ভবের দ্যোতনায় আমাদের চেতনা প্রথমে ধাক্কা খায়, কিন্তু যখন টীকার সাহায্যে জানা যায় যে, 'বলদ' শব্দের অর্থ বলদায়ী (এখানে 'বল'-এর তাত্ত্বিক অর্থ অবিদ্যা বা মিথ্যা মায়া), তখন বিভ্রান্তি কেটে যায়। শুধু pun নয়, ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্রে কোনো কোনো চর্যায় জীবন ও সমাজের নানা অসঙ্গতি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা বেশ উপভোগ্য। সামাজিক অনুশাসনে অস্পৃশ্য ডোমের মেয়ে নগরের বাইরে বাস করতে বাধ্য হয়, কিন্তু জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের দুলালেরা তার গোপন স্পর্শ পাওয়ার জন্য কাঙাল, তাই ডোমনি তাদের গোপনে সঙ্গদান করে (চর্যা ১০)। জাতিভেদপ্রথা এমনই অলঙ্ঘ্য!

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।

ডোমনি, নগরের বাইরে তোর কুঁড়েঘর। (তুই) ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস সেই ব্রাহ্মণকুমারকে। সমাজে জাতিভেদ প্রথা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তা দেখা যায় কাহ্নপাদের ১৯ নং গানে। এই গানে দেখা যাচ্ছে কাহ্ন ঢাকঢোল বাজিয়ে সাড়ম্বরে ডোমনিকে বিয়ে করছে। প্রশ্ন উঠল : 'ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম' = ডোমনিকে বিয়ে করে তো জাত খোয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল : 'জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম' = যৌতুক যা পাওয়া গেল তাতেই ধর্মরক্ষা হল। অর্থাৎ কাঞ্চনমূল্যের কাছে শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ একেবারে বশীভূত—এই অসঙ্গতিই পদটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। সামাজিক অনুশাসনের অন্তঃসারশূন্যতা কুক্কুরীপাদের ২ নং গানেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে :

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।।

অন্তঃপুরিকা কুলবধূ সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে এতই সন্ত্রস্ত যে বাইরে থেকে আসা কাকের ডাক শুনলেও সে ভয়ে অস্থির হয়, কিন্তু কী আশ্চর্য! মাঝরাতে যখন বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে কামসেবার্থে প্রেমিকের অভিসারে চুপি চুপি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তীব্র প্রেমোম্মাদনার কাছে কুলধর্মের মূল্য কতটুকু!

সমাজে শুধু ব্যক্তিগত ভ্রষ্টাচারই নয়, মূল্যবোধের সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটলে সার্বিক ভাবে যে দুঃসহ অসঙ্গতি দেখা দেয় চর্যার কবি তাতে আহত হয়েও নিরুপায় কৌতুক বোধ করেছেন। এই কৌতুকবোধের মধ্যেই ফুটে উঠেছে তাঁর নিরুচ্চার প্রতিবাদ :

জো সো বুধী সৌ নিবুধী।

জো সো চৌর সৌ দুষাধী।। (চর্যা ৩৩)

যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সে-ই নির্বোধ। যে আসলে চোর সে-ই হয় দারোগা। মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হলে সমাজে এমন অঘটনই সত্য হয়ে দেখা দেয়। টেন্টনপাদের এই উক্তির তাত্ত্বিক অর্থ যাই-ই হোক, বাচ্যার্থে এই পদ ব্যঙ্গের গাঢ়তায় সমাহিত। স্বাদের দিক থেকে এই পদ হাজার বছর পরের এক কবির সুপরিচিত পঙ্‌ক্তিচয়র সমতুল্য :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই করুণার আলোক নেই,
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

পাদটীকা :

১. সম্প্রতি অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন দেবস্থান থেকে পাওয়া কতকগুলি পোড়ামাটির ফলকের পাঠোদ্ধার করেছেন। এই সব ফলকে কিছু কিছু কথা লিপিবদ্ধ আছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে রচনাগুলির কোনো কোনোটির ভাষা প্রাচীন বাংলা।

২. এখানে সুনীতিবাবু ও সুকুমারবাবুর প্রদত্ত পাঠে কিছু গরমিল আছে। সেই কারণে অর্থোদ্ধারেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

৩. এখানেও পূর্বোক্ত দুইজনের পাঠে গরমিল আছে।

৪. সুনীতিবাবু এই রচনার অর্থোদ্ধার করেননি। প্রদত্ত অর্থ বর্তমান প্রবন্ধকারের। তবে পাঠ অনেকক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হওয়ায় অর্থও স্বচ্ছ নয়।

৫. দ্রষ্টব্য : মধ্যযুগের কাব্যপাঠ—নির্মল দাশ, কলকাতা, ১৯৭৮।

৬. An Anthology of Buddhist Tantanic Songs : A Study of the Caryagita- Per Kvaerne, Oslo, Norway, 1977.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অভিনয় সঙ্কেত

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মুখ্য কাব্যরূপ চারটি—

১। পদরীতি
২। পাঁচালী রীতি
৩। গীতিকা রীতি
৪। নাটগীত রীতি

প্রথম রীতির উদাহরণ চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তগীত ও বাউলগান।

দ্বিতীয় রীতিতে লেখা হয়েছে মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদগুলি। যথা কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী, কাশীরামের ভারত পাঁচালী।

তৃতীয় রীতির রচনা ময়মনসিংহ, পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা।

চতুর্থ রীতির দৃষ্টান্ত হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নাটগীতরীতির আদি লক্ষণ যদিও আছে জয়দেবের গীতগোবিন্দে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে তার অভিনয় সঙ্কেতটি আরও সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ড বাদে বাকি বারোটি খণ্ডই গানে গানে নাট্যপালা রচনা। গানের ক্ষেত্রে পদগুলি যেমন তৎকালীন প্রবন্ধ-সঙ্গীতরীতির সঙ্গে যুক্ত, তেমনি পদশীর্ষের নাট্যনির্দেশগুলি অভিনয়কলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ যেন সেকালের গীতিনাট্য—গানে গানে খণ্ডে খণ্ডে নাট্যপালার আয়োজন।

৪১৮টি পদের সমবায়ে তেরো পালার কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। যদিও পদরীতিতেই খণ্ডগুলি পরিবেশিত কিন্তু নাট্যগীতিরূপেই এর উপস্থাপনা। পদগুলিতে যেমন আছে প্রবন্ধ-সঙ্গীতের সধ্রুবা অবয়ব পদশীর্ষে নাট্যসঙ্কেতের মধ্যে তেমনি আছে অভিনয় সঙ্কেতের চিহ্ন। যে পরিভাষাগুলি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি এযুগে অপ্রচলিত হয়ে এসেছে। যেমন—দণ্ডক, লগনী দণ্ডক, লগনী-চিত্রক, প্রকীর্ণ লগনী, প্রকীর্ণ লগনী দণ্ডক ইত্যাদি। পদের দৃষ্টান্ত সহযোগে এই সঙ্কেত পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। তাঁকে অনুসরণ করেই এই প্রচেষ্টা।

১। দণ্ডক—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে সমস্ত পদ বিবৃতিমূলক একোক্তি বা মনোলগ তাকেই কবি বলেছেন দণ্ডক। যথা—দানখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের একটি উক্তি—যাতে রাধারূপের বিবৃতি—'নীল জলদসম কুন্তলভারা/ বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা (৭৩)। সমস্ত পদটি রূপমুগ্ধ কৃষ্ণের রাধার রূপবর্ণনা। পদটি কেবল কৃষ্ণের উক্তি, রাধার প্রত্যুত্তর নেই। কাজেই এটা সংলাপ হয়ে উঠল না। এটা কৃষ্ণের একালাপ—রাধার উদ্দেশে

ব্যক্ত। এই জাতীয় বিবৃতিমূলক একোক্তিকেই বলা হয়েছে দণ্ডক।

২। লগনী—কিন্তু যদি কোন পদে রাধাকৃষ্ণের দ্বিরালাপ বা সংলাপ থাকে তখন আর তাকে দণ্ডক বলা যাবে না, তা হবে লগনী। উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ হল লগনী। যেমন—দানখণ্ডের ৫২ নং পদ—

কৃষ্ণ— তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।।
রাধা— যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।।
কৃষ্ণ— তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরূপেসি জান।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান।।
রাধা— এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ।। (৫২)

এ হল কথার পিঠে কথা। এই ধরনের নাট্য সংলাপকে কবি নির্দেশ করেছেন লগনী বলে।

৩। লগনী দণ্ডক—নাট্য সংলাপের সঙ্গে কবির বিবৃতি যদি যুক্ত হয় তাহলে তাকে কবি নির্দেশ করেছেন লগনী দণ্ডক বলে। রাধা কৃষ্ণ সংলাপের শেষে যুক্ত হয়েছে কবির বিবৃতি বা নির্দেশ। যথা যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণ খণ্ডের একটি পদে রাধা-কৃষ্ণের সংলাপ।

কৃষ্ণ— কাহার বহু তোঁ কাহার রানী।
কেহ্নে যমুনা তোলসি পানী।।
রাধা— বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পানী তুলি তোহ্মাতে কী।।

এইভাবে রাধাকৃষ্ণের সংলাপের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির শেষে চারলাইন ভনিতা সহ কবির বিবৃতি—

রাধার নিঠুর সুনিআঁ বাণী / মনত ভয় পাইল চক্রপানী
রস রাখে রাধা না দিল আশে / বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে (২৫৬)

দণ্ডক পদে থাকে কবি বা কোনো চরিত্রের বিবৃতি বা একালাপ। লগনী পদে থাকে দুটি চরিত্রের কেবলমাত্র সংলাপ, আর লগনী দণ্ডকে থাকে কবির অন্তিম বিবৃতি সহ দুটি চরিত্রের দ্বিরালাপ।

৪। বিচিত্র লগনী দণ্ডক—এই নামচিহ্নিত পদগুলিতে নাট্যচরিত্রের দ্বিরালাপ, কবির বিবৃতি আর নাট্যোদ্যোগ অর্থাৎ একালের পরিভাষায় যাকে বলে action বা নাট্যক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে যে পদে এই তিনটি ব্যাপার একত্রে ঘটে তাকে বলা হয়েছে বিচিত্র লগনী দণ্ডক। বংশীখণ্ডের শেষ পদটি যেমন

রাধা— কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী বড়ায়ির মুখে।

কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে।।
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তে কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী।।
কৃষ্ণ— রাধা। বিরহে আকুলী ভৈলী আপনার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে।।
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে।
তবেঁ কি বিরহ দুখ তোক দিএ আহ্মে।।
রাধা— কাহ্নাঞিঁ। যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোঞঁ কৈলোঁ।
তে কারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ।।
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে।
মোক রোস না করিহ কাহারো বচনে।।
কৃষ্ণ— তোর প্রতি মোর মনে নাহি কিছু রোষে।
এহা তত্ত্ব করী জানী দেহ মোরে বাঁশে।।
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ।।

এইভাবে রাধা কৃষ্ণের সংলাপ চলছে। কেবল মাত্র যদি চরিত্র দুটির সংলাপে পদটি সমাপ্ত হত তাহলে এটি হত 'লগনী'। কিন্তু পদের শেষকালে আছে কবির বিবৃতি—

হেন মতে বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।
কালী নই তীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে।।
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর।। (৩৪৯)

এই শেষ চার পংক্তি নাট্যসংলাপের শেষে কবির বিবৃতি। এই কারণে এটি 'লগনী' না হয়ে হল লগনী দণ্ডকের পদ। আর বিচিত্র লগনী দণ্ডক বলা হল কেন পদটিকে? কারণ সংলাপের মধ্যে যখন কৃষ্ণ রাধার কাছে বংশী প্রার্থনা করলেন তখন এক সময় ঘড়ার ভিতর থেকে লুকোনো বাঁশীটা বের করে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে গিয়ে রাধা বললেন—

'হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।'

এই যে নাট্যক্রিয়া বা action রাধাকে দিয়ে করানো হল সেজন্য এই পদটি আর 'লগনী দণ্ডক' না হয়ে 'বিচিত্র লগনী দণ্ডক' হয়ে উঠল। নাট্যক্রিয়া, সংলাপ আর কবির বিবৃতি একসঙ্গে থাকার ফলে কবি পদটির পরিচয় দিলেন 'বিচিত্র লগনী দণ্ডক' বলে।

৫। লগনী চিত্রক—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো পদে যদি দুটি চরিত্রের সংলাপ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় নাট্যক্রিয়া বা action, তাহলে কবি সেই পদটিকে বিশেষিত করেছেন 'লগনী চিত্রক' সঙ্কেতে। যথা বংশীখণ্ডের একটি পদ (৩৪৫) যেখানে বড়ায়ি বংশী প্রার্থনা করে রাধার কাছে কৃষ্ণকে হাতজোড় করতে বলেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তা করতে চাইছেন না,

এই নিয়ে বড়ায়ির সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি বা কথা কাটাকাটির পরে অবশেষে কৃষ্ণ হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। বড়ায়ি ও কৃষ্ণের সংলাপের শেষে কৃষ্ণের হাতজোড় করে দাঁড়ানোর এই নাট্যক্রিয়ার জন্য পদটি কবির পরিভাষায় হয়ে দাঁড়ালো 'লগনী চিত্রক'।

৬। **প্রকীর্ণ লগনী**—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পদগুলিতে নাট্যসংলাপের আদিতে মধ্যে ও অন্তে থাকে কবির বিবৃতি সেই সব প্রকীর্ণ উক্তি সম্বলিত নাট্যসংলাপাত্মক পদগুলিতে বলা হয়েছে প্রকীর্ণ লগনী। এ যেন পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনের মাঝে কবির বিক্ষিপ্ত মন্তব্য বা নির্দেশ। যেমন ধরা যাক তাম্বুল খণ্ডে বড়ায়ি রাধার কথোপকথনের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে কবির বিবৃতি—

পদের আদিতে—

কবি— কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি বসিআঁ রাধার পাশে
কর্পূর, তাম্বুল দিআঁ রাধাক বিমুখ বদনে হাসে। ল বড়ায়ি।

রাধা— কহির কপূর তাম্বুল বড়ায়ি কহির নেত পাটোর।
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ল বড়ায়ি।

বড়ায়ি—আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা পাঠাইলা তোহ্মো বেথা।।

পদের মধ্যে—

কবি— এ বোল সুনিআঁ নাগরী রাধা হানএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ।।
উঠিয়া বড়ায়ি রাধাক বুইল—

বড়ায়ি— হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন তোর দরশনে জীএ।।

রাধা— ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।।

পদের অন্তে—

বড়ায়ি—যে দেব মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।
যে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।।

রাধা— ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী।।

কবি— নাগর শেখর নান্দের সুন্দর উপেখিল মতিমোষে।
বাসলী চরণ শি(রে) বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। (২২)

৭। **প্রকীর্ণ লগনী দণ্ডক**—এই জাতীয় পদে আছে একাধিক চরিত্রের সংলাপের পাশাপাশি মাঝে মাঝে কবির ঘটনা বিবৃতিসহ মন্তব্য। এখানে আদ্যন্ত বিবৃতির প্রাধান্য

এবং কবির ঘটনা বিবরণ কাহিনী কথনের মতো। যেমন রাধাবিরহের একটি পদ—

কবি— বড়ায়িকে তবেঁ বুইল রাধা

রাধা— কি পুছহ মোরে বুধী।

আহ্মার হৃদয় চন্দনে কাহাঞিঁ আপনেঞিঁ কর সুধী।। ল বড়ায়ি।

কবি— রাধার বচন শুনী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী।

বড়ায়ি—তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপানী।। ল রাধা।

কবি— দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।

হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী আসিআঁ দিল দরশনে।। ল রাধা।।

(নারদের প্রবেশ)

কবি— করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।

রাধা— নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে।। স মুনী।।

কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।

কাহ্ন বিনি মো যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিব সকল দেশে।।

কবি— রাধার বচন শুনী মাহামুনী বাসলী যোগ ধেআনে।

জানিল কদমতলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে।।

নারদ বুইল

নারদ— কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে।

কুসুম সেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবে দেবরাজে।।

কবি— নারদের বোল বেদ সমতুল মনে ধরী চন্দ্রাবলী।

চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী।।

কৃষ্ণের বদনদূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে।

ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।।

চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে।

রাধা— বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে।।

বড়ায়ি—এঁবে কি করিবোঁ পরান নাতিনী বোল হরষিত মণে।

তোহ্মার আন্তরে প্রাণ উপোখিআঁ করিব তাক যতনে।।

রাধা— মনে পরিভাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপনে।

ভাল মতে মোর দুখ কথা কহ নিদুখ কাহ্ন চরণে।।

কবি— এ বচন শুনী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। (৩৯৬)

৮। প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী দশুক

এই জাতীয় পদে একদিকে থাকে নাটকীয় উদ্যোগ বা action অন্যদিকেমাঝে মাঝে

কবির বিবৃতিসহ চরিত্রদ্বয়ের সংলাপ।

যেমন—রাধাবিরহের ৩৭২ নং পদটি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য।

বড়ায়ি— সুন নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী লইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।।
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্নু বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর।।

রাধা— মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী।।
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন।।

কবির বিবৃতি— রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন।

বড়ায়ি— আও জাতা রাধা কাহ্নু চাহিতে আপুনী।
তবে সে মেলিব তোকে দেব চক্রপানী।।

কবির বিবৃতি— বড়ায়ির বচন শুনী উল্লসিত মতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।।
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী।।
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।।
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। (২৬৮)

পদটি আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণের অনুসন্ধান ব্যাপারে বড়ায়ি ও রাধার সংলাপ দিয়ে, কিন্তু শেষকালে কবির বিস্তৃত ঘটনা বিবরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বনমালীকে বনের ভিতর দেখতে পেয়ে রাধার মূর্চ্ছা এবং বড়ায়ির জলসিঞ্চনে মূর্চ্ছাভঙ্গের নাটকীয় উদ্যোগ—এই কারণে পদটি প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী দণ্ডক। অর্থাৎ সংলাপসহ কবির বিবরণে নাট্যোদ্যোগময় ঘটনাবিবৃতি।

৯। **কাব্যোক্তি প্রকীণ্ণক লগনী**—বিবৃতিমূলক সংলাপাত্মক গানে আবেগময় নাট্যক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে হবে কাব্যোক্তি প্রকীণ্ণক লগনী। অর্থাৎ কাব্যময় বিবৃতিমূলক সংলাপ।

যথা—রাধাবিরহে রাধার বিরহকথা উত্থাপন করে গতভৃষ্ণ কৃষ্ণের প্রতি বড়ায়ি।

কবি— কাহ্নাঞিক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।

বড়ায়ি—চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।।
লুনী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে।।
বিলম্ব না কর সুন সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।।
কবির বিবৃতি—বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি।।
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
বড়ায়ি—রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহাঞিঁ।।
কবির বিবৃতি—চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুনী।
ঈষত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।।
কৃষ্ণ— বুইল মনোহর বেশ কর গোআলিনী।
পাছে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী।।
কবির বিবৃতি—কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।।
রাধার ক্ষণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। (৩৯৯)

এই পদে আছে বড়ায়ি ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি তাই লগনী। কিন্তু মাঝে মাঝে আছে কবির বিবৃতি। বিবরণে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের প্রতি বড়ায়ি-এর আবেগময় আদর। সংলাপের মধ্যে এই আবেগময় নাট্যক্রিয়া বর্ণিত হওয়ার দরুণ এই পদ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী।

এইভাবে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানা ঢঙের পদ আছে। কখনও একজনের ভাষণ (দণ্ডক) কখনও দুজনের সম্ভাষণ (লগনী), কোথাও কবির বিবরণ (প্রকীর্ণক), কোথাও বা নাট্যক্রিয়া (চিত্রক) এবং কখনও বা আবেগ (কাব্যোক্তি)—এইসব অভিনয় বা নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষা সম্বলিত নাট্যসঙ্কেত যুক্ত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিছক কাব্য না হয়ে, হয়ে উঠেছে নাট্যরীতিতে পরিবেশিত সেকালের নাটগীত।

আধুনিক পাঠক ও বৈষ্ণব পদাবলী, আধুনিক কবি ও বৈষ্ণব পদাবলী

সত্যবতী গিরি

জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে যাদবেন্দ্র দাস পর্যন্ত আদি আর মধ্যযুগের কবিদের বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদনে তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কাব্যরস উপভোগ করার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু একজন আধুনিক পাঠক কোনো কবিতা, গল্প অথবা উপন্যাস পড়তে বসে কি কেবলমাত্র তার বর্ণনার সৌন্দর্যে নিজেকে মোহিত করে নিজস্ব আস্বাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন? দেশকালের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যকে রাখতেই হয়, এমনকি সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য ঘটে যায়। তাই একজন আধুনিক সচেতন পাঠক হিসেবে বলতেই হয় যে বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বনিরপেক্ষ যথার্থ কাব্যপাঠ হয় না। কারণ গড়ে ওঠা তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে বৈষ্ণব কবিতাকে ফেলে দেখলেই তার যুগপ্রেক্ষিতকে, শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসকে ধরা যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিরা মাঝে মাঝে এমন এক একটি কবিতা আমাদের উপহার দেন যেগুলিকে আমরা কোনোমতেই তত্ত্বের খাঁচায় আটকে রাখতে পারি না। তেমনি কিছু কবিতা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত বলরাম দাসের বাৎসল্যের পদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পঞ্চরসাশ্রিত কৃষ্ণ উপাসনায় বাৎসল্য রস একটি গুরুত্বপূর্ণ আলম্বন। আর বলরাম দাস বাৎসল্য রসের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলিতে কৃষ্ণ উপাসনার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু বাঙালি পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক স্নেহময় প্রাত্যহিকতার উপর এর প্রতিষ্ঠা। তাই এর মাধুর্য, এর স্নিগ্ধতার যে সৌন্দর্য তা অভ্যাসের তুচ্ছতায় আকীর্ণ। বলরাম দাসের মতো কবিরা সেই তুচ্ছতা থেকেই আহরণ করেছেন বাস্তবের ছবি।

বাঙালি বলরাম দাসের বাৎসল্যরসের পদে আঁকা জননী যশোমতী একান্ত ভাবেই এক বাঙালি মা। স্বামী সন্তান স্বজন-পরিজনে ঘেরা তাঁর একান্ত মমতায় গড়া সংসারের সীমাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিনযাপন, তিনি সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী। এর বাইরে কোনো বড় আদর্শ, কোনো মহৎ ভাব সন্তানের কোনো মহৎ কীর্তির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাঁকে স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান। অথচ মহাকাব্যের বাল্মীকির আঁকা জননী সুমিত্রা, সপত্নী পুত্র রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে ইচ্ছুক একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণকে বাধা তো দেনই নি, বরং বলেছিলেন— 'এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ।' এখানেই শেষ নয়, তারপরেও—''সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তাম।'' সুমিত্রা বারবার লক্ষ্মণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে যেতে বললেন। অন্যদিকে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও আমরা অলকজননী মদালসাকে

দেখেছি, যিনি পুত্রকে ধর্মমার্গ গ্রহণ করে সংসারত্যাগী যোগী হওয়ার উপদেশ দেন। মহাকাব্যের এই মহীয়সী জননীরা তাঁদের চরিত্রের মহান আদর্শে উজ্জ্বল—কিন্তু আমাদের দূরবর্তিনী। অন্যদিকে জননী যশোদা আমাদের পরিচিত গৃহাঙ্গনের একান্ত আপন এক মাতৃমূর্তি।

অন্যদিকে বলরাম দাস শুধু কৃষ্ণের অদর্শনে মায়ের উৎকণ্ঠাই বর্ণনা করেন নি, সেইসঙ্গে তাঁর কৃষ্ণ ও গোচারণ ক্ষেত্রে মায়ের জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করেছে। একদিকে বাইরের পৃথিবীর আহ্বান আর অন্যদিকে মায়ের স্নেহ এই উভয় আকর্ষণের সমান ভাবে দোদুল্যমান এই বালক কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান তা আমাদের মনেই হয় না। তিনি যেন বাঙালি পরিবারেরই এক মাতৃবৎসল শিশু। তাই সারাদিনের খেলাধূলার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গোপাল শ্রীদামকে বলে—'পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়। সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়' এবং মাকে না দেখে গোপালের 'প্রাণ কেমন জানি করে'।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে বলরাম দাস দীক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণব কবি। তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী রচনা ধর্মীয় সাধনারই অঙ্গ। তিনি পদ রচনা করেছেন মধ্যযুগের বাঙালি পরিবারের ছবি তুলে ধরার জন্য নয়, তাঁর ভক্তি সাধনাকে প্রকাশ করার জন্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর চতুর্থ লহরীতে বাৎসল্য রসের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

বিভাবাদৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।

অর্থাৎ বাৎসল্য (রতি) স্থায়ী (ভাব) বিভাবাদি দ্বারাই তুষ্টিপ্রাপ্ত। সেইসঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছে—'কৃষ্ণং তস্য গুরুংশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ'।

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বাৎসল্যরসের কৃষ্ণ ও তদীয় গুরুবর্গকে আলম্বন বলেন।

এই গুরুবর্গের মধ্যেই শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন যশোদা। তাই আলম্বনের উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী যশোদার কথাই উল্লেখ করেছেন—

নবকুবলয়দাম-শ্যামলং কোমলাঙ্গং
বিচেলদলক-ভৃঙ্গ-ক্রান্ত-নেত্রম্বুজান্তম্।।
ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী
ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রসুবোৎপীড়দিগাঙ্গা।।

অর্থাৎ যাঁর বর্ণ নবনিলোৎপল শ্রেণীর মতো শ্যাম, যাঁর অঙ্গ সুকোমল, যাঁর নয়ন পদ্মের প্রান্ত চঞ্চল, চূর্ণ কুন্তল রূপ ভ্রমর-দ্বারা আক্রান্ত এমন পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করতে দেখে ব্রজপতি দয়িতা যশোদা স্বয়ং ক্ষরিত স্তন দুগ্ধে সিক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ পুত্রকে অবলোকন করায় তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ বলপূর্বক ক্ষরিত হয়ে তাঁর শরীর আর্দ্র করেছে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর এই উদাহরণেই বলরাম দাসদের মতো কবিকে তাঁদের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী বাৎসল্য রসের পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং তত্ত্ববিযুক্ত

কবিতা হিসেবে এগুলিকে আস্বাদন করলে কবিতার রস হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু কবিতাটিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা হয় না।

গোবিন্দ দাসের দু-একটি পদকে অবলম্বন করেও একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। মান পর্যায়ের একটি পদে গোবিন্দ দাসের রাধা মান করার জন্য কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তিনি কৃষ্ণকে আরো বলেন—

তুঁহ যদি লাখ গোপী সঞে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সে মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল আধ না ভাবিয়ে মন্দ।।

শেষ পর্যন্ত এই ঈর্ষা থেকে উত্তরণের প্রয়াস কিন্তু রাধার নিজেরই হৃদয়কে রক্তাক্ত করে, সেই রক্তবিন্দু দিয়ে উচ্চারণ। বহু শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে এক রোমান্টিক কবির রোমান্টিক নায়িকা অথবা নায়কের কণ্ঠে অনুরূপ ভাবেই উচ্চারিত হয়—

যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও ....

আপাত দৃষ্টিতে রাধার উক্তিটিও রোমান্টিক প্রেমের বেদনা মাধুরী মেশানো বলেই মনে হয়। চিরকালের প্রেমিকার বৈশিষ্ট্যই যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রাধার এই উক্তিটি উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণের অধিরূঢ় মহাভাবের একটি বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করেছে। অধিরূঢ় মহাভাবের দুটি ভাগ—মোদন ও মাদন। মোদনের প্রগাঢ় অবস্থাই মোহন। রাধার এই উক্তি সেই মোহন ভাবেরই প্রকাশ। এক্ষেত্রেও বৈষ্ণবীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম প্রকরণ বিভাগের ছক না জেনে এই কবিতাটি আস্বাদন করা যায়, কিন্তু বাংলা ও বাঙালি সমাজের যে বিশেষ ধর্মীয় সামাজিক পরিবেশে এই কবিতা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব আধুনিক কবি ও বৈষ্ণব পদাবলী। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্পদ ও রূপ সম্পদ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা তার ভিতর থেকে একটি মাত্র কবিতা 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের পসারিনীকে বেছে নিচ্ছি। এই কবিতার প্রেরণা স্পষ্টতই ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য সমসাময়িক কবি বংশীবদনের দানলীলার একটি পদ থেকে পাওয়া। বংশীবদনের পদটিতে কৃষ্ণও রাধাকে অনুরোধ করেন, এই তপ্ত দ্বিপ্রহরে রাধা যেন আর না যান, রাধার পসরা কৃষ্ণই সব কিনে নেবেন। কৃষ্ণের চোখ দিয়ে দেখা মধ্যাহ্নের খরসূর্যতাপে ঘর্মাক্ত রাধার চিত্রটি অঙ্কন বংশীবদনের প্রতিভার পরিচায়ক—

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভারে আউলাইল কবরী।

মনে হয় শ্রমক্লান্ত রাধা আর ব্যথিত কৃষ্ণের মমতাকাতর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারেই জীবন্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'পসারিণী' কবিতায়

এর প্রভাব পড়েছে। পসারিণীকে সম্বোধন করে কবিও কৃষ্ণের মতই বলেন—এতভার মরি মরি কেমনে বয়েছ ধরি/ কোমল করুণ ক্লান্ত কায়। বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।

আর রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে বলেন—

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

মধ্য দিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার কোলে
সকলি কিনিয়া লব আমি।

কৃষ্ণের করুণরঙীন, কোমলমধুর প্রেম এইভাবে আধুনিক যুগের কবির কাব্যকেও স্পর্শ করেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের মতো বৈষ্ণব পদাবলীর নির্যাস নানাভাবে সুরভিত করেছে আধুনিক কবিদেরও। আসলে অনিবার্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে *T. S. Eliot* যথার্থভাবেই আমাদের জানিয়েছেন—

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead-poets and artists. You cannot value him alone : (Tradition and Individual Talent).

অনেক সময় বৈষ্ণব পদাবলী নয়—তার নায়ক কৃষ্ণের পৌরাণিক ইমেজও উঠে এসেছে আধুনিক কবিদের কবিতায়। এক্ষেত্রে হয়তো মিথের শিকড় সেখানে গভীরে যায়নি, কিন্তু তার আর্কিটাইপকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। একই মিথ বিভিন্ন শিল্পীর হাতে পরিবেশিত হয়ে থাকে ভিন্ন ভাবে। বৈষ্ণব পদাবলী তথা কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আর সেই কারণেই বিষ্ণু দে'র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধ্যা রাত্রি ভোর' কবিতায় 'ছোটো ছোটো মেঘ' হাজার ধবলী স্থির। তারা 'কার বাঁশি শোনে'।

এই একই কবিতায় বলরামপুরের জঙ্গলে রূঢ় কঠিন পাহাড়ের ওপরের আকাশে গতিশীল মেঘ দেখে কবির মনে হয়—

আর ছোটে দঙ্গলে জঙ্গলে অন্ধ ও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা
অসহায় গোপিনীর মতো ছোটে পাণ্ডুর মেঘেরা।

ভাগবতের—ভাগবত প্রভাবিত রাসলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে পুরোপুরি নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিয়ে কবি বলেন—

যেন কোনো লঙরের খাওয়ার সন্ধানে
কলকাতার পথে পথে অনাহারী ভিড়ে
ভিখারী স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
কিংবা কোনো কাঁদুনে বোমায় ডালহৌসীর ফেরারি জনতা।

এক্ষেত্রে ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস পুরাণের নব রূপায়নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা উদ্ধৃত করতে পারি—

"mythology would be held to be reflection of the social structure and of social relations. And observation contradicts the hypotheses they will immediately suggest that the proper object of mytho is to offer a derivator to real but compressed sentiments."

আসলে পুরোনো ক্লাসিককে নতুনভাবে ব্যবহার করা যেন অনেক রহস্যময়—অনেক অচেনা অন্ধকার থেকে কিছুটা সংশয় আর কিছুটা অপরিচয়ের সংকোচ ঠেলে সরিয়ে তুলে আনা স্বয়ংপ্রভ মণির প্রেমে ধন্য হয়ে যাওয়া।

বৈষ্ণব পদাবলীতে একদিকে আছে এক রূপবান কিশোর—তার প্রেমে পাগল অসংখ্য যুবতী, তাদের ফেলে চলে যাওয়া—কোনদিনই ফিরে না আসার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।

আবার অন্যদিকে রাধার সর্বস্বত্যাগী একনিষ্ঠতার বিপরীতে তাঁর অবিশ্বস্ততা আর আপাত বহুচারিতাও কৃষ্ণ সম্পৃক্ত আধ্যাত্মিকতার আবরণকে সরিয়ে এক কৌতুকতরল লঘুতায় লিপ্ত করেছে তাঁর চরিত্রকে—প্রবাদে প্রবচনে যার অবধারিত প্রকাশ।

আধুনিক কবিরা তাঁদের নিজস্ব জীবন ভাবনা আর জীবন ভাষ্যের সংস্পর্শে এই পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় কাব্য নায়ক চরিত্রকে নতুন ডাইমেনশন দেন। বিষ্ণুদের অনেক পরবর্তী কবির লেখা কবিতায় আমরা খুঁজে দেখতে পারি কৃষ্ণের নতুন নির্মিতিকে।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জয় গোস্বামীর 'আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস 'কর' কাব্য গ্রন্থটি। এরই একটি খুব পরিচিত মুখে মুখে ফেরা কবিতা—'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'। জয় গোস্বামীর কবিতায় কালো নিম্নবিত্ত বাঙালি মেয়েরা বারবার আসে। তারা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ' কবিতার নায়িকার মতো স্বামীর গোপন চুম্বনে অভিষিক্ত হয়ে ভাবী সন্তানদের নাম 'আফ্রিকা' রাখার স্বপ্ন দেখতে পারে না। তাদের জীবনে প্রেম আসে প্রতারণাময় ইন্দ্রজালের ক্ষণিক বর্ণাঢ্যতায়। তাদের জীবনের পরবর্তী অন্ধকার এত সান্ত্বনাহীন—নিম্নবিত্ত জীবনের সেই অন্ধকারে বসে বেদনা রোমন্থন ও এক স্বপ্ন বিলাসমাত্র। 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' সেই দিশাহীন নিরাশ অন্ধকারে ঘেরা বাস্তবের কবিতা। কবিতায় যে মেয়েটি তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলে তার কোনো নাম নেই।

তার প্রেমিকের নাম বেণীমাধব কৃষ্ণের একটি প্রচলিত প্রতিশব্দ। গোটা কবিতায় বৃন্দাবনের কৃষ্ণের ইমেজ একবারই এনেছেন কবি—

বেণীমাধব, মোহন বাঁশী তমাল তরু মূলে
বাজিয়েছিলে ....

বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ ব্রজাঙ্গনারা ঘর ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতায় পথে বেরিয়েছিল; আর আধুনিক বেণীমাধবের মোহন বাঁশীতে ষোল বছরের এক কালো মেয়ের কুঞ্জে অলি গুঞ্জে আর মঞ্জরী ফোটে। তার বাবা দোকানের সামান্য কর্মচারী। রূপ নেই, সামাজিক সম্মান অথবা পরিচয় কিছুই নেই মেয়েটির। আধুনিক কৃষ্ণের সঙ্গে তার দেখা হয় ব্রীজের ধারে গোপনে। এই বেণীমাধব বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যায় না। নামহীন কালো মেয়েটি তার সুন্দরী প্রেমিকার সঙ্গে তাঁকে দেখে 'অপূর্ব আলোয়'। সে স্বীকার করে 'দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো'। কালো মেয়েটি বাড়ি ফিরে চণ্ডীদাসের রাধার মতো বলতে পারে না—

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া—
এমতি করিল যে
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

বরং নিরুপায় হতাশায় সে বলে—"ওদের ভালো হোক।" একতলার ঘরে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে তার মনে পড়ে দিশাহীন দারিদ্রের অন্ধকারে চোরাপথের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া বোনের কথা। সেই বোনের ঠিকানা তার জানা নেই—জানা নেই নিজের আগামীকাল সম্পর্কেও। মাথুর বিরহের বেদনা বিলাস নয়, বেঁচে থাকার তাগিদে নিছকই সেলাই দিদিমনি হয়ে যাওয়া মেয়েটি বেণীমাধবের কাছেই প্রশ্ন রাখে সে নষ্ট মেয়ে হলে কেমন হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'-র মতো স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও তার নেই। মেয়েদের বিকল্প জীবনের কিছু উজ্জ্বলতার পাশাপাশি গাঢ়তর অন্ধকারের ছবি এই কবিতা। তাই কবিতার নাম 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'—সাধারণ নিম্নবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের জন্য অনভিজাত স্কুল। তাদের জীবনেও কৃষ্ণ আসে—কিন্তু তারা কেউ রাধা হয়ে উঠতে পারে না। এই কবিতার বেণীমাধব কৃষ্ণ আজকের প্রজন্মের অবিশ্বস্ত প্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী রাখাল কবিতাটি কিন্তু কৃষ্ণেরই কবিতা। গোটা কবিতায় চূড়ান্ত অ্যান্টিরোমান্টিক বিদ্রূপ আর শ্লেষ কবিতা পাঠকদের মনের নির্জ্ঞান স্তরের কৃষ্ণ মিথ্ কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আবারও জয়ের কবিতায় আসে পাড়ায় পাড়ায় কালো মেয়ের কথা। তাঁর কৃষ্ণ যদি ছন্দ হত তবে ছন্দ রাখাল কৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করতেন কালো মেয়েদের গতি করে দেওয়ার জন্য—

'তুই কিছু ব্যবস্থা কর, বরপক্ষ এত চাইছে পেরে উঠবো না,
আজ কিংবা কাল

তোকে তো আসতেই হবে; তুই এসে ব্যাটাদের খিঁচে দিবি খাল,
সবাই তাকিয়ে আছে তোর দিকে কবির রাখাল।'

'সম্ভবামি যুগে যুগে'র থিয়োরি মেনে নিয়ে কবির কৃষ্ণকে মর্ডানাইজেশানের এই চেষ্টা মিথের সঙ্গে মিশিয়ে, আর এই চেষ্টায় আজকের অ্যাভারেজ সামাজিক মানুষেরই তিনি একজন। 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'-এর নায়ক আজকের কেরিয়ারিস্ট ফ্লার্ট করা কৃষ্ণের পরিবর্তে আর এক কৃষ্ণ উঠে আসে 'রাখাল' কবিতায়। সমাজের আর এক স্তরের ভ্রষ্ট যুবশক্তি এই কৃষ্ণ ওয়াগন ব্রেকার। সে বেণীমাধবের মত লেখাপড়ায় ভালো নয়, তার মুখে চাপ দাড়ি, গালে কাটা দাগ, লাল গেঞ্জি আর ঝাঁকড়া চুল নিয়ে সে চুল্লুর আড্ডায় বসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে। তার লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সুদামা-র লাশ ফেলে দেওয়া।

দুটি কবিতায় দুই সামাজিক পরিবেশ থেকে উঠে আসে কৃষ্ণ। কবি খুব নির্মম ভাবে ভেঙে দিতে চান কৃষ্ণ সম্পর্কিত যাবতীয় রোমান্টিক মোহ, শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম। এই ভেঙে দেওয়ার ভিতর দিয়েই চিনিয়ে দেন যুগকে আর সমকালীন সমাজকে।

দুটি কবিতায়-ই ব্রীজের তলার চালচিত্র। একটিতে ব্রীজ অভিসারের নিভৃত কুঞ্জের বিকল্প আর একটিতে কৃষ্ণ-বলরাম-শ্রীদাম-সুদামের সখ্যরসের প্রবাহ সিক্ত গোষ্ঠের বিকল্প। বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠলীলায় কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখলে সখাদের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় আর এই কৃষ্ণও বন্ধুত্বের মূল্য দেওয়ার জন্য ইচ্ছে করে খেলায় হেরে যান। আর এই কৃষ্ণের লক্ষ্যই হল সুদামার লাশ ফেলে দেওয়া। বন্ধুত্ব প্রেম সব কিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর কোনদিন ফেরা যাবে না বন্ধুতার আর প্রেমমুগ্ধতার সেই অনাবিল প্রসারে। কিন্তু এই স্মৃতিবেদনায় পাঠকের নিমজ্জন কবির উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান সমকালীনতার সমস্ত নেতিকে চিনিয়ে দিতে আধুনিক কৃষ্ণ তাঁর সেই উদ্দেশ্যকেই সফল করে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ঃ মধ্যযুগের কবিদের চোখে

সনৎকুমার নস্কর

সাহিত্যের সার্থকতা কি শুধু সৃষ্টিতে? পাঠক-নিরপেক্ষ তার কি স্বতন্ত্র মূল্য আছে? উপভোগবাদের দিক থেকে বিচার করলে এ দুটি প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই মিলবে। কেননা ঐ মতবাদ বলে, সাহিত্যের চূড়ান্ত সার্থকতা নির্ভর করে যথার্থ উপভোগে—রস উপচিত হয় সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী ভোক্তা-পাঠকের মনে। ফলে যোগ্য উপভোক্তা পাওয়াও লেখকের ভাগ্যের ব্যাপার। বোধহয় এই কারণেই পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য যথাস্থানে আস্বাদিত না হওয়ায় সেই সব সাহিত্যিকদের ভাগে দুর্নাম ও গ্লানি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। আবার অনেক কবি তাঁর সমকালের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ছিলেন যে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর সৃষ্টি সমাদৃত হতে পেরেছে। কবিদের এই দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করে বোধহয় বররুচি বলেছিলেন—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্যবিচার বন্দী হয়েছিল অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুগ কারাগারে। রস, রীতি, ধ্বনি, অলঙ্কার, ঔচিত্য ইত্যাদির মানদণ্ডে তৌল করা হতো কাব্যপ্রতিভা। যাঁরা নামতেন কাব্যবিচারে তাঁদেরও কেউ কেউ ছিলেন সাহিত্যের স্রষ্টা। মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুদের গোলাম হয়ে রাজসভার কবিরা লিখতেন প্রকীর্ণ শ্লোক, পাঁচালী, প্রণয়কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য। আর কিছু কলম নিয়ন্ত্রিত হতো সুনির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠী ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস দ্বারা। স্বাধীন পাঠক-গোষ্ঠীর জন্ম তখনো দূর-অস্ত। ফলে রাজসভা আর দেবমন্দিরের দিকে তাকিয়েই কবিদের প্রহর গুনতে হয়েছে। মধ্যযুগের অনেক বাঙালি কবির জীবনেতিহাসে চোখ বোলালে দেখা যাবে, পৃষ্ঠপোষক রাজা, সম্রাট কিংবা প্রভাবশালী জমিদাররা তো বটেই, এমনকি পদস্থ কর্মচারীরাও কবিদের লেখনী- তুরঙ্গমের বল্‌গা টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মস্থানে ধর্মের আর অধিকাংশ রাজসভায় আদিরসের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা পুতুলে পরিণত হননি, বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টাদেরও স্বাধীনতা বিকিয়ে গিয়েছিল। সেই দাসখতের চিহ্ন পড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য আর প্রণয়-কাব্যের পাতায় পাতায়। অতএব এই দুই প্রতিষ্ঠানকেও এক শ্রেণীর সমালোচক বলে গণ্য করতে হবে, অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করতে হবে তাদের কাব্যস্রোত নিয়ন্ত্রণের আংশিক ক্ষমতা।

কবি কর্তৃক কবিদের সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব একটা প্রাচীন নয়। মধ্যযুগ থেকেই এর সূচনা ধরা যেতে পারে এবং অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলি ছড়িয়ে আছে। মুদ্রণযন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব না থাকায় সেকালে পুস্তকের ব্যাপক প্রচলন হতে পারেনি এবং এর ফলেই পূর্ববর্তীকালের ও সমকালের সাহিত্যচর্চার পরিচয়ও সকলের কাছে অবারিত

হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে 'সমালোচনা' নামক বস্তুটিরই তখন যথার্থ অভাব ছিল। স্বাধীন পাঠকের যে নিজস্ব মতামত দানের অধিকার থাকে—এটা জানতে পারা গেছে উনিশ শতকে পশ্চিমী শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে ওঠার পর। ধর্মমূলক সাহিত্যের প্রচার ছিল একেবারে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। ফলে সেখানে ব্যক্তিপাঠকের মতামতের তুলনায় সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রতিবেদনটাই মুখ্য। বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি শাখা আছে যেখানে 'সমালোচনা মানেই পূজা'—এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল বৈষ্ণবজীবনী কাব্য। এর পিছনে যে কারণটি লুকিয়ে আছে সেটি সাহিত্যের রসবোধের তুলনায় মোহন্তকেন্দ্রিক সম্মাননা ও বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত। শুধু রীতি হিসেবেই নয়, হয়তো বা অনেকে সত্যসত্যই চালিত হতেন সম্মান-প্রদর্শনের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের দ্বারা এবং সেক্ষেত্রে রসবিচার ব্যতিরেকেই কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে যেতো কেবল অগ্রবর্তী কবি বলেই। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। কখনো কবির, কখনো কাব্যের অথবা পাঠকের রুচিবোধের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নিজস্ব শক্তির প্রতি আস্থা ও কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে দৈবী-আনুকূল্যের কথাও বলা হয়েছে। যত বেশি আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে এসেছে সাহিত্য রচনার সময়, আমাদের মনে হয় ততবেশি যুক্তিবাদের পথ গেছে খুলে। অবশ্য তার পিছনে কবির ভিন্ন ধরনের জীবনদর্শন থাকতে পারে এবং এই জীবনদর্শনের শিকড় আত্মগোপন করে থাকতে পারে জীবনের কোন তিক্ততর অভিজ্ঞতার অন্ধকারে।

অতএব সমালোচনার ধারাকে আমরা স্পষ্টত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি—যার একদিকে থাকছে স্তুতিবচনের আড়ম্বর, অন্যদিকে প্রতিকূল সমালোচনা। সংগঠনমূলক আলোচনার প্রাণ হল পূর্ববর্তী কবির প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধাবোধ, আর বিরুদ্ধালোচনায় রয়েছে কোন কাব্যের ধ্বংসাত্মক মূল্যায়ন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অনুবর্তীদের শ্রদ্ধানুরাগ কি কাব্যের প্রকৃত বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সব সময়ে? নাকি প্রথানুবর্তনের মাঝে মাঝে সত্যভাষণের দায়বদ্ধতাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই সব সমালোচকেরা? বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে এই দুই শ্রেণীরই নমুনা চোখে পড়বে। দেখা যাবে, কেবল রসবিচার নয়, কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, কাব্যের মাঙ্গলিক ভূমকা-বিচার ইত্যাদিও বিচার্য হয়ে উঠেছে অন্য কবির কাছে। কেউ শুধু উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কোথাও রয়েছে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য অগ্রজ-বন্দনা। যেমন—মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য থেকে জানা গেল চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্তের কথা, কিংবা বিজয় গুপ্ত জানিয়ে দেন আদি মনসা-মঙ্গলকার কানা হরিদত্তের নাম। কবিকঙ্কণ তাঁর অবলম্বিত কাহিনীর উৎস-স্বরূপ মানিক দত্ত সম্পর্কে বিনয় প্রকাশ করে বলেন—'মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়/যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়।' আর এই শ্রদ্ধাপূর্ণ সৌজন্যের বিপরীত প্রান্তে কটূ সমালোচনার সূত্রে অগ্রজ কবি কানা হরিদত্ত উল্লেখিত হন বিজয় গুপ্তের কলমে—'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য/প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।' উল্লেখের এই ধারাটা খুবই গতানুগতিক এবং সচরাচর বৈশিষ্ট্যহীন। তবুও এইটুকু ভদ্রতায় পূর্বজদের প্রতি কবিদের মনের আনুকূল্য

ধরা পড়ে গেছে। যেমন ধর্ম-মঙ্গলের অন্যতম খ্যাতিমান কবি রূপরাম চক্রবর্তী উল্লেখিত হন ধর্মদাস বৈদ্যের কাব্যে, ময়ূর ভট্ট আদি কবি রূপে বন্দিত হন মানিকরাম গাঙ্গুলী, শ্যাম পণ্ডিত কিংবা সীতারাম দাসদের কলমে।

শুধু মঙ্গলকাব্যের ধারাতেই নয়, অনুবাদ সাহিত্যের নানা শাখাতেও কবি-বন্দনার সুপ্রচুর উল্লেখ মেলে। এগুলিতে কবিত্বের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে যে-সব মন্তব্য করা হয়েছে তা নিছক সম্মান দেখানোর একটা হিড়িক। কাহিনীর নির্মাণ, চরিত্রসৃষ্টির কুশলতা কিংবা রসসৃজনের সক্ষমতা নিয়ে আজকের সাহিত্যরসিকেরা যেভাবে আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন, মধ্যযুগে তা খুব সম্ভব ছিল না। লেখনী-চালনায় একটু সক্ষম হলেই বোধহয় সমাজে আদর ও সম্মান পাওয়া যেতো। (এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা তথ্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। লেখকদের প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ভিক্টোরীয় ও তার পূর্ববর্তী যুগের ইংল্যাণ্ড ছিল স্বভাবধর্মে কৃপণ। একটা সময় এমনও গেছে যে সাহিত্যচর্চা 'ব্রাত্যকর্ম' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে ওদেশে। অর্থ কিংবা সম্মান এ দুটোর কিছুই মিলতো না কবিদের, বরং উল্টে সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে তাঁরা আত্মগোপন করতেন ছদ্মনামের আড়ালে। শোনা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম নাট্যকার কংগ্রীভ্ একবার ফ্রান্সে বেড়াতে এলে ভল্‌তেয়ার তাঁকে সারস্বত শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাতে গিয়ে তাঁর লেখক-খ্যাতির কথা উল্লেখ করতেই অকৃত্রিম বিনয়ে কংগ্রীভ্ বলেছিলেন, মাফ করবেন, আমি লেখক নই, একজন ভদ্রলোক মাত্র। লেখক হিসেবে আমি আমার পরিচয় দিতে চাই না। উনিশ শতকেও ইংল্যাণ্ডের খ্যাতিমান লেখকেরা যে 'ভদ্রলোক' অভিধায় বেশি পরিচিত হতে চাইতেন তার আরো একটা দৃষ্টান্ত প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়াল্‌টার স্কট। ডঃ এল. এল. সুস্‌কিং শিল্পীর সমাজতাত্ত্বিক অবস্থানের পালাবদল প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : *'Scott always preferred to be known as a landed gentleman rather than as an author.'*) যাইহোক, 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল'-এর রচয়িতা মাধবাচার্যের কাব্য সপ্তদশ শতকেও যে বিশেষভাবে সমাদৃত হতো তার সাক্ষ্য মিলছে জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'-এ। এই পণ্ডিতের কাব্য যে পণ্ডিতিয়ানার দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ নয়, বরং কবিত্বের শীতলতায় স্নিগ্ধ সে কথা জানিয়েছেন পদকর্তা দেবকীনন্দন : 'মাধব আচার্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল/যাঁহার চরিতগীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।' প্রায় একই ধরনের প্রশংসা-বাচন উল্লেখিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জবানীতে।

পূর্বাচার্য-বন্দনার সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা বোধহয় সুবিস্তৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য। এগুলির লেখক, পাঠক, লেখবার বিষয় সবই ছিল এক বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের অন্তর্গত। আর শীলভদ্র বৈষ্ণবদের চরিত্রভূষণ হল অকুণ্ঠ বিনয়। মহাপ্রভুর আচরিত জীবনাদর্শ ও নির্দেশ ('তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা....') অনুসরণ করে এঁরা রচনার জগতেও স্তুতিবচনের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিলেন। জীবনীকাব্য আর পদাবলী সাহিত্যের দ্বিবিধ শাখাতে এ জাতীয় প্রশংসাবাক্যের দেখা মেলে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক চৈতন্যজীবনীকাব্যের কথা। বাংলা চৈতন্য-চরিত-সাহিত্যে বৃন্দাবন দাসই অগ্রপথিক। তাঁর রচনা গৌড় ভক্তমণ্ডলীর চৈতন্য

ভাবনাকে তুলে ধরেছিল। বৃন্দাবন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সাধনপদ্ধতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করলেও নরহরির শিষ্য লোচনদাস বৃন্দাবনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন : 'শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে / জগৎ মোহিত যাঁর ভাগবতগীতে।' আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস রচিত গ্রন্থটির মাহাত্ম্য নির্দেশ করেন নিম্নোক্ত পংক্তি কটিতে—

'বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।।
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।'

এ ধরনেরই গ্রন্থমহিমা ব্যক্ত হয়েছে কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত সম্পর্কেও। কবির শিষ্য বলে পরিচিত সিদ্ধ মুকুন্দদেব 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে' কবিরাজ গোস্বামীকে 'ত্রিভুবনে অতুলনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন—'শিলা দ্রবীভূত হয় তাঁর গুণ শুনি।' এই অভিমতের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন নরোত্তম ঠাকুরও। এছাড়া উদ্ধব দাস প্রশংসা করেন কৃষ্ণদাসের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস বাঙালীর প্রাণের কবি বলে পরিচিত। তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ, কবিত্ব এককথায় অনবদ্য। হৃদয়াগত সান্দ্র অনুভূতির নির্বাধ প্রকাশে তাঁর অনায়াস সাফল্য। কানুরাম দাস তাই বলেন : 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা/ যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে / শুনামাত্র আত্মহারা।' জ্ঞানদাসের পদ সম্পর্কেও একই উচ্ছাস পদকর্তা রাধাবল্লভের—'সুধামাখা যার পদাবলী/শ্রবণে প্রবেশমাত্র প্রাণ যায় গলি।' এমনতরো আরও প্রশংসা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র পদাবলী-সমুদ্রে।

তুলনায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী সমালোচনার দৃষ্টান্ত বেশ বিরল। এ জাতীয় বিরুদ্ধ-চিন্তার সূতিকাগার হতে পারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। মধ্যযুগে ধর্মসংঘাত ছিল, কিন্তু তাকে কেউ গ্রন্থসমালোচনায় ব্যবহার করার মতো উপকরণ বলে ভাবতে পারেননি। অন্যদিকে জ্ঞানের বৈচিত্র্য, রসসৃষ্টির সক্ষমতা, কাব্যরসের নব প্রকরণ—যেগুলি ব্যক্তি-মানুষকে নতুন ভাবনায় ভাবিত ও সৃষ্টির জগতে স্বতন্ত্র করে তোলে—তেমন বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও কোন কোন কবির লেখায় পূর্বজদের নিয়ে ব্যঙ্গ শোনা গেছে, দেখা গেছে নিকৃষ্ট সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বর্ষণও। আবার কোথাও আত্মরচনার গৌরবকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার প্রয়াস রয়েছে এবং এ বিষয়ে সাহায্য করেছে সেকালের ধর্মভীরু মানুষের ধর্মভীতি। কোন কোন কবি যুগের চাহিদা, অসুখ ও প্রাণপ্রবাহের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের মধ্যে কিছুটা এবং কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে পুরোটাই এই বোধ পাকা হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। অনুমান যে, যতই মধ্যযুগের নিশান্ধকার অপসৃত হচ্ছিল, ততই মানুষের মন আধুনিক, যুক্তিবাদী, কৌশলী ও ধর্মবিষয়ে সংশয়ী হয়ে উঠছিল। হয়তো এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় শেষ দিকে বেশি পরিমাণ প্রতিবাদী

সমালোচনার সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি। এইসব কবিরা যে যুগমানসিকতায় বিচরণ করেছিলেন, তার নিরিখে পূর্বেকার সাহিত্য-ভাবনা যে কতটা অলৌকিকতামণ্ডিত, প্রথানুগ ও কার্যকারণহীন তা সেদিনও তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কমবেশি ধরা পড়ে গিয়েছিল। এ কারণেই এ ধরনের সমালোচনা কেবল সাহিত্যের নান্দনিক তুল্যমূল্যেরই বিচার নয়, একই সঙ্গে কবির জীবনবোধ ও কালের প্রকৃতি-বোধেরও পরিমানক।

তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, যাঁরা কাব্য সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা সবাই আধুনিক কালের কবি-মানসের অধিকারী; কিংবা তাঁরা মধ্যযুগের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কাব্যজগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কালগত বিচারে তাঁরাও কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টা। আবার ভাবের দিক থেকেও তাই। কেননা যে-কাব্যরীতির ও জীবন-ভাবনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁরা, তার থেকে বেশি দূরে সরেও যেতে পারেননি। যেমন বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তের কাব্যের সমালোচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যও নারায়ণ দেবের কাব্যের সঙ্গে প্রতি-তুলনায় কিছু খাটো। তেমনি অলৌকিকতার প্রসঙ্গ তুলে রামানন্দ যতি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকে সমালোচনা করলেও তাঁর লেখাতে আমরা কম অবাস্তব বিষয় পাই না। আবার কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কাব্যের সুপ্রচারের জন্য মাধবাচার্যের লেখাকে শুধু 'চাষাভোলানো গীত' বলে ব্যঙ্গ করলেন না, ভীরু পাঠকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা দেবভীতিকেও কাজে লাগালেন কল্পনার অলৌকিক বাঘ তৈরি করে। এ সবই ছিল মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধ ভাবনার বৃত্তে কবিদের এলোপাথাড়ি পরিভ্রমণ। তবুও এইসব সমালোচনার গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে সাহিত্যের ইতিহাসের পালাবদলের অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে। কবিরা যে চলমান স্রোতধারায় আত্মসত্তাকে পুরোপুরি সঁপে দেননি, অন্ততপক্ষে সচেতন প্রয়াসে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ, এগুলো তারই প্রমাণ—যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

আধুনিক যুগের অলৌকিকতা-বিরোধী দৈবীপ্রভাবমুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে যেমন আমরা আজকাল মধ্যযুগের কাব্যপ্রত্যয় ও প্রকরণ কৌশলকে অবাস্তব ও সত্যবর্জিত বলে ব্যাখ্যা করি, সেকালের অন্ততঃ দুজন কবিকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের মানসিকতাটি ছিল এই গোত্রের। একই পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে অথবা ঘটনার সম্ভাব্যতায় সন্দিহান হয়ে তাঁরা যে এই ধরনের কাব্যালোচনায় মত্ত হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। কবি রাধাকান্ত মিশ্রের তো স্পষ্ট অভিযোগ বহুচর্চিত সেই প্রথাটির প্রতি। কবি তাঁর যুগে যে 'আধুনিক' ছিলেন তারও প্রমাণ রেখেছেন পূর্ববর্তী রচনাকারদের 'প্রাচীন কবি' এই অভিধায় ভূষিত করে। প্রত্যাদেশ, স্বপ্নাদেশ, বেশ পরিবর্তন করে দেবতার দিবালোকে বিচরণ, জিহ্বায় কবিতা লিখে কবির কবিত্ব প্রদান ইত্যাদি অতি পরিচিত ও বহু ব্যবহৃত দেবতা-ব্যবহারের ধরনকে কবি মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তবে তিনিও যে ধর্মভাবনার বাইরে অবস্থান করছেন না তারও প্রমাণ রেখেছেন নীচের ছত্রগুলিতে—"যে পদ ধিয়ান করিয়া পান বিধাতা/মানব হৈয়া কেহ কহে হেন কথা/ কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।" সমশ্রেণীর অভিযোগ উত্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতকের কবি রামানন্দ যতির

কলমেও। অনেক শিষ্যের অনুরোধে তিনি চণ্ডীমঙ্গল লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁর কবিখ্যাতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল বহুল প্রচারিত ও ভূয়সী প্রশংসিত কবি মুকুন্দের চণ্ডীকাব্য। তাই তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দিতে চান মুকুন্দের স্বপ্নলব্ধ চণ্ডীমঙ্গলের কথা। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনায় ঝল্‌সে উঠেছে তাঁর এই পংক্তিগুলি ঃ

> "চণ্ডী যদি দেন দেখা/তবে কি তা যায় লেখা/পাঁচালীর অমনি রচন।
> বুদ্ধি নাই যার ঘটে/তারা বলে সত্য বটে/পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।
> এত দোষ উদ্ধারিতে/লোকের চৈতন্য দিতে/চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।
> অনেকের উপরোধ/কেহ না করিহ ক্রোধ/অনেক শিষ্যের অনুমতি।।"

রামানন্দ নিজেকে 'কলিযুগে বুদ্ধ অবতার' বলে ঘোষণাও করেছেন। অর্থহীন দেববিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও আফশোষ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনূদিত রামায়ণে। যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে এই ধারণায় আসতে বাধ্য করেছিল যে, 'বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ।।'—সেই প্রখর যুক্তিবাদ ও ভৌমদৃষ্টিই বোধহয় মুকুন্দের কাব্যের দোষ নির্ণয়ে তাঁকে প্ররোচিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, যেকালে আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়নি, যেকালে কবি-সমালোচকদের জীবনদৃষ্টি ছিল সীমিত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ, বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায়ান্ধকার যুগে যে এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া গেল, তা কাব্যালোচনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে কাব্যরূপের যে আলোচনা আজকের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে, মধ্যযুগের ক্ষেত্রে সেই বোধ কখনোই পাকা হয়ে ওঠেনি। বর্তমান কালে ইওরোপীয় কাব্যকলার অনেক প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসপ্রস্থানকে তেমন আর গুরুত্ব দিই না। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, সেকালের কবিরা সংস্কৃতানুসারী কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যা আজকের চোখে খানিকটা গতানুগতিক বলে মনে হতে পারে। তবুও আমরা স্বীকার করবো, সাহিত্যের ভালোমন্দ নিয়ে কোনো প্রাচীন কবির এইসব মামুলি প্রশ্নের গুরুত্ব, অনুধাবন করতে সচেষ্ট হব সেই প্রতিভা-দৈন্যের দিনেও কীভাবে এক কবির কাব্যের জনপ্রিয়তাকে নস্যাৎ করে অপর কবির কাব্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠতো, অথবা যেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন ধর্মকলের ফাঁদে পড়া অনতি-সচেতন ব্যক্তি-মানুষ। সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা সমাজ-মানসের ক্রম-পরিবর্তিত ভৌমদৃষ্টি কীভাবে সেদিনের আধুনিকতাকে বরণ করে নিচ্ছিল—সেটাও হয়ে ওঠে আজকের জিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধানের অন্যতম বিষয়।।

শতাব্দক্রমে বাংলা মঙ্গলকাব্যের গতি-প্রকৃতি
(উন্মেষ, বিকাশ, নবীনতা)
সুমঙ্গল রাণা

সারস্বত পটভূমিতে বাংলা মঙ্গলকাব্যের অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই চারশ' বছর। সময়টা কম নয়। ইতিমধ্যে বাংলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বাদশশতকে বঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিলেও এই সময়ের মধ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটেছে অনেক ওঠা পড়া। বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান এবং মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা। আর ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সময়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা চৈতন্যের আবির্ভাব। এরই মধ্যে অপ্রতিহত গতিতে মঙ্গলকাব্যের ধারা এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে কালানুক্রমিক বিবর্তনও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তনের স্বরূপটুকুই এক্ষেত্রে আলোচ্য।

প্রচলিত মতে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম। মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি হরিদত্ত। বিজয় গুপ্তের বিবৃতি—'প্রথমে রচিল গান কানা হরিদত্ত।' হরিদত্তের গীত কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর রচনার ভগ্নাংশ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের পুঁথিতে আত্মগোপন করেছে। নারায়ণ দেবের কপিরাইটও ছিন্ন ভিন্ন। অবিমিশ্র নারায়ণ দেব ভনিতা যুক্ত পুঁথি পাওয়া যায়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রিঃ প্রকাশিত 'সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে' চন্দ্রপতি, বৈদ্য জগন্নাথ, বিপ্র জগন্নাথ, শ্রীজগন্নাথ, বংশীদাস, দ্বিজ জয়রাম, বল্লভ মাধব, হরিদত্ত, দ্বিজ বলরাম, শিবানন্দ, বিপ্র জানকীনাথের রচনা মিশে রয়েছে। হরিদত্ত বংশীদাস ছাড়া বাদবাকীদের পরিচয় কি? কবি না লিপিকর না গায়েন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কবি হলে এঁদের সম্পূর্ণ কাব্য কোথায়?

কবিকঙ্কণ তাঁর পূর্বসূরী কবিগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে 'গীতের গুরু শ্রীকবি কঙ্কণ'-এর নাম করেছেন। ইনি চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম কবি বলরাম কবিকঙ্কণ। অনেকে এরকম ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু এঁর রচনার নিদর্শন কই? কবিকঙ্কণের অন্যতম আদর্শ মানিক দত্তের কাব্যের (প্রাচীন হোক অর্বাচীন হোক) পুঁথি যদি বা পাওয়া যায় মুকুন্দরাম মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

> মানিক দত্তেরে করিএ পরিহার।
> বড়ু সর্বানন্দে কৈনু নমস্কার।। কবি-সং

বড়ু সর্বানন্দের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির একটি পাতাও তো অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া গেল না।ধর্মমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে উন্মেষ যুগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ময়ূরভট্টই নাকি ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি। ময়ূরভট্ট জনশ্রুতি। তাই তাঁকে জনশ্রুতিমূলক আদি কবি বলা হয়েছে। 'ময়ূর' নাম বাঙ্গালীর কখনও ছিল না, আজও নেই। তাহলে কে এই ময়ূর ভট্ট?

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রায় সব কবি যাঁর দোহাই দিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেছেন।

ইনি কাদম্বরী খ্যাত বাণভট্টের শ্যালক। সংস্কৃত ভাষায় সূর্য শতক কাব্যের রচয়িতা। ভগ্নিপতি বাণভট্টের অভিশাপে ময়ূর ভট্ট কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় সূর্যকে তুষ্ট করে ব্যাধিমুক্ত হয়ে সূর্যশতক রচনা করেন। এদিকে রাঢ়ের দেবতা ধর্মঠাকুরও কিয়দংশে সূর্যদেবতা এবং কুষ্ঠরোগের নিরাময়কারী। সম্ভবতঃ এই কারণে ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গ লের কবিদের আদর্শস্থানীয়। কিংবদন্তি যাই বলুক, ময়ূরভট্ট যে বাংলায় ধর্মমঙ্গল কাব্য (যার নাম হাকন্দ পুরাণ) কদাচ রচনা করেন নি, সে বিষয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই। শূন্য পুরাণের রামাঞি পণ্ডিতের অবস্থাও তথৈবচ। 'মমেতি ন মমেতি চ'-এর মতো। থেকেও নেই কিংবা না থেকেও বিরাজিত। জনশ্রুতি বলে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে নীলাই পণ্ডিত, শ্বেতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত এবং কলিযুগে রামাঞি পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমার স্থির সিদ্ধান্ত, ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতক যাই হোক না কেন যাকে মঙ্গলকাব্যের উন্মেষ যুগ বলা হয় একমাত্র কবির নাম ছাড়া সে সময়কার সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই নি। তার কারণ মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজের যে স্তরে প্রচলিত ছিল লিখিত রূপ দিয়ে ধরে রাখার সাধ্য তাদের ছিল না। সে সময় মঙ্গ লকাব্য ছিল নিছক মৌখিক সাহিত্য। লোকগীতি তো বটেই।

পরবর্তী কালে রচিত অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও ওই একই অবস্থা। রায়মঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম খ্যাতিমান কবি কৃষ্ণরাম তাঁর আত্মকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন—

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।

নানা কারণে মাধব আচার্যের গীত দক্ষিণরায়ের পছন্দ হয়নি। অগত্যা কৃষ্ণরামকে কাব্য রচনায় হাত দিতে হয়। এই মাধব আচার্যের কোনো পরিচয় এবং তাঁর কাব্যের কোনো পুঁথি পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ শতক থেকে মঙ্গলকাব্যের সৃজন যুগের সূচনা। এই সময়ে যে কবির কাব্যে মনসা-মঙ্গল কাব্য কাহিনীর পরিণত ও পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় তিনি বিপ্রদাস পিপিলাই। ১৪১৭ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রিঃ) বিপ্রদাসের মনসা বিজয় রচিত।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।।

কবিবর্গ, গুরুজন ও পণ্ডিতদের কাছে যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করে বিপ্রদাস রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসারে।

শাস্ত্র বলতে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক পুরাণ। পুরাণই মঙ্গ ল কাব্যের ভিত্তি ভূমি। কাব্যের দেবখণ্ডে নানা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

বেদাশ্রিত সনাতন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে পুরাণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য। খ্রিঃ দ্বাদশ শতকে বঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার বিশেষতঃ 'তুর্কানা' পদ্ধতির অব্যর্থ প্রয়োগে দেব মন্দির, দেববিগ্রহ ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ প্রভৃতির ফলে হিন্দুধর্ম পুনরায় বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সমূহ বিলুপ্তির হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে ভাবে পুরাণ কাহিনীর বর্ণনা করেছেন তাকে স্বচ্ছন্দে পুরাণ সাহিত্যের মধ্যযুগীয় সংস্করণ বলা চলে। প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যেই কম-বেশী সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর বর্ণনা আছে—যবে নাহি দিল মহী তার পূর্ব কথা কহি।'.... এই সৃষ্টিপত্তন বর্ণনায় ঋগ্বেদের নাসদীয় সুক্তের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। প্রায় প্রত্যেক মনসামঙ্গলে বিষোৎপত্তি প্রসঙ্গে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থন কাহিনীর বর্ণনা আছে। তবে চাঁদ সদাগর এবং ধন্বন্তরী যে সমুদ্রমন্থনজাত এ তথ্য পুরাণ সমর্থিত নয়। মঙ্গল কাব্যের কবিদের বর্ণনায় দেখা যায় সমুদ্র মন্থনে চাঁদ সদাগরের আবির্ভাব লগ্নেই দেবতারা তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করে মনসাকে অমান্য করার মন্ত্র দিলেন। ধন্বন্তরীকেও ব্রহ্মা ব্রহ্মম-প্রদান করে আধি ব্যাধি জর্জরিত মর্ত্যলোকে প্রেরণ করলেন। চাঁদ সদাগরও ধন্বন্তরীর ব্রহ্মজ্ঞান হরণ করার জন্য মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দর যে পূর্বজন্মের উষা-অনিরুদ্ধ এ তথ্য কিভাবে সমাহৃত জানিনা। কিন্তু এই পালার বর্ণনায় মনসামঙ্গলের কবিরা শ্রীমদ্ ভাগবতের কাহিনী নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করেছেন।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী হর-পার্বতীর পারিবারিক জীবন কাহিনী বেশ বিস্তৃত। শিবের সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ, কোচনীর বেশে গৌরীর শিবকে ছলনা, শিবের ভিক্ষাটন প্রভৃতি কাহিনীতে পৌরাণিক শিবের রুদ্র ও কোমল রূপের চেয়ে লৌকিক ভিখারী শিবের গৃহস্থ রূপেরই প্রাধান্য। চণ্ডীর ক্ষেত্রেও বৈদিক অরণ্যানি, পৌরাণিক দুর্গা ও অনার্য সেবিতা চণ্ডীর মিশ্র রূপ। মনসা ও ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

বাংলা মঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুসরণের তারতম্য যেমন কাল অনুসারে তেমনি কবির প্রবণতা অনুযায়ীও বটে। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে র িত মঙ্গল কাব্যগুলির সঙ্গে পুরাণ কাহিনী যোগ যতটা নিবিড় অষ্টাদশ শতকের কাব্যগুলিতে ততটা নয়। যুগ্ম প্রয়োজনে অষ্টাদশ শতকে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলি সংক্ষিপ্ত হলো। একজন কবি একাধিক কাব্য রচনা করতে লাগলেন। এবং কাব্যের বহিরঙ্গের প্রতি অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ায় অন্তর্গত ভাবের দীনতা বেশ অনুভব করা যায়।

নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দের তুলনায় পরবর্তী কালের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেবখণ্ডের পৌরাণিক অংশ সংক্ষিপ্ত। অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিষয়টি কেবলমাত্র সৃষ্টি পত্তন কাহিনীর বর্ণনায় এসে ঠেকেছে।

সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অন্নদায় পরিণত হয়েছেন। বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। মুকুন্দরাম সংস্কৃতজ্ঞ কবি। ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত জ্ঞান সর্বজন বিদিত। কবি নিজেও বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তাঁর পুরাণ জ্ঞান অনুদামঙ্গল রচনায় প্রয়োগ করেছেন। একান্ন পীঠের বর্ণনায় মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনী স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত। কাশীর মাহাত্ম্য সূচক অংশ কাশীখণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার অধিকাংশ মনসামঙ্গলের কবি কাব্যের নাম দিয়েছেন পদ্মাপুরাণ। পদ্মাপুরাণ নামটি অঞ্চল বিশেষে মনসামঙ্গল কাব্যের সাধারণ নাম।

পুরাণ অনুসরণের সূত্রে দেব-দেবী বন্দনার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হয়। দেবদেবী বন্দনা মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভিক অংশ। সংক্ষেপে হোক, বিস্তারিত হোকমঙ্গলকাব্যে দেবদেবী বন্দনা থাকবেই। একেবারে প্রথমে থাকে গণেশবন্দনা। বন্দনার প্রথমে গণেশকে শিরোধার্য করার ধর্মীয় কারণ যাই থাক মঙ্গল কাব্যের কবিরা গ্রন্থ রচনায় বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে মাঝপথে কাব্য রচনা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সেই জন্যই এই প্রতিষেধক ব্যবহার করেছেন। গণেশ সিদ্ধি দান করেন, বিঘ্ন নাশ করেন। উপরন্তু প্রধান পঞ্চদেবতার মধ্যে প্রথম পূজিত হবার অধিকারী।

তারপরেই থাকে সরস্বতী বন্দনা। কারণ সরস্বতী সঙ্গীত ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মনসা মঙ্গলের কবিরা আরও একটি কারণে সরস্বতী বন্দনা করতে বাধ্য। দেব ভাবনার আদিযুগে মনসা এবং সরস্বতী নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। দুই দেবীর পূজা তিথি অভিন্ন। মনসার নাগ পঞ্চমী; সরস্বতী শ্রীপঞ্চমী। সরস্বতী নৃত্যগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মনসাও নৃত্যগীত বাদ্য প্রিয়া। সরস্বতী ও মনসার পারিবারিক জীবন একইরকম। জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ দেবসমাজে নিয়ম রক্ষা মাত্র; তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। এদিকে সরস্বতীর সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক দেবসমাজে পরিজ্ঞাত। মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে বিষয়টি অজানা ছিল না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই—দেব নারায়ণ সঙ্গে বন্দিব তোমারে রঙ্গে।

ঘনরামের কাব্যে সরস্বতী বন্দনার প্রথম ছত্র—

করিয়া প্রণতি স্তুতি　　　　বন্দি মাতা সরস্বতী
বিশ্বপতি বিষ্ণুর দুর্লভ।

চৈতন্য পরবর্তী কালের মঙ্গল কাব্যগুলিতে চৈতন্যবন্দনা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যবন্দনায় কবিদের মধ্যে ইতিহাস নিষ্ঠা ও ভক্তির সমন্বয় দেখি। আবার কোনো কোনো কবি চৈতন্যের অলৌকিক মহিমা প্রকাশের জন্য আজগুবি গল্প ফেঁদেছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এই রকম একটি গল্প রয়েছে—কাটোয়ার জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী

নীলকণ্ঠ তাঁতীর কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। চৈতন্যদেবের নামে (দয়ায়) তাঁর অর্ধদগ্ধ বস্ত্রাদি বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ভালো দামে। নীলকণ্ঠও চৈতন্যের নামে কাটোয়ায় একটি অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

যাই হোক্ মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবদেবী বন্দনার ধরণ ধারণ এক এক যুগে এক এক রকমের। পঞ্চদশ শতকে রচিত কাব্যগুলিতে দেব-বন্দনা সংক্ষিপ্ত, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি মুকুন্দের কাব্যে সব চেয়ে বেশী *traditional* - দেবদেবী ছাড়াও দিগ্‌বন্দনা নামক একটি অতিরিক্ত তালিকা মুকুন্দরামের কাব্যে রয়েছে। দিগ্‌বন্দনা হলো স্থানীয় গ্রামদেবতা এবং গ্রাম-দেবীদের বন্দনা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গায়েনদের হাতে পড়ে এই তালিকা ক্রমশ বেড়ে গেছে।

সপ্তদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলি দিগ্‌বন্দনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কবিরা হিন্দু দেবদেবীর নাম তালিকায় মুসলমান পীর-ফকির গাজীদের নামও যুক্ত করে দিয়েছেন। মুকুন্দরামের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিত্র আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের গোঁড়ামিই তাকে এই কাজে বিরত করেছে। সপ্তদশ শতকে রচিত অন্যান্য কাব্যে পীর ইসমাইল গাজী শুভি খাঁ পীর, বাহারাম পীরের নামও হিন্দু দেবীদের তালিকায় যুক্ত হয়ে গেছে অবলীলাক্রমে। বেশ বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ-বিদ্বেষ সমাজে তখন অনেকটাই প্রশমিত। মুসলমান পীর ফকিরগণও তখন হিন্দুদের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর কাজিয়া মেটাতে পরমেশ্বর কৃষ্ণ পয়গম্বর রূপ ধরলেন—

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।।

সত্য পীরের সত্য নারায়ণ পরিণতি আরও পরবর্তী কালের ঘটনা। অথচ পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কাব্যে আপন মহিমা প্রচারের জন্য মনসা হাসন হোসেনের পুরীতে প্রবেশ করে যে কাণ্ডটা বাধালেন মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলা চলে না।

মনসার এই হিংস্রতা কালক্রমে মন্দীভূত হয়েছে। দেবভাবনার ক্ষেত্রেও মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কালানুক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তথাকথিত আদি কবি হরিদত্তের রচনায় মনসার রূপ বর্ণনা ভয়াবহ—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেতনাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি।।
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মনি।
... ...
অমৃত নয়ান এড়ি দেবী বিষ নয়নে চায়।
চন্দ্রসূর্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়।।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার রাজবেশ ও রাজসভার বর্ণনা—

নাগ আভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড।
কালি নাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড।।
দুই ভিতে নাগদল ধরিল যোগান।
বাসুকি পঠেন কাছে শাস্ত্র পুরাণ।।

মনসার এই রূপ কালক্রমে অন্তর্হিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে রচিত জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মনসার দুর্দশা পাঠকের করুণা উদ্রেক করে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার যথাবিধি বিবাহ হলো। জরৎকারুর শর্ত ছিল—

মোরে যদি গরহিত করিবেক কদাচিৎ
এড়িয়া পলাইব তবে।

জরৎকারু পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুকাল সমুদ্রতীরে বাস করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে পথশ্রান্ত জরৎকারু বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূত হলেন। এদিকে সন্ধ্যা বন্দনার কাল উত্তীর্ণ হয়। অগত্যা পদ্মা স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করলেন। অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গে ক্রুদ্ধ মুনি বিজন অরণ্যে পদ্মাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। স্বামী পরিত্যক্তা মনসা—

মাথে হাত দিয়া দেবী করএ রোদন।
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কিসের কারণ।।

পদ্মা বনেই বাস করে, গাছের বাকল পরে, ফলমূল খায়। অন্তঃসত্ত্বা পদ্মার যথাকালে পুত্রের জন্ম হলো; নাম আস্তিক। এখন পুত্রকে কিভাবে পদ্মা লালন পালন করবেন সে এক দুশ্চিন্তা। মনে বড়ই দুঃখ—

অন্যের ছাওয়াল হৈলে দুগ্ধ ভাতে খায়।
আমার ছাওয়াল কিনে ক্ষিধায় লালায়।।

অগত্যা মনসা পুত্রক্রোড়ে রাখাল বালকদের কাছে পুত্রের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন।

চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর কালক্রমে উগ্রতা বিসর্জন দিয়ে অতি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন। অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে বিচ্ছেদ বিধুর পিতা মাতার কন্যারূপে—মাতা পত্নী কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল সঞ্চার করেছেন। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবী গণ কালক্রমে যেন ভয়ঙ্করী থেকে শুভঙ্করীতে পরিণত হয়েছেন। এর কারণ অবশ্যই চৈতন্যের আবির্ভাব এবং চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার।

ষোড়শ শতকে রচিত চৈতন্য ভাগবতে চণ্ডীপূজার উল্লেখ নেই কিন্তু মঙ্গল চণ্ডীর গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব শ্রীবাস ভবনে উচ্চৈস্বরে নাম সংকীর্তন শুরু করলে জগাই-মাধাই ভেবেছিল নিমাই পণ্ডিত বুঝি বা মঙ্গল চণ্ডীর গীত আরম্ভ করেছে। তাছাড়া চৈতন্য ভাগবতে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে'—ছত্রটি তো সকলের জানা। পক্ষান্তরে,

মনসা পূজার উল্লেখ থাকলেও মনসামঙ্গল গানের উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে নেই। সে সময় নবদ্বীপে বিষহরির পূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল—

দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন্ জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।

কিন্তু মনসা পূজা উপলক্ষে মনসামঙ্গলের গান গাওয়া হতো না। কাজেই মনসা মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল ধর্মমঙ্গলের গান দেবপূজায় আবশ্যিক উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হতো—ষোড়শ শতকের পরবর্তী কাল থেকে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদি 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গাতি' হয়; কৃষ্ণকথামূলক কাব্য যদি কৃষ্ণ-মঙ্গল হয় তাহলে মঙ্গলকাব্যকে মনসা চণ্ডী ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথামূলক কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কেন? দেব মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই তো মঙ্গল গীত। কিন্তু মনসা মঙ্গল কাব্যে অন্ততঃ দেবী মনসা স্বপ্নে হোক স্বরূপে হোক কবিদের 'মঙ্গল গীত' রচনার জন্য বারংবার হুমকি দিয়েছেন। দৈবাদেশ তো অলঙ্ঘনীয়।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যের ধারা

কাননবিহারী গোস্বামী

।। প্রাক্‌কথন ।।

হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অনুবাদ-কাব্যগুলি একটি বিশিষ্ট ধারার অন্তর্গত। এর উৎপত্তি ও বিস্তৃতিকাল পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চার শতাব্দী জুড়ে, যদিও উনিশ শতকেও এর কিছু অনুবৃত্তি চলেছিল। এই অনুবাদগুলি মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য-আশ্রিত, তবে ঠেট হিন্দী, ফার্সী ও ব্রজভাষা থেকেও কিছু কাব্য অনূদিত হয়েছিল। এই কাব্যগুলি উচ্চতর এবং সমৃদ্ধ ভাষাগুলির সাহিত্যসম্পদ বাংলা ভাষায় পরিবেশন করে এই ভাষার কলেবর পুষ্ট করেছে, সর্বভারতীয় সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রাদেশিক বাংলা ভাষার যোগসাধন ও শ্রীবিধান করেছে। কাব্যে বৈচিত্র্য এনেছে, তত্ত্ব প্রচার করেছে, লোকশিক্ষা দিয়েছে এবং বাঙালীর গল্পরস-পিপাসা মিটিয়েছে। সেই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলা ভাষার প্রকাশ সামর্থ্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এই অনুবাদ-কাব্যগুলি তাই বিশেষ মূল্যবান।

মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ-কাব্যগুলিকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি, বিবিধ সংস্কৃত 'রামায়ণ' অনুবাদের ধারা। দ্বিতীয়টি, সংস্কৃত 'মহাভারত' অনুবাদের ধারা। তৃতীয়টি, ভাগবত-পুরাণ অনুবাদের ধারা। চতুর্থটি, ঠেট হিন্দী, ফার্সী ও ব্রজভাষায় রচিত কাব্য অনুবাদের ধারা। পঞ্চমটি, সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র ও তত্ত্বনিবন্ধ এবং স্তোত্রবলী অনুবাদের ধারা। আর ষষ্ঠটি হল, ভারতচন্দ্র ও তাঁর উত্তরকালীন কবিদের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের ধারা। স্বল্প পরিসরে এই ছয়টি ধারার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা দিগ্‌দর্শন-মাত্র করব।

।। ১. 'রামায়ণ'-অনুবাদের ধারা।।

মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ কাব্যের জনপ্রিয়তম ধারা হ'ল সংস্কৃত 'রামায়ণ' মহাকাব্য অনুবাদের ধারা। এই ধারায় যে 'বাল্মিকী রামায়ণ'-এর অনুবাদ হয়েছে তাই নয়, 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণেরও খণ্ডাংশ এবং কোনো কোনো কাহিনীর অনুবাদ হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন *'The Bengali Ramayanas'* গ্রন্থে ও অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে ৫১ জন কবির বাংলা 'রামায়ণ' অনুবাদের কথা বলেছেন। এঁদের সকলের অনুবাদ কর্মের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে প্রধান কবিগণ পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। এই ধারা পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে অপ্রধান কবিদের পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ অনুবাদের ধৈর্য ও শ্রমস্বীকার কমে গেছে। তাঁরা 'রামায়ণ'-

এর কোনো কোনো কাণ্ডের নির্বাচিত পালার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের *'Literal Translation'* বা আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এগুলি মূলতঃ ভাবানুবাদ বা সারানুবাদ। অনুবাদে মূলের ক্রমও সর্বদা রক্ষিত হয়নি। বাঙালী কবিরা সর্বভারতীয় কাহিনীতে স্বাধীনতা নিয়েছেন, লৌকিক কাহিনী ঢুকিয়েছেন এবং বাঙালিয়ানা মিশিয়েছেন। এঁদের কয়েকজনের পরিচয় সংক্ষেপে নেওয়া যাক।

প্রথমেই আসে ফুলিয়ার 'কীর্তিবাস' কবি **কৃত্তিবাসের** কথা। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় আধুনিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কৃত্তিবাস ১৪৬৪ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের রাজসভায় সম্বর্ধিত হন এবং তাঁর অনুরোধে এর পর বাল্মীকি 'রামায়ণ' মহাকাব্যের স্বাধীন অনুবাদ রূপে **'শ্রীরামপাঞ্চালী'** কাব্য রচনা করেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন, কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে 'বাল্মীকি রামায়ণে'র মূল কাহিনীর কাঠামো অনুসরণ করলেও এই রামায়ণের কিছু কিছু আখ্যান বর্জন করেছেন এবং 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ', 'দেবীভাগবত', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'কূর্মপুরাণ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'জৈমিনি ভারত', ভবভূতির 'মহানাটক', 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে নানা কাহিনী ও উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ কাব্যে গ্রথিত করেছেন। এছাড়া, বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন-মহিরাবণ-অহিরাবণ কাহিনী, রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চণ্ডিকার অকালবোধন ও ১০৮ নীলপদ্মের কাহিনী, গণেশের ছদ্মবেশে হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামচন্দ্রের রাজনীতিশিক্ষা প্রভৃতি উপাখ্যান কৃত্তিবাসের মৌলিক সৃষ্টি। 'বাল্মীকি রামায়ণ' থেকে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর প্রধান পার্থক্য চরিত্রসৃষ্টি এবং রসসৃষ্টিতে। বাল্মীকির নায়ক রামচন্দ্র 'নরচন্দ্রমা'। কৃত্তিবাসের নায়ক রামচন্দ্র নারায়ণের অংশাবতার এবং ভক্তবৎসল ভগবান। বাল্মীকির সীতা বীর্যবতী ক্ষত্রিয় রমণী, কৃত্তিবাসের সীতা স্বভাবকোমলা ভীরু বঙ্গবধূ। বাল্মীকির মহাকাব্যের মূলরস বীর ও করুণ রস। কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল রস ভক্তিরস, যদিও এতে করুণ রস এবং কিছু হাস্যরসের মিশেল আছে। বাঙালীর গৃহজীবনে আদর্শ ভ্রাতৃপ্রীতি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতির প্রচার ছিল কৃত্তিবাসের কাহিনীগ্রন্থনা ও চরিত্রচিত্রণের মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাঙালীর জীবনাদর্শকে চালিত করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পরবর্তীকালে অজস্র প্রক্ষেপবাহুল্য ঘটলেও এই মূল জীবনাদর্শ লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। ড. সুকুমার সেন এজন্য যথার্থই বলেছেন—'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নিখিল বঙ্গভাষীর কাছে 'আহার এবং ঔষধ'—দুই-ই।

বাংলা ভাষায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 'রামায়ণ'-অনুবাদকদের মধ্যে ষোড়শ শতকের কবি , বা **নিত্যানন্দ আচার্যে**র কাব্য 'অদ্ভুত রামায়ণ' অনুসারী। এঁর আঁকা কৌশল্যা চরিত্রে কিছু নতুনত্ব আছে। এই শতকের **কৈলাস বসু**র 'রামায়ণ'ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-আশ্রিত। এই শতকের মহিলা কবি **চন্দ্রাবতী**র 'রামায়ণে' সীতাবর্জনের জন্য রামের প্রতি ধিক্কার

মধ্যযুগেও আধুনিক নারীবাদী চেতনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের **ভিষক্ রামশঙ্কর দত্তের** 'রামায়ণ' কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সমন্বিত রূপ। **ভবানী দাসের** 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়', 'শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়' প্রভৃতি খণ্ডিত পালার যুদ্ধকাহিনীর সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনচিত্র মিশে গেছে। **দ্বিজ লক্ষ্মণের** কাব্য 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-অনুসারী; এঁর 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাটি আকর্ষণীয়। 'বুদ্ধাবতার' **রামানন্দ ঘোষের** 'রামায়ণে'র বিচিত্র বিষয় হল, এঁর কাব্যে রামচন্দ্রই জগন্নাথ এবং বুদ্ধ। কাব্যের শেষে কাষ্ঠমূর্তি বা দারুব্রহ্ম জগন্নাথের প্রতি যে নাস্তিক্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে আধুনিক ব্যক্তিভাবনার চিহ্ন আছে। **রামানন্দ যতি** বা **'ভিক্ষু'**র রাময়ণে বাল্মীকি 'রামায়ণে'র সঙ্গে 'ভাগবত', 'গীতা' ও 'ব্রহ্মাগীতা'র মিল দেখানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পিতা-পুত্র **জগদ্রাম রায়** এবং **রামপ্রসাদ রায়ের** যুগ্মপ্রচেষ্টায় লেখা 'রামায়ণ'টি এই কাব্যধারার সর্ববৃহৎ রচনা। এর কাণ্ডসংখ্যা—আট, 'পুষ্করকাণ্ড'টি নতুন সংযোজন। 'রামায়ণ' অংশটি ধরলে এর কাণ্ডসংখ্যা নয়টিও বলা যায়। 'রামায়ণ' বিচিত্র ব্যাপার! 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীগণের রাসের আদর্শে এই রামায়ণ রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা ও তাঁর সখীদের রাসবিহারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের এইসব বিচিত্র 'রামায়ণ' অনুবাদের ধারা উনিশ শতকেও বাহিত হয়েছিল। বর্ধমানের মাড় গ্রামের কবি **রঘুনন্দন গোস্বামী**র 'রামরসায়ণ' বাংলা রামায়ণ কাব্যধারার শেষ বৃহৎ রচনা। কাব্যটি কবির সংস্কৃত জ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের বিশেষ প্রকাশ আছে। এই রামায়ণে'র উত্তরাকাণ্ডে কিন্তু সীতার পাতালপ্রবেশ বর্ণিত হয়নি।

।। ২. 'মহাভারত'-অনুবাদের ধারা।।

'বাল্মীকি রামায়ণে'র মতো আর এক আর্য মহাকাব্য বা *'Authentic Epic'* বেদব্যাসের 'মহাভারত'। এই অষ্টাদশ পর্ব সংস্কৃত মহাকাব্যও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে অনূদিত হয়েছে। কোনো কোনোটি পূর্ণাঙ্গ অষ্টাদশ পর্বেরই অনুবাদ, অধিকাংশই একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদ। বাঙালীর 'রামায়ণ'-অনুবাদের উৎস যেমন বাল্মীকি ছাড়াও অন্যান্য সংস্কৃত 'রামায়ণ' ও বিবিধ 'পুরাণ', 'মহাভারতে'র কিন্তু তেমন নয়। 'মহাভারতে'র পূর্ণাঙ্গ ও খণ্ডিত অনুবাদগুলি মূলতঃ বেদব্যাসের সংস্কৃত 'মহাভারতে'রই অনুসারী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল 'জৈমিনি ভারত' থেকে কিছু কিছু কাহিনী নেওয়া হয়েছে। 'মহাভারতে'র অনুবাদে বাঙালিয়ানার অনুপ্রবেশও কম।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, সঞ্জয়ের 'মহাভারত'ই প্রথম অনূদিত বাংলা 'মহাভারত'। ড. সুকুমার সেন সঞ্জয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি। তাঁর অনুমান, সঞ্জয় হরিনারায়ণ দেবের ছদ্মনাম। কিন্তু কবি-সঞ্জয়ের অস্তিত্ব এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের নির্দেশে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালের তত্ত্বাবধানে আমি নানা পুথি থেকে সঞ্জয়ের 'মহাভারত' অনুবাদের সমগ্র রূপের অনুলিপি প্রস্তুত করে দিই।

ড. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সেই অনুলিপি অবলম্বনে কাব্যটি সম্পাদনা করেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পাদিত সংস্করণের ভাষা বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সঞ্জয় খুব প্রাচীন কবি নন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি,—কাশীরাম দাসের সমসাময়িক হতে পারেন। তাঁর 'মহাভারতে'র দ্রোণপর্বে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' একটি নতুন আখ্যান।

বস্তুতঃ বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু হয়েছিল মুসলমান শাসকদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের অধীন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আগ্রহে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়পাণ্ডব' নামে সংক্ষেপে সমগ্র অষ্টাদশপর্ব 'মহাভারতে'র কাহিনী গ্রন্থনা করেন। লস্কর পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ খান বা ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী 'মহাভারতে'র অংশবিশেষের অনুবাদ করেন। এটি হল 'অশ্বমেধ'। বিজয় পণ্ডিতের নামে সংকলিত 'মহাভারত' আসলে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'বিজয় পাণ্ডব' কাব্যেরই নকল এবং রূপান্তর। নুসরৎ খান বা ছুটি খানের আগ্রহে শ্রীকর নন্দী যে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন তার মূল 'জৈমিনি ভারত', যে পর্বের কাব্যকাহিনী বেদব্যাসের 'মহাভারত' থেকে বিস্তৃততর। শ্রীকর নন্দীর কাব্যে বীররসের সঙ্গে হাস্যরস পরিবেশনেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় 'মহাভারতে'র সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক। তাঁর পূর্বে এবং সমকালে আর যাঁরা 'মহাভারতে'র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন—দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ। এঁরা কেউ পুরো 'মহাভারত' অনুবাদ করেননি, অংশবিশেষের অনুবাদ করেছিলেন। এঁদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বঙ্গে কৃষ্ণচরিতাদর্শ সম্প্রসারিত হয়েছিল। দৈবকীনন্দন কর্ণপর্বের অনুবাদ করেছিলেন। বাকি কবিরা প্রায় সকলেই অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এঁদের অনুবাদের মূল অবলম্বন 'জৈমিনি ভারত'। বরং নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরামের কিছু পূর্বে বৈয়াসকি 'মহাভারতে'র অনেকগুলি পর্ব অনুবাদ করেন। কাশীরামের অনেক পুথিতে নিত্যানন্দের রচনাংশ ঢুকে গেছে। নিত্যানন্দের রচনা বাহুল্যবর্জিত, সংযত ও পরিচ্ছন্ন।

কাশীরাম যে বেদব্যাসের 'মহাভারতে'র কিরূপ মূলানুসরণ করেছেন, তার একটু দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 'বনপর্বে' পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বনগমনের প্রাক্কালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলেছিলেন—

> "দ্রুপদস্য কুক্ষে দাতাং, সুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
> ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্।
> মাংবৈ বনগতাং দৃষ্টা কস্মাৎ ক্ষমাসি পার্থিব।।
> নূনঞ্চ তব বৈ নাস্তি মন্যুর্ভরতসত্তম।
> যত্তে ভ্রাতৃংশ্চ মাঞ্চৈব দৃষ্টা ন ব্যথতে মনঃ।।

ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োহস্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্।
তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ।।"

কাশীরামের মূলানুগ স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এইরকম—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি তব রানী।।
মম দুঃখ দেখি হৃদি তাপ নাহি হয়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিহ নিশ্চয়।।
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।।"

কাশীরাম দাসের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও অষ্টাদশ শতকে যাঁরা 'মহাভারতে'র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবীন্দ্র নিত্যানন্দ দাস, গোবিন্দ কবিশেখর, শঙ্কর চক্রবর্তী, সারলা দাস, রাজেন্দ্র সেন, বাসুদেব, গোপীনাথ দত্ত, দ্বিজ ঘনশ্যাম, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, রাজীব সেন, রামলোচন প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রায় সকলেই 'মহাভারতে'র খণ্ডাংশের অনুবাদক। যেমন, গোবিন্দ কবিশেখর কোচবিহার রাজসভায় 'কিরাত' পর্বের অনুবাদ করেন। সারলা দাস উৎকল 'আদি' ও 'বিরাট' পর্ব অনুবাদ করেন। শঙ্কর চক্রবর্তী 'মহাভারত' অনুবাদ করেন সংক্ষেপে। রাজেন্দ্র সেন 'ব্যাস-জন্মেজয়' কাহিনীতে অভিনবত্ব এনেছেন। বাসুদেব অনুবাদ করেন 'স্বর্গারোহন' পর্ব। গোপীনাথ দত্তের অনুবাদ 'দ্রোণ' ও 'নারী' পর্বের। দ্বিজ ঘনশ্যাম এবং দ্বিজ কৃষ্ণরাম দুজনেই 'জৈমিনি ভারত' থেকে 'অশ্বমেধপর্ব' অনুবাদ করেন। রাজীব সেনের উদ্যোগপর্বের অনুবাদ বেশ গাঢ়বন্ধ। রামলোচন অনুবাদ করেন 'নারী' পর্ব। এঁদের এইরকম বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদ-গৌরব কাশীরামের অনূদিত 'মহাভারতে'র যশোপ্রভায় ঢেকে গেছে।

।। ৩. 'ভাগবত'-অনুবাদের ধারা।।

বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু হওয়ার আগেই 'ভাগবত-পুরাণ' অনুবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই অনুবাদের ধারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেমধর্ম আন্দোলনের পূর্বেই মহাপ্রভুর পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরী দক্ষিণ-ভারত থেকে বঙ্গে 'ভাগবত-পুরাণ' আনেন ও এর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। বাংলা ভাষায় 'ভাগবতে'র প্রথম অনুবাদক শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বহুমানিত 'গুণরাজ খান' উপাধিক **মালাধর বসু**। এঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে সম্বর্ধিত করেন গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। বর্ধমান কুলীন গ্রামবাসী এই বিদগ্ধ কবি 'ভাগবতে'র দশম-একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচনা করেন তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য '**শ্রীকৃষ্ণবিজয়**'। কাব্যরচনাকাল ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা—এই চারপর্বের বিবিধ লীলা বর্ণিত হয়েছে। মালাধর শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবনলীলা সংক্ষেপে সেরেছেন; তাঁর অপর তিনটি পর্বের লীলায় ঐশ্বর্য ভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তুর্কী-আক্রমণোত্তর বঙ্গে

ভীতিগ্রস্ত ও দুর্বল বাঙালী জাতির চিত্তে শক্তি, সাহস ও আত্মপ্রত্যয় জাগাবার জন্য বীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। মালাধর তাঁর কাব্যে সেই জাতীয় কৃত্যই সম্পাদন করেছেন। অবশ্য মহাপ্রভু মালাধরের কাব্যে "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—এই ছত্রটির মধ্যে মধুররস ও রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকাশ দেখে ভাবাবিষ্ট হন এবং কাব্য ও কবির প্রতি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন।

মালাধরের অনুবাদ মূল সংস্কৃত 'ভাগবত-পুরাণ' অনুযায়ী। কিন্তু তিনি অনুবাদকালে 'ভাগবতে'র গোপীপ্রসঙ্গ প্রায়ই এড়িয়ে গেছেন। যেমন, 'ভাগবতে'র 'কালিয় দমন' কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কালীহ্রদে কালিয় সর্পগ্রস্ত হলে নন্দ, যশোদা ও গোপীদের বিলাপের কথা আছে—

"গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্।।

অর্থাৎ, "শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্ত এবং তাঁর ভালবাসা ও হাস্যযুক্তাবলোকন মধুর বাক্য স্মরণকারিণী গোপীনাথ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হলে অত্যন্ত দুঃখপরিতপ্ত হয়ে প্রিয়বিরহিত ত্রিলোককে শূন্য দেখেছিলেন।" মালাধর ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনায় গোপীপ্রসঙ্গ এক্কেবারে বাদ দিয়েছেন—

"এতেক বিলাপবাণী কান্দে যশোদা রোহিনী পৃথিবীতে গড়াগড়ি বুলে।
নন্দ কান্দে উভরায় সকল গোয়ালা ধায় আজি মৈল সকলে গোকুলে।।
বৃন্দাবনে যতেক বৈসে সকল স্ত্রী পুরুষে যমুনাতে দিয়া রড়ারড়ি।
না দেখিয়া গোবিন্দাই সবে কালীদহে চাই কান্দে সবে দিয়া গড়াগড়ি।।"

মালাধর তাঁর কাব্যে কিছু কিছু ভাগবত-বহির্ভূত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন, 'গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের আদর্শে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বমূর্তি প্রদর্শন 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'হরিবংশ' অনুসরণে পারিজাত-হরণ, 'মহাভারত' অনুসরণে জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত, 'হরিবংশে'র 'বিষ্ণুপর্ব' অংশ অবলম্বনে বজ্রনাভ-উপাখ্যান ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের মতো মালাধরও তাঁর কাব্যের কোনো কোনো স্থানে বাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, তাঁর কাব্যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে বসে 'ভাত' খান, মথুরার দিকে দিকে দেখা যায় "গুয়া জলপাই কামরাঙ্গা" গাছ, দ্বারে দ্বারে বিরাজ করে নারিকেল গাছের সারি। এসব বর্ণনাও কাব্যটিকে বাঙালীর প্রিয় করেছিল।

'ভাগবত'-অনুসারী অন্যান্য মধ্যযুগীয় কাব্যের মধ্যে রঘুনাথ-ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী', দ্বিজমাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয় পাঁচালী', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগুলি ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে বরাহনগরের

কবি **রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী'** সমগ্র ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ভক্তিমান কবির এই কাব্যটি মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল। **দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'** 'ভাগবতে'র অনুসরণ ছাড়াও 'মহাভারত', 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে নানা পৌরাণিক কাহিনী এবং লৌকিক উৎসজাত দানলীলা, নৌকালীলার কাহিনী আছে। কবি রাধাপ্রেমের মাধুর্য ও গৌরব বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। **কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'**ও 'ভাগবত' ছাড়াও 'মহাভারত', 'হরিবংশ' ও বিবিধ পুরাণের কৃষ্ণকাহিনী আছে। কবিশেখর **দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয় পাঁচালী'**তে লৌকিক কাহিনীই বেশী।

অষ্টাদশ শতকে রচিত **দুঃখী শ্যামদাসের** 'গোবিন্দমঙ্গলে'ও লৌকিক কাহিনীরই প্রাধান্য। এ কাব্যে 'রাধার বারমাস্যা' অংশটি অভিনব। **ভবানন্দের 'হরিবংশ'** সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের সূচনায় রচিত হয়ে থাকবে। শ্রীহট্টের এই কবি মূল সংস্কৃত 'হরিবংশ' বিশেষ অনুসরণ করেন নি, লৌকিক *Erotic* কৃষ্ণকাহিনীই বেশী পরিবেশন করেছেন। **শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল'** 'ভাগবতে'র আংশিক অনুবাদ। **দ্বিজ রমানাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'**ও তা-ই।

।। ৪. বিবিধ বৈষ্ণব কাব্য-কবিতা-নাটক-তত্ত্বনিবন্ধ অনুবাদের ধারা ।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত থেকে বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ সব থেকে বেশী বৈচিত্র্য আছে। এই সব অনুবাদের ধারা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের ভক্তিমান বৈষ্ণব কবিরা মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শে উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের অনুবাদে সংস্কৃতের মূল বিষয়বস্তু বিন্যস্তভাবে অনুসৃত। এদের মধ্যে রয়েছে—**জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'**র মতো নাট্য-আখ্যান-গীতিকাব্য, **বিশ্বানথ চক্রবর্তীর 'চমৎকার চন্দ্রিকা'**র মতো আখ্যানকাব্য। **কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'** এবং **রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভের'** মতো নাটক, **প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'**র মতো স্তোত্রকাব্য, **শ্রীরূপের 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবে'**র মতো স্তবকাব্য এবং **'চাটু পুষ্পাঞ্জলি'**র মতো স্তবগাথা, **রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মনঃশিক্ষা'** এবং **'স্বনিয়মদশকে'**র মতো সাধন-কবিতা, **শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতাসিন্ধু'** এবং **'উজ্জ্বলনীলমণি'**র মতো বৈষ্ণব অলঙ্কারগ্রন্থ, **কবি কর্ণপূরের 'গৌরগণেদ্দেশদীপিকা'**র মতো ঐতিহাসিক তত্ত্বনিবন্ধ ইত্যাদি। এদের বিস্তৃত পরিচয় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থের বিষয়। আমরা কয়েকটির সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন মাত্র করছি।

প্রথমে একটি স্তবকাব্যের কথা বলি। এটি শ্রীরূপের সাধনকাব্য **'নিকুঞ্জরহস্যস্তব'**। এই কাব্যের মালিনী ছন্দে রচিত ৩২টি শ্লোকে শ্রীরূপ তাঁর সাধনায় মানসনেত্রে স্ফুরিত বৃন্দাবনের নিভৃতনিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা স্মরণ করেছেন। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ এবং প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী কবি, আমার উর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ, বংশীবদন চট্টো ষোড়শ শতকে **'নিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি'** নামে ৩৩টি পদে এর চমৎকার মুক্তানুবাদ করেন। একটি পদ

মূলাতিরিক্ত মৌলিক রচনা। এই স্তবকাব্য ও তার অনুবাদে নিগূঢ় মঞ্জরীসাধনার কথা ব্যক্ত। কবির অনুবাদ সৌকর্যের একটু পরিচয় দিচ্ছি। শ্রীরূপের মূল ১৬-সংখ্যক পদটি এই—

"কনকজলদগাত্রৌ নীলশোণঞ্জনেত্রৌ
মৃগমদরসভালৌ মালতীকুন্দমালৌ।
তরলতরুণবেশৌ নীলপিতাম্বরেশৌ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।।"

বংশীবদনের সুললিত অনুবাদ এইরকম:—

"নিকুঞ্জমাঝারে দেখ রূপ অনুপাম।
নবরসে ঢলঢল প্রতি অঙ্গ নিরমল প্রেমপীরিতি নিরমল।।
কথিত কাঞ্চনধনি শ্যামজলধর জিনি উজ্জ্বল মনোহর শোভা।
অসিত অম্বুরুহ অরুণ কুশেশর নয়ন সুধারস আভা।।
মৃগমদ রসরাজ কপালে তিলকসাজ গলায় মালতী কুন্দমাল।
যৌবন ঝলমল সকল কলেবর বেশ তরল অতি ভাল।।
মদন মনোহর নীল পীতাম্বর দুঁহু তনু পহিরণ শোহে।
দাস বংশীবাণী রঙ্গিল রঙ্গিণী রূপে বৃন্দাবন মোহ।।"

মূলের মালিনী ছন্দকে পরিহার করে বংশীবদন এখানে বাংলা ত্রিপদী ছন্দেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্" পদের ধ্বনিঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছেন।

অন্যান্য বৈষ্ণবীয় স্তোত্রে ও স্তবকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাতনামা কবি অনূদিত প্রবোধনন্দ সরস্বতীর স্তোত্রকাব্য **'চৈতন্যচন্দ্রামৃত'** ও রূপ গোস্বামীর **চাটুপুষ্পাঞ্জলি** স্তবকাব্য। বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামীর অনুশিষ্য **প্রেমদাস** অনুবাদ করেন রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর সাধনকবিতা **'মনঃশিক্ষা'**। অজ্ঞাতনামা আর এক কবি অনুবাদ করেন দাস-গোস্বামীর আর একটি সাধনকবিতা **'স্বনিয়মদশক'**।

জয়দেবের **'গীতগোবিন্দম্'** কাব্যের অনেকগুলি পদ্যানুবাদ হয়েছিল। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রসময় দাস, রঘুনাথ দাস এবং ভগবানদাসের অনুবাদ। সবগুলি অনুবাদই আঠারো শতকের। এই কাব্যানুবাদের ধারা বিশ শতক পর্যন্ত বাহিত হয়েছে।

নাটকের মধ্যে মহাপ্রভু-কৃপাধন্য কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের **'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং'** অবলম্বনে ১৬৩৪ শক বা ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত কবি প্রেমনাথ বা পুরুষোত্তম মিত্র রচনা করেন **'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'** কাব্য। কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। প্রেমদাসের রচনা মূলানুসারী ও স্বচ্ছন্দ, পড়লে অনুবাদ বলে মনে হয় না। একটু উদাহরণ দিই। কর্ণপূরের মূল নাটকে 'সর্বাবতারদর্শন' নামক দ্বিতীয় অঙ্কে ভক্তিদেবীর উক্তি অনুসারে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ রূপ দেখে নিত্যানন্দপ্রভুর স্তব এইরকম—

"হরিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চিস্ত্বমেব ত্বমপস্ত্বমগ্নিস্ত্বমিন্দুস্ত্বমর্কঃ।

নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুত্বং মুরারে   নমস্তে নমস্তে সমস্তেশ্বরায়।।"

প্রেমদাসের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—

"তুমি হরি তুমি হর তুমি ব্রহ্মা জশ।   তুমি ইন্দ্র তুমি অগ্নি তুমি দিবাকর।।
তুমি নভ তুমি ক্ষিতি বায়ু মুর-অরি।   সমস্ত ঈশ্বর তুমি নমস্কার করি।।"

প্রেমদাসের কাব্যটির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ, এই কাব্যে মূলাতিরিক্ত এমন কিছু প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যা অন্যত্র অপ্রাপ্য। যেমন, নাটকের দশম অঙ্কে কর্ণপূর জানিয়েছেন স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের অনবসরকালে মহাপ্রভু বিরহজ্বরে আক্রান্ত হন। তখন স্বরূপ গোস্বামীর পরামর্শে মহাপ্রভুকে মধুররসাশ্রিত একটি "গৌড়ীয়ভাষোপনিবদ্ধম্ ভগবদ্বংশীনাদ মাধুরী-প্রতিপাদকং গীতম্" শুনিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র ঐ গানটি বুঝতে পারেন নি। তখন কাশীমিশ্র রাজাকে ঐ গীতটি শোনান। কর্ণপূর গীতটি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু প্রেমদাস সমগ্র গীতটি উল্লেখ করে জানিয়েছেন এটি বংশীবদন চট্টো বিরচিত "মধুর মধুর বংশী বাজে বনে" পদ। ড. সুকুমার সেন *'A History of Brajabuli Literature'* গ্রন্থে জানিয়েছেন, প্রেমদাস যেহেতু বংশীবদন-পরিবারের অনুশিষ্য তাই তাঁর দেওয়া তথ্য প্রামাণিক ও যথার্থ। বংশীবদনের 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি' এবং প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা আমার **'বাঘনাপাড়া-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসাহিত্য'** গবেষণাগ্রন্থে লভ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় যদুনন্দন দাস শ্রীরূপের **'বিদগ্ধমাধব'** নাটকের পদ্যানুবাদ করে নাম দেন—**'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব'**। এতে নাটকটির ঘটনাগুলি পয়ার ছন্দে এবং গানগুলি পদের আকারে অনূদিত হয়েছে। যদুনন্দন শ্রীরূপের **'দানকেলি-কৌমুদী'** নাটকের অনুবাদ করেন **'দানলীলাচন্দ্রামৃত'** নামে।

রায় রামানন্দের এই **'জগন্নাথবল্লভ'** নাটকের একাধিক পদ্যানুবাদ হয়েছিল। ষোড়শ শতকে নাটকের মূল শ্লোকগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এর অনুবাদ করেন লোচনদাস। সপ্তদশ শতকে নাটকের অঙ্ক ধরে অনুবাদ করেন অকিঞ্চনদাস। আরো পরবর্তীকালে রায় রামানন্দের এই **'জগন্নাথবল্লভ'** নাটকের পদ্যানুবাদ করেন গোপাল দাস, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আখ্যানকাব্য **'চমৎকারচন্দ্রিকা'**র কাব্যানুবাদ করেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য কৃষ্ণদাস। চারটি 'কুতূহল' বা আখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত। আখ্যান গুলিতে বিচিত্র ছদ্মবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন বর্ণিত। বর্ণনা নাটকীয় ও কৌতুকরসস্নিগ্ধ। প্রথম কুতূহলে কৃষ্ণ যশোদা প্রেরিত অলঙ্কার-পেটারীর মধ্যে কৌশলে ঢুকে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দ্বিতীয় কুতূহলে কৃষ্ণ কুটিলাকে ছলনা করে অভিমন্যু বা আয়ানের বেশে রাধার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছেন। তৃতীয় কুতূহলে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন তাঁর বিদ্যাবলী-ছদ্মবেশে। আর চতুর্থ কুতূহলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন সুগায়িকা কলাবতীর ছদ্মবেশে। কৃষ্ণদাসের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ এবং সর্বত্র মূলানুসারী। এই আখ্যানকাব্যে বর্ণিত ছদ্মবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলনের বিষয়টি

পরবর্তীকালে দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে এবং আমার খুল্লপিতামহ বিপিনবিহারী গোস্বামীর 'মধুর মিলন' কাব্যে অনুসৃত হয়েছে। এ-সব প্রসঙ্গের বিশদ বিবরণ আমার তত্ত্বাবধানে কৃত ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্যোপাদান'-এ লভ্য।

বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থাদির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত **নয়নানন্দের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব'** শ্রীরূপের **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'**র এবং **শচীনন্দন বিদ্যানিধির 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'** শ্রীরূপেরই 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কাব্যানুবাদ। অনুবাদ দুটি যথাৰ্থ মূলানুসারী। এই শতকেই **দীনহীন** নামা কবি **'কিরণদীপিকা'** নামে কবিকর্ণপূরের ঐতিহাসিক তত্ত্বনিবন্ধ **'গৌরাগণোদ্দেশদীপিকা'**র মূলানুগ কাব্যানুবাদ করেন। দেবানন্দ দাসও এর একটি ভাষানুবাদ করেন। এগুলি ছাড়াও মহাপ্রভু, তাঁর পার্ষদগণ এবং তাঁদের অনুবর্তীদের প্রেরণায় ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় চারশো বছর ধরে অজস্র বৈষ্ণবগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় কাব্যানুবাদিত হয়েছে। এই সমস্ত কাব্যানুবাদ বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে এবং মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্মকে নিখিলবঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে।

।। ৫. আরবি, ফার্সী, ঠেট গোহারী ও ব্রজভাষায় রচিত কাব্যানুবাদের ধারা।।

ধর্মীয় কাব্য-কবিতা-নাটকের বাইরে মানবিক রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম-আরাকান-রোসাঙ্গ রাজসভায় নতুন ধরনের কাব্য রচিত হয়। এগুলি ফার্সী ও ঠেট গোহারী পূরবীয়া হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও এদের মধ্যে নানাস্থানের বর্ণনায় এবং আখ্যান গ্রন্থনে বেশ মৌলিকতা আছে। এই পর্যায়ের দু'জন প্রখ্যাত কবি—**দৌলত কাজী** এবং **সৈয়দ আলাওল**। রোসাঙ্গ-রাজ থিরিথুধম্মা বা শ্রী সুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২১-৩৮ খ্রীঃ) দৌলত কাজী তাঁর **'লোরচন্দ্রানী'** বা **'সতীময়না'** কাব্যটি রচনা করেন। এই অসমাপ্ত কাব্যটি ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন পরবর্তী কবি সৈয়দ আলাওল। দৌলতের কাব্যের উৎস মুল্লা দাউদের প্রাচীন হিন্দী কাব্য 'চন্দায়ন' এবং মিয়া সাধকের ঠেট গোহারী ভাষায় রচিত কাব্য 'মৈনা সতবন্তী'। অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণ নয়, কাহিনীধারার অনুবর্তন। কাহিনীর বিষয় গোহারি রাজকন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে রাজা লোরকের প্রণয়। চন্দ্রানীর স্বামী নপুংসক বামনবীরকে যুদ্ধে হারিয়ে লোরকের চন্দ্রানীলাভ ও পরিণয়, লোরকের পূর্বপত্নী সাধ্বী ময়নামতীর বিরহ এবং লোরকের প্রত্যাবর্তনে স্বামীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন। কাব্যটির মধ্যে সুফী দর্শন এবং হিন্দু যোগদর্শনের কিছু পরিচয় আছে।

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী সুপণ্ডিত **আলাওলের** শ্রেষ্ঠ কাব্য **'পদ্মাবতী'** (১৬৪৬ খ্রীঃ)। এই কাব্যটি মূলতঃ অবধী হিন্দী ভাষায় রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ। কাব্যকাহিনী অর্ধ ঐতিহাসিক। এর বিষয়—দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ এবং চিতোরের রাণা রত্নসেনকে বন্দীকরণ, রাণার সুহৃদ গৌরী ও

বাদিনার কৌশলে তাঁর মুক্তিলাভ, রাণার পত্নী পদ্মিনীকে রাজা দেওপালের বিপথগামিনী করার চেষ্টা, দেওপালের সঙ্গে যুদ্ধে রত্নসেনের মৃত্যুবরণ, রাণার দুই পত্নী পদ্মীনি ও নাগমতির স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হওয়া, আলাউদ্দিনের চিতোরে এসে জ্বলন্ত চিতায় প্রণতি জানিয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন। কাব্যকাহিনীতে ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে লৌকিক উপাদান মিশে গেছে। এর মধ্যে সুফী ধর্মের কিছু রূপক প্রভাবও রয়েছে। কোরেশী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যটির মূল তত্ত্ব বিশুদ্ধ প্রেমের জয়গান।

আলাওল জায়সীর কাব্যের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তবে ঘটনাবর্ণনা ও চরিত্রবর্ণনে কোথাও কোথাও কিছু মৌলিকতা দেখিয়েছেন। স্থানে স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু কিছু উপকরণ নিয়েছেন।

আলাওলের **'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'** আরবি ভাষায় লেখা 'আলিফ লায়লা' বা আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনী অনুসরণে। এর বিষয়—মিশরের বাদশাহপুত্র সয়ফুলমুলুকের সঙ্গে বোস্তানের পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামালের রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী। কবির **'হপ্তপয়কর'** কাব্যটি নেজামি সমরকন্দীর ফার্সি ভাষায় রচিত কাব্যের অনুসরণ। এই কাব্যে আরব ও আজমের অধিপতি লোমানের পুত্র বাহারামের বিবিধ 'কেরামত'-যুক্ত সাতটি গল্প বর্ণিত। আলাওলের **'তোহফা'** পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত মুসলমান সমাজের নীতিগ্রন্থ। এর অবলম্বনে ইউসুফ দেহলবী বা গদা-র ফার্সী **'তুহফাতুনসেনা'** নামের নীতিকথা। আলাওলের সর্বশেষ কাব্য **'সেকান্দারনামা'** ফার্সী কবি নেজামি সমরকান্দীর 'ইস্কান্দারনামা' কাব্যের অনুবাদ। এর বিষয় গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের কিছু কিছু বিজয়কাহিনী।

মুসলমানী কাব্যের বাইরে বৈষ্ণবীয় ভক্তদের জীবনকাহিনী নিয়ে হিন্দীর আঞ্চলিক রূপ ব্রজভাষায় নাভাজী রচনা করেন **'ভক্তমাল'** গ্রন্থ (১৫৬০ খ্রীঃ)। পরে নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস এর একটি টীকা লেখেন। উভয় গ্রন্থ অবলম্বনে কৃষ্ণদাস বা লালদাস উনিশ শতকের প্রথম ভাগে **'বাঙ্গালা ভক্তমাল'** গ্রন্থ রচনা করেন। এতে মূল কাহিনীগুলির অনুসরণ ছাড়াও 'রসপ্রকরণ' নামে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক নিবন্ধ আছে।

।। ৬. ভারতচন্দ্র ও উত্তরকালীন কবির কাব্যানুবাদের ধারা।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শেষ বঙ্গ কবি ও ভাষাশিল্পী, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। এঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি **'অন্নদামঙ্গল'** (১৭৫২ খ্রীঃ) কাব্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'এ রাজকণ্ঠের মণিমালা'। এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড **'কালিকামঙ্গল'** বা 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ ভারতচন্দ্র এই অংশের কাব্যনায়ক চোর রূপে ধৃত গোপন অভিসারী রাজকুমার সুন্দরের মুখে সংস্কৃত **'চৌরপঞ্চশিক্ষা'** কাব্য থেকে তিনটি শ্লোক বসিয়ে দিয়েছেন। এই শ্লোক তিনটির প্রথম পংক্তিগুলি হল যথাক্রমে—(১) ''অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং....'', (২) ''অদ্যাপি তন্মনসি বর্ততে মে....'' এবং (৩) ''অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং।'' শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থক।

একটি আর্য দেবী কালিকা-পক্ষে, আর একটি অর্থ নায়িকা বিদ্যাপক্ষ। ভারতচন্দ্র পুথি বেড়ে যাবার আশঙ্কায় এই তিনটি শ্লোকের শুধু বিদ্যাপক্ষে অর্থ ধরে অনুবাদ করেছেন। ভারতচন্দ্রের সমকালে কিংবা কিছু পরবর্তীকালে 'চৌরপঞ্চ শিক্ষা'র পঞ্চাশটি শ্লোকেরই দেবীপক্ষ এবং বিদ্যাপক্ষে কাব্যানুবাদ হয়েছিল। অনুবাদক সম্ভবতঃ নন্দকুমার কবিরত্ন। অনুবাদে ইনি কাশীনাথ সার্বভৌমের সাহায্য নিয়েছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র শেষজীবনে সেখানেই বসতবাটী নির্মাণ করে বাস করেন। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র ও তাঁর মা ঐ গ্রাম পত্তনি নেন এবং রামদেব নাগকে তার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। রামদেব ভারতচন্দ্রের উপর নানা অত্যাচার শুরু করলে বিপদগ্রস্ত কবি শিখরিনী ছান্দ 'নাগাষ্টক' নামে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তার বঙ্গানুবাদ লিখে কৃষ্ণকান্তের কাছে পাঠান। শ্লোকগুলি এবং তাদের অনুবাদে আর্ত কবির প্রতিকার প্রার্থনা ব্যক্ত। একটি সংস্কৃত শ্লোক ও তার কাব্যানুবাদ দেখা যাক—

মূল ঃ
"গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিত
স্তবোদ্দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে কথমপি।
স্থিতা মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রথতি মবিরাগো হরি হরি।।"

অনুবাদ ঃ
"কিবা রাজকার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে সকাল ফুরালো
তোমার দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে রহিয়াছি হে।
ওহে মূলাযোড়ে পরমকুশলে কাল হরিছি
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি।।"

মধ্যযুগের সাহিত্যে কোনো বড়ো কবির স্বকৃত সংস্কৃত কবিতার বাংলায় নিজকৃত কাব্যানুবাদ এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র।

ভারতচন্দ্র তাঁর পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্রকে বসন্তকালে সংস্কৃতে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি সাতটি সংস্কৃত শ্লোকের সমষ্টি। এতে রাজার প্রতি আশীর্বচন এবং বসন্তবর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্র বাংলায় এরও কাব্যানুবাদ করেন। প্রথম দুটি শ্লোক এবং তাদের কাব্যানুবাদ দেখা যাক—

মূল ঃ
"অবশ্য প্রতিপালস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনম্।। ১।।

মহারাজ রাজাধিরাজ-প্রতাপ! স্ফুরহীর্য্যং সূর্য্যোল্লসৎ কীর্তিপথে।

স্থিরা রাজপথালয়া ত্বাং চিরস্থা যতোহস্বানান্তে সমস্তং পুরস্তৎ।। ২।।

অনুবাদ ঃ
"অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণ।
নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদন।। ১।।

শুন হে মহারাজ প্রতাপতপান আজ
ফুটিল সরসীমাঝে কীর্তিপথদল হে।
আশীর্বাদ করি আমি হও পৃথিবীর স্বামী
রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুনাল হে।। ২।।

বাংলা সাহিত্যের কোনো কবির সংস্কৃতে পত্ররচনা এবং বাংলায় তার কাব্যানুবাদের এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত।

উপরের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগের শেষে ভারতচন্দ্রের মতো বড়ো কবি ও শব্দশিল্পী গোষ্ঠীয়তনা এবং দেববাদের বাইরে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ও উপলব্ধিকেও কাব্যরূপ দিচ্ছেন। এই *Subjectivity* বা মন্ময়তা এবং *Individuality* বা ব্যক্তিকতার সূত্রেই ভারতচন্দ্রের রচনা মধ্যযুগের প্রথাগত কাব্যবলয় থেকে সরে আধুনিক মানসিকতার দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে।।

শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্য

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত বঃ শচীনন্দনঃ।।

—এই শচীনন্দন কৃষ্ণ সর্বদা সকলের হৃদয়ে ও বাইরে সমভাবে আত্মস্বরূপে বর্তমান আছেন। অচৈতন্যবিধায় তাঁর এই প্রকাশকে অনুভব করা যায় না। কলিকালে চৈতন্যহীনতাই তার কারণ। সেই হেতু পূর্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যে দীপ্তিমণ্ড হরি—যে স্বরূপে এতকাল অনর্পিত ছিলেন অর্থাৎ কারও কাছে আত্মপ্রকাশ না করে গোপন ছিলেন—সেই উন্নতোজ্জ্বল রসস্বরূপ আপনাকে এবং আপনার প্রতি অভিনিবেশের শ্রেয়স্কর ভক্তিধারাকে করুণাবেশে প্রকাশ করার জন্য শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি তোমাদের হৃদয়ে সুপ্রকাশিত হোন।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের ইতিবৃত্ত জীবনী গ্রন্থের উপজীব্য। আধুনিক কালে আমরা জীবনীগ্রন্থে সমকালীন যুগ ও জীবনের রূপায়ণ প্রত্যাশা করি, এইজন্যই বলা হয়েছে—*Biography is the key to a society*—জীবনীকাব্য সমকালীন সমাজ জীবনে প্রবেশের চাবি কাঠি—অর্থাৎ জীবনীকাব্যের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ তার বাস্তবতা, ঐতিহাসিকতা ও জীবনীকারের সমাজ-সচেতনতা। জীবনীকাব্য যাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হবে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি যথেষ্ট বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই এবং তাঁর জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পারম্পর্য থাকা দরকার। সর্বোপরি সমকালীন সমাজ জীবনের বিশ্বস্ত উপস্থিতি ঐ কাব্যে আমরা আশা করি।

কিন্তু চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি মধ্যযুগের ভক্তকবিদের দ্বারা বিরচিত। যাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন ভগবান স্বয়ং স্বশরীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদেরই পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে। একথা এযুগে বিশ্বাস করা কঠিন হলেও মধ্যযুগের লোকে তা সহজেই মেনে নিতেন। তাই পৌরাণিক চরিত্রগুলি অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদানে পূর্ণ হতে বাধা ছিল না। তাঁর জীবনের তথ্যগত বিশৃঙ্খলা সে যুগের মানুষকে কিছুমাত্র বিচলিত করত না। ইংরেজিতে তাই *Hagiography* অর্থাৎ 'মণ্ডজীবনী' কথাটি জীবনীকাব্যের এই শ্রেণীর রচনা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিকেও আধুনিক জীবনীকাব্য বা *Biography* না বলে *Hagiography* রূপে দেখলেই তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে। 'চৈতন্য চরিতের উপাদান'-গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

বলেছেন—আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আধুনিক যুগের লোকের মনোবৃত্তি নিয়ে মধ্যযুগের ঘটনা বুঝতে চেয়েছেন এটাই তাঁদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি।

অবশ্য মানবিক মূল্য সম্বন্ধে স্বজ্ঞানতা থাকলে তবেই জীবনীকাব্য রচনার প্রেরণা আসে। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব সেই মূল্যবোধ জাগিয়েছিলেন বলেই তাঁর জীবনী আশ্রয়েই বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার সূচনা হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

"পৃথিবীতে কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করে এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর; অলঙ্কার, দর্শন ও বিবিধ রচনায় এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানে এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাই চৈতন্যকেন্দ্রিক ষোড়শ শতকের এই চেতনার জাগরণকে 'চৈতন্য রেনেসাঁস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যচরিত সাহিত্য নিয়েই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হয়। চৈতন্য-উত্তর বাংলা সাহিত্যে দেবতার একচেটিয়া আধিপত্যের স্থানে মানবমহিমা কীর্তন শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুসৃতি ও ইতিহাস চেতনার কিছুটা উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় 'চৈতন্যচরিত' কাব্যগুলিতেই।

এক হিসাবে চৈতন্য জীবনীকাব্যের সূত্রপাত হয় শ্রীচৈতন্যের প্রকট কালেই। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত, কীর্তন সহচর পারিবারিকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় নানা রচনায় হাত দেন। চৈতন্য সহপাঠী মুরারি গুপ্ত তাঁর চরিতকথা অবলম্বনে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্' রচনা করেন। চৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল লীলার প্রিয় সহচর স্বরূপ দামোদরও একখানি কড়চা গ্রন্থ লেখেন। কবি কর্ণপূর চৈতন্যকে নিয়ে 'চৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যম্' , 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্', 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' রচনা করেন। এছাড়া রঘুনাথ দাস লেখেন 'গৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষ' প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত বাঙালি কবিগণ যথা, নরহরি সরকার, বাসু-মাধব-গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গৌরাঙ্গের রূপ, গুণ তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, তাঁর পতিতোদ্ধার কাহিনী নিয়ে 'গৌরাঙ্গ ' বিষয়ক প্রচুর পদ রচনা করেন। এই সব পদের ঐতিহাসিকমূল্য অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালের জীবনীকারগণ চরিতগ্রন্থ রচনায় সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন অবলম্বন করেছেন তেমনি গৌরপদের শরণ নিয়েছেন। বাংলা ভাষাতে চৈতন্যকে আশ্রয় করে চৈতন্য সমকালীন দুএকখানি কড়চা গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন, স্বরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চায় বঙ্গানুবাদ (স্বরূপকৃত), গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' প্রভৃতি।

ওড়িয়া ভাষায় একাধিক চৈতন্য জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে—যেমন, ঈশ্বর দাসের

শ্রীচৈতন্য ভাগবত (সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষে রচিত) মাধব পট্টনায়েকের 'বৈষ্ণব লীলামৃত' প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য প্রথম (?) রচনা করেন বৃন্দাবন দাস—**চৈতন্যভাগবত**, লোচনদাস ও জয়দেবের **চৈতন্যমঙ্গল** নামে দু'খানি কাব্যের নাম এই সঙ্গে করতে হয় কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** কাব্যখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবনকে চরিতকারগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এই সেইভাবেই জীবনীকাব্যে—তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে এঁকেছেন। কোন কোন চরিতকাব্য যেমন—চৈতন্য ভাগবত 'চৈতন্য কীর্তন' রূপেই রচিত—এটি গেয় কাব্য—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও সেই উদ্দেশেই লেখা এবং পদকর্তা লোচনদাসের কবি-কল্পনার তুলিতে গৌরাঙ্গ জীবনলীলার চিত্রপটটি এখানে আঁকা। কোন কোন চরিতকাব্য—যেমন, চৈতন্য চরিতামৃত—শ্রীচৈতন্যের জীবনীর সূত্র অবলম্বনে গৌড়ীয়, বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত। তাই চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গের মানবরূপটি যতখানি প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে তা হয়নি, সেখানে চৈতন্যের ভাগবত স্বরূপের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের মনে চৈতন্যের দেবত্ব সম্পর্কে সংশয় না থাকলেও তিনি যেহেতু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দমুখে চৈতন্যচরিতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাই শিশু ও বালক নিমাই-এর দুরন্তপনা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর গার্হস্থ্যজীবন, কীর্তন লীলা, বঙ্গদেশ পর্যটন ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা কতকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মানবোচিত করেই বৃন্দাবন তাঁর চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করেছেন। স্থানে স্থানে অলৌকিকতা থাকলেও মোটের উপর তাঁর বর্ণনা বাস্তব ভিত্তিক। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে চৈতন্য সমকালীক নবদ্বীপের ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক পটভূমিকার যে পরিচয় দিয়েছেন তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন—

> ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
> দেবতা জানেন সবে চণ্ডী বিষহরি।
> তাও যে পূজেন কেহ মহাদম্ভ করি।।
> ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
> মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।।

আসলে বৃন্দাবন দাস ভক্ত দলেও চৈতন্যচরিত চিত্রণে জীবনীকারের ভূমিকাটি তিনি অনেকখানি পালন করেছেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভূমিকাটি শুধুমাত্র চরিতকারের ভূমিকা নয় অনেকটা আচার্যের ভূমিকা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচার্যরূপে গ্রন্থাদি রচনা করে বঙ্গ তথা ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেননি সে অবস্থা বা মনোভাব কোনওটাই তাঁর ছিল না—বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যেরা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁদের গুরুরূপে বরণ

করেছিলেন—কিন্তু তাঁদের গ্রন্থাদি সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় সেই সব গ্রন্থের সার সংকলন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই আশ্চর্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি রচনা করেছেন এ গ্রন্থ চরিত এবং অমৃত অর্থাৎ তত্ত্ব কথার একত্র সমাহার। কৃষ্ণদাস জানতেন শ্রীচৈতন্যদেবের মতো মহাপুরুষের জীবনে তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বের মূল্য কত বেশী—মহাপ্রভুর মতো মানুষের জীবনচরিত তাই শুধুমাত্র জীবনের তথ্যপঞ্জী নয়, তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনই চরিতাকারের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবার শুধু একা চৈতন্যদেবকে আঁকলেই চলবে না, তাঁর সাক্ষাৎ পরিকরদের পরিচয়ও তুলে ধরতে হবে এই জীবনীকাব্যে—তাই চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরবর্গ—ব্রহ্ম হরিদাস, দোহারি দাস, রূপসনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি চৈতন্য ভক্তবৃন্দের কথাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ফলে চৈতন্য ভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থরূপে চৈতন্য চরিতামৃত—চৈতন্যজীবনীকাব্য হিসাবে বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের তথা রসিক পাঠকের কাছে আদরনীয় হয়ে উঠেছে। চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার কথা যেমন সবিস্তারে জানা যায়, চৈতন্য চরিতামৃতে তেমনি তার নীলাচল লীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। অধিকন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের মুখ্য কারণ, তাঁর রাধাভাব, তাঁর উপদেশ, সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষা শ্লোকাষ্টক প্রভৃতির ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব দর্শনের মর্যাদা লাভের উপযোগী এই গ্রন্থখানি রচনা করে কৃষ্ণদাস আমাদের মহৎ উপকার সাধন করেছেন। কিন্তু জীবনীকারের—মণ্ডজীবনীকারেরই বলছি, কর্তব্য পালন করেছেন কি?

জীবনীগ্রন্থরূপে চৈতন্য চরিতামৃতেরও অসম্পূর্ণতা আছে—চৈতন্য তিরোভাব সম্পর্কে তাঁর নীরবতার কারণ যাই হোক না কেন—জীবনীকাব্যের পরিসমাপ্তি তিনি যেভাবে ঘটিয়েছেন আমরা তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না; শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ীবাণীরূপে গ্রন্থশেষে তাঁর 'শিক্ষাশ্লোকাষ্টক'কে উপস্থিত করে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব ধর্মের সারকথাটি সকলকে শোনাতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর অন্তিম দশার কথা বলার দায় এড়িয়ে গেছেন—অথচ শচীনন্দন মানবরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আটচল্লিশ বৎসর মানব লীলাই করে গেছেন। সুতরাং তাঁর তিরোভাব মানবোচিতই হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা, যেমন হয়েছিল কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহামানবদের। তাঁরাও মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও মানবোচিত রীতিতেই লীলাসংবরণ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে লোচনদাস ও জয়ানন্দ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, তবে লোচনের উল্লেখে কিছু অলৌকিকতার আভাস আছে, জয়ানন্দ এ বিষয়ে বাস্তববাদী এবং তাঁর সাক্ষ্য ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গৃহীত হতে পারে। তাঁর বর্ণনানুসারে রথের আগে নৃত্যকালে প্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিরোভাবের পর তাঁর মরদেহ—'মায়াশরীর থাকিল ভূমে পড়ি' কিন্তু তার শেষ পরিণতি কি হল—এ বিষয়ে বাস্তব বন্দনা জয়ানন্দতেও মেলে না। এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া জীবনীকারেরা বরং কিছু তথ্য দিয়েছেন। ওড়িয়া ভাষায় 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা ঈশ্বর দাস যা লিখেছেন তাতেও অলৌকিকতার আভাস আছে কিন্তু মাধব পট্টনায়েকের

বৈষ্ণবলীলামৃতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

একদিনরে নৃত্যকলা। উদাস ভাব ন ছাড়িলা।।
খোল করতাল সহিত। পাদ চলই অবিরত।।
কাট ইটে পড়িথিলা। তঁহিকি দৃষ্টিতা ন থিলা।।
বাজিল রাম বৃদ্ধাঙ্গুঠি। রুধির ঝরিলা নিকিটি।।
পাদ খজ্জাই থোড়ি হেলা। গলবাজি তলে পড়িলা।...

এর অর্থ—একদিন উদ্দামভাবে (শ্রীচৈতন্য) নৃত্য করছিলেন, খোল করতালের সঙ্গে পা ফেলে চলেছিলেন তিনি, রাস্তায় ইঁট পড়েছিল তিনি দেখেন নি। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গলে জোর আঘাত পেলেন আর ক্ষত স্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হোল, গলায় শব্দ করে তিনি পা মুড়ে পড়ে গেলেন। ইত্যাদি।

এর পর মাধব যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে জানা যায়—ঐ আঘাত থেকে চৈতন্যের গায়ে জ্বর দেখা দেয়, পা ফুলে ওঠে। গরম জলে পা ডুবিয়ে একটু আরাম পেলেও ক্রমে তার সব শরীর ফুলে যায়, জ্বর আরও বাড়তে থাকে। চন্দন যাত্রার পূর্বে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ব্রহ্মমুহূর্তে তিনি দেহত্যাগ করেন (দিনটা ছিল ১৫৩৩ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রিল রবিবার) —লোচন দাস ও জয়ানন্দ দুজনেই ঐ একই দিনের কথা বলেছেন তবে স্থান ও কাল সম্পর্কে তাঁদের মতের পার্থক্য আছে। লোচন বলেন বেলা তৃতীয় প্রহরে, জয়ানন্দ দশ দণ্ডরাতে। তবে তাদের দুজনের সঙ্গে মাধবের বর্ণনার সঙ্গে বড়ো পার্থক্য প্রভুর পার্থিব শরীরের শেষকৃত্য বিষয়ে। জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে মনে হয়, টোটা গোপীনাথের মন্দিরেই তাঁর দেহের সমাধি দেওয়া হয়। লোচনদাস বলেন—গুণ্ডিচা মন্দিরেই প্রভুর দেহ সমাহিত হয়। আর মাধব পট্টনায়কের মত—

মন্দিরে মরা গলা প্রভু। এহাকু এ যে পোতাইবু।।.....
কেইলী বৈকুণ্ঠে শব নেই। পোতাইলে গাত খোলাই।
এ থা ন জানে আন কেহি। পড়িলা দু-আধ ফিটই।।

অর্থাৎ প্রভুর মৃত্যু এখানেই (মন্দিরে) হয়েছে। তাঁর মরদেহ এখানেই সমাহিত করবো। দেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হোল। ওখানে গর্ত খোঁড়া হোল। রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস আর জন দুই সেবক মরদেহ প্রোথিত করলো। এ কথা আর কেউ জানলেন না। এরপর বন্ধ রাখা সিংহদরজা খুলে দেওয়া হল। প্রভুর মৃত্যু ও তাঁর দেহ সমাহিত করার কাল পর্বে মন্দিরের সিংহদরজা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

মাধব কথিত 'কোইলী বৈকুণ্ঠ' বা 'কৈবল্য বৈকুণ্ঠে' জগন্নাথ দেবের জীর্ণ দারুমূর্তি সমাহিত করা নীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিপালিত হয়ে আসছে, সেখানে শ্রীচৈতন্যের মরদেহ যদি প্রোথিত হয়ে থাকে তবে রাজা প্রতাপরুদ্র আর রায় রামানন্দ যে তাঁকে প্রায় শ্রীজগন্নাথের স্তরে উন্নীত করে দুর্লভ সম্মান দিয়েছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে। আর তাছাড়া এই প্রক্রিয়াকে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দেবের দারুবিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়া বলে

('এ প্রভু সে প্রভুরে লীন') বর্ণনা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এই বিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন উৎকলীয় লেখক অচ্যুত, দিবাকর আর ঈশ্বর দাস। অবশ্য ঈশ্বরদাস চৈতন্যের মরদেহ সম্পর্কে কিছু গোপন তথ্যও পরিবেশন করেছেন তার চৈতন্যভাগবতে। তিনি লিখেছেন—

> শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞাপাই। অন্তর্থে নেলে শব বহি।
> গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইলাক জীব।।
> চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গেলে।

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর চৈতন্য প্রভুর শব অন্তরীক্ষে বহন করে গঙ্গানদীতে (পুরী থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচী নদীতে) ভাসিয়ে দেওয়া হয় শ্রী জগন্নাথ দেবেরই নির্দেশে। পরে ঐ দেহ জীবন্ত হয়ে গঙ্গায় লীন হয়। চৈতন্য তিরোভাবের কাল ঈশ্বরদাসের মতানুসারে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অন্যদের মত রথযাত্রার পর তৃতীয়ার দিন—চন্দন যাত্রা উৎসবের দিন।

'শ্রীচৈতন্য তিরোধান রহস্য' নিয়ে নানার্জনে উৎকট ধরনের গবেষণা করেছেন; কেউ কেউ তাঁর গুপ্ত হত্যার কথাও বলেছেন—চৈতন্য পরিকরেরা চৈতন্য তিরোভাবের সত্য ঘটনা জানতেন—তাঁদের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজও সে সব কথা অবশ্যই শুনেছিলেন। মর্মান্তিক দুঃখ পেলেও জীবনীকাব্যে তিনি কেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন উল্লেখ রেখে গেলেন না সেটাই আমাদের তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তিনি যদি তা করতেন তাহলে চৈতন্যের তিরোভাব নিয়ে গবেষকদের কষ্ট কল্পনা ও উৎকট সন্দেহ আজ কোন গ্রন্থেই স্থান পেতো না। তাঁর চরিতামৃতও সুসম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারতো।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 'ধুয়া' গান

নির্মলেন্দু ভৌমিক

...১...

'ধুয়া' গান ঃ পরিচয় ও সাধারণ বক্তব্য

'ধুয়া' গান বা 'ধুয়া পদ' সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। মূলত এটি মধ্যযুগীয় বাঙলা আখ্যানকাব্য-পাঁচালি প্রভৃতির উপস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একটি সাহিত্যিক কৌশল। 'ধুয়া' একটি তদ্ভব শব্দ। সংস্কৃত ধ্রুবক > ধ্রুবা > ধুয়া—এইভাবে এটির উদ্ভব ঘটেছে। অন্য ভাবেও এটির বিবর্তন দেখানো যায়। সং ধ্রুবক > প্রা ধুঅঅ > ধুঅ, ধুআ, ধুয়া। সংক্ষেপে 'ধ্রু'। মঙ্গলকাব্যে, পাঁচালি ও পালাগানে দোহারের (< ধ্রুবকার) যে পদ বা শ্লোক বারবার গায়। 'ধুয়া ধরা' মানে প্রথম পদ বা কলি গাওয়া। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রেমের গানের (সং ২৬, গী. বি) প্রথম কলি হল—''আমার শেষ রাগিনীর প্রথম ধুয়ো ধরলি কে রে তুই।'

মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে ধুয়া-ধ্রুবপদের অবস্থান এবং অবয়ব সর্বত্রই এক বা অভিন্ন হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা গেছে,—পদের দ্বিতীয় কলিতে ধুয়া-র প্রয়োগ হচ্ছে এবং তা তিন পঙ্‌ক্তিতে রচিত 'অপূর্ব ত্রিপদী' ছন্দে; আঞ্চলিক ভাবে কখনো সেই ধুয়াকে 'ঝুমুর' বলা হচ্ছে। কিন্তু আখ্যান-কাব্যগুলিতে ধুয়ার অবস্থান পদের প্রারম্ভে এবং সাধারণভাবে তার বিস্তার দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে। ক্রমে এই ধুয়া-ধ্রুবপদ দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির বদলে গোটা একটা গানেই পরিচিত হয়েছে।

আখ্যান কাব্যগুলির আখ্যানের পটভূমিকায় ধুয়াগুলি সাধারণভাবে কবিদের নিজস্ব *Interpretation*। কখনো বা এগুলি গায়কদের যোজনা—গায়কদের যোজনাই বেশী। কেননা উপস্থাপ্য বিষয়টিকে হৃদ্য ও মনোহারী করবার জন্যই এগুলির প্রয়োগ হত। মুদ্রিত আখ্যান-কাব্যগুলি দেখলে আজ সহসা বোঝবার উপায় নেই, সেগুলি কবিদের না গায়কদের দৃষ্টি। তবে পারিপার্শ্বিক নানা কারণ বিচার করলে সেগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়। আখ্যানের সেই বিশেষ অংশটি কোন্ দৃষ্টিতে বিচার্য অথবা তার রস গ্রহণীয়—বা কোন্ বিশেষ ভাবাবেগ এটির পেছনে ক্রিয়াশীল, এ সবই ধুয়া গানের মধ্যে মেলে। মধ্যযুগের বঙ্গীয় আখ্যানকাব্য ছিল মূলত *Objective*; কিন্তু এই ধুয়াপদগুলি ছিল কবিদের (গায়কদের) *Subjective* বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভব উপলব্ধির দিক। বাঙলা সাহিত্যে কবিদের প্রাচীনতম এবং প্রথমতম ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি প্রকাশের স্থল হল এই ধুয়াগুলি। আধুনিক বাঙলা নীতিকবিতার প্রাচীন ও দেশীয় উৎস বলতে এই নাম-পদগুলিকেই নির্দেশ করতে হয়।

শ্রীচৈতন্য দেবের অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক। রাধা বিরহ-ভাবকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে ধারণ করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিই শেষে 'গৌরচন্দ্রিকা' রূপে প্রবর্তিত হয়। গৌরচন্দ্রিকা যেমন কোনো বিশেষ পর্যায়ের পদাবলীর ভূমিকা হয়েছে, তেমনি সেই রীতি-দ্বারা আখ্যানকাব্যের কবি-গায়কগণও প্রভাবিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের ভূমিকা রূপে ধুয়াগানের প্রয়োগ করেছেন।

পদের দ্বিতীয় কলিতে তিন পঙ্ক্তিতে ধুয়া ছাড়াও দুই পঙ্ক্তির আয়তনে পদের প্রথমেও বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ধুয়ার যোজনা করেছেন। অবশ্য এই দুই রীতিরই ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। কবিদের সম্বোধন, প্রশ্ন, বিস্ময়, আবেগ—এই ধুয়াগুলির মূল লক্ষ্য। এই রীতির জের আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে এবং চৈতন্য জীবনীমূলক কাব্যেও টানা হয়েছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য এবং চৈতন্যদেবই যে ধুয়া গানের প্রবর্তনের অন্যতম উৎস বা কারণ, তার এক প্রমাণ হল—কবি কঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর সামান্য পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধব 'ধুয়া 'কে 'বিষ্ণুপদ' আখ্যা দিয়েছিলেন—যদিও 'ধুয়া' এই অভিধা তখন পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। যদিও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে ধুয়া পদের কোনো প্রয়োগ নেই। অতএব প্রমাণ হল—আখ্যান কাব্যেও বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রের ধুয়া-পদে ব্রজবুলী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। যাই হোক, সম্ভবত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে ধুয়াপদের প্রবর্তন ঘটেছে। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে দেখা গেছে, মনসা বা ধর্ম-মঙ্গলে ধুয়া পদের ব্যবহার খুবই কম; চণ্ডীমঙ্গলে সেই তুলনায় বেশী। চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবি—মুকুন্দ এবং ভারতচন্দ্র ধুয়া পদ রচনা এবং প্রয়োগে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। মধ্যযুগের অপর প্রখ্যাত মুসলমান কবি—দৌলাত কাজীর নামও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বা উত্তরবঙ্গের মনসা মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা পুরাণ'-এ ধুয়াপদের ব্যবহার একেবারেই নেই।

সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পড়বার জন্য রচিত হয়। কিন্তু এতেও রাগাশ্রিত পদ ধুয়া রূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

এইভাবে, মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের ধুয়াপদের একটি সাধারণ পরিচয় এখানে তুলে ধরা গেল। এবার এই পটভূমিকায় আলোচ্য প্রসঙ্গটির বিস্তৃত ও বিশদতর পরিচয় দিই এবং কাব্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রসঙ্গটির কী পরিণতি ঘটেছে, তার ইতিহাস ব্যক্ত করছি।

...২...

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ধুয়াপদ

বৈষ্ণব পদাবলীতে দ্বিতীয় রাশিটি ধুয়ারূপে চিহ্নিত হয়েছে (পরবর্তী কালে এই ধুয়া 'ঝুমুর' নামে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই গৃহীত হয়েছে)। দ্বিতীয় কলিটিকে ধুয়া রূপে

উল্লেখের রীতি জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দে'ও দেখা গেছে—সেখানে তা 'ধ্রুবম্' নামে উল্লিখিত। কিন্তু এই ধ্রুবম এক পঙ্‌ক্তির—বৈষ্ণব পদাবলীর মতো তিন পঙ্‌ক্তির নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধুয়া পদ-প্রসঙ্গে দুটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, বড়ু দুটি পদের মাঝখানে সংস্কৃতে স্ব-রচিত শ্লোক দিয়েছেন, যা গেয় নয়, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে সেগুলি ধুয়ার ভূমিকা পালন করেছে। গেয় নয় বলেই এগুলির (অর্থাৎ স্ব-রচিত শ্লোকগুলির) সঙ্গে স্বভাবতই রাগ-তালের কথা উল্লিখিত হয়নি। এগুলি যোজনার উদ্দেশ্য হল কাহিনী 'খেই' ধরা। কাজেই এগুলি হল 'সংযোজক'। ভাবের দিক থেকে দুটি ভাবের সংযোজক। এখানেই এসেছে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত ভাবের প্রতিফলন, যা ধুয়ারও একটি বিশেষত্ব। দ্বিতীয় কথা এই : অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর লিখিত গ্রন্থের (বাছাই প্রবন্ধ : অক্টোবর, ২০০০) 'কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ' প্রবন্ধে বিস্তৃত গবেষণায় প্রমাণিত করেছেন—বড়ুর কাব্য গীত হবার জন্য লিখিত হয়নি। পরবর্তী গায়কগণ ওই কাব্যের গীত রূপ দেন; এবং তখনই গায়কগণ তাতে ধুয়ার যোজনা করেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ধুয়াগানগুলি বড়ুর নিজের রচনা নয়; পালাগানের গায়কগণের রচনা ও যোজনা এবং সেই কারণেই অধ্যাপক দাসের এই অনুমান, মূল পদের সঙ্গেও ধুয়াগানগুলির প্রসঙ্গত সঙ্গতি এবং ছন্দোগত সঙ্গতি নেই। আমরা অধ্যাপক দাসের এই অনুমান অনুমোদন করি এ কারণেই যে, এই রীতি সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে ও সত্য এবং হয়তো বা কৃষ্ণকীর্তন থেকেই তা সূচনা হয়ে গেছে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে পর্যবেক্ষণ করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত এই ধরনের ধুয়ানামের আরো নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়বে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা—চর্যাপদের ধুয়োর কথা এখানে স্বভাবতই ওঠে। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক ধুয়া ত্রিপদীছন্দে ব্যক্ত হয়ে থাকে, অতএব চর্যাপদের যে-যে অংশ ত্রিপদী ছন্দে সজ্জিত করা যায়, সেই-সেই অংশ ধুয়াগানের আদি উৎস। এই বলে তিনি ২৮-সংখ্যক চর্যার বিশেষ একটি অংশকে ত্রিপদী ছন্দে পুনর্বিন্যাস করে, তাকেই ধুয়া বলেছেন—

মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিন মাবরী
গিবত গুঞ্জরী মালী।।

অধ্যাপক বসুর এই মন্তব্য পড়লে সহজেই মনে হয়, ধুয়া বলতে আমরা যে বিষয়-প্রসঙ্গটিকে বোঝাতে চাইছি, তাঁর ধারনা তা থেকে ভিন্ন।

...৩...

পদাবলী ও চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যে ধুয়া পদ

আগেই বলেছি, বৈষ্ণব পদাবলীতে, গীত গোবিন্দের অনুসরণে প্রথম পদের

অব্যবহিত পরেই ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধুয়া সচরাচর তিন পঙ্‌ক্তির, তবে ব্যক্তিক্রমও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থের দিক থেকে সেগুলি হয় সম্বোধন মূলক, নয়তো প্রশ্নবোধক। গোবিন্দ দাসের পদ থেকে এর উদাহরণ দিই।

ক. পদের আরম্ভেই ধুয়া ঃ

শুন শুন মাধব কোন্ কলাবতী সোয়।

প্রেম হেম গাহি আপন রঙ্গ দেই

এ হেন সাজাওলি তোয়।। ধ্রু।। - শ্রীপদামৃত মাধুরী/পৃ.১৮৪

(তোমার প্রেম রূপ সুবর্ণ গ্রহণ ('গহি') করে তার পরিবর্তে নিজের রঙ্গ (স্বল্পমূল্যের ধাতু বা প্রভা) দিয়ে তোমাকে এমন করে সাজাল কে? —খণ্ডিকা)

খ. পদের দ্বিতীয় স্তবকে ধুয়া ঃ

হরি ঘরে হরিখে বরিষে রস-বাদর

সাদরে পুছয়ে বাত।

নিরায বদন তোরি, আকুল সো হরি

নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত।

মানিনি! কিয়ে কঠিন তুয়া মান

ছলে বলে দিবি জলে তোহে কত সাধল

পাশটি না হেরলি কান। ধ্রু।। —ঐ, পৃ.২৬৫

[সখির উক্তি। কলহান্তরিতা। শ্রীকৃষ্ণ যখন হর্ষভরে রসের বাদল সৃষ্টি করেন, তখন কতো আদরে তোমাকে নানা প্রশ্ন করেন। সেই হরি আজ তোমার মুখপানে চেয়ে আকুলা হয়েছেন এবং তোমার হাত নিয়ে নিজ মস্তকে স্থাপন করেছেন (সাক্ষাৎ করবার ছলে) ....]

চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস প্রভৃতি সব বৈষ্ণব কবিই এই দু'ভাবে ধুয়ার প্রয়োগ করেছেন : হয় একেবারে পদের প্রথমেই, নয়তো দ্বিতীয় স্তবকরূপে। ধুয়া সর্বত্রই তিন পঙ্‌ক্তির এবং তা সম্বোধন, প্রশ্ন বা বিস্ময়বোধক কাব্যরূপে প্রযুক্ত। এমন কি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-এ যখন কোনো রাগাশ্রিত গান দিয়েছেন (মধ্যলীলা। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ), তখন তিনিও এই রীতি মান্য করেছেন ঃ

অন্যের সে অন্যমন আমার মন বৃন্দাবন

মনে মনে এক করি জানি।

তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়

তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি।

প্রাণনাথ মোর সত্য নিবেদন।

ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম,

না পাইলে না রহে জীবন।। ধ্রু।।

আমি এখনো নিশ্চিত নই, তবে মনে হয়, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকেই সম্ভবত মধ্যযুগীয় বিশেষত্বপূর্ণ ধুয়ার ব্যবহার আরম্ভ হতে থাকে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ও ধুয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমে বৃন্দাবন দাসের ধুয়ার পরিচয় দিই। বৃন্দাবন দু'রকমের ধুয়ার ব্যবহার করেছেন : তিন পঙ্‌ক্তির এবং দুই পঙ্‌ক্তির। মনে হয়, তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া খাঁটি বৈষ্ণবপদাবলীর ধারার অনুগত; আর দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়া পাঁচালী কাব্যের ধারার অনুগত। দৃষ্টান্ত এই ঃ

ক. তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া : এগুলিকে 'অপূর্ণ ত্রিপদী' বলা যায় ঃ

কি আরে রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।

ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর,

আনন্দে দেখিছে।। ধ্রু।।

[শ্রীরাগঃ। চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড। রাম = বলরাম। গোপাল = শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বৃন্দাবন দাস বলছেন]

খ. তিন স্তবকের ধুয়া গানের দ্বিতীয় স্তবক 'অপূর্ণ ত্রিপদী' ছন্দে ঃ

জিনিঞা রবিকর, অঙ্গ মনোহর,

নয়নে হেরই না পারি

আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম

উপমা নাহিক বিচারি।। ধ্রু।। (প্রথম স্তবক)

হে মাই! হে মাই! দেখত গৌরাঙ্গ চন্দ্র।

নদীয়াক লোক— শোক সব নাশম,

দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ।।

[ভাষাভঙ্গি লক্ষণীয়। বিস্ময়। ধানশ্রী। অদ্দিখণ্ড।]

গ. অপূর্ণ ত্রিপদীতে ভাবিয়ারা রাগে ঃ

চৌদ্দিগে গোবিন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে বঙ্গে।

বিহ্বলা হৈলা সব পারিষদ সঙ্গে।

হরি রাম রাম রাম ।। ধ্রু।।

[মধ্যখণ্ড । অষ্টম অধ্যায়।]

ঘ. দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়া : পঠ মঞ্জরী, একপদী ঃ

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ।

দশ দিনে উঠিলা আনন্দ।। ধ্রু।।

ঙ. দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাভূত করবার পর কবির উল্লাস। বর্ণনার মাঝখানে স্থাপিত

হরি হরি বলি গোরা পহুঁ নাচে বাহু তুলি।

জনমন বান্ধল করুণ বোল বলি।। ধ্রু।।

[ধানশী রাগ। আদি খণ্ড, নবম অধ্যায়।]

চ. পুণ্ডরীক-গদাধর মিশানের পর উল্লাস।

নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি
অসাধনে চিন্তামনি হাথে দিল বিধি।। ধ্রু।।

[মধ্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়। অসাধনে = সাধন-ভজন ব্যতীতই। চিন্তামনি = এখানে চৈতন্যদেব। মানুষের হাতে বিধি এই চিন্তামনিকে সাধন-ভজন ব্যতীতই তুলে দিলেন।]

ছ. গৌর এ পরম দয়াল।
ধন্য ক্ষিতি, ধন্য অবঁতার, ধন্য কলিকাল।। ধ্রু।।

[মধ্যখণ্ড। শ্রীধর বরলাভ বর্ণন নামে নবম অধ্যায়ে।]

জ. গৌরনিধি কপটসন্নাসিবেশ ধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী।। ধ্রু।।

[শ্রীচৈতন্যের কোনো মায়াবন্ধন নেই। তত্ত্বতঃ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কাজেই তার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য কোনো উপাসনারই দরকার নেই। এজন্যেই তাঁকে 'কপটসন্ন্যাসীবেশধারী' বলা হয়েছে। মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই।]

ঝ. মোর মোর বঁধুয়া
গৌর গুণনিধিয়া।। ধ্রু।।

[ভাষা লক্ষণীয়। মধ্যখণ্ড। মহা মহাপ্রকাশবর্ণন নামে দশম অধ্যায়ে।]

অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধুয়ার ব্যবহারের কথা বলি। বড়ুচণ্ডীদাস যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই পদের মাঝখানে বা পদের প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকের যোজনা করে, ধুয়ার পরিবর্তে পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তেমনি দুটি রীতির অবলম্বন করেছিলেন : ক. পরিস্থিতি ও বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সমতা-সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরাণ গ্রন্থ থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন; খ. 'তথাহি গ্রন্থকারস্য' বলে নিজের রচিত সংস্কৃত শ্লোক যোজনা করেছেন। এই দুই রীতির মধ্যেই স্বয়ং কৃষ্ণদাসের নিজস্ব ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণটি ফুটে উঠেছে বটে, তবে দ্বিতীয় রীতিটিরই মধ্যে তা বেশী পরিমাণে দেখা যাবে। কী করে *Objective* বিষয়-পরিস্থিতিকে *Subjective* করে নেওয়া যায়, এগুলি তারই নিদর্শন। এছাড়াও কৃষ্ণদাস তৃতীয় আর একটি রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাকে খাঁটি ধুয়াই বলা যায়। যেমন—মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে 'তথাহি পদম্' বলে তিনি দুই পঙ্ক্তির একটি ধুয়ার উল্লেখ করেছেন এবং এটি যে ধুয়াই, নিজেই তার উল্লেখ করেছেন—

তথাহি পদম্—
সেই! সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহালাগি মদন-দহনে দহি গেনু।।
এই ধুয়া-গানে নাচেন দুই ত প্রহর।
কৃষ্ণ ল'য়ে ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর।।
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।

সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক।।

এই একই রকম ভাবে, বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তার পদকে চৈতন্য দেবের মানস-প্রকাশক ধুয়া রূপে কৃষ্ণদাস ব্যবহার করেছেন। যেমন,

ক. তথাদি পদম্—

কি কহব রে সখি, আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।। ধ্রু।।
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন।। —মধ্যলীলা। ৩য় পরিঃ

খ. তথাহি পদম্—

হা হা প্রাণ-প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জরে।। ধ্রু।।
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ।।
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতর।।

এখানে লক্ষ করবার বিষয় হল : ক. 'পদম্' বলতে কৃষ্ণদাস অপরের রচিত গানকে বুঝিয়েছেন, যা ধুয়া রূপে গীত হয়েছে। ধুয়া এখানে গানের ধুয়া নয়, —অর্থ-প্রসঙ্গ-পরিস্থিতির প্রকাশক একটি সাহিত্যিক দিক; খ. সম্বোধন, বিস্ময়, ভাবাবেগ প্রভৃতি দিক এখানে মূল লক্ষ্য, তা ব্যক্ত করতেই এই রীতির আশ্রয় নেওয়া। এই সব ক্ষেত্রে যে ভাষাগত বিশেষত্বের সৃষ্টি হয়েছে,—তা পূর্ণমাত্রায় *Stylistics* বা শৈলীবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রধান দিক।

...৪...

মঙ্গলকাব্যে ধুয়াপদ

চৈতন্য পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্যে ধুয়া পদের ব্যবহার বিস্তৃততর হয়েছে। চৈতন্য দেবের ভাবাবেগময় জীবন। শাক্ত কবিদের মনেও অনুরাগ-বেদনার ভাব সৃষ্টিও করেছিল। সে কারণেই প্রাকচৈতন্য যুগের তুলনায় চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্যে ধুয়া পদ এত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের রাধাভাবের আবেগকে অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবিদল যেখানে নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগে পরিণত করে নিতে পেরেছেন এবং নিজ নিজ কাব্যে, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে তা প্রয়োগ করতে পেরেছেন, সেখানেই ধুয়াপদ একটি সাহিত্য শিল্প হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সাহিত্যাবেগ শেষে বাঙলা গীতিকাব্যের উৎসরূপে কাব্য করেছে। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের দুই সেরা কবি—মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্র—এই দুজনের ধুয়াগানের বিশদ আলোচনা করলেই এই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। দেখা গেছে, মনসা ও ধর্মমঙ্গলের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলে ধুয়া পদের

প্রয়োগের পরিমাণ অধিক। এর মূল কারণ, মনসা বা ধর্মের তুলনায় চণ্ডী স্নিগ্ধতর দেবী,—কাজেই তাঁকে কেন্দ্র করে আবেগের উৎসারণ সহজতর হয়েছে, চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই ভাবাবেগকে তীক্ষ্ণতর ও ব্যাপকতর করেছে। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য এবং তাঁর পরবর্তী কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ধুয়াগানকে যে স্তরে পৌঁছে দিলেন,—ভারতচন্দ্রে এসে সেটাই পূর্ণতর হয়ে গোটা এক-একটি গান বা কবিতায় রূপ নিল। ভারতচন্দ্রের পর বাঙলা কাব্যে একশ' বছর কোনো কবি নেই—সবাই কবিওয়ালা। এই কবিওয়ালাদের কেউ কেউ যে শ্রেষ্ঠস্তরের নীতিকবিতা রচনা করেছিলেন—তা ভারতচন্দ্রেরই উত্তরাধিকার রূপে, —যে ভারতচন্দ্র আবার তা অর্জন করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্গ ধারার ফল থেকেই। ক্রমেই দেখা যাবে, এক একজন কবি এসেছেন, বিশেষত মুকুন্দ-ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাধর কবিগণ—তাঁরাই পূর্ববর্তী ধারা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজ নিজ প্রতিভা মিশিয়ে, এক-পা এক-পা করে ওই ধুয়াপদ ও গানকে গীতিকাব্যের স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দের 'বিষ্ণুপদ' নামকরণের মধ্যে কেবল বৈষ্ণবতার আক্ষরিক প্রতিধ্বনিই নেই, 'বিষ্ণুপদ'গুলি যেন 'গৌরচন্দ্রিকা'র নামান্তর হয়ে উঠেছে। এই দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল, মুকুন্দ 'বিষ্ণুপদ' নাম ব্যবহার করেন নি, কালকেতুর উপাখ্যানে একবার মাত্র কবি পয়ারপদকে 'ধুয়া' নামে উল্লেখ করেছেন। 'বিষ্ণুপদ' অভিধা নেই বলেই যে মুকুন্দের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব নেই, একথাও বলা যায় না। আমার নিজের গণনায় কালকেতুর উপাখ্যানে 'অপূর্ণ ত্রিপদী' ছন্দে মোট আঠারোটি ধুয়াবৎ পদ আছে, অবশ্য তার মধ্যে একটি সন্দেহজনক। আমার মতে, 'অপূর্ণ ত্রিপদী'তে রচিত ধুয়াবৎ পদগুলি সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণবতার ফল, —ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যা লক্ষ্য করেন নি।

অপূর্ণ ত্রিপদীতে কালকেতুর উপাখ্যানে যে ধুয়ারং পদগুলি আছে তা এই : ১. 'শুকদেব বন্দনা'র আরম্ভে; ২. দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গের আরম্ভে; ৩. গৌরীর রূপ বর্ণনার প্রারম্ভে; ৪. নারদাগমনের প্রারম্ভে; ৫. নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ অংশের প্রারম্ভে; ৬. সাধভক্ষণ-এর প্রারম্ভে; ৭. কালকেতুর বাল্যক্রীড়া অংশের প্রথমে; ৮. চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন-এর প্রথমে; ৯. চণ্ডীর পরিচয়-দান অংশের দ্বিতীয় স্তবকে; ১০. ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর রূপবর্ণনা-অংশের প্রথমে; ১১. বনে ব্যাঘ্রভীতি অংশের প্রথমে; ১২. বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু অংশের প্রথমে; ১৩. রাজ-সমীপে হাটুরিয়াগণের আবেদন অংশের প্রথমে; ১৪. কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ অংশের প্রথমে; ১৫. কালকেতুর খেদ-অংশের প্রারম্ভে; ১৬. গুজরাটে আনন্দোৎসব অংশের প্রথমে; ১৭. ভাঁড়ুর প্রতিউক্তির প্রথমে।

আর দুই পঙ্ক্তির পয়ারধর্মী ধুয়াবৎ পদ পাই দুটি মাত্র : ১. কালকেতুর যুদ্ধ অংশের প্রথমে; ২. সৃষ্টিপ্রকরণ অংশের প্রথমে এবং মুকুন্দ কর্তৃক 'ধুয়া' রূপে একমাত্র চিহ্নিত পদ।

'অপূর্ণ ত্রিপদী' ছন্দে যে সতেরোটি 'ধুয়া'বৎ স্তবক পাওয়া গেছে, লক্ষ্য করবার

বিষয়, কেবল একটি ক্ষেত্রে ('চণ্ডীর পরিচয় দান' অংশে) এই পদ দ্বিতীয় স্তবকে গ্রথিত হয়েছে, বাকী সবই, ষোলোটি ক্ষেত্রে বর্ণিতব্য বিষয়ের প্রথমে স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর 'ধুয়া' পদের প্রথমে মেলে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকেই বেশী, যা গীতগোবিন্দে দেখা গেছে। অথচ মুকুন্দ সতেরোটি ক্ষেত্রেই সেগুলিকে প্রথমে স্থান দিয়েছেন। বিষয়ের দিক থেকে দুঃখ, আনন্দ, আবেগ, বিক্ষোভ, প্রশ্ন, বিস্ময়—প্রভৃতি বোঝাতেই এই গতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে—যা *Objective* সাহিত্যের মধ্যে *Subjectivity*র সুর লাগিয়েছে। এখানেই ধুয়ার সঙ্গে গীতিকবিতার যোগ আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

আমাদের আরো একটি অনুমান ছিল : 'অপূর্ণ ত্রিপদী'তে রচিত ধুয়াপদ বৈষ্ণব পদাবলীর; আর দুই পঙ্‌ক্তিতে রচিত ধুয়া পদ আখ্যায়িকা-পাঁচালি কাব্যের। এই অনুমান দৃঢ়তর হয় মুকুন্দের প্রয়োগ থেকে। একমাত্র 'দৃষ্টিপ্রকরণ' অংশের দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়াকেই তিনি 'ধুয়া' বলেছেন—কুত্রাপি তা আর বলেন নি। মুকুন্দের ধুয়াগুলি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে—তাঁর 'অপূর্ণ ত্রিপদী'র ধুয়াগুলি অনেকবেশী আবেগপ্রবণ, এমন কি *Subjective* দিকের আভাস তাতে আছে; কিন্তু দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়াগুলিতে *Ojective* দিক বেশী। এই 'অপূর্ণ ত্রিপদী'গুলিই পরবর্তীকালে গীতিকাব্যের উদ্ভবের মূলে সক্রিয় হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এসে দেখা গেল, এতে ধুয়া পদ ও গান মিলিয়ে মোট ৮০টি রচনা আছে। ধুয়াপদের এই আধিক্যই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাবৎ মধ্যযুগীয় কোনো মঙ্গল কাব্যেই এত অধিক সংখ্যায় ধুয়াপদ ব্যবহৃত হয়নি। স্বভাবতই মনে হয়, পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় ভারতচন্দ্র অনেক বেশী গীতিপ্রাণ কবি, যে গীতিপ্রাণতা তাঁকে একজন সমর্থ নীতিকবিরূপে প্রমাণিত করে। ভারতচন্দ্র যে গীতিকবিতার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গেছেন, এ তারই প্রমাণ। ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, কোনো কোনো বিশেষ দুঃখ-আবেগ-আনন্দ-উল্লাসের ক্ষণে ওই ধুয়াপদগুলিকে কেবল দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আখায়া-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের সম্মিলিত রূপের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গান সৃষ্টি করা। মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের ধুয়া রচনার যে ঐতিহ্যময় ধারাটি ছিল (অর্থাৎ দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া) তিনি তাকে অব্যাহত রেখেই ধুয়াকে পূর্ণাঙ্গ এক-একটি গান-কবিতায় রূপ দিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ একদিকে তিনি যেমন ঐতিহ্যনুসারী দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া রচনা করেছেন, অপর দিকে তেমনি কো‌নো কোনো ধুয়াকে পূর্ণাঙ্গ গান-কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন। ভারত-প্রতিভার এই দিকটি সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

অন্নদামঙ্গলের সর্বপ্রথম যে ধুয়াবৎ পদটি আছে, তা 'গণেশ বন্দনা' অংশের দ্বিতীয় স্তবকে, একেবারে জয়দেবীয় পদ্ধতিতে—

বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ
পূজা হোম যোগযাগে   তোমার অর্চনা আগে,
তব নামে সিদ্ধ সর্ব রাজকাজ।।

অতঃপর 'শিববন্দনা', 'সূর্যবন্দনা', 'কৌষিকী বন্দনা' প্রভৃতি বন্দনা অংশে এই একই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি কোনো কোনো বন্দনা অংশে আবার নেনও নি। প্রথম যে ধুয়াটি একটি পূর্ণাঙ্গ গানরূপে মেলে সেটি 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশটি। তেমনি 'পীঠমালা'র প্রারম্ভে এক পঙ্‌ক্তির ধুয়া—"ভব সংসার ভিতরে। ভবভবানী বিহরে।" 'শিব বিবাহের সম্বন্ধ' অংশের পূর্বে সরাসরি 'নারদের গান' নামে একটি গান আছে,—যাতে কালী-দুর্গা-চণ্ডীর প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। 'শিববিবাহ' এবং 'কন্দল ও শিবনিন্দা' নামে যে দুটি পূর্ণাঙ্গ গান আছে, পরবর্তী গানে বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতকে' এবং তারও পরে রবীন্দ্রনাথের গানে সেই ছাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে। তুলনার জন্য প্রসঙ্গটিকে বিশদ করা যায়:

'শিববিবাহ' নামে গানটির প্রারম্ভিক দুটি স্তবক এই :

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
  করবিশসিত নিশিত পরশু
  অভয় বর কুরঙ্গিয়া।।
লক লক ফনী জটাধিরাজ
তক তক তক রজনিরাজ
ঠক ঠক ঠক দহনসাজ
  বিমল চপল গঙ্গিয়া।।[২]

প্রারম্ভিক স্তবকটি তিন পঙ্‌ক্তির, যা মধ্যযুগীয় ধুয়াপদের মূল রচনরীতির অনুসারী, —এটির মধ্যে তাই আলোচনা করবার নতুন কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবক বা অন্তরার পর-পর তিনটি মিল পরবর্তী কালের বাঙালী গীতিকারগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে পাই,—

ক. তবু যে পরান মাঝে
গোপনে বেদনা বাজে—
এবার সেবার কাজে।
  ডেকে নাও সন্ধ্যাকালে।।

খ. কত যে গিরি কত যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
  কাহারে তাহা কর।।....
আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব

নজরুলের গানে—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা ঘুচাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।।

'কন্দল ও শিব নিন্দা'র গানটিতে যে অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয়েছে, বাঙলার গান বলতে সেই মিলটিই সর্বাধিক গৃহীত হয়, — রবীন্দ্রনাথও সর্বাধিক এই মিলটিই অনুসরণ করেছেন—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।।....
উমার কেনা চামর ছটা / তামার শলা বুড়ার জটা
তাই বেড়িয়া ফোঁকায় কেনা, / দেখে আসে ঘর লো।।

কখনো ভারতচন্দ্র প্রথমেই একটি পয়ার দিয়ে পরে ত্রিপদী ছন্দে গানটি আরম্ভ করে দেন। যেমন,

ক. সিদ্ধিঘোটন :

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয়।। এর পর ত্রিপদী।

খ. সিদ্ধি ভক্ষণ :

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধিশুদ্ধি হৈল ভুল।।[১] এর পর ত্রিপদী।।

'হরগৌরীর বিবাদসূচনা' অংশে প্রথমে একটি পয়ার পদের পর, —পর-পর তিনের মিল রক্ষিত হয়েছে,—

বিধি মোরে লাগিল হর বাদে
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে।।
এ বড় বিষম ধন্দ
যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ
পড়িনু প্রমাদে।

'অন্নদার বরদান' অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর তিন পঙ্‌ক্তির পরিচিত ধুয়া মেলে :

ভবানী বাণী বল একবার
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবানী ভবের সার।।

...৫...

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিগণও তাঁদের আখ্যানকাব্যটির প্রয়োজন ও ঐতিহ্য অনুসারে ধুয়া ব্যবহার করেছেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মোটামুটি মধ্যভাগের, রোসাঙ্গ রাজসভার কবি দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী' আখ্যান কাব্যটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দৌলত এটি শেষ করে যেতে পারেন নি। মধ্যযুগের অপর শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল তা সম্পূর্ণ করেন। দুই শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিকে একই রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বলে রচনাটিকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলে গ্রহণ করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা কেবল দৌলত কাজী-র রচিত অংশটুকুকেই উদাহরণের জন্য নির্বাচন করে নিচ্ছি।

'সতীময়না এবং লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের মধ্যে দেখা যায়, যেখানেই দুঃখ-বেদনা-কারুণ্য-বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই 'ধুয়া' গানের প্রয়োগ করেছেন দৌলত। ধুয়াগুলির রচনারীতিতেও ঐতিহ্যানুসারিতাকেই দেখা যায় : হয় মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্যের নিজস্ব রীতিতে দু পঙ্‌ক্তির ধুয়া গান; নয় তো বৈষ্ণব পদাবলীর ধারায় রচিত তিন পঙ্‌ক্তির অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে রচিত ধুয়া। এ ছাড়া খুব তীব্র ও তীক্ষ্ণ দুঃখবেদনার ক্ষেত্রে পরে একটি গোটা গানই দেওয়া হয়েছে—পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যার পূর্ণতর রূপ মেলে। ভারতচন্দ্রের গানগুলি আস্থায়া-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ অংশে পর-পর চারটি অভিন্ন অন্ত্যমিল যোজনা করে গানকে আরো ঘন ও জমাট করে তুলেছেন। দৌলত কাজীর গানে তখনো তা পূর্ণতা অর্জন করেনি।

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত দু পঙ্‌ক্তির ধুয়া গানগুলি প্রয়োগের দিক থেকে 'ভূমিকা' ধর্মী—অর্থাৎ যে ঘটনা এখনো ঘটে নি, কিন্তু এখনি ঘটবে, সেই ঘটিতব্য ঘটনার ভূমিকা রূপে ধুয়াগুলি যোজিত। ফলে এগুলি গৌরচন্দ্রিকা পদের নামান্তর হয়ে উঠেছে। গৌরচন্দ্রিকা যেমন চৈতন্যদেবের জীবনের বাস্তবভূমির আলোকে মহাজনদের রচিত পদের ভূমিকা—ঠিক তেমনি। এই হিসেবে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রভাব ধুয়া গানে দুরকম ভাবে দেখা যেতে পারে : রচনাগত দিক থেকে, যথা তা তিন পঙ্‌ক্তির; আর প্রয়োগগত দিক থেকে, যখন তা দু পঙ্‌ক্তির রচনা হয়েও, গৌরচন্দ্রিকার নামান্তর রূপে ব্যবহৃত।

যেমন, 'লোরের বিলাপ' অংশে, তখনো চন্দ্রানীকে সাপ দংশন করেনি, কিন্তু প্রসঙ্গ টির সূচনা হয়েছে, কাজেই ভবিতব্য ঘটনার সূচক হিসেবে ধুয়া গান পাওয়া গেল,

কালরূপে নাগেতে দংশিল চন্দ্ররানী।
রাজার কুমারী বালা মোহর পরানা।।

প্রয়োগের দিক থেকে এতে নতুনত্ব কিছু মাত্র নেই। আর যে কোন দু-পাঁচটি মধ্যযুগীয় আখ্যানকাব্যে যা করা হয়, এখানেই তাই করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনোটিতেই কেবল আর একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য থাকে, যা বিশেষভাবে নজর কাড়ে, — যা এখানেও আছে। তা হল—একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশক রূপে ঘটনাটিকে ব্যক্ত করা। *Narratology*-র দিক থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্য মাত্রই *Objective* দৃষ্টি থেকে উপস্থাপিত, — কিন্তু এখানে, এই ধুয়া নামটিতে প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা হচ্ছে লোরের ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা রূপে। কবি এখানে নেপথ্যে সরে গেছেন। কালনাগিনী চন্দ্রানীকে দংশন করেছে, সেই 'বালা' হল—'মোহর পরানী',—'আমার পরান'। শুধু ওই 'মোহর' শব্দটিই এখানে একটি নীতিকাব্যের আভাস জড়িয়ে দিল। অবশ্য এমন ব্যাপার খুব কমই

ঘটেছে, এবং সে কারণেই এগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান। এর পরবর্তী 'ময়নার বিলাপ' অংশে কিন্তু এই ব্যক্তিগত দুঃখানুভূতির দিকটি নেই। এখানে কবিই যেন বিশেষ কোনো উপদেশ-পরামর্শরূপে ময়নাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

ময়না, মিল না রে।
ছাতনের সঙ্গে ময়না, মিল না রে।।

পদের প্রারম্ভে যোজিত, ময়নার উদ্দেশে কৃত কবির এই মন্তব্য স্পষ্টতই পদের শেষে যোজিত, চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর ভনিতাকে স্মরণ করায়। এর মধ্যে দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, মুসলমান কবিগণ চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভনিতার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করেন নি; ভনিতার দিক থেকে মুসলমান কবিগণ চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভাবধারাকে এক এবং অভিন্নই রেখেছেন; দ্বিতীয়তঃ, ভনিতার শেষের বক্তব্য ধুয়ারূপে প্রথম বক্তব্যে পরিণত হয়েছে।

ধুয়াগান এবং গোটাগানের প্রয়োজনের ফলে দৌলতের কাব্যের বারমাস্যা বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, —তাবৎ মধ্যযুগীয় কাব্যে যা একটি বিরল-দৃষ্ট প্রসঙ্গ। বারমাস্যা গানের দুটি প্রয়োগগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই : প্রথমত, তা দুঃখবিরহ-বেদনাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তা প্রযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, সচরাচর তা বছরের এক জায়গা থেকে শুরু হয়ে, অবিচ্ছিন্ন ধারায় ব্যক্ত হতে থাকবে। দৌলতের কাব্যে কিন্তু বারমাস্যা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়নি। আষাঢ় মাস থেকে এখানে ময়নার বারমাস্যা শুরু হয়েছে এবং প্রতি মাসের দুঃখ ব্যক্ত করবার পর একবার করে 'মালিনীর মিনতি' ব্যক্ত হয়েছে। ফলে বারমাস্যা অংশ ময়না-মালিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা উত্তর বঙ্গের 'নীলার বারমাসী'তেও দেখা যায়। এই উত্তর-প্রত্যুক্তি একদিকে যেমন লোকনাট্যের ঈষৎ বৈশিষ্ট্যের ধাবক, অপর দিকে তেমনি ময়নার নিজস্ব উক্তির মধ্যে তাঁর একক হৃদয়েরও প্রকাশ, — যা গীতিকাব্যের ইঙ্গিত বহন করে। এজন্যেই অর্থাৎ এককভাবে একান্তভাবে ময়নার হৃদয়-বেদনার সূচক হয়ে ওঠবার জন্যই দৌলত এই অংশে এক-একটি গোটা গান জুড়ে দিয়েছেন। আষাঢ় মাস থেকে ময়নার বারমাস্যা শুরু করবারও একটি বিশেষ কারণ আছে। দেখা গেছে, সব বারমাস্যাতেই বর্ষাকালকে একটু বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অন্যসব মাস সম্পর্কে একটি শ্লোক থাকলে, অনেক সময়ই বর্ষাকাল সম্পর্কে থাকে একের অধিক শ্লোক। এর অন্য যে কোন কারণই থাক, একটি কারণ হল,—বর্ষাকালকে বিরহের মাস রূপে মনে করা। বিদ্যাপতির রাধা অন্য সব মাসকে বাদ রেখে 'ভরা ভাদর মাহ'কেই তার বিরহের তীক্ষ্ণতম স্তর বলে মনে করেছিলেন। বর্ষাকালীন এই বিরহবোধই ময়নার সাধারণ বিরহের সঙ্গে বাড়তি আরো একমাত্রা যোগ করে ব্যক্তিগত ভাবটিকে গভীরতর করে তুলেছে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস প্রসঙ্গে ময়নার যে দুটি ধুয়া গান আছে, দুটিই অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে এবং আশ্চর্যের কথা, ভাষাতে ব্রজবুলির স্পর্শ লেগেছে। এতে এই বিশেষ ছন্দের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর যে ভাবানুষঙ্গের কথা আমরা অনুমান করেছি, তা দৃঢ়তর হয়।

যেমন—

ভাদ্র প্রসঙ্গে :

(আরে মালিনি) হাম বড় দুঃখী অপরাধী রে।

যে দুঃখ মোহর পরে পড়ৌক সতিনী শিরে

চন্দ্রানী হইল মোর বাদীরে।। ধুয়া।।

আশ্বিন প্রসঙ্গে, স্পষ্টতই রাধার কথা এসেছে এখানে—

মালিনি, কি এ তুই ভোলাও সি রাই।

যেই সিংহাসন খঞ্জন খেলন

তাত তুই কাক সোয়াও সি আই।। ধুয়া।।

আশ্চর্যের কথা এই, ময়নার দুঃখের পাঁচালি শুনতে শুনতে কখন 'আনমনে' মালিনীরও মনের মধ্যে ব্যক্তিগত বেদনাবোধ জেগে উঠেছে। মাঘ মাসের বিরহ কথার প্রাক্‌কালে মালিনীর ব্যক্তিগত জবানীতে অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে এই ধুয়া মেলে,

কি হৈল জঞ্জাল রে

যৌবন জঞ্জাল জাল ধঞি হৈল মোর কাল

কি মোর জীবন রে।। ধুয়া।।

...৬...

শেষ কথা

খুবই সংক্ষেপে মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য পরিক্রমা করে আসা গেল। সব কবির কাব্যের উল্লেখ প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত হলেও স্বাভাবিক কারণেই তাদের নামোল্লেখ করা যায়নি। তবে যাঁদের কাব্যের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরাই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদেরই কাব্যধারার মাধ্যমে ধুয়া গানের বিশেষত্বটিকে ধরতে চেয়েছি।

এই পরিক্রমাকালে আমাদের বারবার মনে হয়েছে, শ্রীচৈতন্য দেবের অনুভব-উপলব্ধির ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে যেখানে তা একটি সাহিত্যিক রীতি হয়ে উঠেছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সংবেদনশীল কবি সেটিকে এক ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের উপায় রূপে দেখেছেন যেখানে—সেখানেই এই ধুয়াগানের মূল সার্থকতা নিহিত আছে। চৈতন্যদেবের সাংস্কৃতিক অবদানের এই পরোক্ষ দিকটি এতোদিন অনালোচিত এবং প্রায় অনাবিষ্কৃত ছিল। এই ভাবাবেদন মূলক ব্যক্তিগত অনুভূতির চিরকালীন দিকই পরবর্তী কালে কবি টপ্পা গানের মধ্য দিয়ে আধুনিক গীতিকবিতার স্বর্ণসম্পদ রচনা করেছে। সকলেরই জানা আছে, মধ্যযুগের *Objective* বিষয় এবং সেই ধরনেরই তার উপস্থাপন রীতি *Subjective* নীতিকবিতার পরিপোষক ছিল না। ইউরোপীয় এবং পাশ্চাত্য প্রভাবই বাঙালীর নীতি কবিতার মূল উৎস—এ কথা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। 'বিবিধ প্রবন্ধে'

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'গীতিকাব্য' নামে প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন তিনি 'ভেতো বাঙালী'র জাতীয় মানসিকতার মধ্যে গীতিকাব্যের উৎসে অন্বেষণ করেছিলেন,—হাতের কাছেই যে কবি-টপ্পা গান কিংবা তারও পেছনে যে 'ধুয়া গান' 'জাতীয় কারণ' রূপে বিদ্যমান ছিল—তখনকার তথ্যের স্বল্পতার জন্যই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা উল্লেখ করেন নি। 'পঞ্চভূতে'র 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে রোমান্টিক কাব্যের উৎস খুঁজেছিলেন। তাঁরও অন্বেষণের মূল নীতি ছিল—বাঙালী বা ভারতবাসীর জাতীয় মানসিকতার দিক। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতবাসী নিসর্গের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম যে মানুষ ও নিসর্গ এখানে সহোদর-সহোদরা—রোমান্টিকতার সুযোগ স্বভাবতই সেখানে সঙ্কুচিত। ইউরোপের সঙ্গে নিসর্গের যোগ রেনেসাঁসের পরে, নিসর্গের সঙ্গে মানুষের এই নব পরিচয়ই, নতুন এবং প্রথম প্রেমের মতো দুর্বার ও পরব রমণীয়। সে কারণেই পাশ্চাত্য বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতার জোয়ার আসে। কিন্তু বিদেশ থেকে আগত এই রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারা কখনোই একটি পূর্ণ রোমান্টিক ধারা হয়ে বাঙালা সাহিত্যে দেখা দিতে পারত না,—যদি মধ্যযুগ থেকে ধুয়া গানের ব্যক্তিগত ভাবনা-অনুভূতির এই ধারাটি না থাকত।।

---

১. 'হাপোঁরী রূপ' অংশের গানেও পর-পর তিনটি অন্ত্যমিল দেখা যায়

২. এই রীতিটিই ভারতচন্দ্রে সর্বাধিক অনুসৃত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : ফিরে দেখা

শক্তিনাথ ঝা

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় মুর্শিদাবাদে শাসনকেন্দ্র এবং ট্যাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। নেমে আসে বর্গীর আক্রমণ, শুরু হয় পাঠান বিদ্রোহ, নবাবদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তারপর পলাশীর যুদ্ধে শাসক, ভূমি ও অর্থনীতি বদলে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম লুন্ঠন শুরু হয় বঙ্গদেশে। আসে মন্বন্তর। এ শতকের দ্বিতীয় পর্বের শিল্পী ভারতচন্দ্র (১৭১৯—১৭৬৭), রামপ্রসাদ (১৭২১—১৭৮১), মহারাষ্ট্র পুরাণকার গঙ্গাধর দত্ত এবং শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বরকে আমরা আলোচনায় ব্যবহার করবো। এরা সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের নিম্নবিত্ত মানুষ। ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি এবং রামপ্রসাদকে সাধককবি বলে, এদের সাহিত্যে সমকালের ছবি এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যাখ্যার দায় আমরা এড়িয়ে গেছি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বহু আগে থেকেই নবাব, ইংরেজ শাসক এবং তাদের কর্মচারীরা বলপ্রয়োগে অধিকতর খাজনা আদায় করতো। ঐতিহ্যবাহিত জলসেচ-ব্যবস্থার বিনষ্টিতে, রাজকর্মচারী ও বর্গীর লুন্ঠনে, সজল বর্ষার অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। বিদেশী বণিক এবং তাদের দেশীয় সহচর ব্যবসায়ীদের শোষণ এবং পীড়নে হস্তশিল্পিরা বিপন্ন হয়েছিল। তুলনায় নিরাপদ কলকাতা ইত্যাদি শহরে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে শহরে, শাসক এবং শোষকদের হাতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদিও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নাগরিকদের এলাকায় চলে এসে মুনাফাবাজদের গুদামে জমা হোত। গোপন সুরঙ্গে হারিয়ে যেতো রক্ত ও ঘামে ভেজা ফসল, রৌপ্য-স্বর্ণমুদ্রা। একচেটিয়া ব্যবসায় বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জনের রীতিপদ্ধতি অলৌকিক ঘটনার মতো, যাদুকরের ভোজবাজির মতোই প্রতীয়মান হতো। চেনা দেবতারা কেউ এ সমস্যার সমাধান জানতো না। কাশীর খাদ্যাভাবে ভৈরবেরা খাদ্যশস্য হরণ করেছিল। দিল্লিতে ভূত, প্রেত, ভৈরবেরা খাদ্য কেড়ে নিতো। দক্ষযজ্ঞে ভূত প্রেতাদি শুধু যজ্ঞ নষ্ট করে নি, যজ্ঞ কর্তাদের খাদ্যও কেড়ে নিয়েছিল। ধন-ধান্যের সাবেক দেবী লক্ষ্মী কাশীর খাদ্যাভাব দূর করতে পারেন নি। এর সমাধানের জন্য তিনি অন্নপূর্ণার শরণ নিতে বলেছিলেন। সম্ভবত শস্যের সংগ্রহ, ব্যবসা, পরিবহনের গুরুতর সমস্যাগুলি আঞ্চলিক খাদ্যাভাব সৃষ্টি করতো। ধীরে ধীরে তা মন্বন্তরে পূর্ণতা পায়।

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গের বিপুল রাজস্ব দিল্লি চলে যেতো। পলাশীর যুদ্ধের পরে এ দেশের সম্পদ চলে যাচ্ছিল ইংলণ্ডে।[১] বাংলার লক্ষ্মীর পদচিহ্নিত মাটিতে অভাব-অনটনের, দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নামতে থাকে। দরিদ্র এবং উঞ্ছজীবি মানুষেরা হয় এর শিকার। উচ্চবর্ণের নিম্নকোটির মানুষের দুর্দশার কাহিনী শাক্ত পদে, শিবায়নে আছে। এ যুগের শিব ভিখারি[২], গ্রাম্য ছেলেরা তার গায়ে ফেলে দেয় ছাইমাটি; পার্বতীরা "অন্ন বিনা হৈল

কালি''। সাধক কবির শাকে, ''লুন মেলে না''। নিম্নবর্গের উদ্বাস্তুদের মিছিল এঁকেছেন গঙ্গাধর দত্ত। আর ভারতচন্দ্রে গ্রাম্য-সর্বহারাদের বিচিত্র ছবি।

সেকালে কৃষক খাজনা দিতে / অর্থাভাবে ফসল বেচে দিত। জমিদারেরা খাজনার পরিবর্তে ফসল দিত। জগৎ শেঠের মতো বহু মহাজন করতো খাদ্যশস্যের ব্যবসা। পরে ইংরেজ কোম্পানী এবং তার কর্মচারীরা খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসায় কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, অহেতুক মূল্যবৃদ্ধি করে বিপুল মুনাফা করতো। ১৭১১ এর দুর্ভিক্ষে কয়েক হাজার লোক মারা যায়। মুর্শিদকুলি খাদ্যশস্যের রপ্তানী বন্ধ করে এবং গুদামজাত শস্য উদ্ধার করে অবস্থা সামাল দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ''শস্যগোলা''-এ দুর্দিনের জন্য যে আঞ্চলিক খাদ্যভাণ্ডার রাখতো, সে প্রথা লুপ্ত হয়। সৈন্যদের জন্য খাদ্যশস্য সংগৃহীত হতো। নবগঠিত শহরগুলির জন্য যেমন কলকাতা, চন্দননগর, হুগলি, খাদ্যমজুত করার রীতি ছিল। অন্নদামঙ্গলে নবগঠিত কাশীর সমস্যা—'অনেকের হৈল বাস সকলের অন্ননাশ'। মানসিংহ কাহিনীতে খোদ দিল্লির সাময়িক খাদ্যসমস্যা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং নগরের জন্য ব্যবসায়ীরা খাদ্য মজুত করতেন। রাজনৈতিক গোলযোগে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শস্যহানির ফলে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতো। ১৭৩৭ এ ঝড়ের পরে এবং ১৭৫২-৫৩ এর বন্যায় বাংলার অঞ্চল বিশেষে খাদ্য-সমস্যা প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।[৫] এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে মোঘল বাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন ভবানন্দ মজুমদার। এ সূত্রেই তার সৌভাগ্যদয়। তিনি কিখাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ছিলেন? না, সৈন্যদের সহায়তায় স্থানীয় ফসল কেড়ে নিয়ে বিজয়ীদের তুষ্ট করেন। কাশী এবং দিল্লিতে ভূত, প্রেত, ভৈরবেরা খাদ্য ছিনিয়ে নিত (অন্নদামঙ্গল)। এরা সৈন্য, খাজনা আদায়কারী, একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সশস্ত্র অনুচর হলেও হতে পারে। ব্যাসের মত ভারতচন্দ্রও ক্ষমতাবানদের নেতিবাচক দিকের পরিচয় উহ্যই রেখেছেন।

এ সময়ের কবিগণ দেশের সমস্যা, বিশেষতঃ দারিদ্র্য সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। সমৃদ্ধির পাশে সর্বনিম্ন ক্রয়ক্ষমতা হীনতাই রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য। একদিকে সমৃদ্ধ জমিদার, তারই সমান্তরালে ''আমার শাকে লুন মেলে না।'' ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হল খাদ্যবস্ত্রের অভাব। দেবী বন্দনায় তাঁর উক্তি ''দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ''। তিনি প্রার্থনা করেছেন, ''অন্নপূর্ণা অন্নে পূর্ণ কর।''

অন্নদামঙ্গলে পদ্মিনী বস্ত্রাভাবে পদ্ম পাতায় লজ্জা নিবারণ করে। ''অন্নবিনা কলেবর অস্থিচর্ম সার।'' ভূমিহীন, জাত-বৃত্তিহীন তার স্বামী কাঠ ঘুটে সংগ্রহ করে। তিনি ''অন্ন বিনা পান তাপ।'' দৈবী কৃপায় সন্তান পেলেও পদ্মিনী, 'অন্নবিনা মরে'। দেবী-পুত্র হরিহোড় বলে ''অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ''।

শতচ্ছিন্ন কাপড়ে গিঁঠ দিয়ে অনাথা এক গ্রামবৃদ্ধা রোগেশোকে জীর্ণ, ''অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্ম সার।''

এসময়ে খাদ্যাভাবে গায়েন বাদকেরা নির্জীব হয়ে প্রার্থনা জানায়, ''অন্নে পূর্ণ কর

ঘর, কণ্ঠে দেহ স্বর।" ভারতচন্দ্রের মত 'মহাকবি'দের অবস্থা পতিনিন্দা থেকে উদ্ধার করি—

"মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে (অন্নদামঙ্গল)

বহু গ্রন্থকার স্বনাম ধন্য ব্যাস দীক্ষা, যজ্ঞ, পূজা, বিচার বিতর্ক থেকে সশিষ্য খাদ্যবস্ত্র জুটিয়ে নেন। ক্ষমতাবাজের রোষে এবং অন্নভাবে সশিষ্য তার দুর্দশার বিস্তৃত বর্ণনা পাই অন্নদামঙ্গলে। "ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈল উতরোল"। শিষ্যেরা খাদ্যাভাবে হল মৃতপ্রায়। তিনদিন পেটের জ্বালায় জ্বলে অবশেষে অন্নদার দয়ায় খাদ্য পেলেন। পরোক্ষে অন্নকে, অন্নদাকেই তিনি ব্রহ্ম হিসাবে শ্রদ্ধা জানালেন।

শিব-পার্বতীর কৈলাসেও ছিল অন্নাভাব। ভিক্ষান্নে পেট ভরে না শিবের; কাঁপে ক্ষুধায় দেহ। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।" অর্থনৈতিক উৎপাদনে তার সক্রিয় ভূমিকা নেই। তিনি সাপের খেলা দেখান। জাদুবিদ্যায় জটা থেকে জল নিষ্কাষণ করে, জ্বালেন কপালে অনল। শিঙ্গা ও গাল বাজিয়ে আনন্দ দেন মানুষকে। পার্বতীর তেল সিঁদুর, শাঁখাশাড়ি নেই। ধনী কুবেরের বাড়ীতে দু'তিনবার দিনে যান খাবার ধার করতে। অভাব থেকেই শিব-পার্বতীর অবিরল কোন্দল। শিবের ভিক্ষা প্রার্থনায় গ্রাম্যজন বলে,

"অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া" (অন্নদামঙ্গল)

এমনকি অন্নস্রষ্টা চাষীর ঘরেও খাদ্যাভাব। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।।" (ঐ)

এ সময়ে হস্তশিল্পিদের গুরুত্ব ছিল। ব্যাস বিশ্বকর্মাকে তোয়াজ করে বলেছে, "তুমি বিশ্ব গড়তেই বিশ্বে বড়"। তিনি তো বিশ্বকর্মাকে ব্রহ্মপদ দিয়ে নতুন পুরাণ রচতে চেয়েছিলেন। তখন কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েরাও সুতো কাটতো। কিন্তু ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের যুগে শ্রমিকদের বেগার খাটতে হতো। 'গুণধর যত কারিগর হইবে দুঃখী বেগার" ব্যাসের এই অভিশাপ বাস্তবায়িত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গের হস্তশিল্পের সুপরিকল্পিত ধ্বংসসাধন অর্থনৈতিক ইতিহাসের অতিপরিচিত এক অধ্যায়। এই তো ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের সামাজিক চালচিত্র।

সে সময়কার ঈশ্বরী পাটনীরা পেটভরা ভাতের সঙ্গে শ্রমশক্তি বজায় রাখার জন্য সামান্য দুধও চাইতো। বর্ধমান, কৃষ্ণনগরের রাজসিক খাদ্য ছিল না তাদের প্রার্থিত। জমি, সোনার প্রতিও তাদের লোভ ছিল না। তখন সম্পদের অবিরল হস্তান্তর ঘটে চলেছিল। নয়াঅর্থনীতির কার্যকারণ সূত্র মানুষের মনে হতো দৈবী মায়া। অনুগ্রহ এবং নিগ্রহের কারণ স্পষ্ট ছিল না। হরিহোড় অন্নদার কৃপা পেল, কিন্তু অকারণে কৌশলে তিনি তাকে ছেড়ে

গেলেন। হরিহোড়ের মৃত্যু মাত্র, "দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়।" যায় কোথায়? সে দুর্দিনে কুবেরের গৃহ ছিল অন্নে পূর্ণ। অন্নদা যেতেন সেখানে ধার করতে। অন্নদার অভিশাপ পেলেও তার অনুচর, সন্তানের অন্নাভাব ছিল না। জয়াবিজয়ার ভবিষ্যৎ বাণীর সূত্রে[৪] অন্নদার পূজা মর্তে করেছে কুবের। পূজা প্রচার করেছে তার অনুচর বসুন্ধর এবং পুত্র নলকুবের। রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর সঙ্গে কুবেরের পার্থক্য নির্ণয় করে কুবেরকে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের দেবতা বলেছেন। নয়া অর্থনীতিতে মূলধনের মালিকেরা অদৃশ্য থেকে পণ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং লাভজনক মূল্যে সরবরাহ করেন। পলাশীর যুদ্ধের আগে ও পরে জগৎশেঠের মত বড় ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্যের মত পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ শাসকেরা এ ব্যবসায় একচেটিয়া সংগ্রহ, কৃত্রিম অভাব এবং অধিকতর মুনাফা করতেন। ফরাসডাঙ্গার ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং ওলন্দাজদের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে দেবীপুত্র জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রও ঋণের প্রয়োজনে গতায়াত করতেন।

হিন্দু ঐতিহ্যে লক্ষ্মী ছিলেন ধনধান্যের উৎপাদনের দেবী। নতুন দেবী অন্নদা হলেন, কুবেরের সম্মতিক্রমে, অন্নাদির নিয়ন্ত্রক দেবী। পৌষের সবুজ খেতে তার আসন পাতা নয়। চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে, যখন ধান এবং চৈতালি ফসল উঠে গোলাজাত, গুদামজাত হয়, তখনই অন্নদার পূজার আসর বসে। প্রাচীন উক্তিকে পরিবেশন করে ভারতচন্দ্র বলেছেন,

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ। * *
* * *
ভিক্ষা মাগা নৈব নৈব চ (অন্নদামঙ্গল, শিবের ভিক্ষা যাত্রা)

সাধক রামপ্রসাদ বা মহাভক্ত ভারতচন্দ্র রায় কোথাও দারিদ্রের গুণকীর্তন বা ভিক্ষার মহিমা ঘোষণা করেন নি। ভারতীয় সন্ন্যাস এবং প্রচলিত ধর্মীয় ঐতিহ্যের গুণগ্রাহী ছিলেন না তাঁরা। না করেছেন বৌদ্ধ-বৈষ্ণব ঐতিহ্যের অনুসরণ। জমির মালিক সামন্তযুগে ছিল সর্বোচ্চ মানের পাত্র, বেনেরা সমাজে শ্রদ্ধেয় ছিলেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে কৃষি খুব লাভজনক নয়; সরকারী কর্ম জটিল, ব্যবসা বাণিজ্য বরেণ্য। বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছে। পণ্যের ব্যবসায়ে ধন উৎপাদন এবং সে ধন দিয়ে রাজক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সঙ্গে অন্নদার সম্পর্ক আছে। তার কৃপায় মোঘল সৈন্যকে বিপদে খাদ্যাদি সরবরাহ করে ভবানন্দের ভাগ্য ফিরে যায়। এ সময় অর্থই সমাজের চালিকা শক্তি। হীরামালিনী স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছে, "কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।" টাকা পেয়ে ঘটকেরা অকুলীন হরিহোড়কে মহাকুলীন বলে প্রচার করে, তিন কুলীন কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তারপর সংগৃহীত হয়েছে চতুর্থ পত্নী। ধনগর্বী নলকূবর দেবীও ধর্মাচারকে ব্যঙ্গ করেছিল। ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে যান ভারতচন্দ্র। ঘুষ দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন সুন্দর।

সেই বিপর্যস্ত যুগের এক কুলীন কন্যা পারিবারিক কলহে পিতৃগৃহে যেতে উদ্যত হলে সখী জয়া তাকে নিরস্ত করে। অন্নাভাবের কালে পিতামাতা-ভাজের কাছে বিবাহিত

কন্যা সমাদৃত হবে না। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, নয়া বাণিজ্যনীতি অচিরস্থায়ি ভোজবাজির মত। ভোজবাজী জানতেন শিব, অন্নদাও। লোকায়ত যাদুকরদের ''ভেলকিতে কত ভাত সোনা হয়'' (হরিহোড়ের উক্তি)। দেবী ঘুটেকে সোনা করে দিলে বিমূঢ় হরিহোড়ের মনে হয়েছে, ''জাগিতে স্বপন কিংবা বাজী অনুমানি''। তিনি কবিঘুটে অদৃশ্য করে, নিজের পসরা রাখেন। লোহার সেউতিকে দেন সোনা করে। সঙ্গত কারণেই রামপ্রসাদ বলেছেন,

''তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা''।

মধ্যযুগের রসায়নবিদেরা, যুগীসিদ্ধারা লোহা বা অন্যধাতুকে সোনায় পরিণত করতেন গুপ্ত বিদ্যায় বা কৌশলে। শিব পরিবারে রক্ষিত ছিল এ গুপ্তকাল। জয়া অন্নদাকে এ কৌশল ব্যবহার করে এক কর্মকাণ্ড শুরু করতে বলেছিল—

'তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে।
কৈলাশ শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে' (জয়ার উপদেশ, অন্নদামঙ্গল)

তখন অন্নের সামাজিক চাহিদা প্রচুর। সব দেবতা এবং অনুগামীরা অন্নাভাবে পীড়িত। কৈলাশ শিখরের নির্দিষ্ট কোন স্থলে দেশের সমস্ত অন্ন একত্রিত করলে, কৃত্রিম যে খাদ্যাভাব দেখা দিবে, তাতে কোথাও অন্ন না পেয়ে শিব তার কাছে আসতে বাধ্য হবে। দেবতারা এবং মানুষেরা অন্নের জন্যই তার মহিমা স্বীকার করবে। ভারতচন্দ্র তদানীন্তন অন্নাভাবে এ ভাবেই অন্নদার ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছেন। কৈলাশের অনুচর বৃন্দ সর্বত্র খাদ্য ছিনিয়ে নিচ্ছিল তখন। একচেটিয়া পণ্য সংগ্রহ, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, মুনাফা এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের এ কৌশল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মানবায়িত হয়েছিল।

দেশের দারিদ্র্য এবং অন্নাভাবের পেছনে অদৃশ্য হাতকে স্বীকার করেও ভারতচন্দ্র বহু বাস্তবিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিদ্যাসুন্দরে বর্ধমানের রাজা কোটালকে বলেছে—

আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্বস্ব হরি
* * *
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।।

সেকালের নগরপাল চুরি এবং ডাকাতি করতো। এ তথ্য রাজা হঠাৎ জানেন নি। রাজপ্রসাদের সমস্যায় এ ভর্ৎসনা কেবল।

সাধারণ রাজকর্মচারী ''সাজোয়াল হৈল সুজন সর্বভক্ষ্য''। রাম দেবনাগ/সুজনের মতো অনেকেই প্রজাসাধারণের সর্বস্ব গ্রাস করে। হীরা নগরপালের বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ এনেছিল,—''লোকের ঝি বউ লয়ে সদা থাকে মত্ত হয়ে''।

তখন দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে চলেছে বর্গীদের লুঠপাট। গঙ্গারাম দত্ত বলেছেন যে তারা

মানুষ/নারীকে পণ্য করে," "সোনারূপা লুটে নেয়"। ভারতচন্দ্র একই কথা বলেছেন—

"লুটিয়া লৈল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি'। বর্গীরা
লুটিয়া বাঙ্গলার লোকে করিল কাঙ্গাল।" (অন্নদামঙ্গল)

একদিকে রাজকর্মচারী, অন্যদিকে বহিরাগত লুঠেরাদের যৌথ আক্রমণে,

"বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।।" (অন্নদামঙ্গল)

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মধ্যবঙ্গের ভূমিতে চাষ হয় না। গৃহহারা হয় নিম্নকোটির মানুষ। শিল্প-বাণিজ্যে প্রাদুর্ভূত হয় সঙ্কট। উৎপাদনের সঙ্গে ব্যবসার, সরবরাহের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। জাত-বৃত্তির অচলায়তন ভাঙ্গে। শিবের মত ব্রাহ্মণ ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙ্গল বানিয়ে শুরু করেন চাষ। কৃষির উপর চাপ পড়ে, উৎপাদন কমে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফাটকাবাজি আসে ব্যবসায়। সামান্য কারণে সরবরাহ বিপর্যস্ত হলে, নির্দিষ্ট আয়ের লোকের বাড়ে দুর্দশা। বঙ্গের প্রবল বর্ষায়, বন্যায় মোঘল সৈন্যেরা এই বলে বিলাপ করেছে, "শির বেঁচে টাকালই সেহ যায় ভেসে" (মানসিংহ পর্ব)। বীরত্বের, অস্ত্রের আস্ফালনের পরিবর্তে দরিদ্র মানুষদের এ বিলাপ সাহিত্যের মধ্যযুগে এক তুলনা রহিত সংলাপ।

সে সময়ে যেন তেন প্রকারে ধ্বংসগ্রাহী ব্যক্তিরা 'দেবীপুত্র' বলে বিবেচিত হতো। সবল দুর্বলের ধন লুণ্ঠন করতো। রামপ্রসাদ তো মন্বন্তর দেখেছিলেন। দিনমজুরীর অর্থ ছিনতাই করে পঞ্চভূতে। বঙ্কিমের ভাষায়, "দেশ তখন শ্মশান" (আনন্দমঠ)। সর্বত্র ভূত, প্রেত, ভৈরব। কাশী বা দিল্লিতে খাদ্য ছিনতাই করে এরা। প্রজাদের এনে কয়েদ করে, বেগার খাটায়। খাজনার দায়ে নিলামে ওঠে সম্পত্তি, নয়াধনীরা তা কিনে নেয়। টাকা দিয়ে তারা প্রভাবিত করে বিচারককে। নির্বিত্ত প্রজারা উকিল দিতে পারে না। সরকারী উকিল বিপক্ষের সহায়তা করে গোপন উৎকোচে। প্রজাদের ভোগ করতে হয় দীর্ঘ কারাবাস। শৃঙ্খলিত হাতে পায়ে, নামমাত্র খাদ্যে, কশাঘাতের অশেষ বেদনায় কাটে দিন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে খাজনার দায়ে ভারতচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

অর্থ ও খাদ্যাভাবে, সামন্তদের অত্যাচারে বিচারের প্রহসনে, বেগার খাটায় গোটা জীবনটাই গারদখানায় পরিণত হয়েছিল। দুঃখের আগুনে মানুষ হয় লোহাপেটা। জীবনের আগে পিছে দুঃখের দুর্বহ বোঝা। 'শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুন পোড়া" (ভক্তের আকুতি, রামপ্রসাদ)। দেবতার সঙ্গে সুবিচার এবং মঙ্গলের সম্পর্ক নেই। সমকালীন সামন্তশক্তির প্রতিরূপে তিনি স্বৈরাচারী, খেয়ালি। তার নিগ্রহ অনুগ্রহের থাকে না যুক্তিসঙ্গত কারণ। অবিচারে রামপ্রসাদের মত নির্দোষ মানুষের উপর ভারী হয় দুঃখের ডিগ্রি। ব্যবসায়ী কৃষ্ণপান্তি পায় জমিদারী; অথচ সাধক কবির 'শাকে নুন মেলে না।" জীবন-নাট্যে সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট হয় দুঃখীর ভূমিকা পালন। একেই ব্যাখ্যার অতীত 'লীলা' বলা হয়েছে। একদিকে দুঃখে আর্ত নির্দোষ মানুষ; অন্যদিকে বর্ধমানে,

কৃষ্ণনগরে জমিদার গৃহে ভোগ সুখের শত আয়োজন। সাধক ভক্তেরা পায় না দেবীকে বা তাঁর কৃপা। অথচ, হরিহোড়, ভবানন্দ তাকে পায়। সর্বব্যাপ্ত নৈরাজ্যে বিপুল সংশয়ে পদকর্তা নরচন্দ্র তাই বলেই ফেলেন,

"থাকলে আসি দেখা দিতো
সর্বনাশী বেঁচে নাই।"

দেবী অন্নদা কূটবুদ্ধি ও কৌশল পরায়না। তিনি শিবের মত খোলামেলা নন। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করে তিনি কাজ করেন। বিষ্ণু বা ব্রহ্মার মতো শিবের বিরুদ্ধে যেতে তিনি অক্ষমতা জানান না। কিন্তু দিল্লির ঈশ্বর জাহাঙ্গীর বাদশার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যান নি। ক্ষুধার্ত ব্যাসকে তিনি দুর্নাম, অভিশাপ, ব্রহ্মহত্যা নিবারণার্থে খাদ্য দেন। কিন্তু ছলনা করে ভেস্তে দেন তার পরিকল্পনা। ছলনা করেই তিনি ছাড়েন হরিহোড়ের বাড়ি। এমন কি ভক্তদেরও "নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় বলে ছলো।" আনন্দ বাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে তিনি যন্ত্রণায় দগ্ধ করেন। ছল, চাতুরী, কূটকৌশল এবং রাজনৈতিক 'ষড়যন্ত্রের যুগচ্ছায়া' প্রসারিত হয়েছে অন্নদার মূর্তি নির্মাণে।

ঐতিহাসিকেরা অষ্টাদশ শতকের বঙ্গে নারীর স্বাধীন অস্তিত্বের অস্বীকার দেখেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে অন্নদা, কালিকা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রানী ভবানী এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বিদ্যা স্বাধীন ভাবে স্বামী নির্বাচন এবং পুরুষসঙ্গ করে। স্ব-উপার্জনে হীরা মালিনী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকে। সৈন্যদলে কর্মরত ১৫ বছরের ঘেসেড়ানী এগার বার স্বামী বদলায় এবং 'খুচরো' প্রেম করে। শাক্তপদের উমাসঙ্গীতে পুরুষ তান্ত্রিক শাস্ত্র এবং সম্মানের বধূ নির্যাতনের বহু তথ্য আছে। মেনকা আর্তনাদ করে বলেছে "নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।" ভারতচন্দ্র নারীকে দুঃখ বহন করতে দেখেছেন। কিন্তু ত্রিবিধ নারীর মধ্যে মধ্যমারা পতির অহিতের প্রতিশোধ নেয়। শ্যামাসঙ্গীতে নির্যাতিত বালিকাবধূ উমা, কালিরূপে পিষ্ট করেন পুরুষ তন্ত্রকে। এ যেন এক প্রতিশোধ।

ঢাকার বৈদ্য সামন্ত রাজবল্লভ এবং নাটোরের রানীভবানী বিধবাদের কষ্টলাঘব করে/বিধবা বিবাহ চালু করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের অনুগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে সে সব বানচাল করে দেন। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ররায় কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণাদির সমর্থনের সমালোচনা করেছেন। রাজাদের জাঁকজমকের অন্নদা/দেবী পূজাকে সমর্থন না করে রামপ্রসাদ লিখেছেন—

"জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে"

পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন করেননি ভারতচন্দ্র। তিনি 'ও রসে বঞ্চিত ছিলেন।" তার বিয়ে ছিল সুন্দরের মতই প্রেমজ। অথচ শিব, হরিহোড়, ভবানন্দ, কৃষ্ণচন্দ্রের একাধিক স্ত্রী। অন্নদা মঙ্গলে শিবের প্রেম নিবেদনে অন্নদা বলেছেন—

"সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।"

বহুগামী শিবকে তিনি ঠাট্টা করেছেন। স্বামী মরলে স্ত্রী যায় সহমরণে, স্ত্রী মরলে তাকে ভুলে স্বামী ঘরে আনে অন্য নারী। কামে বিবশ 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' শিবের চরিত্রকে শ্রদ্ধাযোগ্য করে ভারতচন্দ্র আঁকেন নি। কুবেরের অনুচর বসুন্ধর, পুত্র নলকুবর আংশিক বিকৃত কার্যে মগ্ন। এ জন্যই অভিশপ্ত। বার্ধক্যে তরুণী ভার্যা এনেই হরিহোড়ের পতন ঘটেছে। শাক্তপদে রামপ্রসাদ কুলীন প্রথায়, গৌরীদানে, বহুবিবাহে নারীর স্বাধীনতা হীনতায় উৎফুল্ল হননি।

প্রেমিকা বিদ্যার জন্য সুন্দর বহু নির্যাতন সহ্য করেছিল। সে আমরণ, আজীবন একনিষ্ঠ ছিল বিদ্যার প্রতি। সমাজ বিধির প্রতিবাদ করে সে ঘোষণা করেছিল—

"বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ তপজপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান"। নারীকে মহত্তম শ্রদ্ধার এ এক নিদর্শন। উত্তর কালের নারী মুক্তি আন্দোলনের বীজ এখানেই উপ্ত হয়েছিল। সুন্দর বিদ্যাকে দেবী করেনি, আদর্শায়িতও করে নি। পৃষ্ঠপোষক রাজার রক্ষণশীল মতাদর্শের অন্ধ বাহন ছিলেন না এ কবিরা।

প্রসঙ্গত ব্যাসের কাশী নির্মাণের স্পর্ধাকে সুচিহ্নিত করেছেন ভারতচন্দ্র। এ সময়ে দ্বিতীয় বারানসী গড়তে চেয়েছিলেন বড় নগরে রানীভবানী, নদিয়াতেও কৃষ্ণনগরের রাজারা। ব্যাসের ব্যর্থতা থেকে তাদেরও সুশিক্ষা হয়েছিল। পৃষ্ঠপোষক রাজার কাছে কলম বেচেন নি ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ। ভারতচন্দ্র তো ব্যাস কাহিনীতে, ব্যাস-গঙ্গা-বিশ্বকর্মার প্রসঙ্গে শাস্ত্রাদির মূল ধরেই টানাটানি করেছেন। নদী গঙ্গার কলঙ্ক কাহিনী গোপন করে তার মহিমা বিষয়ক গ্রন্থে এবং প্রচারেই গঙ্গার খ্যাতি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবের মহিমার উৎস ও ব্যাসের রচিত গ্রন্থ এবং সামাজিক প্রচার। দরকার হলে বিশ্বকর্মাকেই ব্রহ্মপদ দিতে পারেন গ্রন্থকার ব্যাস। তলোয়ারের চাইতে কলমের অধিক ক্ষমতার প্রবক্তা ভারতচন্দ্র। ব্যাসের মত তিনি নবপুরাণ লিখে অন্নদাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কল্পিত একগল্পের সাহায্যে ইতিহাসকে উপন্যাস করে তিনি ভবানন্দকে গৌরব দিয়েছেন। বঙ্গে মোঘল বিজয়ে ভবানন্দ বা তার দেবীর অলৌকিক মায়াকে ভর্ৎসনা করে জাহাঙ্গীর সৈন্যদলের বাহুবলের জয়গান করেছেন। তথাপি রাজা উপাধি পেয়েছেন ভবানন্দ। এ জন্য এক কাল্পনিক ভৌতিকউপাখ্যান রচেছেন ভারতচন্দ্র। দিল্লি যে বহুদূরা আর ঘটনার কালও সুদূর অতীত। সুতরাং রম্য কাহিনী রচনায় বাঁধা কোথায়? কবিরা তো প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো কল্পমূর্তিকে বাস্তবে রূপ দেন। উপরন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শর ভারতের হাতে। গঙ্গা, ব্যাসের মতো দেবতাদের, সামন্তদের প্রামাণ্য কেচ্ছা কাহিনীও জানেন এবং প্রয়োজনে পারেন তিনি এগুলি নিয়ে মজা করতে। এমন বিপজ্জনক কবিকে রায়গুণাকর উপাধি না দেওয়ার মতো নির্বোধ ছিলেন না জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

তথ্যসূত্র ঃ—

(১) ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত বঙ্গ থেকে ইংল্যাণ্ডে নিষ্কাশিত হয়েছিল ৩৮, ৪০০, ০০০ পাউণ্ড।

তখন বাংলার আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্য কোম্পানী এবং তার কর্মচারীদের কুক্ষিগত ছিল।

(২) অন্নদামঙ্গল, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা

(৩) বিস্তৃত আলোচনার জন্য, প্রাক্‌পলাশী বাংলা, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬—১০২

(৪) ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা পূজা করেছে কুবের। তার সহচর ও ছেলে শাসিত হয়ে মর্তে অন্নদার পূজা প্রচার করেছে। তার আগে নলকুর অন্নদাকে জানতো "শঙ্কর ভিখারী সেত তারি নারী* বাপের ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে দিনে আসে তিনবার" (অন্নদা মঙ্গল, নলকুবরে শাপ)

(৫) তখন তুমি পণ্যে পরিণত হয়েছে। দেহী বিক্রয় হয় দাসদাসী হিসাবে।

বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা

মানস মজুমদার

লোকসাহিত্য লোকের মুখে মুখে রচিত। মুখে মুখে প্রচারিত এ সাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য। ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। সাহিত্য-সংসারে লোকসাহিত্যের উদ্ভব আগে, লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব পরে।

লোকসাহিত্যের 'লোক' শব্দে ব্যক্তি বিশেষকে বোঝায় না, বোঝায় একদল মানুষকে। যারা গোষ্ঠীবদ্ধ। নির্দিষ্ট একটি ভূ-খণ্ডের বাসিন্দা। একই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অধীন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বন্টনরীতির প্রক্রিয়াটি একই ধরনের। সম জীবনচর্যা সমষ্টিগত জীবনবোধের অধিকারী। লোকসাহিত্য এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি। দেশের মাটি-জলের সঙ্গে এ সাহিত্যের ওতপ্রোত যোগ।

ছড়া, ধাঁধা,প্রবাদ, গীতি, গীতিকা, কথা এ সবই লোকসাহিত্যের নিদর্শন। ছড়া হলো ছুটকো পদ্য। ধাঁধা সমস্যানির্ভর রচনা, রহস্যময়তা সৃষ্টিই ধাঁধার উদ্দেশ্য। প্রবাদের আশ্রয় সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ও সরস। গীতি সুরবাহিত রচনা। গীতিকা হলো আখ্যানগীতি। কথা বলতে বুঝি গল্প বা কাহিনীকে।

লোকসাহিত্য লোকসমাজকে আনন্দ দান করে থাকে। মূলত লোকসমাজের মনোরঞ্জনের জন্যই এ সাহিত্যর উদ্ভব। লোকসমাজের সাহিত্য-রস-পিপাসা এতে পরিতৃপ্ত হয়। অবসর বিনোদনে সহায়তা করে। কিন্তু তাই সব নয়। লোকসাহিত্য লোকশিক্ষা দানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আবার জন-সংযোগের কাজটিও করে। নানা ধরনের সংবাদ দেয়। লোকসাহিত্য হয়ে ওঠে লোক-সাংবাদিকতার মাধ্যম। অন্যদিকে প্রয়োজনে লোকসাহিত্য প্রতিবাদের অস্ত্রও হয়ে ওঠে।

লোকসমাজ প্রতিবাদপ্রবণ। লোকসাহিত্যে লোকসমাজের প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রতিবাদ নানাবিধ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, ভড়ং-ভণ্ডামি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ-সহায়তায় সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস। ন্যায়-নীতির আদর্শ রক্ষার চেষ্টা। অসতের প্রতি বিরূপতা, সতের সমর্থন। মঙ্গল-কল্যাণে আস্থা।

প্রতিবাদ সমাজকে সুস্থ রাখে। যে সমাজ ও সাহিত্য যত বেশি প্রতিবাদমনস্ক, সে সমাজ ও সাহিত্য তত বেশি সচল জীবন্ত।

....২....

প্রতিবাদ অনেক কিছুর বিরুদ্ধে। যেমন, সমাজ-প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা। একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় সমাজে যে প্রথার জন্ম হয়, পরিবর্তিত পটভূমিতে তার যাথার্থ্যে

সংশয় জাগে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। প্রচলিত পুরনোর বিরুদ্ধে পরিবর্তনকামী নতুনের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়, বিদ্রোহের অবসানে নতুন একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সাম্য (thesis), প্রতিসাম্য (anti-thesis), সমন্বয় (synthesis) -এর মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে। শুধু সমাজ নয়, প্রতিবাদী চেতনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতেও সহায়তা করে। প্রসঙ্গত কৌলীন্য প্রথার উল্লেখ করা চলে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের প্রভাবেই বাঙালি সমাজে এ প্রথার উদ্ভব। জনশ্রুতি, দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের আমলে এ প্রথার প্রচলন ঘটে, কুলীন ব্রাহ্মণেরা সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন কান্যকুব্জ থেকে আগত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের উত্তর পুরুষ। কুলমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কুলীন-অকুলীন ব্রাহ্মণেরা তাই কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে তৎপর হতেন। এতে অর্থব্যয়ও কম হতো না। কোনও কোনও কুলীন ব্রাহ্মণ এ সুযোগে বিয়েটাকেই জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে বহু বিয়ের প্রথা চালু হয়। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ অনেকগুলি বিয়ে করতেন। কৌলীন্য রক্ষার জন্য কন্যার অভিভাবকেরা বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে শিশু বা বালিকা কন্যার বিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। কন্যার দাম্পত্য জীবন যে এর ফলে সুখকর হতো না তা বলাই বাহুল্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এজন্য কন্যার মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতো। কিন্তু তা প্রকাশের উপায় ছিল না। তারা ছিল নিতান্তই দুর্বল ও অসহায়। সমাজ-শাসনে পিষ্ট। সমাজের কাছে কন্যার আশা-আকাঙ্ক্ষার কামনা-বাসনার কোনও মূল্য ছিল না। একটি ছড়ায় শুনি, সমাজ এ ব্যাপারে অদৃষ্টের দোহাই দিয়েছে ঃ

তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী?[১] বালিকা কন্যার মন কিন্তু এতে প্রবোধ মানে না। সে তার ক্ষোভ আর অসন্তোষটুকু অভিযোগের মাধ্যমে প্রকাশ করে ঃ

> চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো,
> এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো।[২]

বাপ মা এবং খুড়োর অবিবেচনার বিরুদ্ধেএখানে প্রতিবাদ ধ্বনিত। বালিকা কন্যা কৌলীন্য প্রথার নির্মমতার বলি। অসমবয়সী পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে সে অসুখী। অভিভাবককুলকেই সে এজন্য দায়ী করে। তার অশ্রুসিক্ত চোখ, হাহাকার ও আক্ষেপ আমাদের ব্যথিত করে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের প্রতিবাদ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। একসময় এ প্রথার অবসান ঘটেছে। প্রসঙ্গত, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলন স্মরণীয়।

....৩....

বহু শতাব্দী লালিত আর একটি প্রথা হলো সতীদাহ প্রথা। নারীর সতীত্ব প্রমাণের এক নির্মম ব্যবস্থা। মৃত স্বামীর চিতায় জীবিতা স্ত্রীর আত্মবিসর্জনে সতীত্বের পরীক্ষা হতো। জীবনে-মরণে স্ত্রী স্বামীর অনুগতা, এই সমাজ-আদর্শ এভাবেই রক্ষিত হতো। স্ত্রী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত, স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হতো, সমাজ সতী নারীর প্রশংসা করতো।

জীবিতা মানবীর দুঃখ-কষ্ট, দহন-জ্বালা তাকে মুগ্ধ করতো, দগ্ধ করতো না। বীভৎস অমানবিক এক প্রথা শতাব্দী পরম্পরায় আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রথাটি অবশ্য চালু ছিল উচ্চ-বর্ণ সমাজে। রামমোহন রায়, এক যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন। সতীদাহ প্রথা রদের অনুকূলে জনমত তৈরি করলেন। লিখলেন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯)। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলো না। লর্ড বেন্টিঙ্কের আনুকূল্যে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা রদ হলো। অর্থাৎ, সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলো।

রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এ প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। কীর্তিমান তিনি। কিন্তু তিনি যে জনসমর্থন পেয়েছিলেন তার কারণ সমাজের অনেকের মধ্যেই প্রথাটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত ছিল। ছিল যে তার প্রমাণ এই ছড়াটি ঃ

বুড়ইয়া জামাই পুড়ইয়া খাইয়াম লবণ মাখাইয়া,
জোয়ান জামাই ঘরে আনবাম তেল সিন্দূর দিয়া।
কন্যারে ডাক্য না আর আম গাছের ডালে,
বুড়ইয়া জামাই দেখলে আমার ইন্দ্রের আগুন জ্বলে।[৫]

বৃদ্ধ জামাতা কন্যার জননীর পছন্দ নয়, কন্যার অকালবৈধব্যের আশঙ্কায় তিনি শঙ্কিতা। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু ঘটলে কন্যাকে সহমরণেও যেতে হবে। অর্থাৎ, তার অকালমৃত্যু অবধারিত। তাই এ অনিচ্ছা। 'আম গাছের ডালে'-তে এর ইঙ্গিত আছে। সেকালে সহমরণে যারা যেত বা সহমরণে যেতে চাইতো, তারা হাতে একটি আমের শাখা ধরে থাকতো। ঐ আমের শাখাটিই তাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করতো। সদ্য বিধবার পক্ষে জনে জনে ডেকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন সম্ভব ছিল না। আমের শাখাটি সঙ্কেতের কাজ করতো। 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে' প্রবাদবাক্যে এই প্রথার সমর্থন লভ্য। প্রসঙ্গত সেকথা স্মরণযোগ্য। সে যাই হোক, উদ্ধৃত ছড়াটিতে কন্যার জননীর প্রতিবাদ প্রবণতারই যে প্রকাশ ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। নির্মম হৃদয়হীন এই প্রথার বিপক্ষে তিনি।

...৪...

বলতে হয় পণ প্রথার কথাও। পণপ্রথা আমাদের সমাজ-জীবনে এক অভিশাপ। বহুকালাগত এই প্রথাটির উচ্ছেদই কাম্য। কিন্তু উচ্ছেদ সহজ নয়। এক শ্রেণীর মানুষের অপরিসীম লোভ ও হৃদয়হীনতা প্রথাটিকে সচল রেখেছে। লোকসাহিত্যে নানাভাবে প্রথাটির বিরোধিতা করা হয়েছে। পণ-শিকারীদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হয়েছে। তাতে প্রতিবাদী চেতনারই বহি:প্রকাশ ঘটেছে। বোলান গানের রং পাঁচালিতে কন্যার পিতার কণ্ঠে ধ্বনিত আক্ষেপে তারই পরিচয় পাওয়া যায় :

আমি অত গয়না কোথায় পাব?

মাটির নয় যে গড়িয়ে দেব।[৪]

পাত্রপক্ষের দাবি আকাশচুম্বী। কন্যার পিতার পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রতিবাদ তাই তাঁর কণ্ঠে।

একটি গম্ভীরা গীতে কন্যার পিতার বিপরীতে পাত্রের পিতাকে স্থাপন করে পাত্রের বাক্যবাগীশ পিতাকে কশাঘাত করা হয়েছে :

(দেখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি

বরের বাপের লম্বা বুলি।[৫]

সহানুভূতি এখানে কন্যার পিতার প্রতি। বরের পিতার প্রতি বিরূপতা। বরের পিতার সীমাহীন লোভ আর বিপুল চাহিদা কন্যার পিতাকে সর্বস্বান্ত করেছে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাকে পথে নামতে হয়েছে। বরের পিতার জন্যই কন্যার পিতার এই অবস্থা। বরের পিতার প্রতি তাই বর্ষিত হয়েছে ঘৃণা। যা কিনা প্রতিবাদ সম্ভূত। দেবতা শিবের কাছে প্রার্থনায় এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট :

'পণ প্রথাটা উঠিয়ে দিয়া সমাজ রক্ষা কর'।[৬]

একটি প্রবাদে কন্যার পিতা ও বরের পিতার অবস্থা বৈপরীত্য প্রদর্শনে বরের পিতার প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপিত :

কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।

বরের বাপ বসে আছে পাঁচশ টাকার আশে।।[৭]

কন্যার পিতার দুর্দশার সীমা নেই, পাত্রের পিতার নিলর্জ্জতার শেষ নেই। প্রবাদটি প্রতিবাদধর্মী।

পাত্র হয়ে উঠেছে পণ্য। মোটা দামে বিক্রি হয়। যে পাত্র যত বেশি শিক্ষিত, সে তত বেশি দাম হাঁকে। তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। পাত্রপক্ষ কশাইয়ের ভূমিকা নেয়। গম্ভীরা লোকনাট্যের ডুয়েট পর্যায়ে পিতা ও কন্যার কথোপকথনে পাত্রপক্ষকে তাই ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করা হয় :

পিতা —মা তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে

অমন শিক্ষাতে ধিক, অন্ধ অধিক বেচে যেন শালিক টিয়ে।

কন্যা— সোনার চেন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায় পরি,

অমন পশু কিনো না বাবা দিয়ে টাকাকড়ি।

বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝে না ছেলে পেয়ে।

পিতা—ভণ্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত চোষে

বি-এ এল-এ হলে ছেলে অর্থ পিয়াসী

ধিক্ উচ্চশিক্ষা, স্বদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।

কন্যা— বেচবে কেন ভিটেমাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটি,

মজবে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর কাটি।
ভাল কুলীন কুল-ই, কশাইগুলি, ফিরছে ছুরি শানাইয়ে।*

পিতা ও কন্যার কথোপকথন এখানে নিছক প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ নয়, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নেয়।

একটি আলকাপ পালায় দেখা যায়, পিতা প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে না পারায় কন্যার বিবাহিত জীবন বিড়ম্বনায় ভরে ওঠে। স্বামীগৃহে নানাবিধ লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় তাকে। তাই সব নয়, তাকে পরিত্যাগ করে স্বামী পুনরায় বিয়ে করে। কন্যার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। তার চোখ তাই অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠে হাহাকার। পিতা-মাতাকে উদ্দেশ করে সর্বনাশা প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কন্যা। আমরা বিচলিত হই। শিহরিত হই প্রথার ভয়াবহ পরিণতিতে :

মাগো ক্যান্যা প্যাটে ধৈর্‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যান্যা মানুষ কৈর‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যান্যা সহাগ কৈর‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, তোর বুকের দুধের এতো
জ্বালাগে মা ওগে মাগে
মাগে, আর যে সহিতে পারিন্যা
গে মা ওগে মাগে
বাপুজি, টুটি চিপ্যা
মারনি ক্যান্যা
ওজি বাপুজি
বাপুজি, বড় ক্যান্যা
কৈরল্যা বাপুজি
ওজি বাপুজি
বাপুজি, বিহা ক্যান্যা
দিল্যা বাপুজি
ওজি বাপুজি
বাপুজি, আর যে সহা
যায় না বাপুজি
ওজি বাপুজি।*

মাগো, পেটে কেন ধরেছিলে? মাগো, কেন মানুষ করেছিলে? মাগো, কেন সোহাগ করেছিলে? মাগো, তোর বুকের দুধের এত জ্বালা! মাগো, আর যে সইতে পারি না। বাপুজি, গলা টিপে মারো নি কেন? বাপুজি বড় কেন করলে? বাপুজি, বিয়ে কেন দিলে? বাপুজি, আর যে সহ্য হয় না।

...৫...

উত্তর বাংলার রাজবংশী সমাজে কন্যাপণ প্রচলিত। অনেক সময় বেশি পণের লোভে অভিভাবকেরা মেয়ের বিয়ে দিতে কালক্ষেপ করে। এদিকে মেয়ের বয়স বেড়ে চলে। তার রূপসৌন্দর্যে ভাটার পালা শুরু হয়। মনের মধ্যে অসন্তোষ জমে ওঠে। একটি রাজবংশী লোকগীতিতে অভিভাবকদের আচরণের বিরুদ্ধে রাজবংশী কন্যাকে তাই সোচ্চার হতে দেখা যায় :

বাপ- মড়াটার মুখত্ লইজ্জা নাই,
ভাই-মড়াটার মুখত্ পড়ুক ছাই।।
বিহোর ব'স মোর চলিয়া যা'ছে
ব্যাচেয়া খালেক নাই।।
বাপ-মড়া, তোক ভাত আন্দিয়া দিম্
দনো হাতে খাইস;
এক লোটা জলের বাদে
মোক যদি ডাকাইস —
ও মুই শুনিয়া শুনিবা' না হওঁ
বাপ-মড়া, অধিক ডাকালে
টোঁটোয়ারা ধরিম টিপিয়া।।[১৮]

গীতিটিতে বলা হয়েছে : বাপ-মড়াটার মুখে লজ্জা নেই, ভাই-মড়াটার মুখে ছাই পড়ুক। আমার বিয়ের বয়স চলে যাচ্ছে, এখনো আমাকে কারো কাছে বেচলো না। বাপ-মড়া তোকে ভাত রেঁধে দেবো, দু'হাতে খাস্। এক লোটা জলের জন্য যদি আমাকে ডাকিস্, তা হলে আমি শুনেও না শোনার ভান করবো। বাপ-মড়া বেশি ডাকাডাকি করলে তোর টুঁটি টিপে ধরবো।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবাদ অভিভাবকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পণপ্রথার সঙ্গে এর যোগ আছে। রাজবংশী কন্যা তার ক্ষোভ প্রকাশে শালীনতার তোয়াক্কা করে না, জৈবিক কামনা-বাসনাটুকুও গোপন করেনা। সহজ সরল অকপট ও বলিষ্ঠ তার প্রতিবাদ।

অন্য একটি গীতিতে শুনি, বেশি অর্থের লোভে মোটা পণের বিনিময়ে বৃদ্ধ কোনও বরের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে কন্যাকে। কন্যার মনে তাই তীব্র জ্বালা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে সে তার চিত্তজ্বালাটুকু প্রকাশ করে :

তোর টাকা খহিয়া মুখত্
বাধিনী ডাঙনাওঁ তোর গে আই,

এমন বেসালেন জাএই
আর মুলুকত্ বর কি পালেন নাই।।
ও আই, টাকার লোভত্ বুড়াক দিলেন —
আর মুলুকত্ বর নাই পালেন;
মোক কি শবাইসে গে বুড়ী আই।।
সোগায় ক'ছে 'জ্যেঠাই-খুড়াই';
কাঁহো ক'ছে, 'বুড়ী আই, বুড়ী আই।'
নদারী ক'বার গে মান্‌ষি নাই।।
অ আই, সাজি বুড়ার গুয়া-পান
বুড়া বরের ফ্যাদেলান;
গুয়া ভুকাইতে কি যাবে জান।।'[১১]

প্রতিবাদিনী কন্যা বলে : দিদিমা, কন্যা-পণের টাকা খেলে যে মুখে সে মুখে ঝাঁটা মারি। মুলুকে আর বর পেলে না, এমন জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে। দিদিমা, টাকার লোভে বুড়োর হাতে তুলে দিলে, মুলুকে আর বর পেলে না। কী শোভাটাই না পাচ্ছে আমার। সবাই আমাকে 'জ্যেঠিমা-খুড়িমা' বলে, কেউ বা বলে 'বুড়ী দিদিমা'। নতুন বউ বলার মানুষ নেই। দিদিমা, বুড়োর গুয়া-পান সাজি, বুড়োর ঠোঁট বেয়ে পানের রস গড়ায়। হামানদিস্তায় বুড়ো বরের পান-সুপারি ছেঁচতে ছেঁচতেই কি আমার জীবন যাবে?

দিদিমাকে উদ্দেশ করে বলা হলেও কন্যা-পণের প্রতি তার বিরূপতাটুকু গোপন থাকে না। প্রতিবাদ জানায় সে এই অবিচারের বিরুদ্ধে।

...৬...

একদিকে অত্যাচারী, অন্যদিকে অত্যাচারিত। একদিকে সবল, অন্যদিকে দুর্বল। অত্যাচারিত তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সংগ্রামের শেষে অত্যাচারিত জয়ী হয়। অত্যাচারীর পরাজয় ঘটে। পরস্পরের অবস্থান বদল হয়। সংগ্রামের শুরুতে যে সবল ছিল, সংগ্রামের শেষে সে আর সবল থাকে না। দুর্বল প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে দুর্বল সবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া'-র (১৩০৬) 'তাঁতির সাজা' ছড়াটিতে তার পরিচয় পাই। ছড়াটি কাহিনীমূলক, কৌতুকাশ্রিত। কিন্তু আপাত কৌতুকের আড়ালে রয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের নমুনা। তাঁতির ছেলে কোলাব্যাঙের ছা-কে আঘাত করেছে। কোলাব্যাঙের দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। তাঁতির ছেলে পরাজয় স্বীকার করেছে। ছড়াটি উদ্ধারযোগ্য :

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছা,
খায় দায়, গান গায়, তাইরে - না রে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকড়া বাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।

একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ — চৌদ্দ হাজার ঢালী।
হুগলীর শহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ — সনাতন সিপাই।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণির হাটে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি উঠ্‌লো গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি নাব্‌লো গিয়ে ভুঁয়ে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ মার্‌লো লাথি মুয়ে!
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চৌদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাই-ফাঁই,
না মার, না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই।

প্রতিবাদ এখানে সক্রিয়। কোলাব্যাঙের দল তাঁতির ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। অতর্কিত আক্রমণে পর্যুদস্ত করেছে। প্রতিবাদ সফল হয়েছে। কোলাব্যাঙের দল জয়ী হয়েছে।

...৭...

প্রশাসনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ রয়েছে বৈকি। দুর্বল, শিথিলচিত্ত, অপদার্থ প্রশাসনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে লোকসমাজ। একটি গম্ভীরা গীতে মালদহ শহরকে আশ্রয় করে প্রশাসনের যে সমালোচনা করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলার যে কোনও শহর সম্পর্কেই সত্য:

১. যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে রাস্তা চলা দায়।
২. জেলার সদর হাসপাতাল, হয়ে গেছে মহাকলি।
রুগীরা হয় নাকাল, ঔষধ চিনে মারা যায়।।
৩. সরকারী এলেকট্রিক সাপ্লাই, গুণের তাদের অন্ত নাই।
জ্যোস্না রাতে আলো জ্বালায়, আঁধারে নিভায়।
চুরি করে গুণ্ডাচোর, আলোর দয়া এদের উপর।
সাথে পুলিশ যোগ দিয়ে, চুরি সে করায়।।[২২]

রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পুলিশ সর্বত্র বিপর্যস্ত অবস্থা। প্রতিবাদ না করে উপায় কী? তীক্ষ্ণ শ্লেষ নির্মম ব্যঙ্গে প্রতিবাদ তীক্ষ্ণতা পেয়েছে।

...৮...

শেষ প্রতিবাদ আল্লার বিরুদ্ধে, রিক্ত, নিঃস্ব, বঞ্চিত, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলি আল্লার উদ্দেশে তাদের অভিযোগ পেশ করেছে :

রিলিপের মাটি কাটি ভরে নাক পেট।
দিনের শেষে ফিরে এসে মাথা করি হেঁট।।
আথায় আছে আগুন শুধু হাঁড়ি ভরা জল।
বো-পুতের চক্ষে পানি করে টলমল।।
ছোট ব্যাটা কেঁদে বলে আমায় খেতে দাও।
হায়রে আল্লা কি ফয়সাল্লা আমায় বলে দাও।
ক্ষেতে এবার ধরেনি ফল কেবল পাতানি।
এমন করে আর কতদিন ফেলব চোখের পানি।।[১৩]

উনুনে আগুন আছে, হাঁড়িতে জল আছে, কিন্তু পেটে ভাত নেই। দিনান্তে অন্ন জোটে না। সপরিবারে উপবাস দিতে হয়। চোখের জল নিয়ে তাই এই ক্ষুধার্ত অন্নহীন মানুষেরা আল্লার কাছে অভিযোগ জানায় : 'এমন করে আর কতদিন ফেলব চোখের পানি।' তাদের জীবনে চোখের পানিটুকুই বোধ হয় একমাত্র সম্বল। আল্লা কি তা দেখতে পান? অভিযোগে কান দেন?

...৯...

লোকসমাজের প্রতিবাদের কারণ ক্ষোভ ও অসন্তোষ। প্রতিবাদী লোকসমাজ পরিবর্তন-প্রয়াসী। পরিবর্তন-কামনার মধ্যেই প্রতিবাদের তাৎপর্যটুকু খুঁজতে হবে।

যে সমাজ প্রতিবাদবিমুখ, সে সমাজ নিষ্প্রাণ ও জড়। প্রতিবাদধর্মিতা আমাদের সমাজের সুস্থতা ও সজীবতাই প্রমাণ করে।

।। উল্লেখপঞ্জি।।

১-২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৮৫
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃ. ৪৪৬
৪. সুধীর চক্রবর্তী, লোকনাট্য বোলান, লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৭৭
৫-৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃ. ২৫১
৭. সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, ১৩৯২, পৃ. ৩৭
৮. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, ১৯৮২, পৃ. ৭৩
৯. ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, ১৯৯৫, পৃ. ১১৮
১০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, ১৩৮৪, পৃ. ১৩১-১৩২
১১. ঐ, পৃ. ২৩২
১২. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, ২০০০, পৃ. ১৩০-১৩১
১৩. শঙ্কর সেনগুপ্ত, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, ১৯৭০, পৃ. ৫২

শোষণ পীড়নের প্রেক্ষিতে গীতিকা-সাহিত্য

বরুণকুমার চক্রবর্তী

মধ্যযুগীয় দেবতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের গীতিকাগুলির অভিনবত্ব মূলতঃ রক্তমাংসের মানুষগুলিকে আশ্রয় করে রচিত হওয়ার সুবাদে। তামাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যেখানে আশ্রয় করেছে দেবতাকে আর সেই সুবাদে প্রশ্রয় দিয়েছে অলৌকিকত্বকে, বিসর্জন দিয়েছে যুক্তিবাদকে, নিষ্প্রভ করে রেখেছে মানবিক শক্তিকে, বেশি করে দেখিয়েছে মানুষের দৈব-নির্ভরতাকে, চিত্রিত করেছে মানুষকে দেবতার হাতের ক্রীড়নক রূপে, সেখানে একমাত্র গীতিকা সাহিত্যেই রক্তমাংসের মানুষের আধিপত্য। সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সমালোচকেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গীতিকাগুলিতে চিত্রিত নারী চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যকে, দেখিয়েছেন এগুলির নাটকীয় পরিবেশন রীতিকে, ব্যবহৃত অলংকারের বৈশিষ্ট্যকে কাহিনী প্লট গঠনের স্বাতন্ত্র্যকে। এমনকি মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে, কিংবা ঘটনার পূর্বাভাস জানাতে লোক-কবিদের প্রকৃতিকে ব্যবহারের নৈপুণ্যও সমালোচকদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারেনি। গীতিকাগুলির বন্দনাংশকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করে এগুলিতে রূপায়িত অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নিরূপণেও প্রয়াসী হতে দেখা গেছে কাউকে কাউকে, কাব্যে কবির এ সম্পর্কিত মন্তব্যকেও প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছে, অথবা সমালোচকদের নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তা উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। গীতিকায় প্রকাশিত মানবিকতাবাদও অনালোচিত থাকেনি, প্রকারান্তরে রক্তমাংসের মানুষকে উপজীব্য করে রচিত গীতিকাগুলিতে মনুষ্যত্বের জয়গান কেমন ভাবে ঘোষিত হয়েছে, তা আলোচনায় প্রলুব্ধ করেছে অনেককে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বীজের সন্ধান করেছেন বর্ষীয়ান সমালোচক গীতিকাগুলিতে। আমাদের আলোচ্য বিষয় একটু স্বতন্ত্র চরিত্রের, গীতিকাগুলিতে শোষণ-পীড়নের-নির্যাতনের মনুষ্যত্বের অবমাননার কিসে প্রলোভন অথবা সহশক্তির ব-কলমে পশুশক্তির প্রকাশ কতটা ঘটেছে সেই প্রথম। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, কম-বেশি সব গীতিকাতেই এই শোষণ-পীড়নের চিত্র উপস্থিত, পরিমাণগত ভাবে কিংবা চরিত্রগত ভাবে কিছু ইতর-বিশেষে পার্থক্য ঘটেছে মাত্র।

শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন শব্দগুলি আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হলেও এগুলির প্রকারভেদ অনস্বীকার্য। কখনই এগুলি একে অন্যের সমনাম নয়। এমনকি এগুলির পশ্চাতে উদ্দেশ্যও সব সময় অভিন্ন থাকেনি। কখনও দেখা গেছে আর্থিক শোষণ, কখনও বা মানসিক পীড়ন, আবার কখনও দৈহিক নির্যাতন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে কর্তার (*Subject*) বীভৎস আনন্দ লাভের চিত্ররূপে। শোষণ পীড়ন-নির্যাতন কখনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির আবার কখনও তা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে সমগ্র সমাজে, অথবা

সমাজের একাংশের এবং অবশ্যই প্রতিনিধি স্থানীয়ের হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো শোষণ-পীড়ন ঘটেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে, কখনও বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঘটনাচক্রে অথবা সমাজের কিংবা প্রতিনিধি স্থানীয় কারোর প্ররোচনা।

তবে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা পদাধিকার বলে অর্জিত শক্তির কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষণ-পীড়ন সংঘটিত হতে দেখা গেছে। দস্যু কেনারাম জানিয়েছে মানুষ খুন সে অর্থের লোভে করে না, যদি অর্থ লাভই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হত, তবে অনেক ক্ষেত্রেই আক্রান্ত পথিক তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেই মুক্তি পেত, রেহাই পেত। কেনারাম এক বিচিত্র মানসিকতার রুগী বিশেষ, তা না হলে সে বলে যে মানুষ খুন করাতেই তার আনন্দ। মানুষকে খুন করাই তার জীবনের ব্রত। এ আনন্দকে আমরা 'বীভৎস' ছাড়া আর কি বিশেষণেই বা বিশেষিত করতে পারি?

কেনারাম তার শিশুপুত্রটি যখন মাত্র এক বৎসরের, তখন অবলীলাক্রমে তাকে নিজের শ্বশুরালয়ের হেফাজতে রেখে তীর্থ পর্যটনে গেছে, আর সে ফেরেনি। যে শিশুর প্রাপ্য ছিল মাতৃহীন অবস্থায় পিতার কাছ থেকে মাতৃ-পিতৃ উভয়ের স্নেহ, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে নিদারুণভাবে। শিশুর প্রতি এত এক ধরনের মানসিক পীড়ন। পিতার সান্নিধ্যে মানুষ হলে কে বলতে পারে হয়ত ডাকাত হওয়া কেনারামের ভবিতব্য হত না। আবার মহুয়া পালায় ছয় মাসের যে ব্রাহ্মণ কন্যার অপহৃতা হয়ে ঘটনাচক্রে বেদের কন্যা মহুয়ারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটল, তার জীবনসাথীকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে হুমরা বেদে প্রচণ্ডভাবে যে বাধ সেধেছিল, তার মূলে ছিল একদিকে তার *Professional Interest* অন্যদিকে তার *Ego* বা অহংবোধ। ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল এইখানে যে সে খেলা দেখাতে সার্থকভাবে মহুয়ার যৌবন-সৌন্দর্যকে ব্যবহার করত, তার সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবন-সৌন্দর্যেই যে মূলতঃ নদের চাঁদ তার প্রতি অদৃষ্ট হয়েছিল সেই সত্য এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত করার দাবী রাখে। নদের চাঁদের সাথে মহুয়ার বিবাহ হলে পুনরায় ব্যবসায়িক খ্যাতি হবার সমূহ সম্ভাবনা, তাই সে এই বিষয়ে ছিল ঘোর বিরোধী। অন্যদিকে তার অহংবোধও কাজ করেছিল, সে ষোল বছর ধরে মানুষ করেছে মহুয়াকে, অতএব তার প্রসঙ্গে হুমরা বেদের ইচ্ছাই শেষ কথা, সেখানে মহুয়ার ইচ্ছার কোনো মূল্য থাকতে পারে না, হুমরা অন্ততঃ থাকতে দেয়নি। তাতেই অকালে ঝরে পড়েছে দুটি সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীর সুখী দাম্পত্য জীবনের মধুর স্বপ্ন। কঙ্ক ও লীলা পালায় যে স্বর্গ জাতপাত বিচার না করেই পরিত্যক্ত শিশু কঙ্ককে অপত্য স্নেহে গ্রহণ করেছিলেন, স্থান দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, তাকেই আবার স্বহস্তে নিধন করার অমানসিক পরিকল্পনা করেছিলেন সমাজের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায়। পরম প্রাজ্ঞ, যুক্তিবাদী, স্থিতধী স্বর্গ পরিবর্তিত হয়ে গেছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর স্বাভাবিক ন্যায় নীতি ও কর্তব্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব ধর্মকে। পরে এসব তিনি ফিরে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনেক গুনগার দেওয়ার পর, প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা লীলাকে হারানোর পরে।

কমলা পালায় নিজের পরিবারের এক কর্মচারী, ভৃত্য কারকুন মনিব কন্যার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার কারণে তার প্রতি আসক্ত হয়ে অথচ তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণতা বশতঃ কমলার সর্বাত্মক বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে ব্যর্থ প্রেমিক কারকুনকে। কিন্তু মলুয়া পালায় নিছক মাতুলের জেহাদে চাঁদ বিনোদ কিরূপে তার প্রাণ রক্ষাকারিনী পত্নী মলুয়াকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করল? সমাজ সংস্কারের এবং সংস্কারের কাছে চাঁদ বিনোদ তাঁর পত্নী প্রেমকে বিসজর্জন দিল, বিসর্জন দিল তার কর্তব্যবোধকে? অপরিসীম মানসিক নির্যাতনে ঘাত বিঘাত, অপমানিত মলুয়ার শেষ আশ্রয় হয়ে দেখা দিয়েছে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। কাজী-দেওয়ান প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে আমরা গীতিকাগুলিতে নারী দেহ লোভী, অত্যাচারী শোষক রূপেই পেয়েছি। গীতিকাগুলির কাহিনী যতই কাল্পনিক হোক, সমসাময়িক সমাজ জীবনের কিছু স্মৃতির প্রতিফলন যে এসবে ঘটেছে ঘনিষ্ঠভাবে, তা অস্বীকার করা যাবে না। অস্বীকার করা যাবে না গীতিকার সংকীর্ণ প্রকাশিত নীতিভেদ প্রথাকে, হিন্দু-মুসলমানে পারস্পরিক সম্পর্কের বিরূপতাকে কিসে অর্থহীন সংস্কারের অথবা সমাজের তথাকথিত ধারক বাহকদের নীতিহীন নির্দেশের আস্ফালনকে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষত অসহায় নিরীহ মানুষদের জীবনে চরম বিপর্যয়ের কারণ রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আমরা এইবার নির্দিষ্ট ভাবে কয়েকটি গীতিকার ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখে আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার প্রয়াস পাব। তবে সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বলে নেওয়া ভাল, গীতিকা সাহিত্যের মাধুর্য ও আকর্ষণ নিছক এইসব শোষণ পীড়নের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তবে এইসব শোষণ, পীড়নের বিবরণ গীতিকাগুলিকে পূর্ণতা দান করেছে। যদি নিছকই কতকগুলি আদর্শ মানুষের, আদর্শ চরিত্রের চিত্রায়ণ ঘটত, তবে সেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই হ্রাস পেত। মানুষের মধ্যে যেমন ভাল থাকে, তেমনি মন্দ লোকও থাকে। সাহিত্য বেছে বেছে কেবল ভালদের স্থান দেয় না। নির্বিচারে সকলকেই সে গ্রহণ করে, আশ্রয় দেয়। তাছাড়া আরও একটি সত্য স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—যে মলুয়াকে আদর্শ প্রেমিকা রূপে পেয়েছি যদি কোনও প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হোত, হুমরা বেদের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে না হত, তাহলে কি তাকে সেভাবে পেতাম? কিংবা ধরা যাক মলুয়ার প্রণয়। মলুয়ার সতী সাধ্বী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাজী ও দেওয়ানের অপরিমেয় প্রলোভন ও চক্রান্তের মধ্যেও অন্তরের প্রেমাবেগকে অবিচল রাখার কারণে। চাঁদ বিনোদনের তুলনায় মলুয়া বা পাঠকের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে, তা ত তার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার সুবাদেই।

'জামাল ও অধুয়া' পালায় আমরা নানা ধরনের শোষণ পীড়নের চিত্র পাই। আলালের ভাই দুলাল খাঁ দেওয়ানি লাভ করে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ক্ষমতার স্বাদ পেতে না পেতে

সে দেখা দিল শোষকরূপে। বানিয়াচঙ্গের প্রজাদের জীবনকে সে দুর্বিষহ করে তুলেছিল—

হাহাকারে কান্দে সবে বড় দুক্ষু মন।।

এবারে প্রজাদের দুঃখিত হবার কারণগুলি কি কি ছিল দেখা যাক—

দুষমন দুলাল খাঁ দেখ কোন্ কাজ করে।
পরজারে আনিয়া যত বে-ইজ্জত করে।
খিরাজ্যের লাগ্যি কার কার কাটে স গর্দান।
তাওয়াই বইল সজ্যি না পায় আছান।।
শিঙ্গের পাগাড়ে লোকে রাখে গছাইয়া।
মরিচের ধুমা দেয় দাড়িতে সন্ধিয়া।
আওরাত জননী সবে বে-ইজ্জত করে
দুক্ষু পাইয়া দেশের লোক বাড়ী ঘর ছাড়ে।

প্রজাদেরই শুধু বেইজ্জত করা হত না, বেইজ্জতের হাত থেকে রেহাই ছিল না মহিলাদেরও। খাজনার জন্য প্রজার গর্দান নিতে বাধত না দুলাল খাঁর। দুলালের অত্যাচারে সমগ্র বানিয়াচঙ্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হল। যে কূপে শিঙ্গি মাছ রাখা হয়, সেই কূপে প্রজাদের নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া হত, প্রজাদের শ্মশ্রুতে লঙ্কা পুড়িয়ে ভাঁড়ে ঝুলিয়ে শাস্তি প্রদান করা হত। অর্থাৎ শাস্তি দানের কত বিচিত্র পন্থাই না অনুসৃত হত।

দুবরাজ কন্যা অধুয়া জামালের প্রেমাসক্ত হয়ে তার প্রতি প্রণয় নিবেদন করলে জামাল বৃদ্ধ উজিরকে প্রেরণ করেছে অধুয়ার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। যেহেতু জামাল মুসলমান, তাই হিন্দুরাজা দুবরাজ বৃদ্ধ উজিরকে বিবাহের প্রস্তাব আনয়নের জন্য অমানুষিক শাস্তি দিয়েছেন—

জহ্লাদ ডাকিয়া সরা কোন কাম করে।
শতদিন রাখে সরা অন্ধ কারাগারে।।
বুকেতে পাষাণ দিয়া করিল বন্দনা।
পিপড়া বান্দাইল সব বইল বিছানা।।
দাড়ি উপাড়িয়া তার যারে বেড়া পাক্।
এক কান কাটিয়া তার করিল বিপাক।।
লোহা পুড়াইয়া তার অঙ্গে দাগ দিল।
গর্দ্দানা ধরিয়া তারে রাজ্যের বাহির কৈল।।

আমরা জানি দূত অবধ্য। কিন্তু বৃদ্ধ উজিরের ক্ষেত্রে দুবরাজ যে আচরণ করেছেন তা কূটনীতি বহির্ভূত। জামালের প্রেরিত বিবাহ প্রস্তাব তাঁর কাছে অকল্পনীয় ধৃষ্ঠতা বলে মনে হয়েছে। তাই সেই ধৃষ্ঠতার জবাব দিয়েছেন তিনি উজিরকে নির্যাতিত করে।

কথায় বলে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' এখানেও দেখি আলাল খাঁ পুত্রশোকে অগ্নিশর্মা হয়ে আদেশ করে বসেন 'রাত্রিমধ্যে যেন দুবরাজকে বেঁধে আনা হয়, সেইসঙ্গে—

দক্ষিণ বাগ সহর জুর‍্যা আগুন লাগাও
গর্দ্দান কাটিয়া সবে সায়রে ভাসাও।।
সেহি দেশের গাছ নিরিখ নাহি থাকে মাটি।
লাউবের নদী বহাইয় দেও লোকজন কাটি।।

ফেনিও হুকুম তামিল করল নির্দেশমত।

দেওয়ান আলাল খাঁ পুত্রশোকের প্রতিশোধ নিতে মনস্থ্ করেছে তার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লার সঙ্গে দুবরাজ দুহিতা অধুয়ার বিবাহ দিতে—

আমার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লা হয়।।
অধুয়ারে বিয়া দিয়াম তাহার সহিতে
আমার মনের দুঃখ খন্তিবে তাহাতে।
কেশে ধর‍্যা অধুয়ারে বাহির করিল।।

নারী হয়েও কোনো পৃথক মর্যাদা পেল না হতভাগিনী অধুয়া।

কুসংস্কার কেমন করে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধহীন করে তোলে, শোষণ-পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করে তারও পরিচয় মেলে 'সূরৎ জামাল অধুয়া' পালাটিতে। আলাল-পত্নী ফতেমা এক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটি হল নিম্নরূপ—

একদিন ফতেমা যে কুয়াবে দেখিল
পুন্নু মাসীর কান্ যেন কুলেতে লইল।।

আলাল গণককে আহ্বান জানালেন। গণক গণনা করে জানাল—

রূপেতে অইব পুত্র ছুরৎ জামাল
বাপের চমান বেটা বংশের দুলাল।।

সেইসঙ্গে তার ভবিষ্যদ্বাণীটিও উচ্চারিত হল—

হইবে তুমার পুত্র ছাহা হেকান্দর।।
যদি কুড়ি বছরের মধ্যে দেখ পুত্রের মুখ
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড় ছোক।
রাজ্যের যতেক লোক যে দেখে তাহারে
তাহার কারণে তোমার পুত্র যাইব মরে।।

আলাল তখন তেরা লেংড়াকে নির্দেশ দিলেন হাইলা বনে উপস্থিত হয়ে সে যেন এক পুরী নির্মাণ করে তারপর সেখানে নির্বাসনে প্রেরণ করেন ফতেমাকে

বিবিরে পাঠাইলা সাহেব সেই হাইলা বন।
কুড়ি বছরের খান খুড়াকী সঙ্গে তার দিয়া
এক বান্দী সঙ্গে বিবির রাখিল আসিয়া।।

নির্বাসিত ফতেমা বিবির করুণ জীবন যাপনের যে আভাস মাত্র লোককবি দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় তার জীবন কতখানি বিড়ম্বিত ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। লোককবিও হতভাগিনী ফতেমার প্রতি যে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ তার মন্তব্যেই লভ্য—

সোনার পালঙ্কে যেবা শুইয়া নিদ্রাযায়।
কপালের দোষে সেই মাটিতে ঘুমায়।
বান্দী দাসী ছিল যার লেখা জুখা নাই
হেন বিবি একা থাকে কেমনে জানি তাই।।
এক মাত্র বান্দী আছে সাথের সঙ্গিনী
খিদায় জুগায় খানা পিয়াসেতে পানি।

দুলাল তার দাদার দেওয়ান গিরি প্রাপ্ত হয়ে শিকারে গিয়ে আলাল-তনয় ছুরত জালালকে দেখে ফেলে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গণকের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভেবে—

(হায় আল্লা) কুড়ি বছরের মধ্যে হইল দরশন।
গণক গণিল গনা না জানি কেমন।।

এরপর সুখেতে দেওয়ানি করার অভিপ্রায়ে সে তেরা লেংরাকে নিযুক্ত করেছে ঘরে মাটি চাপা দিয়ে জালাল এবং তার মা ফতেমা বিবিকে মেরে ফেলার জন্য। অসহায় রমণী ফতেমাকে তার বিনাদোষে নির্বাসিত করাও তো শোষণ-পীড়নের নামান্তর। সপুত্র ফতেমাকে হত্যার যে চক্রান্ত করেছে জালাল তা যে শোষণ-পীড়নেরই চরম নিদর্শন, তা বলাই বাহুল্য।

নিছক গণকের কথার উপর বিশ্বাস করেই এই শোষণ পীড়ন অব্যাহত ধারায় চলেছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার জন্যই বিনা দোষে সপুত্র ফতেমাকে এত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে।

'মহুয়া' পালায় শোষণ-নিপীড়নের নায়করূপে চিত্রিত হয়েছে হুমরা বেদে। তার প্রথম শোষণ-চিত্র-ধনু নদীর পারে উপনীত হয়ে কাঞ্চনপুর নামীয় গ্রামে বসবাসকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয় মাসের শিশুকন্যা অপহরণ। এই শিশুকন্যাই হল মহুয়া। কোথায় ব্রাহ্মণ কন্যারূপে মহুয়ার জীবন পরিচালিত হত, তা না হয়ে বেদের কন্যারূপে সম্পূর্ণ অন্য খাতে তার জীবন প্রবাহিত হল।

এরপর মহুয়া ও নদের চাঁদ যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হল, তখন এদের সম্পর্ককে বিনষ্ট করতে হুমরা কি না করেছে। হুমরা তার পালিতা কন্যা মহুয়ার হাতে তুলে দিয়েছে ছুরি। নিদ্রাভিভূতা মলুয়াকে সে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

এই ছুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পারে।
শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইরা আইস তারে।।
* * * * * *
ভিন্ দেশী দুষমন সেই যাদুমন্ত্র জানে।
বইক্ষেতে হানিয়া ছুরি মারহ পরানে।।
আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও।
দুষমনে মারিয়া ছুরি সাওরে ভাসাও।।

এ মানসিক পীড়ন অবর্ণনীয়। প্রেমিকাকে হত্যা করতে হবে নিজের হাতে নিজ নির্বাচিত

প্রেমিককে। একে ত মহুয়া শৈশবেই হুমরা কর্তৃক অপহৃতা। তার নিজের ভাষায় তার অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা হইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি।।

বেদের দলে থাকলেও সে নিঃসঙ্গ। এমন কোনো দরদীর সাক্ষাৎ সে পায়নি, যার কাছে সে তার মনের ব্যথা অকপটে প্রকাশ করে হাল্কা হতে পারে। দস্তুর মত শারীরিক কসরত দেখিয়ে তাকে জীবিকার সংস্থান করতে হয়। নিজের পছন্দমত বিবাহ করবে, তাতেও বাধা। বাধা, কেননা হুমরার ভয় সেক্ষেত্রে মহুয়াকে তাকে চিরতরে হারাতে হবে। তাদের দলের উপার্জনে তাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। তন্বী কিশোরীর সদ্য উদ্গত যৌবন দেখিয়ে দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হবে না। মহুয়া হয়ে উঠবে নদের চাঁদের গৃহিনী। সেইজন্য হুমরা চেয়েছিল মহুয়ার সঙ্গে সুজন বেদের বিবাহ দিয়ে মহুয়াকে নিজের কাছে রেখে নিজের পেশায় তাকে ব্যবহার করতে। মহুয়ার ক্ষত বিক্ষত চিত্তের দহন জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে এইরূপে—

পাষাণ সপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে।
কিরূপে বধিব তোমায় নাহি লয় চিতে।।
পাষাণ আমার মা ও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইব ফিরিয়া তোমারে মারিয়া।।
জ্বালিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই।।
তুমারে মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে।
পাষাণ বইয়া দাও বাপে বধিল আমারে।।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুমরা প্রদত্ত ছুরিতে সে নিজেই আত্মঘাতিনী হবে। কিন্তু নিদ্রাভিভূত নদের চাঁদের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় আর তার আত্মঘাতিনী হওয়া হয়ে ওঠেনি। নূতন করে বাঁচার সে স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখেছে ঘর বাঁধার, দাম্পত্য জীবনের মধুর রসের স্বাদ গ্রহণ করার। তায় পলায়ন করেছে। চেষ্টা করেছে হুমরা বেদের নাগালের বাইরে চলে যেতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। তীক্ষ্ণ সন্ধানী প্রতিহিংসাপরায়ণ হুমরা ঠিকই তাদের নাগাল পেয়েছে। পুনরায় তার সেই একই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি—

প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষ লক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার।।
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।

মহুয়া তার জেহাদ ঘোষণা করেছে, জানিয়েছে—

আমার বন্ধ চান্দ সুরুজ কাইস্তা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে।।

সে তার অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছে করুণ কণ্ঠে—

কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।।

নিরুপায় মহুয়া শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতিনী হয়েছে, মৃত্যুকালে সে হুমরাকে অভিযুক্ত করে বলেছে ঃ

কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়।।
ছুটকালে মা-বাপের কুল শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরে ছিলে চুরি।।
জন্মিয়া না দেখালাম কভু বাপ আর মায়।

হুমরার আদেশে বেদের দল নদের চাঁদকে বধ করেছে। অকাল সমাপ্তি ঘটেছে দুই তরুণ তরুণীর সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্ন, মিলনের স্বপ্ন, সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাবার আকাঙ্খার।

'দেওয়ান ভাবনা পালা'য় দেখি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সোনাইকে লাভ করার জন্য দেওয়ান ভাবনা পাগল। সঘরার মাধ্যমে দেওয়ান ভটুক ঠাকুরকে প্রলোভন দেখিয়েছে—

বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকোন পুষ্কনী।
সানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটের সিঁড়ি খানি।।
বাউন্ন পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ।।

ভটুক ঠাকুর প্রলুব্ধ হয়ে দেওয়ান ভাবনার সঙ্গেই তার ভাগনীর বিবাহ দিতে মনস্থ করেছে। তবু ভাবনার চর ধরে নিয়ে গেছে সোনাইকে। মামার ভূমিকার কথা সোনাইর অগোচর থাকেনি, থাকেনি যে তার প্রমাণ—মাতুলের সঙ্গে তার 'দুষ্মন' বিশেষণটির ব্যবহার। সোনাইর ভাষায়—

কইও কইও কইও দূতী দুষ্মন মামার ঠায়।
বাউন্ন হয় জমি লইয়া সুখে বস্যা খায়।

দেওয়ান ভাবনা বন্দী করেছে মাধবের পিতাকে। পিতাকে মুক্ত করতে মাধব উপনীত হয়েছে দেওয়ানের সমীপে। সোনাইর শ্বশুর মুক্তিলাভ করেছে পুত্রের বিনিময়ে। মুক্তিপ্রাপ্ত শ্বশুর তখন পুত্রবধূর কাছে আবেদন জানিয়েছে ঃ

শুন বধূ তুমি যদি কিরপা নাইসে কর।
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ঘর।।
দুরন্ত দুর্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা যে করে।

তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে।।
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই।।

পুরুষশাসিত সমাজ বলেই সোনাইয়ের শ্বশুর তাকে দেওয়ান ভাবনার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে মাধবকে মুক্ত করার কথা বলতে পেরেছে। এর থেকে বড় শোষণ আর কি হতে পারে? জেনে শুনে অসহায়া রমণীকে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়ার প্ররোচনাকে আর কি বলা যাবে? সোনাই শেষ পর্যন্ত মাধবকে উদ্ধার করে নিজে বিষপানে আত্মহত্যা করে—সতীত্বের পরাকাষ্ঠা হয়েছে।

এইভাবে গীতিকাগুলিতে শোষন-পীড়নের জীবন্ত চিত্র সকল সংযোজিত হয়েছে। প্রচণ্ড পেষণের ফলে ইক্ষু থেকে যে রস নিষ্কাশিত হয়, আমরা তার স্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত হই, লাভ করি আত্মপ্রসাদ, অনুরূপ ভাবে গীতিকার যে সব চরিত্র ত্যাগে, তিতিক্ষায়, আত্মবিসর্জনে, চরম কৃচ্ছ্র সাধনে উজ্জ্বল্য লাভ করেছে, সেই দীপ্তি, সেই উজ্জ্বল্য এসেছে নানা শোষণ পীড়নের কারণেই। স্বাভাবিক অবস্থাতেই এই চরিত্রগুলি এখনকার মত দীপ্তি লাভ করত না কখনই।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যবিচার এক দিক

জ্যোতির্ময় ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যকবিতার আলোচনা বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা-পর্বেরই আলোচনা, যার সময়সীমা ধরা যায় ১৮৪০ থেকে ১৮৯০। আমরা নবজাগরণের কথা বলে থাকি এই নবজাগরণকে বাঙালির রেনেসাঁস বলে আক্ষরিকভাবে স্থূল অর্থেও গ্রহণ করা যায় না। মনে রাখতে হবে, এ ছিল আসলে কলোনির রেনেসাঁস। আরো ছোটো বড়ো ঘটনার কথা মনে রেখেই নবজাগরণের সত্যটিকে স্বীকার ও গ্রহণ করা যায়। সত্যই আধুনিক বাংলা সাহিত্য বা বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতির সূচনাতেই উনিশ শতকের বাঙালির রেনেসাঁস বা বাংলার নবযুগ। এবং এই রেনেসাঁসের বাহক ও বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী—অর্থাৎ 'হিন্দু ভদ্রলোক'। উল্লিখিত দুটি কারণ নিঃসম্পর্কিত নয়—কিন্তু এই দুটি কারণে আধুনিক বাঙালির জীবনে, শিল্পে, সাহিত্যে নানা অসঙ্গতি ও দুর্বলতা প্রথমাবধি থেকে গেছে। কেননা বাংলার রেনেসাঁস ছিল কলোনির রেনেসাঁস অর্থাৎ পরাধীন জাতির রেনেসাঁস। যে স্বাধীন নয়, তার সত্যকার রেনেসাঁস হবে কী করে। বাঙালি সমাজের বিকাশে বা বিপ্লবে সেই রেনেসাঁস উদ্ভূত হয়নি। বরং বিজয়ী শাসকবর্গের সংস্পর্শে এসে বিজয়ী সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার তাড়নায় পরাজিত ভগ্নোদ্যম জাতি ও সমাজ তা গ্রহণে বাধ্য হয়। ইংরেজ বণিকের রাজত্বে বাস্তবক্ষেত্রে এ জাতির বিকাশের সম্ভাবনা তখন অবরুদ্ধ। শিল্প বাণিজ্যে ও বৈষয়িক উদ্যোগে তার বিকাশের পথ নেই অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় বণিকসভ্যতার বিরাট দান বাঙালিকে মুগ্ধ অভিভূত করলো। কলোনিয়াল রেনেসাঁসের দুর্গতি এমনিই-বাস্তব ভিত্তি তার সামান্যই, অথচ মানস প্রয়াস আকাশস্পর্শী। তার সৃষ্টিও তাই বহুলাংশে আকাশস্পর্শী—বাস্তববিমুখ। গণতান্ত্রিক প্রেরণায়, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে ও চিন্তায় দুর্বল।

ঔপনিবেশিকতার অসংগতির সঙ্গে মধ্যবিত্তের স্ববিরোধীতাও আছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এই রেনেসাঁসের বাহন—যাঁরা হয় জমির মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদার, নয় ইংরেজি শিক্ষাকে মুখ্যত গ্রহণ করেন ইংরেজ শাসনযন্ত্রের ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পেয়ে সৌভাগ্য লাভ করবেন, এই আশায়।

সমাজতাত্ত্বিকেরা জানেন, একেই শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তের কোনো ভিত্তিকেন্দ্র নেই। তার উপরে এই বাঙালি মধ্যবিত্ত দোকানী পশারীরা ব্যবসায় নিপুণ, জীবিকার ক্ষেত্রে নিতান্ত চাকুরে বা কেরানী হলো। দেশীয় রাজা জমিদারের মতো ইংরেজ এদের নিজেদের শাসনের একটি যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিল, এঁরাও রাজি ছিলেন ইংরেজের তল্পিদারি করতে। শ্রেণী হিসেবে ছিলেন ইংরেজের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের মতো যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা অনেকেই হয়ে উঠলেন স্বাধীনতার অগ্রদূত। শোষিত মুক্তি-

চেতনার সেদিন এঁরাই প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধের এও একটি দিক। শ্রেণীগত ভাবে যারা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, তাঁদের মধ্যে উদ্ভূত হলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদীরা। তাই এই প্রতিবাদের মধ্যেও অন্তর্নিহিত থাকে অনেক অসংগতি।

যেমন শ্রেণী হিসেবে যারা ইংরেজের মুখাপেক্ষী এবং জমিদারী প্রধান ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, তাঁদের পক্ষে স্বাধীনতার তাগিদেও এখন জনসাধারণের সঙ্গে সামিল হওয়া সম্ভব হলো না, শোষণমুক্ত কৃষকদের সংগ্রামে যোগদান বা ব্যাপক কোনো জাতীয় মোরচা অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠন করা। বরং একদিকে যেমন তাঁদের সৃষ্টিতে স্বাধীনতার তীব্র প্রেরণা লক্ষণীয়, অন্যদিকে জনসাধারণ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাও মনে রাখতে হবে। তাঁদের কথায় ও কাজে কলোনির কেরানি চরিত্রের দুর্বলতা—দ্বিধা, কুণ্ঠা, সাহসের শোচনীয় দৈন্য। মনস্বী গোপাল হালদারের এই ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছাপ কম নয়। ঔপনিবেশিক রেনেসাঁসের মতোই ঔপনিবেশিক সাহিত্যেও থেকে গেছে এই খণ্ডতার চেতনাজনিত কলঙ্কস্পর্শ ঃ

> আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রতধর্ম করতো সবে।
> একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
> যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
> তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।।

অথবা,

> লক্ষ্মী মেয়ে ছিল যারা
> তারাই এখন চড়বে ঘোড়া।
> ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া।।
> এরা পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে।।
> ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে।।
> আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে।
> এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।।

এইরকম সব অগণিত চরণ-পংক্তির মাধ্যমে রচয়িতার অতিশয় রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাই নয়, সাধারণভাবে এই মনোভাবকে আধুনিক চেতনার বিরোধী, প্রগতি-চেতনার বিরোধী বলেও চিহ্নিত করতে হয়। মনে হয়, রচয়িতা সামগ্রিকভাবে স্ত্রী-শিক্ষারই বিরুদ্ধতা করছেন।

পক্ষান্তরে,

আহা, স্ত্রীলোকেরা জ্ঞান শিক্ষাকরণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমাদিগের ক্লেশ বোধ হইতেছে, আহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, আমরা যদ্যাপি গৃহ বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রী-জাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার

মূলীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে। আর সংসারে সুখস্বচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।

উদ্ধৃত এই গদ্যাংশের বক্তব্যও সুস্পষ্ট।

পুনরপি,

> সোনার বাঙলা করে কাঙাল ইয়ং বাঙালি যত জনা।
> সদা কর্তৃপক্ষর কাছে গিয়ে কানে লাগিয়ে ফোঁস-ফোঁসনা।।
> এরা না হিঁদু না মোসলমান, ধর্ম বর্ণের ধার ধারে না।
> নয় মগ ফিরিঙ্গি, বিষম ধিদি ভিতর বাহির যায় না জানা।।
> ঘরের ঢেকি কুমির হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।
> এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খানা।।

শুধু ইয়ংবেঙ্গল প্রসঙ্গেই এই তীব্র ও তিক্ত বিরোধীতা নয়, আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় রীতিনীতি এবং হিন্দুর প্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম আহিন্দুয়ানিই যে যেতে বসেছে, সেই আশঙ্কাও সুস্পষ্ট নিচের চরণগুলিতে—

> হয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে
> টেবিল পাতে খানা খাবে।
> এরা বেদকোরাণের ভেদ জানে না
> খেদ করে আর কে বোঝাবে।।
> ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
> জুতো-পায়ে দেখতে পাবে
> হলো কর্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড
> হিঁদুয়ানি কিসে রবে।।

একই রচয়িতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিকতম পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছে—

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলণ্ড দেশে সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে প্রকার বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে এদেশের লোক তাহার কোনো বিষয়েই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে....... এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া অপ্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিনে তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইয়া উঠিত।

শুধু তাই নয়, কবিতায় যিনি সিপাহী যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধ, ব্রহ্মা যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনায় উল্লাসিত হয়ে ইংরেজদের স্তবস্তুতি করেছেন এবং দেশীয় শক্তির পরাভব কাম্য মনে করেছেন, দেশীয় শক্তির পরাজয় হলে আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করেছেন, তাঁতিয়া টোপি, নানা সাহেব ও লক্ষ্মীবাঈকে অসংযত তীব্রতায় আক্রমণ করেছেন, এমন কী রাণী ভিক্টোরিয়াকে আশ্বস্ত করে লিখেছেন—

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, ভেব না মা, সে ভাবনা।
সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা আমরা ধরে ধরে দেব নানা।

সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য যিনি ইংরেজ সরকারকে 'ধন্য'-'ধন্য' করেছেন, কবিতায় ব্রিটিশের জয়গানে নিত্য মুখর হয়েছেন, বীর বিদ্রোহী সিপাহীদের বিপর্যয় অথবা শিখজাতির দুরাবস্থায় উল্লাসিত হয়ে লিখেছেন—

ব্রিটিশের জয় জয় বলো সব ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভু গান গাইবে।।

তিনিই আবার নিজেদের স্বজাতি প্রীতিকে অভিনন্দিত করেছেন, তাঁদের 'বিদ্রোহী' বলায় ক্ষুন্ন হয়ে লিখেছেন—

শিখদিগকে বিদ্রোহী শব্দে বাক্য করা কর্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে অস্ত্র ধারন করে, তাহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহারা পুওালকাবৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থে যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করনার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন এবং প্রয়াস করিয়াছে।

১৮৫০ সালের পয়লা মে তারিখে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় দেখা যায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই একই মানুষ বোধ হয় সর্বাগ্রে উষ্মা প্রকাশ করেছেন, এমনকি কয়েকটি বিষয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বানিজ্যনীতির বিরুদ্ধে সাংবাদিক-সম্পাদক ভদ্রলোক আন্দোলন-সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লিখেছেন—

স্ট্যাম্পের কর ও লবণের কর আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি উপায়ে যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কোনো মতেই রাজনীতি সিদ্ধ বলিয়া বাচ্য হইতে পারে না, কারণ একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিসূচক, তাহাতে আবার একচেটিয়ারূপে বাণিজ্য করা কত বড় অন্যায়, তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

ইংরেজ শাসকের ভারত শোষণ তার অনুভবের ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সঠিক ভাবেই এসেছিল। সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠাগুলিতেই তার প্রমাণ আছে। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে বহুবার, স্বজাতিকে তিনি নীল-আন্দোলন প্রসঙ্গে সচেতন করতেও সচেষ্ট ছিলেন। সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকার প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে তাঁর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও সম্যক প্রতিফলিত এমনকি গান-কবিতার মাধ্যমেও রানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ও অভিযোগ বাউল সুরে নিবেদনের মোড়কে লক্ষণীয়, একই সঙ্গে সমকালীন অসহায় বিড়ম্বিত জনজীবনের চিত্রটিও এরই মধ্যে পরিস্ফুট—

মা তুমি কল্পতরু আমরা সব বোকা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,

আমরা ভুসি খেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না।

সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যকবিতায় প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, তার সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাই ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। আর সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্তের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই সঠিক মন্তব্যই করেছিলেন—'সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বরগুপ্তের প্রাদুর্ভাব।' অর্থাৎ , ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধির সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব, সংক্ষেপে যুগসন্ধির কবি।

মনে হতে পারে, কবি ঈশ্বর গুপ্ত আর সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত যেন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আর এখানেই ঈশ্বরগুপ্তের স্ববিরোধ। কিন্তু স্থূলত তা সত্য হলেও এটাই একমাত্র নয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের দুই রূপ, সাংবাদিক-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তেরও দুই রূপ। সুধী-সজ্জনেরা জানেন, সংবাদ- প্রভাকরের অন্যূন তিনটি পর্যায় আছে। এবং সংবাদ-প্রভাকরের চরিত্র ও প্রবহমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সম্পাদকের মধ্যে কালক্রমে দেখা গেছে অগ্রণী সময়ের প্রগতি প্রভাব ও প্রেরণা।

বস্তুত, আবার আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। তাঁরই মন্তব্য উদ্ধৃত করতে হচ্ছে : 'মধুসুদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালি কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।' কেন, 'জন্মিয়া কাজ নাই'? বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন : "বাঙ্গলার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া পৌষপার্বণ চাই না। কিন্তু বাঙালির মনে পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই উদ্ধৃতাংশ থেকেই আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেদিক আপাতত আমরা মনঃসংযোগ করতে পারছি না।

আলোচ্য প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য কবিতার যে-কোনো আলোচনায় সমগ্র শতাব্দীটিকে অন্যূন চারটি কালপর্যায়ে বিভক্ত করে নেওয়াই সুবিধাজনক। ১৮৩০-৩১ পর্যন্ত একটি পর্যায়, যার সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু অর্থাৎ ১৭৬০ সাল থেকে। অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কালপর্বে মোট সত্তর বছরের বাংলা কাব্যের প্রাঙ্গনে অন্যূন সাতটি ধারায় বাংলা কাব্যচর্চার নিদর্শন পাই—

১। কবিওয়ালা
২। নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পা রচয়িতারা
৩। রামপ্রসাদের উত্তর সাধকেরা ও ভক্তিসঙ্গীত রচয়িতারা
৪। ভারতচন্দ্রের উত্তর সাধকেরা
৫। প্রাচীন কবিদের বিচ্ছিন্ন উত্তর সাধকেরা : জয় নারায়ণ ঘোষাল, রঘুনন্দন গোস্বামী ও অন্যান্য।

৬। পাঁচালী ও যাত্রা-কারেরা

৭। বিবিধ সঙ্গীত রচয়িতারা

সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. সুশীলকুমার দে তাঁর *Bengali Literature in Nineteenth Century (1757-1857)* গ্রন্থেও এই সাতটি ধারাতেই আলোচ্য সত্তর বছরের বাংলা গান-কবিতার ইতিহাসটিকে অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রথম প্রকাশ এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। এই সময় পর্যন্ত কবিওয়ালা প্রমুখ যাঁদের কথা উল্লেখ করা হলো, বাংলা কাব্য-সংসার পুরোপুরি তাঁদের দখলে ছিল। বাংলা সাহিত্যই শুধু নয়, সমাজে-রাজনীতিতেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর ত্রিশেক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল একই সঙ্গে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি এবং নবোদ্ভূত মননশক্তির প্রভাবে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়েই নতুন ধ্যানধারণার পদধ্বনি।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রতিবেদন পাঠালেন তাদের দেশে—'*There appears to be a favourable change in the general temper of the people. Commerce has roused new thoughts and awarcened new energies, so that hundreds. If we could skillfully teach them, would croud to learn the English Language*'–Smith:Life of W. Carey.

এতকাল পর্যন্ত কোম্পানির আমলের প্রথম যুগে উপনিবেশগুলিতে শিক্ষার উন্নতিসাধন শাসকশ্রেণী আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করেনি, অজ্ঞতার মধ্যেই শোষিতদের রেখে দিলে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। ওয়েলেসলির সময় থেকেই এ বিষয়ে ভিন্নতর নীতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু নতুন পরিবেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরো মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থেই এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে আগ্রহ বাড়ছিল, যেমন মুসলমান শাসনে পারসিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ঝোঁক পড়েছিল। পারসিক শিক্ষা এই সময়ে ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল এবং ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা বাড়ছিল। মনে রাখতে হবে, এতদিন সঠিক ইংরেজি শিক্ষার তাড়না কেউ বোধ করেন নি। সামান্য ভাঙা ভাঙা দু-চারটি ইংরেজি শব্দ ও বাগভঙ্গি, দু'চার ছত্র কোনোক্রমে লেখাপড়ার কাজ, একটু তাড়াতাড়ি টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ সমাধা করার নৈপুণ্য : এইটুকু হলেই যথেষ্ট মনে করা হতো। রামদুলাল দে-র মতো ব্যক্তিদের সম্পর্কেও জানা যায় : '*and even men like Ramdulal De. We are told, never cared to make a better acquaintance with English than picking up a few broker phrases of colloqual speech, for such knowledge was enough to make them sure as ship sarkars banians and writers and ultimately win for them collossal fortunes*' (P.45)

মোটের উপর অষ্টাদশ শতকের শেষ আর উনবিংশ শতকের শুরুর সময়টাকে বলা যায়, পুরোনো বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য উত্তরণের পরিবর্তকাল। নতুন ধ্যানধারণা, নতুন পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটছে কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের

অবশেষগুলিও টিকে আছে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল ১৭৬০ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকাল ১৮৫৮ পর্যন্ত পুরো সময়টাই এইভাবে চিহ্নিত করা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি বাংলা কাব্যকবিতার মধ্যযুগীয় প্রবণতাগুলি নিঃশেষিত হয়ে গেল? রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও তাঁর সেই 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' প্রভৃতিও বাংলাকাব্যে নতুন সময়কে, প্রগতিকে আত্মস্থ করে প্রকাশ করার নিদর্শন হতে পারলো না। কেননা, কে রঙ্গলাল?

'রঙ্গলাল গুপ্তকবির অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হওয়ায় কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার অপূর্ব-সঙ্গীত রচনাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ছাতুবাবু ও লাটুবাবু (আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব, দুজনেই রামদুলাল সরকারের পুত্র) রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবির দলের 'কবি' নিযুক্ত করিলেন।' —(মন্মথনাথ ঘোষ : রঙ্গলাল, ১৩৩৬, পৃষ্ঠা ৭৬)

কিন্তু ১৮৫৩ সালের ২২শে জুলাই তারিখে লিখিত *The Future Results of the British Rule in India* নিবন্ধে মার্কস যেমন লিখেছিলেন, '*From the Indian natives, veluctantly and sparingly educated at Calcutta under English Superintendence, a fresh class is springing up, endanced with the requirments for the Govt. and imbued with European Science.*'

এবং '*The Indians will not veap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British bourgeosie, till in Great British itself the new ruling classes shall have been supplanted by the industrials, or till the Hindus themselves shall have grown strong to throw off the English yoke altogether.*'

এইসব নির্ণয় কালক্রমে ফলপ্রসূ হতে আরম্ভ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোর স্পর্শেই শুধু যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর মেঘনাদবধকাব্য প্রভৃতি সৃষ্টিগুলি পাওয়া গেল, তাই নয়, আসলে, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে যে পুরনো সামন্তশ্রেণীর ইংরেজ বিরোধিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কারের অন্তরায়ও ক্রমশ মুছে যেতে থাকে, তার বদলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী, বিদেশী শাসনের সর্বগ্রাসী শোষণ থেকে আত্মরক্ষা ও জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা নতুন ইংরেজ-বিরোধী-সংগ্রামের ধ্বনি। এল. হাচিনসন তাঁর *Empire of the Nababs* গ্রন্থে (১৮৩ পৃ.) লিখেছেন—'গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নতুন করে আরম্ভ হল, শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ভারতীয় ধনতন্ত্র তার শিল্পবিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসে, নবজাত শিল্পগুলির থেকে উদ্ভূত শ্রমিক-শ্রেণী শহরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সংযোগ ঘটায় এবং ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক বিক্ষোভ উগ্র হয়ে ওঠে।'

জাতীয়তাবাদের প্রধান তিনটি উপাদানই ভারতের সমাজে এখন সমুপস্থিত—

১। বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে ও ভারতের নিজস্ব শিল্পবিকাশের ঘোরতর বিরোধী একটি স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার।

২। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পের মালিকশ্রেণী, এবং

৩। উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

এইভাবে দেশের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হলো। উৎপীড়ক বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূত রূপে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের কাব্যকবিতাকে এই আলোকেই দেখতে হবে। গতানুগতিক জীবনে, সমাজে যে প্রবহমানতা দেখা দিল, তাই এলো কাব্যেও, মধুসূদনের কাব্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতাকে এই দিক থেকেই দেখতে হবে। মধুসূদনের কাব্য কবিতার মধ্যে না দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, তা স্পষ্টতর তাঁর প্রহসন দুটিতে। হেমচন্দ্রকে তাঁর বৃত্রসংহার কাব্যের আলোকে দেখলে যে দেখা সম্পূর্ণ হবে না, দেখতে হবে তাঁর খণ্ড কবিতাবলীও—

বেঁচে থাক মুখুজ্জ্যের পো একটি চালে
করলে বাজিমাৎ

হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলীর আলোকে দেখা যায়—তিনি তাঁর কালকেই কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস তথা বিখ্যাততম ত্রয়ী মহাকাব্য দেখলেই চলবে না, তাঁর আকাশ রঞ্জনী প্রভৃতির খণ্ড কবিতাগুলি দেখতে হবে।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে যা ক্লাসিক কাব্যাদর্শের অনুমানে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত, বিহারীলালের তথাকথিত আত্মগত-কাব্যসাধনার মধ্যেও তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্বের কাব্য সাধনা পর্যন্ত *'Content'* ও *'form'* এর বিষয়বস্তু আর প্রকরণের দ্বন্দ্বের বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই আমরা প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বটিকেও অনুভব করতে পারি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একই সঙ্গে ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ এবং ঘোষিতভাবে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই। শিক্ষা-ভাবুক রবীন্দ্রনাথকেও পাই তাঁর অতীত ভারতের মর্মমূলে প্রবেশের চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

সমকালীন গৌণকবিদের কাব্যকবিতায় এই দ্বন্দ্বটি কম পরিস্ফুট নয়। কেননা গৌণকবিরা প্রায়শ তাৎক্ষণিকতা বা সমকালীনতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যান। পক্ষান্তরে, মুখ্য কবিরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভার দৌলতেই স্বকালকে বহুলাংশে অতিক্রম

করে যেতে পারেন বলেই তাদের রচনায় সাময়িকতা প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয় না। হলেও কবিজীবনের কোনো এক বা বড়োজোর একাধিক বিশেষ পর্বেই তা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তার অর্থ অবশ্যই এই নয়, যে, মুখ্য কবিরা নির্দ্বন্দ্ব। পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের টানাপোড়েনে তাঁরাও ক্ষতবিক্ষত হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তাঁর মধ্যে আইডিয়াল আর রিয়াল-এর দ্বন্দ্ব তো ছিল রীতিমতো তীব্র ও গভীর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একই সঙ্গে সমাজ সচেতন ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ এবং রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথকে পাই বটে, তবু এই ধরনের বিভাজন কিন্তু জলাচলরেখা ভিত্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে কবিত্বের কল্পনাপ্রতিভা যেমন সুলভ ঠিক তেমনি তাঁর কবিতায় আখ্যানধর্ম অনুপস্থিত নয়। তথাপি, সমাজসচেতন গল্পকারের সঙ্গে সঙ্গে একজন রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ কবিকেও আমরা অনুভব করি।

রবীন্দ্রজীবনে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব খুব অল্প কিছু বা অনুমানের বিষয় নয়। উনিশ-বিশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি শুধু অনুরাগই অনুভব করেন নি, বহুলাংশে মোহাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু প্রাচীন ভারতীয় তথা কালিদাসের কাব্যাদর্শনই নয়, তাঁর মনঃপুত হয়েছিল অতীত ভারতের জীবনাদর্শেও। শুধু কল্পনা-ক্ষণিকা-নিবেদ্য কাব্য কবিতাগুলিই যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ও প্রায় প্রশ্নহীন আনুগত্যের নিদর্শন,তাই নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথেরও কোনো কোনো সমকালীন কর্ম প্রচেষ্টায় এই ঐতিহ্যানুরাগ বস্তুত পশ্চাদগামিতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে এমনিভাবেই প্রভাবিত করেছিল যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নেতিবাচক কোনো কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাসও তিনি এই সময়ে যথেষ্ট বর্জন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার গুলি যেন পুরোপুরি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে পালিত হয়, এই সময়ে তা-ও ছিল তাঁর নির্দেশ। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রণাম করবে কী-না, এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বেশ বিব্রত বোধ করে তাঁর বিদ্যালয়ের জনৈক অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষককে শিক্ষাদানের কাজ থেকে সরিয়ে এনে ভিন্নতর কাজের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন।

যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মকেই তাঁর ধর্ম হিসেবে পরবর্তীকালে ঘোষণা করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষের উর্দ্ধে ছিলেন, উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি সেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয়বহ নয়, একথা বলাই বাহুল্য। 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রটি আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করলেই রবীন্দ্র-জীবনে ও সাহিত্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল। তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। গোরার চরিত্রে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার যে চরম প্রকাশ লক্ষণীয়, সেই প্রসঙ্গে গোরার জবানীতে যত যুক্তিই পরিবেশিত হোক না কেন, মুক্ত

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে-সব যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য উপন্যাসের উপসংহারে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এই নায়কের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। সংকীর্ণ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে উদার মানবতাবাদী চিন্তাধারার অভতারণা দেখা যায়। গোরা-চরিত্রে অনেকেই সমকালীন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আদল খুঁজে পেয়েছেন। বলাই-বাহুল্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন চিন্তার সংকট ও তার নিরসন-চেষ্টারও পরিচয় এই চরিত্র-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বহুলাংশে ধরা পড়েছে।

এই ধরনের সাময়িক পিছুটান এবং দ্বিধা-সংশয় শ্রেণীসমাজে অনিবার্য। এই বৈশিষ্ট্য তাই উনবিংশ শতকেরও অপরিহার্য চরিত্র-লক্ষণ। সাহিত্যের জগৎ তা থেকে স্বভাবতই মুক্ত হতে পারে না। সমকালীন কোনো কবির পক্ষেও এই ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউ শ্রেণীর উর্দ্ধে নন। তবে স্বভাবতই এই দ্বন্দ্বের সঠিক চরিত্র ও পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো গাণিতিক নিয়মাবলী প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গীয় কবি সমাজ যেমন একদিকে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সূত্রের উর্দ্ধে অবস্থান করতে পারেন না, তেমনি আবার সব কবিরই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, সংগ্রাম ও সাধনার স্তর, প্রকৃতি ও ফল-পরিণাম পুরোপুরি একই রকম হতে পারবে না।

সর্বোপরি, বলাই বাহুল্য সামগ্রিক বিচারে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি ঘটেছিল। শুধু পরিমাণের প্রাচুর্য নয়, ভাষা ও প্রকাশরীতির ঐশ্বর্যও লক্ষণীয়, সাময়িক অতীত মুখীনতা সত্ত্বেও তার উদ্দেশ্য ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্মাণ অর্থাৎ প্রবলতাটা মূলত সামনের দিকেই নিঃসন্দেহে, কিন্তু কোথায় থেকেই যায় একটা পিছুটান, কিছু পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতা—যার হাত থেকে পরিত্রাণ—সর্বৈব মুক্তিলাভ আর কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কাব্য
সৌমিত্র বসু

প্রথমেই স্বীকার করতে চাই, রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী'কে আলোচনার বিষয় হিসেবে বেছে নেবার পেছনে এ লেখকের কোন সযত্নলালিত পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। তবে হঠাৎ করেই যে সে রবীন্দ্রনাথের এই বইটিই নির্বাচন করল তার অন্যতম কারণ হল, এই বইটিকে তার কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর সংরূপের অনির্দিষ্টতা। এ বিষয়ে, বিস্তর তফাৎ সত্ত্বেও একে 'লিপিকা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। লিপিকায় যেমন, কিছু লেখাকে স্পষ্টতই ছোটগল্প বলে মনে হয়, যদিও তারা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ছোটগল্পের থেকে কিছুটা আলাদা। আবার, বেশ কিছু রচনাকে তো কবিতাই বলব আমরা, গদ্য কবিতা এবং পরে লেখা পুনশ্চর তুলনায় অনেক আধুনিক কবিতা। অন্যদিকে, কর্তার ভূতকে কি আমরা ছদ্মবেশী প্রবন্ধই বলব না?

সংরূপের এই মেশামেশি কাহিনীর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে আছে নাটকাকারে সংলাপবদ্ধ কয়েকটি রচনা, আবার আছে 'পতিতা' এবং 'ভাষা ও ছন্দ' নামে দুটি কবিতা—যাদের আকারের সঙ্গে নাটকের কোন সাযুজ্য দেখা যাচ্ছে না। আবার পুরাণ বা ইতিহাস নির্ভর এই রচনাগুলির মধ্যে দেখছি রূপকথাপ্রতিম চটুল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', যাকে এই একই বইয়ের অন্তর্গত করাটা ভাল মনে হয় নি অনেকের।

এই বিষয়টা আমাকে টেনেছে খুব বেশি। আমার মনে হয়, সংরূপের নির্দিষ্টতার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের ধারনার কোথাও বিরোধ আছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে একটি নির্দিষ্ট সংরূপের নিয়মকে মেনে চলার যে বাধ্যতা ছিল লেখকের ওপর, আধুনিক সাহিত্য তার থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, লেখকের মন যা চায় তাই এবং যেমনভাবে চায় তেমনভাবেই নিজেকে প্রকাশ করা তার ধরন।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীর লেখাগুলির রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের নানামুখী আগ্রহ সংহত হচ্ছে এই বইটির মধ্যে। কাহিনী প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে, এর রচনাকাল ১৩০৪ থেকে ১৩০৬। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের একটি বিস্তৃত বলয় তৈরি করে নিচ্ছেন, যার মধ্যে আছে 'সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি, আছে প্রাচীন, লোক এবং আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে তাঁর লেখা। সেই সঙ্গে মনে রাখব পঞ্চভূত নামক সংকলনটিকে, তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বা শিল্পতত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি লিখছেন ধর্ম বিষয়ক বই ব্রহ্মোপনিষদ বা ব্রহ্মমন্ত্র, প্রকাশ পাচ্ছে নৈবেদ্যর কবিতা। চারিত্র্য পূজার লেখাগুলিও তৈরি হচ্ছে এই পর্ব থেকে। আবার কথা, কল্পনা এবং চৈতালিতে উঠে আসছে প্রাচীন ভারতবর্ষের ছবি। যদি মনে রাখি ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করবেন

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যেখানে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে ছাত্রদের। শিল্প, জীবন মানুষ বিষয়ে যে চিন্তার সমাহার এই পর্বের রবীন্দ্রসাহিত্যে, তার কিছু প্রতিফলন কাহিনীর রচনাগুলিতেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাকে প্রকাশ করবার উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন পুরাণ বা ইতিহাসের কোন আখ্যান, তার সঙ্গে যুক্ত করছেন এই কাহিনীগুলি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। আমরা জানি, প্রাচীন সাহিত্য বইয়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যেও কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ তা-ই করেছেন, অর্থাৎ ঘটনা বা চরিত্রের আচরণের মধ্যে সেই তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন যা আসলে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, কালিদাসের রচনার ওপর তাকে আরোপ করা হয়েছে মাত্র। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা বা মেঘদূতে তিনি যে দেখেন মোহের বশে নয়, প্রগাঢ় দুঃখের মধ্যে দিয়েই সম্ভব হতে পারে যথার্থ মিলন, তা আসলে তাঁর নিজের সাহিত্যকে বোঝবার ক্ষেত্রেই বেশি কাজে লাগে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটকে দেখি, প্রবল দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর পাত্রপাত্রীরা জীবনকে চেনে—বাল্মীকি প্রতিভা, প্রকৃতির প্রতিশোধ পর্ব থেকে রাজা ও রানী বিসর্জন হয়ে শারদোৎসব রাজা পার হয়ে বেশির ভাগ নাটকেই তাঁর এই চিন্তন কাজ করে চলেছে।

সমকালে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা বা ঘটনাবিহীন কোন ইঙ্গিত, যা অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে গেল, তার থেকে যেমন কোন লেখক পারেন তাঁর উপাদান সংগ্রহ করে নিতে, ঠিক তেমনি, পুরাণ বা ইতিহাসের কোন আখ্যানেও যদি লেখকের জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে যায় তাকেও রচনার উপাদান করা সম্ভব, এবং সেই ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক উপাদান নিয়ে একটি আধুনিক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। পুরাণ এবং ইতিহাসের সেই গল্পটি তখন লেখকের কাছে হয়ে দাঁড়ায় একটি প্রতীক মাত্র, যার ওপর ভর দিয়ে লেখক নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারবেন। খানিকটা ব্যতিক্রমী লক্ষ্মীর পরীক্ষা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনীর অন্য লেখাগুলিতে ইতিহাস বা পুরাণকেই আশ্রয় করছেন তার বেশ কয়েকটি কারণের কথা মনে হয়। প্রথমত, এই লেখাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মহত্ত্বের একটি অনুষঙ্গ সঞ্চারিত করে দিতে চাইছেন, যে মহত্ত্বের বোধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারিত্রপূজা, ধর্মভাবনা বিষয়ক লেখাগুলি 'কথা'র কবিতা, নৈবেদ্যর কবিতা এবং সাহিত্যতত্ত্বে বিধৃত সাহিত্য ও মঙ্গলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণায়ক লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে। কাহিনীর মধ্যেও দেখি বড় মাপের কিছু চরিত্রকে, যাঁরা তাদের মহৎ জীবনাদর্শ দিয়ে জীবনের ক্রুর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন। আমার মনে হয়, এই মহৎ চরিত্ররা কিছুদিন পরেই ফিরে আসবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে—গোরা, শচীশ বা নিখিলেশ পুরাণ বা ইতিহাসের দূরত্ব থেকে মহত্ত্ব আহরণ করবে না, কিন্তু তাদের মধ্যে এই পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর ধাঁচ কেমন করে চলে আসবে তা লক্ষ্য করবার বিষয়, আর এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই বিরাট পুরুষদের ধর্মবোধও আক্রান্ত হবে পার্থিবতার দ্বারা; কাহিনীর চরিত্রদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে।

এভাবে দেখলে কাহিনীতে বিধৃত ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে একটা প্রতিবাদের ছবিও হয়তো দেখতে পাই। উনিশ শতকের শেষের দিকে, হিন্দু পুনর্জাগরণের পর্বে গিরিশচন্দ্রদের হাতে নাটক যে মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদের বাহন হয়ে উঠছিল, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি, দর্শন, আদর্শ-নির্ভর জিজ্ঞাসা তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করে।

প্রাচীন পটভূমি নির্ভর এই রচনাগুলির মধ্যে দুটি স্পষ্টতই নাটকাকারে রচিত নয়, বাকিগুলিকে হয়তো নাটক বলা যেতে পারে। সংরূপের দিক থেকে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা বা কর্ণকুন্তী সংবাদকে আমরা আপাতত নাটক হিসেবেই ধরতে চাই। চটুল, রূপকথাপ্রতিম কাহিনী নিয়ে রচিত লক্ষ্মীর পরীক্ষাকে বাদ দিলে বাকি চারটি নাটকের ধরন সেই সময়ের প্রথাগত নাটকের মত তো নয়ই, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের থেকেও এদের স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে বিষয়ে আলো ফেলবার আগে, আমরা রবীন্দ্র নাটকের ধারায় এই নাটকগুলির স্থান সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই।

আমরা জানি, উন্মেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ নাটকের সংরূপ নিয়ে বিচিত্র সব পরীক্ষা করেছেন, রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ বা নলিনীকে কোনভাবেই সমকালীন অন্য-নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। যেমন বাল্মীকি প্রতিভা বা কালমৃগয়া স্পষ্টতই সমকালীন গীতিনাট্যের রীতি প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। ১৮৮৮ সালে মায়ার খেলা, '৮৯-এ রাজা ও রানী এবং '৯০-এ বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত নাটক বা গীতিনাট্য রচনার দিকে যেতে চাইলেন। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল, মায়ার খেলা ঠিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা স্বর্ণকুমারীদের ধাঁচে গীতিনাট্য হচ্ছে না, যেমন বাইরের আকারের দিক থেকে পঞ্চাঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও রাজা ও রানী বা বিসর্জনকে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না গিরিশচন্দ্রদের পঞ্চাঙ্ক নাটকের সঙ্গে।

ফলে, বিসর্জনের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনায় নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। গোড়ায় গলদ বা বৈকুণ্ঠের খাতার বিপরীতে রাখলেন চিত্রাঙ্গদা বা মালিনী; যাদের সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশেল নেই এবং প্রথাগত নাটকীয় সংঘাতের বদলে যাদের মধ্যে কবিতার প্রাধান্য। বাইরের নাটকীয়তা পরিহার করে আন্তর সংকটের উন্মোচনের যে ধরন শুরু হবে শারদোৎসব পর্ব থেকে তার একটা সূচনা ইঙ্গিত বুঝি চিত্রাঙ্গদা বা মালিনীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

চিত্রাঙ্গদা, মালিনী এবং শারদোৎসবের মধ্যপর্বে কাহিনীর এই নাটকগুলির স্থান। আমরা লক্ষ্য করব, এই নাটকগুলি আকারে ছোট, সংহত, একটি মাত্র ঘটনামুহূর্তকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং বাইরের ঘটনা নয়, নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে ঘটনাসঞ্জাত অভিজ্ঞতা এবং আত্মজিজ্ঞাসা, যুক্তির বিনিময়। এও দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ সংশয়হীনভাবে নির্বাচন করে নিচ্ছেন একটি চরিত্রকে, গান্ধারী, সোমক বা কর্ণ, তাদের আদর্শের বা ধর্মবোধের কথা বলবার উপায় হিসেবেই যেন আসছে বাকি চরিত্ররা।

একাঙ্ক নাটকের ধরন চলে আসছে এদের মধ্যে। মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন পণ্ডিত যদি এসব নাটকে নাটকীয় ঘটনার বিরলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মঞ্চ বিষয়ে অভিজ্ঞ কেউ তাঁকে মনে করিয়ে দিতে পারবেন, চরিত্রদের আন্তর সংক্ষোভ এবং গভীর এবং আধুনিক নাটকীয়তার জন্ম দিচ্ছে সেই অর্থে এদের আধুনিক একাঙ্ক নাটক অভিধা দেওয়া যেতেই পারে।

পতিতা এবং ভাষা ও ছন্দ নাটকাকারে রচিত নয় অথবা রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থখানির অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই এ দুটি কবিতা কাহিনীতে জায়গা পেয়েছে। এই গ্রন্থে কবিতা দুটি অনিবার্য হয়ে উঠল কি শুধু তাদের পুরাণ নির্ভর বিষয়বস্তুর জন্য? লক্ষ্য করার বিষয়, পতিতার ছন্দ বা ভাষা ব্যবহার ঠিক অন্য পুরাণ বা ইতিহাস নির্ভর নাটকগুলির মত নয়, এক ধরনের চটুলতাই হয়তো তৈরি হয় সেখানে।

এ বিষয়ে আমার দুটি কথা মনে হয়। পতিতা কবিতাটি আদ্যন্ত একটি নাট্যসংলাপের আকারে রচিত, সেখানে রাজমন্ত্রীকে তার অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছে একটি মেয়ে। এই সংলাপধর্মিতা—এর মধ্যে কিছুটা নাট্যলক্ষণ এনে দিয়েছে। পতিতাকে নাটক বলে ভাবা হয়তো ঠিক সংগত হবে না, কিন্তু তার সংলাপ সর্বস্বতা তাকে এই বইয়ে জায়গা দেবার যোগ্য করে তুলেছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে সে কথা বলা যাবে না, তবে রবীনদ্রনাথের প্রথম পর্বে রচিত বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা বোধহয় এই কবিতাটির সংযোগ চারিত্রপূজার সঙ্গে —যে আদর্শ মানুষের অনুসন্ধান রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর এই বইয়ে, তারই প্রতিফলন যেন পাওয়া গেল এই কবিতায়, অন্যদিকে লক্ষ্মীর পরীক্ষার সংযোগ লোকসাহিত্যের সঙ্গে, এর কাহিনী এবং রচনাকৌশলের মধ্যে তার ছাপ পাচ্ছি। সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে চাই, লক্ষ্মীর পরীক্ষার ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারের ধাঁচ অনিবার্যভাবে একই বছরে প্রকাশিত ক্ষণিকার সগোত্র, যে মহান প্রসন্নতায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে দেখবার ধরন এই কাব্যগ্রন্থে, লক্ষ্মীর পরীক্ষার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে পড়ার লোভ হয়।

এই ছোট লেখায় কাহিনী গ্রন্থটিকে নানাদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা হল, বলা বাহুল্য, এতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি সূত্রই আলোচনার বিস্তৃতি দাবি করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মিথের প্রয়োগ

মীনাক্ষী সিংহ

কবিতায় মিথের প্রয়োগ একাধারে রূপ নির্মাণ ও স্বরূপ সন্ধানের মেলবন্ধন। প্রাচীন মহাকাব্যিক, পৌরাণিক বা লোকপুরাণের সুপ্রয়োগে সাহিত্য অন্যতর মাত্রা পায়, কবিতা হয়ে ওঠে পরম রমনীয়।

মনের চেতন স্তরে যেমন বাইরের ঘটনা প্রভাব ফেলে, অবচেতন লোকে তেমনি কিছু ঘটনার প্রভাব কাজ করে যায়—তা-ই আসলে 'মিথ'। মিথের সমাবেশে সমৃদ্ধ কাব্য সাহিত্য সমালোচনার 'আর্কেটাইপ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় সমালোচনার মূলকথাই Myth ও legend.

'মিথ' শব্দটি এসেছে 'Muthos' থেকে—যার অর্থ কাহিনী বা প্লট; অর্থাৎ শব্দের ভেতরে একটি গল্প বা ছবি লুকিয়ে আছে। সেই পুরোনো গল্পটি যখন নতুন অনুষঙ্গে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখনই মিথের প্রয়োগ হয় সার্থক। মিথের উৎপত্তি জনজীবন থেকে, উত্তরকালের কাব্যে যা বারে বারে ফিরে আসে। যুং একেই বলেছেন—Collective Unconscious বা যৌথ নির্জ্ঞান। প্রাচীন দেশগুলিতে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত বস্তুকে দেবতা হিসেবে কল্পনা কর হত। তাই প্রাচীন মিশরের তম্মুজ, গ্রীসের অ্যাডোনিস, এসোরিজ—সবাই শস্য দেবতা বা Corn god যা যুক্ত Fertility myth-এর সঙ্গে। এলিয়টের The Waste land -এ এই প্রাচীন মিথকেই নতুন ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে; ঐতিহ্য ও অধুনাতনকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কবিতার ফিলোমেনা এসেছিল পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে, কিন্তু অবশ্যই একালের জীবনের প্রাসঙ্গিকতাসূত্রে। একালের কবি একালের ভাষায় 'মিথ' রচনা করেন না, লোকপুরাণ বা মহাকাব্যিক পুরাণকে তিনি ব্যবহার করেন এবং এভাবেই তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সমকালের এবং আগামীকালের পাঠকের হাতে তুলে দেন।

'মিথের' সন্ধান হল সমাজ ও ঐতিহ্যচেতনার নামান্তর; কাব্য রচনার সময় deep structure-এ কাজ করে। 'মিথ' তাই সাহিত্যের উপরিতলের কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে। Deep structure হল দেশজ ও কালগত, Surface structure কবির নিজস্ব, যার ভিত্তি একালে। এই দু'য়ের সার্থক সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভব হয়। লেনিন বলেছিলেন সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো প্রগতিই সম্ভব হয় না, যদি না নতুনের প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য থাকে। 'মিথ' হল সেই ঐতিহ্য। বড় শিল্পী আপাত দৃষ্টিতে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাঁর ভাবে কল্পনায় এবং রূপায়ণে স্বদেশী ঐতিহ্য গোপনে জাল বুনে যায়। কবিতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই অন্তর্লীন ঐতিহ্যবোধ বিশেষ রূপে সহায়ক। একেই I. A. Richards বলেছেন Stock response। কবিতা পড়ে পূর্ব নির্দিষ্ট কাব্য সংস্কার জেগে ওঠার নামই Stock response. রবীন্দ্রনাথের উর্বশী

কবিতা একান্তভাবেই আধুনিক; কিন্তু তার সমস্ত নবীনতা সত্ত্বেও তা পুরাণচরিত্র। একালের যে কোনো কবিই নতুন করে উর্বশীকে গড়তে পারেন, কিন্তু তিনি পারেন না উর্বশীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'মিথ' বা লোকবিশ্বাসকে ভাঙতে। প্রাচীন মিথকে আধুনিক জীবনে মিলিয়ে কবি যখন অর্থময়তা দান করেন—তখনই ঐতিহ্য নবায়মানতা লাভ করে। পুরাণ হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক। একালের কবিতায় লোকপুরাণের চরিত্র আত্মপ্রকাশ করে Objective Co-relative-এর সূত্রে যার কথা বলেছেন এলিয়ট। তিনি তাঁর Waste Land কবিতায় পুরোনো মিথ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন বর্তমানকে দিয়ে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একসূত্রে গ্রথিত একেই বলা হয় Objective Co-relative.

Creation myth-এর আদিম কাহিনীতে আছে দুই পুরুষ ও এক নারীর কাহিনী। আধুনিক মানুষের জীবনেও এক নারী-দুই পুরুষ বা দুই নারী-এক পুরুষ কেন্দ্রিক সমস্যা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে Richard chase-এর মন্তব্য—"We should rather think of myth as a river which flows eterually"

এই চিরন্তন প্রবহমান 'মিথ'-কেই সাহিত্যিক অতীতের কাহিনীসূত্রে বর্তমানের অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত করেন। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ছিল সুগভীর। তাঁর মৌলিক সৃষ্টিতে বারে বারেই মহাকাব্যিক, পৌরাণিক 'মিথ' ছায়া ফেলে গেছে। প্রাচীনকে তিনি নবরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই মহাভারতের উর্বশী, কালিদাসের মেঘদূত বা লোকপুরাণের সুরদাস তাঁর রচনায় নবরূপায়ণে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

মালার্মে বলেছিলেন "Wounds not with write poetry with words, not with ideas"; আমরা সেটিকে একটু বদলে নিয়ে বলতে পারি শব্দ ও ভাব দু'য়ে মিলেই কাব্য রচিত হয়। কবি যখন সচেতন ভাবে 'মিথ' প্রয়োগ করেন, তখন সেই মিথের ভাবটির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ দিয়ে গাঁথা চিত্রকল্প নির্মিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে শব্দটিও তার বিশেষ দ্যোতনাবহ ভাব-দুটিই অপরিহার্য ও পরস্পরের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতায় কখনো প্রতীক, কখনো চিত্রকল্পরূপে মিথকে ব্যবহার করেছেন, কখনো বা সমগ্র কবিতার অবয়বে ও আত্মায় মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মধ্যযুগ মুগ্ধতা ও কালিদাস প্রিয়তার অনুষঙ্গে বারেবারেই বৈষ্ণব পদাবলী ও মেঘদূত ফিরে এসেছে তাঁর রচনায়। প্রাচীন মিথকে আধুনিক অর্থময়তায় ভাস্বর করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষের বেদনাকে আধুনিক মানুষের অনন্ত বিরহের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

নির্বাচিত কয়েকটি রবীন্দ্র কবিতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা রবীন্দ্র কবিতায় মিথের প্রয়োগ ও তার তাৎপর্য অনুসন্ধানে ব্রতী হবো।

সুরদাসের প্রার্থনা—মানসী কাব্যের এই কবিতাটির পূর্ব নাম ছিল 'আঁখির অপরাধ'। চিত্রধর্মী এই নাম থেকে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ করেছেন কবিতাটিকে সঙ্গীতধর্মী নামকরণে, রূপ থেকে পৌঁছেছেন অরূপলোকে। প্রেমের কামনাবিহীন অনুভবের গান এ কবিতা। কবি বিশ্বাস করেন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ যে রূপারতি তা ভোগের অন্য নাম।

ইন্দ্রিয়াতীত অন্তর্দৃষ্টিই প্রেমকে গভীরতর মহিমাদীপ্ত করে। তাই কামনামদির নয়নকে তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা বিদ্ধ করে বাসনাতীত অনির্বচনীয় অরূপলোকে যেতে চান। এই প্রসঙ্গে লোককথার অন্ধ সুরদাসের কাহিনী প্রাচীন কাল থেকে উঠে এসেছে বর্তমানে। কবি যখন বলেন—

"আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মি সম
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম"

তখন পাঠকের মনোলোকের গভীরে প্রচ্ছন্ন সুরদাসের প্রাচীন মিথ বা কাহিনী উঠে আসে Surface structure-এ। প্রেমের অরূপ অসীমতা বোঝাবার জন্যই 'সুরদাসের প্রার্থনা' নামকরণে প্রাচীন 'মিথ' আধুনিক ও চিরন্তন আবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—

'আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে"।

অন্ধকারকে এভাবেই অসীমের দ্যোতক করে তাঁর প্রেমভাবনার রূপাতীত বোধকে প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ, তাই অন্ধ সুরদাসের প্রাচীন 'মিথ'কে বর্তমানের প্রসঙ্গে অনিবার্য করে তোলেন।

মেঘদূত—কবে কোন বিস্মৃত বরষে, পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কালিদাস লিখেছিলেন মেঘদূত। রবীন্দ্র মনোলোকে চিরবিরহের গান হয়ে মেঘদূত চিরজীবী। নির্বাসিত যক্ষের বিরহ-বেদনার সেই 'মিথ'-কে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বারবার বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান জীবনের বিচ্ছিন্ন প্রেমের অনন্ত বিরহ যেন মেঘদূতের মধ্যে প্রতীকিত। কোন কুবেরের অশ্রুত অনুচ্চারিত অভিশাপে মানব-মানবীর অনন্ত বিরহ— এই চির অন্বেষা কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। কালিদাসের যক্ষ-যক্ষপ্রিয়ার কাহিনীকে সর্বমানবের চিরবিরহের প্রতীক করে সেই 'মিথ'-কে বর্তমানে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তাঁর আকুল প্রশ্ন যেন অনন্ত আর্তি হয়ে রামগিরি পর্বত শিখর থেকে উজ্জয়িনী অলকাপুরী স্পর্শ করে বর্তমান কালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?

এ ক্রন্দন অতীতের যক্ষ থেকে বর্তমানের নায়কের হৃদয়-বেদনাকে প্রকাশ করে— কালিদাসের কাল পেরিয়ে এই 'মিথ' বর্তমান কালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কালিদাসের 'মেঘদূত' তখন Objective Co-relative-এর সূত্রে বর্তমানের নব মেঘদূত হয়ে ওঠে।

উর্বশী—রবীন্দ্রমানসের নিরাকার সৌন্দর্যতত্ত্ব রূপ পেয়েছে 'চিত্রা' কাব্যের 'উর্বশী'

কবিতায়। বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য যা ইন্দ্রিয়গণ্য, তা-ই ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে কবির অন্তরে বিরাজিত। সৌন্দর্যের অখণ্ড অনন্ত সত্তারই বাণীমূর্তি উর্বশী।

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে নারীর সৌন্দর্যের প্রকাশ মাধুরী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উর্বশীকে প্রতীক বলে মেনে নিয়েছেন।

> "নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক।..... এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট্ সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়। কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেই জন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে।"

নারীর যে রূপ সংসারের বন্ধনে, প্রাত্যহিকতার সীমায় আবদ্ধ, সম্পর্কের বন্ধনে যা আসক্তির অভিমানকে জাগায় উর্বশী সেই সম্পর্কের উর্ধ্বে।

> "নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী
> হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"

যে মুহূর্তে 'নন্দনবাসিনী' শব্দ যুক্ত হল সেই মুহূর্তেই সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী থেকে তার উর্ধায়ন। 'সুরসভাতলে নৃত্যপরা' উর্বশী অথবা 'সাগর মন্থনে উত্থিতা' মোহিনীর উল্লেখ আর্কেটাইপ অনুষঙ্গ মনে আনে, আর তখন প্রাচীনে ও নবীনে, পুরাণে ও জীবনে মেশামেশি ঘটে।

> 'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষপাত্র লয়ে বাস করে'

—এই অভ্রান্ত অভিজ্ঞান পাঠকের মনে আনে পুরাণোক্ত ব্যঞ্জনা, কিন্তু কবি সেটিকে প্রয়োগ করেন, ব্যবহার করেন আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে। প্রেমের মাধুর্য ও গ্লানি—দুই-ই এতে ধরা পড়ে। লৌকিক জীবনে পুরুষের কাছে তার প্রেমিকা কখনো বাসনার চরিতার্থতা, কখনো বা কামনার অতৃপ্তি। তাই 'সুধাপাত্র' ও 'বিষপাত্র' শব্দ দুটি ব্যবহৃত। প্রেম কখনো দেয় দাহ, কখনো দেয় দীপ্তি। ব্যক্তি প্রেমের এই দ্বিবিধ রূপই সম্ভবত এখানে আভাসিত। এই লৌকিক ব্যাখ্যার বাইরে 'উর্বশী'র অনন্ত সৌন্দর্যমূর্তির প্রচলিত ধারণাও সত্য। কবি স্বয়ং তাকে বলেছেন—

> "সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা, যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে"

তেমনই প্রেম একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। এজন্যই স্বর্গবাসিনী উর্বশীর প্রত্নপ্রতিমা সমগ্র কবিতাটিকে ঘিরে আছে। নারীরূপের অনিন্দনীয় পূর্ণতার যে প্রকাশ ছবি আছে স্বর্গের উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমার—সেই বিগ্রহিনী নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ মিলেই উর্বশী কবিতার সৃষ্টি। সুরলোকের উর্বশীর মিথকে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই এযুগের পুরুষের মনোলোকে মুক্তি দিয়েছেন।

এভাবেই আমাদের ঐতিহ্যবাহিত ও পুরাণচালিত প্রতিমাকে রবীন্দ্রনাথ বারবার কবিতার শরীরে যুক্ত করেন; মিথের অন্তর্লীন প্রেক্ষিত তার কাহিনী স্পর্শ করে আধুনিক

রূপান্তরে নবীন হয়ে ওঠে। তাঁর বহু কবিতায় 'মিথের' সুনিপুণ প্রয়োগ অনন্য শিল্পকর্ম হয়ে দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে স্বপ্ন, অহল্যার প্রতি, মদনভস্মের পূর্বে, মদনভস্মের পরে, ব্যর্থ অভিসার প্রভৃতি কবিতার কথা মনে আসে।

ঐতিহ্যের অনুধ্যানে শিকড়ের সন্ধানে বারবার কবিকে মিথের কাছে ফিরে যেতে হয়, কারণ পুরাণ কথার মানবিক সত্যের মধ্যে আধুনিক যুগ বিম্বিত হয়।

এজন্যই Richard Chase বলেছিলেন—

"Myth is not vaporous, abstract or unreal – it is a blaye of reality."

এই বাস্তব সত্য হল মানুষের যৌথ নির্জ্ঞান, যা আদিম কাল থেকে মানব মনে সঞ্চিত হয়ে আছে। অবৈজ্ঞানিক যুগের এই বিজ্ঞানকেই সুজান ল্যাঙ্গার বলেছেন—

"Primitive phase of metaphysical thought"

—তাই 'মিথ' কেবল অতীত চারণাই নয়, বর্তমান প্রসঙ্গ ছুঁয়ে তা' অনিবার্য ভবিষ্যতেও ছায়া ফেলে যায়; এজন্যই মিথ ইতিহাস না হয়েও ইতিহাসের ব্যঞ্জনায় অন্যতর মাত্রা পায়; অতীত ইতিহাস বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বিস্তৃততর মর্যাদা পায়। কারণ 'পুরাণের মধ্যে নিহিত আছে ইতিহাসের নির্যাস'। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক বিশ্বাস ও সংস্কার দিয়ে গড়ে ওঠা 'মিথ' তাই কবিদের উদ্দীপিত করে—ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে মিশিয়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় এভাবেই কখনো উর্বশী, কখনো অহল্যা, কখনো চিত্রাঙ্গদা, কখনো বা সুরদাসকে রামায়ণ, মহাভারত, লোকপুরাণের গভীর স্তর থেকে তুলে আনেন, আর সেই "Mythological motif-এর প্রয়োগে শিল্পিত কবিতা হয়ে ওঠে অনন্য।

রবীন্দ্র কাব্য—প্রাক্ গীতাঞ্জলি পর্ব

প্রশান্ত কুমার পাল

একটা সময় সাধারণ বইতে রবীন্দ্রনাথের রচনা সাহিত্যের বিভিন্ন দিককে আলোচনা করা হত প্রধানত তার তাত্ত্বিক রূপটি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজকে মানুষকে চিনবার, জীবনকে জানবার দৃষ্টিভঙ্গীটি অনেক বদলে গেছে। তাই আর শুধু কবিতা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজস্ব জীবনকে সংলগ্ন করে, তাঁকে তাঁর কবিতার সঙ্গে মিশিয়ে একটি পূর্ণ দৃষ্টিতে অনুভবেদ্য করে তোলা হচ্ছে যার ফলে কবি ও কবিতা দুইই আমাদের কাছে সহজ হয়ে উঠেছে। এই চেনা-জানার রাস্তা ধরেই রবীন্দ্রনাথও আজ আমাদের কাছে অনেক বেশী মুক্ত। মুক্ত তিনি তাঁর সমকালীন জীবনের মাটিতে পা রেখেই।

কবিতার কালাশ্রয়ী বিবর্তনের অর্থ হল, কবির অন্তর্জীবনের ক্রমিক রূপান্তর ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার *style*, মনোভূমি এবং প্রাণাবেগ তাঁর মাত্র বারো বছর বয়সে লেখা কবিতা থেকে শুরু করে আশী বছর পর্যন্ত লেখা কবিতা থেকে শুরু করে প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে, রোমান্টিকতায়, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের সংযোগ করে করে বিবর্তিত, বিবর্ধিত হয়ে নতুন করে সেজে উঠেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এমনকি এও বলেছেন প্রথম দিকের কবিতায় তাঁর অন্ত্যমিলের রকম দেখে ("নিকটে—শকটে") দাদা গুনেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথেরা হাসাহাসি করেন। তবুও তাঁর প্রথমদিকের রচনাতেই মাঝেমধ্যে একটা ইঙ্গিত বা *image* এসে পড়েছে।

যেমন ঃ "আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে"

—এই সাধারণ ছবির পরই এসে গেছে একটা *image*

— "হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

তাঁর কবিতাগুলি একেবারে প্রথম দিকে প্রায়। সবই হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের অনুসরণে দেশপ্রেমমূলক ফরমায়েসি লেখা। যদিও পরে এর কোন প্রভাব তাঁর স্বকীয়তাকে আচ্ছন্ন করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের অন্য একজন বড়ো কবি মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অন্যদের থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি কখনোই মধুসূদনকে বড়ো কবি বলে মানেননি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে মধুসূদনের সমালোচনা করেছেন। হয়তো বা বস্তুবাদী কাঠামোর সঠিক নিয়মে বিশ্বাসী মধুসূদনের রচনাশৈলীকে রসবাদী সৌন্দর্যরসিক রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে মেনে নেননি। কিন্তু এরপর বিহারীলালের সঙ্গেই ঘটেছে তাঁর

যথার্থ মনের মিল। প্রকাশভঙ্গীর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভাবের প্রকাশের উচ্ছ্বাসের কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রীতি অনেককাল অনুসরণ করে গেছেন। যদিও তার অনেকটাই তাঁর নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর ফরমায়েসে, যিনি বিহারীলালকে একটি সাধের আসন বুনে বিহারীলালকে উপহারও দেন। তবে এখানেও রবীন্দ্রনাথ বেশীদিন বদ্ধ থাকেন নি, আসলে কোনদিনই কোনো সীমাতে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখা বেশীদিন পছন্দ করতেন না। এমনকি পরবর্তীকালে তিনি নিজের বিভিন্ন কবিতায় নিজেকেই নিজে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলেছেন।

'সন্ধ্যাসংগীত'কেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কাব্য হিসেবে স্বীকৃত দেন। এবং এখানেই তাঁর নিজস্বতা প্রথম প্রকাশ পায়। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র অকারণ বিষণ্নতা, বিষাদময়তা, আপনাতে আপনি গুটিয়ে থাকার বিরোধ-বিড়ম্বনার সীমাবদ্ধতা মুক্তি লাভ করল প্রভাত সংগীতে। যেন কৃত্রিম বিষণ্নতায় পথ ভুল করে ফেলা কবিমনের আলোর সঠিক পথ উত্তরণ ঘটল। এই উচ্ছ্বাসময় কবিমনের প্রতীক হয়ে দাড়াল প্রভাত সংগীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি। ভারতী পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত এই কবিতার তীব্র পুঞ্জীভূত আবেগকে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ কেটেছেঁটে অনেক সংক্ষিপ্ত করে দেন। এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টাসত্ত্বা এবং সমালোচক-সত্ত্বার দ্বৈত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা তাঁকে বারবার সৃষ্টি ও সংস্কার করতে বাধ্য করেছিল। সাহিত্য পাঠকের কাছে এইটা বড়ো অভাব যে এই পর্বের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। অবশ্য 'সন্ধ্যা সংগীত' এবং 'প্রভাত সংগীতে'র আগে লেখা 'মালতী পুঁথি' পাণ্ডুলিপিতে তাঁর শৈশব কবিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রভাত সংগীতেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুরসাধনার ঠিক খরবটি পেলেন এবং প্রেম এবং আনন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্যের সার্থক শুভ সূচনা হয়ে উঠল প্রভাত সংগীত।

এরপরে 'ছবি ও গান'। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এর আগে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে ঘুরে সেখানকার ব্যক্তিস্বাধীনতার চেহারাও দেখে আসেন—কিভাবে সেখানকার মেয়েরা ছেলেদের প্রতিটি কর্মের সঙ্গে যুক্ত। তাই বিলেত থেকে ফিরে জোড়াসাঁকোর বদ্ধ পরিবেশ তাঁর আর পছন্দ হচ্ছিল না। এর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যিনি ঠাকুর বাড়ীর অন্দর ও বাইরের বিশাল ব্যবধানের মধ্যেও সেকালের অন্যান্য রমনীদের থেকে বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে, অনেক স্বতন্ত্র ছিলেন। পার্কষ্ট্রীটে সত্যেন্দ্রনাথ—জ্ঞানদাদেবীর আলাদা ভাড়া বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যেতেন। সেখানে উচ্চবিত্তের বড়লোকী জীবনের পাশাপাশি গরীবদেরও দিনযাপনের ছবি দেখতে পেতেন। যার পরিচয় তাঁর কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। 'ছবি ও গানে'র এক শ্রেণীর কবিতায় সেই মাটির জগতের মানুষের প্রতি মমতা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ বেদনা ছবির রেখায় ও গানের সুরে ফুটে উঠল।

কড়ি ও কোমলে নানা শ্রেণীর কবিতার বিমিশ্রণ ঘটেছে। সমাজের নানা ত্রুটির ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার পাশাপাশি অত্যন্ত দেহমূলক ইন্দ্রিয়জ আসক্তির কিছু সনেট আছে সেখানে। এছাড়াও আছে কিছু স্নেহমূলক কবিতা। উল্লেখ্য যে এই পর্বের আগেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ঘটে যা ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই বৈচিত্রহীন। কারণ প্রতিষ্ঠিত, সুন্দর, শিক্ষিত হয়েও দশবছরের নিরক্ষর সাধারণ মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ (২৩ বছর বয়সে) কিছুমাত্র স্বাভাবিক ছিলনা। যাইহোক শেষপর্যন্ত তিনি যৌবনের মাদকরসকে ১৪ পংক্তির সনেটের সংযমে বদ্ধ করে তার ক্রম উৎসারকে রুদ্ধ করলেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের প্রধান কাব্য 'মানসী' বিচিত্র কবিতায় ভরা। তাঁর প্রথমা কন্যা বেলা এই সময়ে জন্মালেও স্ত্রীর সঙ্গে কোন মানসিক আদানপ্রদানের স্বাভাবিক সম্পর্ক তাঁর ছিল না। তবু স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে তিনি গাজীপুরে আলাদা ভাড়া বাড়ীতে চলে গেলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'গাজীপুরের পত্রে' এই সময়ের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের কাব্যে কবিতায় কবিকে ভীষণ একাকীত্বে মগ্ন হতে দেখা যায়। এর মূলে হয়তো বা প্রীতিভাজন ইন্দিরাদেবীর তাঁর বাসভবনে আসা যাওয়ার সংযোগসূত্রটি বর্তমান। এক্ষেত্রে কবিতার তারিখগুলির সঙ্গে ইন্দিরাদেবীর থাকা-নাথাকার হিসেবটুকু মিলিয়ে নিলে কবির একাকীত্বের স্বরূপ ও কারণ সন্ধান দুটোই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোঝা যায় এই আসাযাওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিজগতের অনেকখানি উত্থান-পতন ঘটিয়েছে। তাই এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তগত জীবনের সঙ্গে কবিতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের টানাপোড়েন—এমন কিছু বর্ণনার অংশে প্রতিফলিত হয়েছে, যার সাধারণ অর্থে কোন মানে করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে দেখলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এবং এখানেই দেখা যায় কিভাবে তাঁর কবিতার এক একটি ভাব সংস্কারের পরিবর্তনে কাব্যের মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

এরপরের পর্বে পূর্ব বাংলাতে জমিদারির কাজে যাওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের এক নতুন উন্মেষ ঘটে। "সোনার তরী" এর নাম। শিলাইদহ, সাজাদপুরে পদ্মার বোটে রবীন্দ্রনাথের মানসপটে প্রকৃতির পটভূমিকায় অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের এক অঙ্গাঙ্গী উপস্থিতির সূত্রপাত ঘটেছে। সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অবস্থা তাঁকে তাদের দূরবস্থা সম্পর্কে অবগত করল। মাটির পাশাপাশি বেঁচে থাকা মানুষদের বাস্তব জীবন ও মনের সান্নিধ্যে তিনি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর জীবন দর্শন ছিল "শিক্ষাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার নিজের দেশের ওপরে।" বাংলা দেশের কৃষক, তাদের দূরাবস্থাকে তিনি শুধু দেখেননি 'চিত্রা' কাব্যে 'দুইবিঘা জমি' কবিতার উপেনের দুর্দশাকে তুলে ধরেছেন। তাদের মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা জুগিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতীয় হিন্দু যে অস্তিত্ব সংকটে (*identity crisis*) পীড়িত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথও তাকে এড়াতে পারেন নি। সেই কারনে তিনি 'কল্পনা' ও

নৈবেদ্য'তে নব্য হিন্দুদের মৌল প্রেরণার ভিত্তিভূমি, প্রাচীন ভারতের উপনিষদের আত্মস্থ স্থিতধী অবস্থা এবং সর্বোপরি প্রাণের সঙ্গে কবির নিবিড়তর আসক্তির কথা চমৎকার ভাবে বলেছেন। এরই মধ্যে ''ক্ষণিকা''র আপাত চটুল ছন্দ ও বাগবিন্যাসের হানাকারীতির সাহায্যে ক্ষণশাশ্বতীর বন্দানা করেছেন।

ইতিমধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মৃত্যু, দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে। তবুও কবি স্ত্রী পুত্রের শূণ্য স্মৃতি বুকে নিয়ে নিজেকে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিত্য কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মতে মৃত্যু কোনো ভাবেই জীবনের একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া নয়, শুধু আরেকটা নতুন অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে যাওয়া। এই অনুভূতিই চলে আসে তাঁর 'খেয়া' কাব্যে। এই 'খেয়া' পর্বে একদিকে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সামঞ্জস্যের তত্ত্ব 'খেয়া' কাব্যের একটি প্রধান দিক। এর সঙ্গে মিশেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গ সম্পর্কচ্যুতির হতাশ বেদনা। এর পরিণতি ঘটল 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-পর্বের খণ্ড কবিতা ও গানে। উপনিষদের তত্ত্ব ও বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের অন্তরালবর্তী দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব তরুণ বয়স থেকেই তাঁর মনের উপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল—এদের মধ্যে বিশেষত শেষেরটি তার ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প নিয়ে রবীন্দ্রকবিতার রূপ ও ভাবদেহের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এরই চমৎকার সংমিশ্রণ দেখা গেছে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্যে।

(অনুলেখিকা—শ্রবণা মিত্র)

ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান ঃ রবীন্দ্রকাব্যের কপিবুক পর্যায়

বিশ্বনাথ রায়

বাল্য ও কৈশোর কালের সাহিত্যসৃষ্টি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও এই সময়ে লেখা কবিতা সম্ভারকে নিজের কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্জন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সন্ধ্যাসংগীত' এর 'সূচনা'য় এই সব কবিতার সৃষ্টি প্রকরণ সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক। বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়।.... সেই কপিবুকের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত।'

'সন্ধ্যাসংগীত' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষপর্ব ধরা হয়ে থাকে, এর পূর্ণ পরিণতি 'শেষলেখা'য়। এই দীর্ঘ কাব্য প্রবাহ স্বয়ং কবি কর্তৃক শীল-মোহর অঙ্কিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার শিক্ষানবিশি পর্যায়ের ভিত্তিভূমির উপরেই তা দাঁড়িয়ে আছে।

মার্তৃভাষায় স্বদেশী সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো অতবড়ো গ্রহিতা আর কেউ ছিলেন না। বাল্য-কৈশোরের কাঁচা গাঁথনিতে সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উপস্থাপনা টলমলে শিথিল হলেও পরবর্তী কাব্যকলায় পাকা নির্মাণ শৈলীতে তা যে উপস্থাপিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার প্রাচীন বৈদিক-সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকেই সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত করে নিয়েছিলেন তিনি। সাধারণভাবে তাঁকে ঔপনিষদিক ভাবনার কবিও বলা হয়ে থাকে। অপর পক্ষে 'সন্ধ্যা সংগীতে'র কবিকে উনিশ শতকের বাবু বাঙালি 'শেলি' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই সূত্রের বিসারণে বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রাজ্ঞ সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যধারায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিচিত্র প্রেরণার আধিক্যই শুধু লক্ষ্য করেন নি প্রায়শই দেখতে পেয়েছেন য়ুরোপীয় কাব্যকলার ছায়াপাত।[১] রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চায় এই দুইয়ের টানা পোড়েনেই অন্তরালে থেকে গেছে মাতৃভাষায় পুরাতন সাহিত্যক ঐতিহ্য অনুসরণের সবচেয়ে বড়ো ভূমিকাটি। প্রাক্‌ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার রবীন্দ্র-সৃষ্টিলোকে কি ভাবে প্রথম থেকেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মনন্ধ পাঠক রবীন্দ্রকবিতার নিবিড় পাঠ মগ্ন হলে দেখতে পাবেন শেষোক্ত কথাটি কত গভীরভাবে সত্য।

শৈশব বাল্য ও কৈশোরে দ্বিবিধ উপায়ে মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সংযোগ সাধন হয়েছিল। প্রথমটি শ্রবণ, দ্বিতীয়টি পঠন। ছড়া

রূপকথা রাময়ণ-মহাভারতের গল্প, পাঁচালি ইত্যাদি শোনার ব্যাপারে শিশু রবীন্দ্রনাথের সহায়ক হয়েছিলে বাড়ির বুড়িদাসী ঝি, চাকর সেরেস্তার কর্মচারী প্রমুখ। ছেলে ভুলানো ছড়া তাঁর কাছে ছিল 'শৈশবের মেঘদূত'। এক-আধটি কবি-কথায় তাঁর পাঠ-জগৎ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারি আমরা।

১. 'ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।....... যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন তিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।'[২]

২. 'মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়ন মাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই।'[৩]

৩. 'আমি যে বাল্যকালে য়ুরোপীয় সাহিত্য পড়বার ভালো সুযোগ পাইনি—এবং তার পরিবর্তে বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছিলুম ও তার থেকে আমার লিরিকের ভঙ্গী ও ভাষা গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেম, এটা আমার পক্ষে একটা বাঁচোয়া। নইলে আমি হয়ত নবীন সেন প্রভৃতির মত বাইরনী ছাঁচে লেখবার চেষ্টা করতুম।'[৪]

।। দুই।।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলীর 'অচলিতসংগ্রহের' (১ম খণ্ড) 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত'-পূর্ব সাহিত্যধারা সম্পর্কে লিখেছিলেন, তা 'অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে' তুলেছে; আর সেই জন্যই এই 'অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক' রচনাগুলিকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যাবতীয় 'দোষগুণ' স্বীকার করে নিয়েও তাকে 'নিজের সুরে নিজের কবিতা' বলার কারণ একটাই, এই সময় থেকেই নিজের কবিস্বভাবের স্বধর্ম খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর পূর্বেকার অপরিণত রচনাসম্ভারে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব যে স্পষ্টভাবে জাজ্বল্যমান তা তিনি ভাল করেই জানতেন। 'পরাশ্রয় প্রবণতার' দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়েই যে কোন শিল্পী তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অক্ষম অনুকরণ' বলেছেন, বস্তুত তা প্রতিভার অঙ্কুরোদ্‌গম কালে 'পরনির্ভরতা' বা 'পূর্বানুসৃতি'। অর্বাচীন কবিস্বভাব যেহেতু সেই প্রভাবকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতে পারেনি সেই জন্যই তা 'অনুকরণ' বলে অভিহিত হয়েছে—আসলে এও এক ধরনের মোটাদাগের প্রভাব।

'পদ্য' রচনার 'প্রথম অঙ্কুরণ লগ্নে' ছেলে ভুলানো ছড়া এবং বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের 'ভাষা ও ছন্দের' উপর নির্ভর করতে হয়েছিল শিশু রবীন্দ্রনাথকে। সাত আট

বছর বয়সে 'কবিতা রচনারম্ভে'র ব্যাপারে ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯) ছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগুরু। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"একদিন দুপুর বেলায় তাঁহার (জ্যোতিঃপ্রকাশ) ঘরে ডাকিয়া লইয়া কেমন করিয়া চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা লিখিতে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন এবং আমার হাতে একটা স্লেট দিয়া বলিলেন পদ্মের উপরে একটা কবিতা রচনা কর। তাহার পূর্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যছন্দ আমার কানে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়া ফেলিলাম।"[৭]

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ছন্দের অনুসরণে স্লেটে যার সূচনা, জমিদারী সেরেস্তার এক কর্মচারীর অনুগ্রহে পাওয়া নীলকাগজের ফুলস্ক্যাপ খাতায় সাধু-পয়ার ছন্দে সেই কাব্যচর্চা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে রচিত দুটি পদ্যাংশ ('মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' এবং 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি') 'জীবনস্মৃতি'র 'কাব্য রচনাচর্চা' অধ্যায়ে 'দলিলভুক্ত' করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আরম্ভের আগে যেমন আরম্ভ আছে, তেমনি 'পদ্মের উপরে' রচিত আদিতম কবিতার পূর্বে 'প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে' নির্ভেজাল ছড়ার ছন্দে রচিত একটি পদ্যের উল্লেখ 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে পাওয়া যায়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চার। কাঠের সিঙ্গিকে বলি দিতে গিয়ে মন্তর বানিয়েছিলেন—

সিঙ্গি মামা[৮] কাটুম,
সন্দিবোসের বাটুম,
উলকুট টুলকুট ঢ্যামকুড় কুড়্
আখরোট বাখরোট খট্ খট্ খটাস্—
পট্ পট্ পটাস।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এর মধ্যে প্রায় সবকথাই ধার করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের'।[৯] শিশু কবি কোথা থেকে এই ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ১৩০১-২ সালে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত তিনটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার উল্লেখ করে লিখেছেন—'চিরন্তন শিশু শাস্ত্র থেকে এই শিশু পুরোহিত তার পূজোর মন্তর উদ্ধার করেছিলেন'।[১০] ছড়া তিনটির প্রাসঙ্গিক পংক্তিগুলি হল (ক) 'তাল গাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি' (খ) উলুকুট ধুলুকুট নলের বাঁশি (গ) ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙার ঘর।

শিশুকালে শোনা ছড়া-পাঁচালির ছন্দ ঝংকারে গঠিত শিশুকবির মনে যে মন্তর রচিত হয়েছিল তা নিতান্ত দেশী পদ্ধতিতে। ছেলেবেলা গ্রন্থে (অধ্যায়-১৪) রবীন্দ্রনাথের সেই স্বীকারোক্তি আছে—"যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি।" চোদ্দ বছর বয়সে দেশী ছড়ার লৌকিক ছন্দ এবং ভাষারীতিকে প্রথম ব্যবহার করেন তিনি 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের 'ডাকিনী' অংশ অনুবাদ

করতে গিয়ে।[৯] পরবর্তী কালে কেবল ছড়ার ছন্দই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন ছড়া রচনা করেছেন, তেমনি ছড়ার প্রসঙ্গ নানাভাবে এসে পড়েছে তাঁর রচনায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত অল্পবয়সী রবীন্দ্রনাথের মনে যে দাগ কেটে গিয়েছিল, তারই ছায়াপাত দেখতে পাই 'আদি-কৈশোরক' (১৮৭৩-৭৬) পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' (১৮৭৪) ও স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলায় উপহার' (১৮৭৫)-এ হেমচন্দ্রের ভাব-ভাষা-ছন্দের প্রভাব থাকলেও মানুষের উচ্চাভিলাষের ক্ষতির দিক, কিংবা পরাধীন জাতিকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় দিনগুলির স্মরণে রামায়ণ-মহাভারতের যে সবা কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা বাল্যকালে কৃত্তিবাস-কাশীরামদাস পাঠের প্রত্যক্ষ ফল। মানুষের উচ্চাভিলাষকে ধিক্কার দিয়ে কিশোর কবি লিখেছিলেন ঃ—

............কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দৃষ্ট অভিলাষ।
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিল বনবাস,
কাড়িয়া লইল দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

* * * * *

দুর্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগরে হৃদে ক্রোধ জ্বালিদিলে।

(অভিলাষ /স্তবক ৩৩-৩৪)

কিংবা 'হিন্দু মেলায় উপহার'-এ স্বদেশের গৌরবময় দিনগুলির স্মরণে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী উল্লেখ ঃ—

"........রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোক বীণার ভারতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা।

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি;
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে।

শ্রীরথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী আবিস্কৃত[১০] 'হোক ভারতের জয়' (বান্ধব, মাঘ ১২৮১)

কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী হিতৈষী' হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করে 'যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্মবীর'দের এবং 'আদি সম্রাট' রামায়ণের রামকেও স্মরণ করেছেন। অন্যপক্ষে 'অন্ত্য-কৈশোরক' (১৮৭৬-৮৩) পর্যায়ে গাথাকাব্যের আধিক্য থাকলেও কোন কোন গীতিকবিতাতেও মহাভারতের প্রভাবজনিত রেশ থেকে গেছে দেখতে পাই। হিন্দু মেলায় পঠিত 'দিল্লী দরবার' (১৮৭৭) কবিতায় আছে ঃ—

..........."তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডস্বর
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে।"

ইতিমধ্যে (অন্ত্য-কৈশোরে) বৈষ্ণব পদাবলী ও রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়ার গানে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ ঘটায় কোন কোন কবিতায় কমবেশি তার প্রভাব পড়তে থাকে। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১২৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছে কিংবা 'বনফুল' গাথাকাব্যে সমসাময়িক বড় কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত ঘটেছে মাঝে মধ্যেই। এই সময়ে বৈষ্ণব কবিদের রচনা রবীন্দ্রনাথকে যে বিশেষভাবে উত্তেজিত করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক ১২৮৩) তাঁর প্রথম গ্রন্থ সমালোচনা 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'তে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন—'অক্ষয় সরকার মহাশয় যখন বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম প্রকাশ করলেন লুকিয়ে পড়লাম। পরে জানলাম যে কাব্যকলা ব'লে একটি জিনিষ বাংলা প্রাচীন কাব্যেও আছে। সেদিন সাহিত্য রসের উদ্দীপনা সহজে প্রাণে পৌঁছল। তারি প্রথম প্রবর্তনায় অন্তত আমার সাহিত্য অধ্যবসায়কে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।'[১১]

'প্রলাপ'-এ রবীন্দ্রনাথকে যখন লিখতে দেখা যায়—

'হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা। (প্রলাপ—২)

কিংবা 'বনফুলে'—

নিভৃত যমুনাতীরে বসিয়া রয়েছে কিরে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞান হত নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে। (চতুর্থ সর্গ)

তখন মনে হয় বৈষ্ণব পদাবলীর আবেগ আকুলতা নবীন কবির কলমের ডগায় অনিবার্য ভাবেই চলে এসেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের লালিত্য যে 'বনফুলের' সর্বাঙ্গে বিরাজিত সমসাময়িক সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি তা। 'সাধারণী'[১২] পত্রিকায় লেখা হয়—'বনফুল' অতি সুন্দর। জয়দেবের লালিত্য..... বনফুলের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে'। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ' এই কাব্যটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা বিরহার্তি যেন নতুন ভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

"..........তুই নদীতীরে কাঁদগে লো ধীরে
যমুনারে কহি মরম জ্বালা।
* * * * *
লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোর। (তৃতীয় সর্গ)

তাছাড়া ষষ্ঠ সর্গের কোন কোন ছত্রে চণ্ডীদাসের পদের প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্য করা গেছে—

"অস্ফুট বাঁশীর মৃদুরব—
সুধীরে পশিয়া কানে শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব।

এর সঙ্গে মেলানো যাক চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদ :—

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

সমগ্র কাব্যটিতে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই পরাণুকরণ সম্পর্কে কবি নিজেই 'জীবন স্মৃতি'তে স্বীকার করেছেন—আলোচ্য পর্বের প্রায় সব রচনাতেই 'আবেগের ফেনিলতা,.......তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ।'

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাস থেকে 'ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা' 'ভারতী' প্রকাশিত হতে শুরু করলে রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে অজস্রধারায় বিচিত্র বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য হলেও তা 'ভারতী'তেই আগে মুদ্রিত হয় (১২৮৪-পৌ-চৈত্র)। তাছাড়া 'শৈশবসঙ্গীত' (মে—১৮৮৪) ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র (জুলাই ১৮৮৪) কবিতাগুলি 'ভারতী'র প্রথম বর্ষ থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 'কবিকাহিনী' ও শৈশব সঙ্গীতে'র 'গাথা' কবিতাগুলিতে প্রেমভাবালুতার অনুষঙ্গে অস্ফুট হলেও অল্পবিস্তর বৈষ্ণবপদাবলীর ছায়াসম্পাত ঘটেছে—

শুধু ভালবাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?

(কবিকাহিনী / দ্বিতীয় সর্গ / সঙ্গীত)

অন্যপক্ষে 'ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) 'গীতকাব্যে' 'শেলি-বায়রণের কাব্য-কবিতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হলেও রাধাকৃষ্ণেরপ্রণয়গীতির রোমান্টিক ব্যাকুলতা কবির হৃদয়াবেগ মন্থনে যথেষ্ট

সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্ররচনাবলীর 'অচলিতসংগ্রহে' অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত না হলেও 'ভগ্নহৃদয়ের কোন কোন অংশ 'মুক্ত কবিতা' রূপে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) 'কৈশোরক' ভাগে সংকলিত হয়েছিল। কবিতাগুলির বিন্যাসপদ্ধতি এবং কোন কোনটির শীর্ষনাম লীলাচিত্রণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল কাব্য থেকে কিছু নমুনা দিলে বৈষ্ণব কবিতার অনুসৃতি ঠিক কোথায় তা বোঝা যাবে।

'প্রণয়ীর নাম রসনার, সখি
সাধের খেলেনা মত,
উলটি পালটি সে নাম লইয়া
রসনা খেলায় কত।

*　*　*　*　*

ফুলের মালায়　　কুসুম আখরে
লিখি দিব সেই নাম
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন, করিবি,
হৃদয় উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুম দাম।

*　*　*　*　*

সারা জগতের বিশাল আখরে
পরিবি তাহারি নাম। (প্রথম সর্গ)

আধুনিক কবির কলমে এ যেন রাধার পূর্বরাগের চিত্র। সপ্তম সর্গে 'অভিসারে'র ছবিও আছে ঃ—

দেখিস বাধে না যেন চরণ লতায়—
আঁচল না ছিঁড়ে যায় গাছের কাঁটায়।
চমকি উঠিল কেন? কিছু নাই ভয়—
বাতাসের শব্দ শুধু, আর কিছু নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রেম বৈচিত্র্যে'র প্রভাবও কাব্যের কোন কোন পংক্তিতে লক্ষ্য করা গেছে—

তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়
পড়িবে উভয়ের ছায়া উভয়ের গায়।

*　*　*　*

কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ।
দুজনার মঝে কেন এত ব্যবধান? (একাদশ সর্গ)

এছাড়াও 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম ছয় সর্গে চপলার মুখে 'পদাবলীর উপজীব্য পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা' এবং ষড়বিংশ সর্গের কোন কোন পংক্তিতে গোবিন্দদাসের পদের প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন ড. বিমান বিহারী মজুমদার[১৩]।

'ভগ্নহৃদয়ে'র দু'একটি 'স্বগত' ভাষণে শাক্তপদাবলীর আত্মনিবেদনের স্বরও ধ্বনিত হয়েছে—

দেবি গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মা গো— কোথা গিয়ে কাঁদি।
দুর্ব্বল এমন দে মা পাষাণেতে বাঁধি।

অবশ্য ইতিপূর্বেই 'ভারতী' (আশ্বিন ১২৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত 'অগমনী' কবিতায় শাক্ত গীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'জীবনস্মৃতি'র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায় থেকে জানা গেছে, অক্ষয় চৌধুরীর সাহচর্যে 'শ্যামাবিষয়ক গানের' সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিশোর কবি। পরবর্তী কালে 'আগমনী ও বিজয়া'কে 'বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান' বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি।[১৪] রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনার সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত কবিতার খুব বেশি অমিল নেই—

………… 'হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী
চুমিয়া উমার অধর খানি,
আয় মা জননী আয় মা কোলে
আজ বরষের পরে।'

উমা-মেনকার আনন্দ-বেদনার অশ্রুজলে বিধৃত আগমনী-বিজয়ার গানের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনাতেও লক্ষ্য করা গেছে—'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে, বিচিত্র প্রবন্ধের 'শরৎ' শীর্ষক রচনাটিতে কিংবা 'শারোদৎসব' নাটকে 'শারদা দেবীর ধ্যানে'। 'কৈশোরক' পর্যায়ের রচনায় 'শ্যামা-বিষয়ক গানের' প্রভাব আলোচনায় 'শৈশব সঙ্গীতে'র 'হরহৃদে কালিকা' (কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে) কবিতাটিও স্মরণীয়।

।। ৪ ।।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের (১২৮৪) যে সংখ্যায় (আশ্বিন) 'আগমনী' কবিতাটি মুদ্রিত হয় 'ভানুসিংহের' কবিতা প্রকাশের সূচনা হয় সেই একই সংখ্যায়। 'মল্লার' স্বর নির্দেশিত 'সজনী গো— / আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা'[১৫] পদাবলীর পাদটীকায় জানানো হয়—'এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতিমধুর হয় না—প্রত্যুত হাস্য-জনক হইয়া পড়ে'। পাদটীকায় কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থনির্দেশ করাও হয়েছিল।

যেভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'ভানুসিংহের কবিতা' রচিত হয়েছিল,

সেই তুলনায় বলতে হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'—পূর্ব কৈশোরক পর্যায়ের অন্যান্য কবিতায় বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার স্পষ্ট অনুকরণ, ভাষা ও রূপে সম্পূর্ণত বটেই, ভাবের বহিরঙ্গ দিক থেকেও হয়তো কিছুটা। আর সেই জন্যই বিভিন্ন সময়ে এই পদগুলি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করতে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথকে ;— কখনও বলেছেন 'মেকি' 'সস্তা অর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র', কখনও বলেছেন 'পদাবলীর জালিয়াতি', কিংবা 'মা সরস্বতী চোরাই মাল', আবার কখনো-বা 'একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য' করেছেন। তা সত্ত্বেও ভানুসিংহের কবিতা একটা প্রশ্রয়-মিশ্রিত 'ছাড়পত্র' সবসময়েই পেয়েছে তাঁর কাছে;— যার জন্য প্রথম প্রকাশের পর নব নব সংস্করণে তা যেমন মুদ্রিত হয়েছে, তেমনি এর বেশিরভাগ পদ কৈশোরক পর্বের রচনা হয়েও রবীন্দ্রনাথের পরিণত লেখার পাশে স্থান করে নিতে পেরেছে। কবির দিক থেকে সম্ভবত এর একটাই কারণ, 'ভানুসিংহের কবিতা'র সাঙ্গীতিক গুণ এবং সাফল্য[১৬]। অন্য কারণও আছে। পদগুলি পরাণুকরণ হলেও এর মধ্যে 'ভাবের অস্ফুটতা ভাষা ও রচনাশৈলীর পরিণতির অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে।[১৭]''

গ্রন্থাকারে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী''[১৮] ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও, আমরা পূর্বেই বলেছি 'ভারতী' পত্রিকায় তার মুদ্রণ শুরু হয় অনেক আগেই, ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পদগুলির রচনাকাল সম্পর্কে জানিয়েছেন—''ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সে লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্তী কালের লেখাও আছে।[১৯]'' 'পরবর্তী কাল' বলতে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছর বয়সের পরে নয়, কেননা ভানুসিংহের শেষ পদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯২-৯৩ সালে।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের কবিতা রচনা মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের খণ্ডশ-প্রকাশিত 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের' বৈষ্ণব পদগুলি পাঠ করে। শব্দতত্ত্বের প্রতি স্বভাব-কৌতূহলী কবির পক্ষে বিদ্যাপতির মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষার রহস্যময় দুরধিগম্যতা অতিক্রম করতে অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রাচীন পদকর্তাদের অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার থেকে এক একটি কাব্যরত্ন উদ্ধার করতে পারার আনন্দেই উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ব্রজবুলি কবিতার ভাষা, ছন্দ, ধ্বনিমাধুর্যে মোহিত হয়েই এগুলি অনুসরণ করার অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা তাঁর মনে জেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন—''এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে।''[২০]

ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণে 'ভানুসিংহে'র প্রথম পদ 'গহন কুসুম কুঞ্জ-মাঝে / মৃদুল মধুর বংশি বাজে'। আসলে এই কবিতায় গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'শারদচন্দপবনমন্দ'

ইত্যাদি পদের ছন্দ, শব্দঝঙ্কার ও সুরধ্বনি ধরা পড়েছে বিদ্যাপতির প্রভাবের চেয়ে বেশি।[২১] পরবর্তী কালে ভানুসিংহের অন্যান্য কবিতায় দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের চেষ্টাকৃত যে আড়ম্বর তা থেকে মুক্ত ছিল বলেই এটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাল্যকালে অর্থ না বুঝে জয়দেবের গীত-গোবিন্দে 'শব্দ ও ছন্দগ্রন্থির' আবিষ্কারের কিশোর কবির মন যেমন হর্ষ-উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, ভানুসিংহেও অনেকটা সেই ধরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং নতুন আবিষ্কারের আনন্দ। ফলে বিদ্যাপতি-গোবিন্দ দাসের ব্রজবুলি ছাড়া জয়দেবের ছন্দের দোলাও পদগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে। 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী (৫।৮) কিংবা 'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং' (৫।১১) ইত্যাদির শ্লোক ভানু সিংহের পদে ছন্দ-সৌন্দর্যের ঝংকার তুলেছে। ধ্বনির স্পষ্ট অনুরণন আছে নবম পদটিতে —

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূণ্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষন্ন।

পাশাপাশি মেলানো যাক গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের দশম শ্লোকটি—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্।

ভানুসিংহের—

বসন্ত আওলরে
মধুকর গুণ গুণ, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওলেরে।

গ্রন্থের প্রথম পদটিতেই বিদ্যপতির —

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চমে গাওই রে।
মলয়ানিল হিমশিখরসি ধাবল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে। ইত্যাদি পদের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পদটির (হৃদয় সাধ মিশাওল হৃদয়ে/ কণ্ঠে বিলিনমালা) সঙ্গেও জয়দেবের 'চন্দনচর্চিত নীকলেবর পীতবসন বনমালী' ইত্যাদি শ্লোকের ছন্দের আদল লক্ষণীয়। পদগুলির শেষে ভানুসিংহের ভণিতা দেওয়ার ব্যাপারেও বৈষ্ণব কবিদের যথাযথ অনুসরণ

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মঞ্জরী ভাবের ভণিতা গোবিন্দ দাসের পদেই বেশি দেখা যায়; ভানুসিংহেও আছে—

নদী-মগন মহী, ভয় ডর কিছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ। (সপ্তম পদ)

বৈষ্ণব কবিদের প্রত্যক্ষ অনুকরণ-অনুসরণের দৃষ্টান্ত আর বাড়াতে চাই না।[২২] তবে একথা বলতেই হয় বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার সঙ্গে ভানুসিংহের পদের বহিরঙ্গের মিল বেশ গভীর; ওপর ওপর পড়লে উভয়ের পার্থক্য সহজে ধরাও যায় না। পদ গুলির রচনার অব্যবহিত পরেই গ্রন্থটি সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর রিপোর্টে অনেকটা এই ধরনের মন্তব্যই করেছিলেন। —"*The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better sonneter the imitator Bhanusinha Thakur, or his model the great Baisnaba poet.*[২৩]"

যেহেতু ব্রজবুলি একটা কৃত্রিম ভাষা, তাই প্রাচীন পদকর্তার ব'লে ভানুসিংহের কবিতার ভাষাকেও চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়;—একথা স্বীকার করেও পদগুলির ভাবের গভীরতা ও খাঁটিত্ব সম্পর্কে নিজেই অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রাণ-গলানো ঢালা সুর' হয়তো এতে নেই, তা হলেও ধ্বনিসৌন্দর্য, গীতঝঙ্কার, বাহ্যরূপাবয়বের উৎকর্ষে ভানুসিংহের পদাবলী সমসাময়িক কালে রচিত আর সব রবীন্দ্রকবিতার চেয়ে অনেক উঁচুদরের। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—"প্রভাতসংগীত' ও 'ছবি ও গান' কবির পরিণত কাব্যকে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান,পরবর্তীসের সাহায্যছাড়া কোনো পাঠক তাহাদিগকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহের পক্ষে পর প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, সে আপনাতে আপনি বিধৃত ও সম্পূর্ণ[২৪]।" এই নিঃসম্পর্ক "আধুনিক কবির মনোধর্মদ্যোতক" কবিতাগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহতীব্রতা অপেক্ষা 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়ে'র মত রোমান্টিক কৈশোর উচ্ছ্বাসই প্রবল। যার জন্য পদগুলি হয়েছে দীর্ঘ। বৈষ্ণবপদাবলীর 'ফেনায়িত রূপ'। ভাষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন কবি, ভানুসিংহের কবিতা মধ্যযুগের ব্রজবুলি ভাষার হুবহু অনুকরণ নয়; এক ধরনের 'ছদ্মবেশী বাঙালী বাগ্‌রীতি' তার মধ্যে সব সময়েই ছিল। 'তৃষিত নয়নে বন-পথপানে / নিরখে ব্যাকুল বালা'— এ তো খাঁটি বাংলা। কিংবা 'হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু / কাঁদিবার কো নাই'— মধ্যযুগের কোন প্রথমশ্রেণীর কবির হাত দিয়ে ব্রজবুলির এমন অদ্ভুত প্রয়োগ ঘটত কিনা সন্দেহ! বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকৃতি বলে কেউ যদি ভানুসিংহের মধ্যে বৈষ্ণবীয়তা খুঁজতে যান, তা হবে বৃথা। শশিভূষণ দাসগুপ্ত খুব সুন্দর করে বলেছেন—"ধ্বনির সহিত প্রতি ধ্বনির যে সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিতার সহিত 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সম্পর্ক তাহা হইতে কিছু বেশী নহে।"[২৫]

বস্তুত ভানুসিংহের কবিতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবণতাই ধরা পড়েছে, যেখানে পূর্বতন কবিদের অনুকরণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। আর সেই জন্যই পদগুলি নির্গুণ বা অসার্থক নয় মোটেই। হয়তো তাতে পরিমার্জনার অভাব ছিল, অপরিণত কবি স্বভাবের কাছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিতা যদি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় তবে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র শিল্পাঙ্গে আদৌ মেকিত্ব নেই, তা উচ্চাঙ্গের কাব্য—এমন স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যের সুসমালোচক।[১৮]

তা হলেও একথা স্বীকার করতেই হয় রাধাকৃষ্ণলীলার রসতত্ত্বের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ না করেও বৈষ্ণব ভাবপ্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন স্বাভাবিক প্রবণতায়। নিজের কবিকল্পনায় উপনিষদ এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের কথা বলেছেন নান প্রসঙ্গে। এখানে শুধু বলার কথা এইটুকুই বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় ভাবাদর্শকে পরিহার করে তার প্রেমভাবনার পরিশ্রুত মহিমাকেই নতুন জীবনানুভবে গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলেন তিনি—'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তার অস্ফুট সূচনা। পরবর্তীকালের রবীন্দ্র কবিতার দেহে-মনে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ যে ভাবেই হোকনা কেন, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ভাব সুর ছন্দ রূপকল্প নানা প্রকরণে মিশে যেতে পেরেছে—আজীবন শুধু সচেতন মনেই নয়, অবচেতনাতেও বৈষ্ণবভাবুকতাকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিহার করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, বৈষ্ণব কবিরা রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব''।[১৯] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে তারই মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ—

১. বুদ্ধদেব বসু ঃ সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩) পৃ. ১৫১-১৬২।

২. দ্র. জীবনস্মৃতি, 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়।

৩. প্রসঙ্গকথা, সাধনা আষাঢ় ১৩০০, পৃ.১৯৬।

৪. দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠি, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৬, পৃ. ৩০-৩১।

৫. প্রশান্ত কুমার পাল ঃ রবিজীবনী ১ম খণ্ড (২য় সং পৌষ ১৪০০) পৃ. ৮৮-৮৯ থেকে উদ্ধৃত।

৬. পরবর্তীকালে 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে 'পথহারা' কবিতায় পুনরায় 'সিঙ্গি মামার ডাক'-এর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

৭. ছেলেবেলা, রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সং) ১০ম খণ্ড পৃ. ১৩৪

৮. দ্র. দেশ ২১ বৈশাখ, ১৩৫৮ পৃ. ১১।

৯. দ্র. সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী আশ্বিন ১২৮৭, পৃ. ২৯২-৯৩।

১০. রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা, দেশ ২৯ মে ১৯৭৬, পৃ. ৩০৯।

১১. দ্র. ঈ. বী. হ্যাভেল, প্রবাসী মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ৪৯৪।

১২. শ্রাবণ ১২৮৬ পৃ. ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

১৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ. ৬৭-৬৮।

১৪. ছেলে ভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য (১৯৭১ মুদ্রণ) পৃ. ৩৫।

১৫. পদটি গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় 'আকারে ও রূপে' অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল। গ্রন্থে (১৩ নং) পদটির কয়েকটি পংক্তি বর্জিত হয়—প্রথম পংক্তিটি হল 'সজনী গো,— / শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা'। ভানুসিংহের অধিকাংশ কবিতাই প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় অনেক পদের বহু পংক্তি যেমন বর্জিত হয়েছে তেমনি পরিবর্তন সাধনও হয়েছে অনেক। দ্র. ১৩৭৬ সালের 'পাঠান্তর সংবলিত' সংস্করণ।

১৬. প্রথম প্রকাশের সময় ভানুসিংহের সবকটি পদের সুর নির্দেশিত হলেও, মাত্র ন'টি সুর এখন পাওয়া যায়। দ্র. স্বরবিতান-২১।

১৭. ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৮২ সং) পৃ. ৩০৬।

১৮. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সংখ্যার দিক থেকে মোট ২২টি। এর মধ্যে ১৩টি 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত। ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পদছিল ২১টি। আর একটি পদ (কো তুহুঁ বোলবি মোয়) পরে ১২৯২-৯৩ সালে 'প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত' হয় এবং ১২৯৩-এ 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে সংকলিত হয় সেটি। সর্বসাকুল্যে এই ২২টি পদের মধ্যে কুড়িটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্তমান থাকে— প্রথম সংস্করণ থেকে দুটি পদ ('সখিরে—পিরীত বুঝরে কে' এবং 'হম সখি দারিদ নারী') বর্জিত হয়। ১৩৭৬ সালের 'পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণে' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১ম খণ্ডে (১৯৮০ সং) সংযোজন হিসাবে পদ দুটি পুনরায় গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২২টি পদের মধ্যে আটটি পদ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়ে সরাসরি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

১৯. দ্র. ভূমিকা, কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)।

২০. জীবনস্মৃতি, ভানুসিংহের কবিতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১. দ্র. বিমান বিহারী মজুমদার ঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃ. ২২-২৩।

২২. ভানুসিংহের পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দুর্গেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। দ্র. বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর উত্তর সাধক রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী কার্তিক ১৩৬৯ পৃ. ১২-২০।

২৩. রবিজীবনী, ২য় খণ্ড (১ম সং) পৃ. ২৭৬ পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত।

২৪. রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (নবম মুদ্রণ) পৃ. ৪১।

২৫. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (পাঠান্ত সংবলিত সং ১৩৭৬) গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) পৃ. ৩১-৩৬।

২৭. বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, পৃ. ৭৩।

২৮. প্রমথনাথ বিশী ঃ রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, পৃ. ৪০-৪১।

২৯. রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক, দেশ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ পৃ. ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

নজরুলের কবিতা 'বিদ্রোহী ঃ শৈলীগত বিশ্লেষণ

অভিজিৎ মজুমদার

১.০ নজরুলের কবিতা এবং 'বিদ্রোহী' ঃ

কবির অভিপ্রায় এবং কবিতার সংগঠন — এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে এক সুগভীর যোগসূত্র। সে সম্পর্ক কখনো কবি সচেতনভাবে গড়ে তোলেন, কখনো আবার তা গড়ে ওঠে কবির অজান্তে। শৈলীবিজ্ঞানের *(Stylistics)* লক্ষ্য হলো, সম্পর্কের সেই গূঢ় বিন্যাস আবিষ্কার করা এবং সূত্রায়িত করা।

সমাজ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিম্বা ব্যক্তিগত জীবনবোধের প্রেক্ষাপটে নজরুলের কবিতার বিচার ও বিশ্লেষণে কোনো আপত্তি নেই। কারণ আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যকৃতিকে এভাবে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি স্বীকৃত এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয়ও বটে। কিন্তু এরই পাশাপাশি কবিতার শব্দময় শরীর দিয়ে কবিকে চিনে নেওয়াটাও সমান জরুরি। কবিতার বিষয় *(content)* দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যতটা প্রয়োজনীয়, গঠনের *(form)* দিক থেকে তাঁর অভিনবত্বের ধরণটি বুঝে নেওয়াও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান আলোচনায় নজরুলের বহুপঠিত এবং সমালোচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি[১] আমরা বেছে নিয়েছি। এ কবিতা অন্যান্য পরিচিত কবিতাগুলির থেকে জাতে একটু আলাদা। কবি এখানে অতিমাত্রায় সিরিয়াস, কবির মধ্যে কাজ করে এক ধরণের টেন্‌শন, তা থেকে মুক্তি পেতে কোমল ও মধুর পৃথিবীর আমন্ত্রণেও তিনি সাড়া দেন। স্মরণীয় 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ এর বিপরীত চিত্র। গোটা কবিতায় মজাদার ভঙ্গিতে সমালোচকদের আক্রমণ করতে করতে একেবারে শেষ চার স্তবকে তিনি সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। পরিবেশন-রীতির দিক থেকেও 'বিদ্রোহী' কবিতা স্বতন্ত্র। 'আমার কৈফিয়ৎ'-এর সংলাপ-প্রবণ কথ্য চাল অথবা 'সাম্যবাদী'-র 'মানুষ' কবিতার মতো নাটকীয় আখ্যানের ধাঁচ আলোচ্য কবিতাটিতে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র 'আমি'-কে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের চিত্রপরম্পরা সাজিয়ে তোলেন কবি এখানে। কাজেই এ কবিতা আগাগোড়াই আত্মকথনমূলক আঙ্গিকে গড়া।

'বিদ্রোহী' কবিতার মূল উদ্দেশ্যই হ'লো শৃঙ্খলাহীন উত্তেজনা আর উল্লাসে সমস্ত প্রতিকূলতাকে বিপরীত আবেগের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া। কবি এ কবিতায় শুধু যে ভাবের জগতেই বিদ্রোহ করেন, তা নয়, কবিতার ভাষা দিয়ে গড়া শরীরেও এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটান। কবিতার নিজস্ব গড়নেই আমরা পেয়ে যাই এক শৃঙ্খলাহীন সমগ্রতার সন্ধান। কবিতার স্তবক সংখ্যার প্রথাগত রীতি ভাঙেন কবি। স্তবকগুলি অসমান, অন্ত্যানুপ্রাসে নেই কোনো ধরাবাঁধা প্যাটার্ন।

অথচ লক্ষণীয়, 'সঞ্চিতা' সমগ্রের দ্বিতীয় কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' রচনা

ভাবের দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সমধর্মী। কবি এখানেও বাঁধনছেঁড়া বিদ্রোহের উল্লাস অনুভব করেন। কিন্তু ভাবের দিক থেকে শৃঙ্খলাহীন উত্তেজনার বাহক হলেও ভাষার দিক থেকে এ কবিতা সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। 'আজ জাগল সাগর, হাসল মরু/কাঁপ্‌ল ভূধর কানন তরু' জাতীয় সজ্জায় একই ধরণের ক্রিয়া আর বাক্যের আবর্তন এক সংযত ছন্দস্পন্দের *(rhythm)* সৃষ্টি করে। ভাব ও ভাষার এই বিপ্রতীপতা 'বিদ্রোহী' কবিতায় নেই। ভাব আর ভাষা- দু'দিক থেকেই কবির বিদ্রোহ। ফলে ভাব এবং ভাষা কবিতাটিতে সমান্তরাল পথের যাত্রী হয়ে উঠেছে।[২]

১.১ 'বিদ্রোহী' কবিতার অভিপ্রায় *(motif)* বিচার ঃ

সাহিত্য সমালোচকের সুগভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটির বিচার করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবিতার সন্দর্ভে *(discourse)* পাঁচটি মোটিফ আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথমত, সমগ্র কবিতা কবিচিত্তের চরম উত্তেজনার অনুরণন। কবিতার মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ছবি পাঠকের সামনে মেলে ধরেন কবি।

১. ক) 'আমি দুর্ব্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার' (২য় স্তবক)
খ) 'আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল' (৭ম স্তবক)

দ্বিতীয়ত, কবির অন্তরে জমাট বেঁধে থাকে এক অবরুদ্ধ আবেগ। হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে সে আবেগ কখনো কখনো পাঠকের কাছে অবারিত হতে চায়। ফলে রুদ্ধ প্রাণ আর মুক্ত আবেগের দ্বন্দ্ব কবিতার শরীর জুড়ে বিস্তারিত। উদাহরণস্বরূপ, কবির রুদ্ধ আবেগ যেমন 'আমি' সত্তার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে — 'আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস', তেমনি এই 'আমি'ই সক্রিয় হয়ে উঠে কবি-আত্মার অবরুদ্ধ অর্গল খুলে দেয় — 'আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমি-কম্প। / ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'। লক্ষণীয় কবিতার সংগঠনে ক্রিয়া-উহ্য বাক্যে রুদ্ধ আবেগ প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে আবেগের মুক্তি ঘটে। যেমন —

২. ক) 'আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি—আমি আপনার তালে নেচে যাই' — (৩য় স্তবক)
খ) 'আমি চঞ্চল,/ আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল। (৭ম স্তবক)

তৃতীয়ত, সমগ্র কবিতায় কবি যেন নিজেকে শনাক্ত করতে চান। পাঠকের কাছে নিজের আইডেনটিটি তুলে ধরার অভিলাষী তিনি। বলাবাহুল্য, কবির এই আইডেনটিটি সর্বদাই দ্বিধাবিভক্ত — কখনো কমনীয় লাবণ্যে তার পরিচয় —

৩. ক) 'আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল' (৫ম স্তবক)
খ) 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী' (৮ম স্তবক)

কখনো আবার অমঙ্গলরূপী কবিসত্তার উদ্বোধন —

৪. ক) 'আমি দাবানল — দাহ, দাহন করিব বিশ্ব' (৫ম স্তবক)
খ) 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ' (২য় স্তবক)

চতুর্থত, কঠোর, কোমল, মঙ্গল-অমঙ্গল দু'য়ের এক দ্বন্দ্ব তুলে ধরা কবির অন্যতম অভিপ্রায়, যদিও এরূপ দ্বন্দ্বকে কল্যাণময় পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে ছড়িয়ে থাকা চরণে যেমন কবির দ্বিধাবিভক্ত আত্মপরিচয় মেলে, তেমনি একই স্তবকের চরণ-বিন্যাসে এ দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ —

৫. ক) 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস' (৪র্থ স্তবক)
খ) 'আমি উত্থান, আমি পতন' (৭ম স্তবক)

বস্তুত, এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই কবির অভ্রভেদী সামগ্রিক মহিমান্বিত 'আমি'-র অনুভব।[৮]

পঞ্চমত, কবিতার নামকরণ কবির আরেক অভিপ্রায় স্পষ্ট করে তোলে; তা হ'লো প্রচলিত প্রথা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে গৌরবদীপ্ত 'আমি'-র উজ্জীবন।

৬. ক) 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' (২য় স্তবক)
খ) 'আমি মানিনাকো কোনো আইন' (২য় স্তবক)
গ) 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর'— (শেষ স্তবক)

বলা বাহুল্য, কবির এই অনুভব কবিতার গঠনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়, সে প্রশ্ন শৈলীবিজ্ঞানীর। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে বিচার করার চেষ্টা করবো, নজরুলের ভাষাশৈলীতে কীভাবে তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায়গুলির প্রতিফলন ঘটেছে।

১.২ শৈলীগত কৌশল ঃ পুনরুক্তি এবং সমান্তরতা ঃ

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির মূলধন উত্তেজনা ও আবেগ। ভাষার জগতে অনেক সময়ই যার প্রতিফলন ঘটে পুনরুক্তির *(repetition)* মাধ্যমে। ধ্বনি বা দলের *(syllable)*, শব্দ বা শব্দগুচ্ছের, এমনকি বাক্যাংশ বা পুরো বাক্যের পুনরুক্তি কাব্য বা কবিতার এক বিশেষ কৌশল। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে এধরণের পুনরুক্তি সমান্তরতার *(parallelism)* সূচক। অবশ্য যে কোনো পুনরুক্তিই সমান্তরতা পদবাচ্য নয়। পুনরুক্তি যখন সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, তখনই তাকে সমান্তরতা বলা যায়, নচেৎ পুনরুক্তি কেবলমাত্র *mechanical* বা যান্ত্রিক হিসেবে পরিগণিত হতে বাধ্য।

কবির আবেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ করতে পুনরুক্তি এবং সমান্তরতা যে একটি শৈলীগত কৌশল, তা ভাষাবিজ্ঞানী *Leech*-এর বক্তব্যে প্রমাণিত[৯] — *" By underlining rather than elaboratying the message, it presents a simple emotion with force. It may further suggest a suppressed intensity of feeling...for which there is no outlet but a repeated hammering at the confining walls of language." B.R. Lewis* তাঁর *'(reative poetry'* গ্রন্থে লিখেছেন আদিম মানুষ *"if strongly aroused and if his emotion was sustained..must have repeated...the same sequence of sounds." (Princetion Encyclopaedia of poetry and poetics: Alex Preminger [ed.], p. 529*

আপাতদৃষ্টিতে নজরুলের কবিতায় এজাতীয় পুনরুক্তির প্রাচুর্য দেখে মনে হতে পারে,

এ নিছকই কবির ভাষা-প্রয়োগরে দৈন্য। কিন্তু বাস্তবে পুনরুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কবির রুদ্ধ আবেগের সবল বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আরও লক্ষণীয়, কবি 'বিদ্রোহী' কবিতায় নিজের সত্তাকে তুলে ধরতে চান। ক্লাইভ বেলের ভাষায় *'Because I wish to be understood, I repeat myself'*,[৮] নিজের পরিচয় পাঠকের কাছে নিশ্চিত করে তোলার জন্যই পুনরুক্তি এবং সমান্তরতার প্রয়োগ ঘটে কবিতায়।

১.৩ কবিতার দ্বন্দ্ব : মিল ও অমিলের বৈপরীত্য :

'বিদ্রোহী' কবিতায় উদ্ধত আবেগের পাশাপাশি কবির মনে একধরণের দ্বন্দ্বও কাজ করে। কবিতার ভাষাতেও তার ছাপ থেকে যায়। পুনরুক্তি এবং সমান্তরতার কবিতার শরীরে এক মিলের জন্ম দেয়। ফলে কবিতা হয়ে ওঠে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিটোল। কিন্তু কবি এই সুসমঞ্জস পৃথিবীর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে চান না। মিলের প্রত্যাশা ভেঙে অমিলের প্রত্যাশাকেও তিনি গড়ে তোলেন। শৈলীগত বিচারে মিল ও অমিলের বৈপরীত্য অবশ্যই কবির মুন্সিয়ানা, যা অনেক সময়ই কবির সচেতন অথবা অবচেতন মনের প্রতিফলন। এই দ্বন্দ্বের শৈলীগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক তাই বলেন — /মিল-প্রয়োগের কলার মধ্যে একটি বিরোধিতার টানাপোড়েন চলেছে। .....প্রত্যাবর্তন যদি আসে অনিবার্যতার পথে তাহলে তার চমৎকৃতি কোথায়? ..... অপ্রত্যাশিত পথে যখন প্রত্যাশার পূরণ হয় তখনই তাকে সুন্দর মিল বলে গ্রহণ করি। ....একদিকে মিলের অবারিত আহ্বান, মধুর প্রলোভন, অন্যদিকে কবির সংযম, মিলকে শাসন।'[৯] ভাষা বিজ্ঞানী *Leech* এ কারণে বলেন, *"in any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast."*[১০]

বলা বাহুল্য, প্রত্যাশার সুসংহত বাঁধন থেকে অপ্রত্যাশায় পৌঁছনোর মধ্যে এক ধরণের বিদ্রোহ আছে। ভাবনার জগতে প্রথানুগত্যের শেকল-ছেঁড়া বিদ্রোহ ভাষার জগতকেও প্রভাবিত করে। কবি মিলের আহ্বানকে যেমন মেনে নেন, তেমনি অমিলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ ঘটান।

কাজেই উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, সমগ্র কবিতায় কবির ভাবগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় ভাষারূপে পুনরুক্তি এবং মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমান্তরতা মারফৎ।

এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার, লেখকের ভাষাপ্রয়োগে মিল-অমিলের সংবদ্ধতা এক জটিল সম্পর্কের শাসনে নিয়ন্ত্রিত। মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব, ধ্বনি, শব্দ, পদগুচ্ছ, বাক্য ও চরণের গঠন, এমনকি অর্থের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অনুশাসিত।

১.৪ ধ্বনিমিলের প্রযুক্তি এবং 'বিদ্রোহী' :

নজরুলের আলোচ্য কবিতায় ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের স্তরে মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রযুক্তিগত এক টেক্‌নিকে পরিণত হয়, তা খুঁজে বার করতে কবিতার একেবারে প্রথম স্তবকটিকে বেছে নিতে পারি। অবশ্য প্রয়োজনবোধে মূল বিষয়ের বিশদীকরনের স্বার্থে

ওই একটি স্তবক থেকে সমগ্র কবিতার সন্দর্ভের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

'বল বীর —
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর —
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!'

ধ্বনির স্তরে সমান্তরতার পরিবর্তে 'মিল' কথাটি ব্যবহার করবো আমরা। মিল বলতে অবশ্য শুধু চরণান্ত মিল নয়, সমগ্র স্তবকটির চরণাশ্রয়ী ধ্বনি ও দলের মিলকেও তা সূচিত করবে।

কবিতার প্রথম তিনটি চরণেই রয়েছে মিল, মিলের বৈচিত্র্য এবং মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব। প্রথম চরণে ব্যঞ্জন 'ব্'-এ মিল, যদিও স্বরধ্বনিতে অমিল। দ্বিতীয় চরণে বিপরীত চিত্র। ব্যঞ্জনে আদৌ মিল নেই, কিন্তু 'বল', 'উন্নত', 'মম'-র উচ্চারণে 'অ' এবং 'ও' স্বরধ্বনির বিন্যাস মিলের প্যাটার্ন গড়ে তোলে। ফলে স্বর-ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে গড়া দ্বিতীয় চরণ।

তৃতীয় চরণে মিল প্রসারিত ধ্বনি থেকে দলের স্তরে। এই একটি চরণেই মিলের বৈচিত্র্য তৈরী হয় নানা ভাবে।

প্রথমত, পদাদি দলের অনুপ্রাস ঃ 'শি'*(cv)* ধ্বনিগুচ্ছ চরণে বারবার ফিরে আসে।

দ্বিতীয়ত, পদান্ত দলের অনুপ্রাস ঃ 'রি' ধ্বনিগুচ্ছ 'নেহারি', 'আমারি' প্রভৃতি বিভিন্ন পদে পুনরাবৃত্ত হয়। 'আমারই'-র পরিবর্তে লেখায় 'আমারি' পদের ব্যবহার মিলের ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

তৃতীয়ত, ধ্বনির স্তরে একই 'র্' ধ্বনি পুনরুক্ত হয় 'শির', 'শিখর', 'হিমাদ্রির' শব্দের বিন্যাসে পদান্ত দলে। অনুরূপ পদমধ্য স্তরে আবার 'আ' এসে হাজিরা দেয় 'নেহারি', 'আমারি', 'হিমাদ্রির' প্রভৃতি শব্দে।

চতুর্থত, রুদ্ধ ও মুক্ত দলের বৈপরীত্য ঃ তৃতীয় চরণের প্রথম তিনটি পদ শেষ হয় মুক্ত দলে *(open syllable)*, কিন্তু 'কমা' চিহ্নের পর প্রতিটি পদেরই রুদ্ধ দলে *(closed syllable)* পরিসমাপ্তি (এখানে ধরে নিতে পারি, প্রথম ও দ্বিতীয় 'শির' যথাক্রমে মুক্ত ও রুদ্ধ দলের সূচক)। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে মুক্ত এবং রুদ্ধ দলের পদ পরম্পরা তৃতীয় চরণে

ফিরে এসে এক ধরণের সমান্তরতার সৃষ্টি করে।

বলাবাহুল্য, এ বৈপরীত্য সমগ্র স্তবকটির অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। প্রথম চার ও শেষ দু'চরণে রুদ্ধ দলে অন্ত্যমিল। কিন্তু মাঝের চার চরণের শেষে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়াপদে (ফাড়িঃ ছাড়ি, ভেদিয়াঃ হেদিয়া) অন্ত্যদলের 'ই' এবং 'আ'-এ সমাপ্তি মিলের প্যাটার্নে অমিলের রেশ রেখে যায়, মুক্ত ও রুদ্ধ দলে মিল-অমিলের বৈপরীত্যকে নিম্নোক্ত উপায়ে সূত্রায়িত করা যায় — রুদ্ধ$_1$ মুক্ত$_2$ মুক্ত$_2$ রুদ্ধ$_1$।

রুদ্ধ থেকে মুক্ত দলে যাবার ক্রমিক পর্যায়টিও লক্ষণীয়।

		চরণান্ত দলের অন্ত্যস্বর	চরণ
৭.	ক)	∅	১
			২
		↓	৪
	খ)	ই	৫
		↓	৬
	গ)	আ	৭
			৮

'ই' সংবৃত *(closed vowel)* স্বরধ্বনি থেকে বিবৃত *(open vowel)* 'আ'-এ সরণের মধ্য দিয়ে কবির রুদ্ধ আবেগও সহসা যেন মুক্ত হয়ে ওঠে। রুদ্ধ দলে কবির দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতিফলন, যা মুক্ত দলবর্তী ক্রিয়া মারফৎ সক্রিয় হতে চায়।

রুদ্ধ এবং মুক্ত দলের বৈপরীত্য সম্ভবত কবির অবচেতন মানস সঞ্জাত। স্মরণীয়, 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার প্রতিটি চরণ শেষ হয় রুদ্ধ দলে। কবি-অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়, শপথের দৃঢ়তা ভাষায় অনুরণিত হয় এভাবে। অন্যদিকে 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ কবি যখন হাল্কা মুডে, চরণের সমাপ্তি মুক্ত দলে। একেবারে শেষ দু'চরণ আর এগারো, বারো স্তবেকে কবি যখন সীরিয়াস, তখন রুদ্ধ দলে চরণের সমাপ্তি।

১.৫ শব্দের পুনরাবর্তন এবং অর্থবহতা ঃ

ধ্বনির মতো শব্দের স্তরেও পুনরাবর্তন ঘটেছে কাব্যে। শব্দের পুনরুক্তি মানেই ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তন, যা কবিতায় কবির আবেগের এক ধ্বনিগত অনুরণন *(echoing effect)* ঘটায়।

প্রথম স্তবকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে একই ক্রিয়াপদ 'বল' বারবার ঘুরে ফিরে আসে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরণের শুরু 'বল' দিয়ে। 'শির'-র পুনরাবৃত্তিতেও বৈচিত্র্য রয়েছে। দ্বিতীয় চরণের সমাপ্তি 'শির'-এ। তৃতীয়টির সূচনা ওই একই পদ দিয়ে। তৃতীয় চরণেও দু'বার এর ব্যবহার — স্বতন্ত্রভাবে এবং সমাসবদ্ধ শব্দের অন্ত্যপদ হিসেবে। পুনরাবৃত্তির আরও বৈচিত্র্য সমাসবদ্ধ পদে। কখনো সমাসবদ্ধ জোটের পূর্বপদ পুনরুক্ত,

কখনো আবার অন্ত্যপদের পুনরাবর্তন। উদাহরণস্বরূপ, 'মহাবিশ্ব', 'মহাকাশ' 'রাজ-রাজটীকা' জাতীয় ব্যবহারে পূর্বপদের পুনরুক্ত রূপই আবার সমাসবদ্ধ হয় মূল পদটির সঙ্গে। শব্দমিলের ক্ষেত্রে একই স্তবকে নানান্ বৈচিত্র্য, যার ফলে মিলটা ক্লিশে হয়ে ওঠেনি। মিলের এই বৈচিত্র্যকে সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে —

৮. ক) পূর্বানুবৃত্তি ঃ চরণের গোড়ায় একই পদের পুনরাবর্তন।

সূত্র ঃ (*a*....) (*a*....)

খ) চরণের অন্ত্যপদ পূর্বপদ হিসেবে পুনরুক্ত।

সূত্র ঃ (....*a*) (*a*....)

গ) সমাসবদ্ধ গঠনে পূর্বপদের মিল।

সূত্র ঃ (ab_1) (ab_2)

ঘ) সমাসবদ্ধ গঠনে অন্ত্যপদের মিল।

সূত্র ঃ (a_1b) (a_2b)

ঙ) পুনরুক্ত অংশের মূল পদের সঙ্গে সমাসবদ্ধতা।

সূত্র ঃ (a-ab_1)

চ) একই চরণে একই পদ পুনরুক্ত।

সূত্র ঃ (*a*... *a*...)

ছ) স্তবকের বিভিন্ন অংশে একই পদগুচ্ছের পুনরাবর্তন। যেমন, 'বল বীর'।

সূত্র ঃ (*ab*) ... (*ab*)

পুনরুক্তি এখানে মূলত দু'ধরণের — ক) অব্যবহিত পুনরুক্তি *(immediate repetition)* ঃ প্রথম স্তবকের সপ্তম চরণ এর উদাহরণ;

খ) দূরান্বয়ী পুনরুক্তি *(discontinuous repetition)* ঃ একই স্তবকের ভিন্ন চরণে পদ কিম্বা পদগুচ্ছের পুনরুক্তি এর দৃষ্টান্ত। যেমন - 'বল' বা 'বল বীর'।

পুনরুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের দিকে এবারে দৃষ্টি দিতে পারি, যেখানে শব্দের স্তরে মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

প্রথম স্তবকের বেশ কয়েকটি চরণে রয়েছে 'বল x' প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম চরণের বিস্তারে 'x' তিন ধরণের সংগঠন সূচিত করে। যথা —

৯. ক) x → কর্তা *(subject)* *[১ম চরণ]*

খ) x → কর্ম *(Object)* *[২য় চরণ]*

গ) x → কর্ম(বিগর্ভিত পূরক বাক্য) *(embedded complement sentence) [৫ম চরণ]*

'বল' পুনরুক্ত হ'লেও 'x'-এর বৈচিত্র্য মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে। ক্রিয়া দিয়ে সূচনা, এমন চরণগুলির তুলনা এ দ্বন্দ্বকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

বল বীর — ab_1
বল উন্নত মম শির — ab_2
বল বীর — ab_1
বল বিধাত্রীর — ab_3
(.... উঠিয়াছি....বিধাত্রীর) — - - -

'বল'-র পুনরুক্তি এবং 'ab'-র পুনরাবর্তনে যে প্যাটার্ন তৈরী হয়, তা সহসা ছিন্ন হয়ে যায় 'উঠিয়াছি' ক্রিয়ার আবির্ভাবে।

প্যাটার্ন মেনে যখন কবি চলেন, তখন কবির 'আমি' সত্তা এবং তাঁর সামনে দাঁড়ানো কাল্পনিক 'বীর' স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রূপে বিরাজ করে। প্যাটার্ন ভেঙে যায়, যখন যা অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়ার পরিবর্ত রূপে 'উঠিয়াছি' ক্রিয়াপদ কবির অভ্রভেদী অহং সত্তাকে জাগ্রত করে। লক্ষণীয়, প্রথম চার স্তবকে 'বল বীর' চরণের মাধ্যমে বীরকে আহ্বান জানালেও পরে আর ওই চরণ ব্যবহৃত নয়। একে বারে শেষ চরণেও 'বল বীর'-এর সাহায্য ছাড়াই 'আমি' সত্তা 'চির উন্নত শির' তুলে দাঁড়ায়।

শুধু প্রথম স্তবক নয়, সপ্তম স্তবকেও ধরা পড়ে মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব। এই স্তবকের শেষ আট চরণের প্রথম চারটিতে 'আমি'-র পুনরুক্তি। প্যাটার্ন ভেঙে যায় পূর্বস্থাপিত *(preposed)* 'ধরি' ক্রিয়ার ব্যবহারে। শেষ দু'চরণে আবার 'আমি'-যুক্ত বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি। 'কর্তা' ও 'ক্রিয়া' প্রয়োগের এই পরিপূরকতা কবির অবচেতনেরই প্রতিফলন। কারণ একদিকে কবির মধ্যে আইডেনটিটি প্রকাশের ব্যস্ততা, অন্যদিকে সক্রিয় হয়ে ওঠার আন্তরিক তাগিদ। সেদিক থেকে এ কবিতা যেন কর্তা-ক্রিয়া বাক্যিক সংগঠনেরই এক বিস্তার।

১.৬ বাক্যিক কৌশল এবং মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব ঃ

ধ্বনি বা শব্দের মতো বাক্যিক মিল এবং সমান্তরতা ও এ কবিতার শৈলীগত উপকরণ। বাক্যিক সমান্তরতা বলতে বুঝাবো, সমগঠন বা প্রায় সমগঠনের বাক্য বা আন্বয়িক উপাদানের পুনরাবর্তন। এ কবিতায় বাক্যিক স্তরেও মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব সমান্তরাল সমগঠন গড়ে তুলেছে। কবিতার প্রথম তিনটি চরণ তিন ধরণের সংগঠনের হদিশ দেয়।

১০. ক) ক্রিয়া-কর্তা (১ম চরণ)
খ) ক্রিয়া-কর্তা (২য় চরণ)
গ) ক্রিয়া-কর্ম (বিগর্ভিত পূরক বাক্য) (৫ম চরণ থেকে শুরু)

একই ক্রিয়ায় মিলের পাশাপাশি কর্তা, কর্ম এবং কর্মের বিন্যাসগত ভেদ তৈরী করে মিল-অমিলের বৈপরীত্য। (১০)-এর মতোই আর একটি প্যাটার্নের বৈপরীত্য লক্ষণীয়।

১১. ক) 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি' ঃ কর্ম$_1$ - ক্রিয়া$_1$
খ) 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি' ঃ কর্ম$_2$ - ক্রিয়া$_2$
গ) 'ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া' ঃ কর্ম$_3$ - ক্রিয়া$_3$

ঘ) 'খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া' ঃ কর্ম,-ক্রিয়া,

(১১)-র বিন্যাসে মিলের স্পষ্ঠ প্যাটার্ন লক্ষণীয়। (১০) এবং (১১)-র প্যাটার্নের দ্বন্দ্বটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমত, (১১)-র দৃষ্টান্তে কর্ম-ক্রিয়ার একই সংগঠন পুনরাবৃত্ত, যদিও (১০)-এর বিন্যাসে রয়েছে বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয়ত, (১০)-এর উদাহরণগুলিতে ক্রিয়া পূর্বস্থাপিত। কিন্তু (১১)-তে ক্রিয়া স্বস্থানে বিরাজমান।

তৃতীয়ত, (১০)-এর দৃষ্টান্তে একই ক্রিয়া পুনরুক্ত, (১১)-তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ক্রিয়া। (১০)-এ মিলের বিন্যাসে উপাদানের পুনরুক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু (১১)-র দৃষ্টান্তে গঠনের পুনরাবর্তন মিলের জন্য দায়ী।

(১১)-তে অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশের বিস্তারের মাধ্যমে লেখক একদিকে যেমন কর্তার আবির্ভাবকে বিলম্বিত করেন *(Crescedo effect)*, অন্যদিকে বিলম্বীকরণের মাধ্যমে কর্তার সক্রিয় ভূমিকাকে প্রমুখিত *(foregrounded)*" করেন।

বাক্যিক স্তরে ক্রিয়া-উহ্য ও ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের বৈপরীত্য কীভাবে কবিতাটিতে অর্থবহ হয়ে উঠেছে, তা আগেই জানানো হয়েছে (দ্র ১.১)। এই বৈপরীত্য আরো স্পষ্ট তৃতীয় স্তবকে — যেখানে প্রথম চরণে ক্রিয়া উহ্য, দ্বিতীয়টিতে উপস্থিত, আবার তৃতীয়টিতে তার অনুপস্থিতি। 'আছে' এবং 'নেই'-এর বৈপরীত্য সমগ্র স্তবকে স্থিতি ও গতির যেন এক দোলাচলতা গড়ে তোলে।

উপসংহার ঃ

'বিদ্রোহী' কবিতায় ভাবের জগতে যে বিদ্রোহ, তার প্রতিফলন ভাষার অবয়বেও। তাই সুসংযত প্যাটার্নের প্রত্যাশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এ কবিতা। সাহিত্য সমালোচকের মাপকাঠিতে এ কবিতায় কবির অহংসর্বস্বতা হয়তো সমালোচিত হতে পারে, যদিও শৈলীর দিকে থেকে ভাষা-শিল্পের আশ্চর্য-এক নির্মাণ 'বিদ্রোহী' কবিতা।

ঃ নির্দেশিকা ঃ

১. আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থটির উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম ঃ 'সঞ্চিতা', ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ৭ম সংস্করণ, ১৩৫৬।

২. কবিতাটির শরীরে ভাষার শৃঙ্খলা যে নেই, তা কিন্তু নয়। কবি এক ধরণের শৃঙ্খলা গড়েন, আবার তা ভেঙেও ফেলেন। সমালোচকের কথায় /কবি প্যাটার্নের আভাস দিয়ে প্রত্যাশা জাগালেন, কিন্তু অচিরে তা ভেঙে দিলেন। কবিতার রূপকে কোনো সুসমঞ্জস নিটোল আকৃতি তিনি দেবেন না"।

(দ্র. ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ 'নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প', সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১০)

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থে জানান ঃ 'অমঙ্গল ও ধ্বংসরূপী 'আমি' কোমল মধুর 'আমি' সদসতের দ্বন্দ্বে শান্তি ও কল্যাণস্রষ্টা 'আমি'—এই তিন রূপ পৃথক, আবার একই সমগ্রতার তিন দিক' (পৃ. ৯)

৪. *G.N. Leech : 'A Linguistic Guide to English Poetry', Longman, 1969, p. 79.*

৫. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ 'ভাষা সাহিত্য শৈলী', প্রমা, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬২।

৬. শিশির কুমার দাশ ঃ 'কবিতার মিল ও অমিল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪,১০।

উপরোক্ত গ্রন্থে সমান্তরতা *(parallelism)* সম্পর্কেও রয়েছে বিস্তৃত আলোচনা।

৭. *Leech*-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ঃ *p. 65*।

৮. স্মরণীয় 'ওথেলো' নাটকেও শে'পীয়ার একইভাবে *'farewell x'* জাতীয় গঠনের পুনরাবৃত্তি ঘটান এবং *'O, farewell!'* পদ ব্যবহার করে প্রত্যাশিত প্যাটার্ন ছিন্ন করেন।

৯. *Leach* পূর্বোক্ত গ্রন্থে জানান ঃ *'An apparent ...disorderliness in the maner of repetition, can also suggest spontaneity and exuberance (p. 79)*

১০. প্রমুখণ *(foregrounding)* মূলত প্রাস্ স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত অভিধা। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন — *'..deviations from linguistic or other socially accepted norms have been given the special name of 'foregrounding', which invokes the analogy of a figure seen against a background' (p.57)*

'কল্লোলযুগ' ও বাংলা কবিতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সেই পুরোনো প্রশ্ন দিয়েই শুরু করতে হয়। 'কল্লোলযুগ' এই নামটা নিয়েই এক সময়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, এই সময়কার সাহিত্য কি কেবল কল্লোল-এরই প্রেরণাতে সৃষ্টি হয়েছিল? কিংবা কল্লোলই ঐ সময়কার সব কিছু যুগলক্ষণকেই সাহিত্যে ধরতে পেরেছিল? আর কোনো পত্রপত্রিকার তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিল না?

উত্তরে বললে হয়, কল্লোল-এর লেখকগোষ্ঠী কখনো এমন দাবি করেন নি যে কল্লোল-ই যে সময়কার ধারক-বাহক ছিল, বা কল্লোল সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা দিয়েছে তা অন্য পত্রপত্রিকার লেখকরা দিতে পারেন নি। তাহলেও 'কল্লোলযুগ' কথাটা ব্যবহার করা কি ঠিক হয়েছে এমন সন্দেহ থেকেই যায়। ভূপতি চৌধুরী দিগন্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় কল্লোল গোষ্ঠীর স্মৃতিকথা রচনা করতে গিয়ে 'কল্লোলযুগ' এই নামটিই যেমন রেখেছিলেন, তেমনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও তাঁর বইটিরও নাম রেখেছিলেন 'কল্লোলযুগ'। একথা মানতেই হবে, পরবর্তীকালে পরিচয় পত্রিকা, কবিতা পত্রিকা ইত্যাদি নানা পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে-সব লেখকের আবির্ভাব হয়, কী সংখ্যায়, কী বৈচিত্র্যে সেই সব পত্রিকা-কেন্দ্রিক লেখকগোষ্ঠী অতো ব্যাপকভাবে এবং অতো সময় ধরে পরবর্তীকালে সাহিত্য চর্চায় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কি? কথাসাহিত্যে কল্লোল-এর সমকালীন বিচিত্রা ও প্রবাসীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচিত্র ও বঙ্গশ্রীর লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মূলত পরিচয়-পত্রিকার লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার এবং আরো পরেকার সতীনাথ ভাদুড়ী যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাসভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন তাতে কল্লোল-এর প্রভাব কতোটুকু বলা শক্ত, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদের পাশাপাশি শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র দীর্ঘ সময় ধরে কাব্য ও কথাসাহিত্য ধারায় এবং কথাসাহিত্য ছাড়াও অন্য গদ্য রচনায় যে বৈচিত্র্য ও বিন্যাসভঙ্গির শক্তিতে কল্লোল-এর সূচনাকে সিদ্ধিতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তাতে কল্লোল-এর গভীর ও ব্যাপক সৃষ্টি শক্তিকে 'সতত সঞ্চরমান' বললে খুব একটা অন্যায় বলা হয় না। চল্লিশের দশক এবং পঞ্চাশের দশক নতুন পত্রপত্রিকা ও নতুন লেখক গোষ্ঠীর প্রতিভা সাহিত্যে নতুন বাঁক এনেছিল নিশ্চয় এবং তাতে প্রবীণ এমনকি বৃদ্ধ কল্লোলীয়রা অবশ্যই ম্লান হয়ে আসছিলেন, তবু কারো কারো সৃষ্টি নতুন নতুন বৈচিত্র্য ও বাঁক নিয়ে পাশাপাশি থেকে গিয়েছিলেন বোধ হয়, বিশেষ করে বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র ও জীবনানন্দের কথা ভাবলে একথা অস্বীকার করা যাবে না।

২. বলা হয়ে থাকে, সময়ের বা যুগের সবচেয়ে সচেতন শিল্পী থাকেন কবিরাই। সেই সচেতনতা সময়ের ধারণায় এবং প্রকাশের অনন্যতায়। কল্লোল পর্বে যে-সব কবি এই সচেতনতার সূচিমুখে ছিলেন তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি বলার আগে পরিপ্রেক্ষিতটা একটু দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালিদের একটা অংশ শিক্ষাদীক্ষার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছে। কলকাতা ও অন্যান্য মফস্‌সল শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি টান তাদের বেড়েছে। চাকরি-বাকরি করে অল্প হলেও স্থায়ী একটা রোজগারের আশায় শহরে আসতে চাইছে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিই পল্লীবাসী ও উৎপাদন ভোগী। যারা শিক্ষাদীক্ষার জন্যে আসছে তারা গ্রাম ছেড়ে এলেও দেশের জন্যে তাদের টান থেকে গেছে। কাজেই গ্রাম-দেশের মোহ তাদের ছেড়ে যায়নি। রোজগারের জন্যে তাদের কষ্টদুঃখ বা সংগ্রাম যেমন 'বাস্তব', দেশের মাটির টান তেমনি 'রোমান্টিক'। কল্লোল-এর অধিকাংশ লেখক ও কবির পক্ষে এই 'বাস্তব' ও 'রোম্যান্টিক' দুই-ই সত্য।

যারা কোনোভাবে শহরে বিশেষ করে কলকাতায় বারো মাসের বাসিন্দা হবার উপায় করতে পেরেছে তারা শহরের ঔজ্জ্বল্য ও সুখ-সুবিধেতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে নাগরিক হবার মানসিকতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অন্যদিকে গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার অভাব-অসুবিধে ক্রমশ বাড়ছে। জমি ভাগাভাগিতে যৌথ-পরিবার ভাঙছে। আর একদিকে কলকারখানা প্রসারের ফলে অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ, বাঙালি ও অবাঙালি, ভীড় করছে শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে। বস্তি হচ্ছে, ফুটপাতের বাসিন্দা দেখা যাচ্ছে। গ্রামছাড়া মানুষের শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তির প্রয়োজন যোগাচ্ছে গ্রামের মেয়েরা। অর্থকরী চিন্তাটাও সেখানে মোটেই গৌণ নয়।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ধাক্কা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে সে ধাক্কাটা কম নয়। শিক্ষার প্রসার যেটুকু হচ্ছে, চাকরি-বাকরি তুলনায় তেমন কিছু নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ধামা চাপা দিয়েছে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের রিফর্ম (১৯১৯)। অসহযোগ আন্দোলনের উচ্ছ্বাসেও শেষ পর্যন্ত ভাঁটা পড়ল। নতুন আদর্শের আলো দেখালো রুশবিপ্লব। কিন্তু সেও তো বেশির ভাগটাই চিন্তায় চেতনায়। পুরোনো বিপ্লবপন্থীদের কেউ গেল আধ্যাত্মিকতার পথে—পণ্ডিচেরি। কারো স্বপ্ন হল মস্কো। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে জনশক্তির সংহত রূপের যে উল্লাস দেখা দেয়, তা ক্ষণিক হলেও পরবর্তীকালে দক্ষিণ বা বাম যে কোনো পন্থাতেই জনশক্তির সংহত রূপের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কোনো কবি বা শিল্পীর কাছে এই সম্ভাবনা অবশ্যই উত্তেজক।

৩. কল্লোল পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় (১৯২৩) তখন কিছু প্রবীণ ও কিছু নবীন লেখক গোষ্ঠী এই পত্রিকাতে লিখতে শুরু করেন। কল্লোল-এর সাহিত্যচর্চার যে-সব সাধারণ লক্ষণগুলোকে আমরা যুগলক্ষণ বলে মনে করি সেগুলোর মধ্যে প্রথম হল

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ'। বিদ্রোহী না হলেও রবীন্দ্র-পন্থায় চলছেন না এমন অনেক কবি-লেখক আগে থেকেই ছিলেন। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে মোহিতলাল এবং আরও পরবর্তীকালের কাজি নজরুলের কথা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার শিশুলীলার মোহময় জগৎ, অন্যদিকে, তার একেবারে বিপরীতে, নাগরিকতার কদর্যতা যা কল্লোল-এর লেখক ও কবিদের বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ('ভস্মলোচন সব সভ্যতা রুক্ষ / কল করে গিলে গায় জোয়ানের জোয়ানী......'), যতীন্দ্রনাথের কাব্যে মিথ্যার মুখোস খুলে জীবনের সত্যমূর্তিকে দেখার তৃষ্ণা, মোহিতলালের শুধু দেহবাদ নয়, মোহমুক্ত স্ববল দৃষ্টির তীব্র জীবনতৃষ্ণা, নজরুলের বিদ্রোহাত্মক ঘোষণার মধ্যে দৃঢ় মানবসত্যের ভিত্তি—সবই মিলেমিশে কল্লোল-এর কবিদের জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছিল। যা ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু বিশিষ্ট কবির স্বাতন্ত্র্য, কল্লোল-এর কবিরা তাকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন এই জন্যেই যে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড কাব্যসাধনার এক অপরিমেয় অনিবার্য প্রভাব না কাটাতে পারলে তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন না নিজের কবি-চারিত্র্য নিয়ে। এটা তাঁদের ভালোই জানা ছিল।

৪. কল্লোল গোষ্ঠী একটা খুব বড় কাজ করেছিল, যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিভার অনিবার্য তাড়নায় বঙ্গদর্শন-এর বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা-র রবীন্দ্রনাথ বা গোষ্ঠীগতভাবে ভারতীয় বেশ কিছু লেখক তা আগেই করেছিলেন নিছক বিশ্বসাহিত্য পাঠের নিরন্তর চর্চায়। কিন্তু এক আন্তর্জাতিক লেখক সমাজ-এর কল্পনায় দেশ-বিদেশের তখনকার সমস্ত অসামান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারতবর্ষের বাংলা ভাষার ছোট দরিদ্র নিঃসম্বল একটি পত্রিকা। এই চেতনাটা সম্ভবত প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বশান্তিকামী শিল্পী, কবি ও লেখকদের জোট বাঁধার বাসনা থেকেই জেগেছিল। বিশ্বশান্তি তো বটেই, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানেরও একটা ইচ্ছে জেগেছিল খুব স্পষ্টভাবেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র খুব স্পষ্ট করেই লিখেছেন, 'এ দুঃসাহসের মূলে ছিল সাহিত্যের সর্বজনীনতায় একটা গভীর আস্থা। আর যেখানেই থাক, সাহিত্যে দেশ, কাল বা জাতিভেদ বলে কিছু থাকতে পারে না এই বিশ্বাসেই 'কল্লোল' সেদিন বার্ণাড শ', রোমা রোলাঁ থেকে হামসুন, গর্কিদের কাছে ভিক্ষুকের মতো নয়, সমকক্ষের মতো প্রীতি বিনিময়ের পত্রালাপ করেছিল।' (কল্লোলের কাল, সন প্রসঙ্গ) যে বিশ্বযোগ তখন বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই আয়ত্তে, তা গোষ্ঠীগতভাবে কল্লোল-ও আয়ত্ত করতে চেয়েছিল, সাড়াও পেয়েছিল অভূতপূর্ব। আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাই স্মরণ করতে হয়, 'সমবেত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে চেয়েছে কল্লোল। 'কল্লোল' বলতে তার চেয়ে স্বল্পায়ু সঙ্গী কালি-কলমকেও একত্র বুঝতে হবে। ভিন্ন উৎস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই-এরই এক মিলিত ধারা।' 'প্রগতি'-কেও নিতে হবে। একই সময়ের একাধিক পত্রিকার লেখক অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, মনীশ ঘটক, শিবরাম ইত্যাদি তাই আলাদা। আলাদা বিশেষ করে জীবনানন্দও।

দ্বিতীয় পর্বে যে পরিপ্রেক্ষিতের খুব সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দিয়েছি তাতেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির যন্ত্রণার কথা আছে। সৃজনশীল স্রষ্টার মনে সেই যন্ত্রণাই তার শিল্পসৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও বিহ্বল ভাববিলাস'-এই সৃষ্টি তখনকার প্রধান সুর। জীবনের সার্বিক বিকাশের বিরুদ্ধে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি যেন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারই মধ্যে আবার 'সর্বশক্তিমান' এক স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব। বাইরে-মনে এই অসন্তোষে, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এই অবনিবনায়, সংগ্রাম ও নৈরাশ্যের মধ্যে দুলছিল কল্লোল-এরা ছন্দ। বলা উচিত, কল্লোল, কালি-কলম প্রগতি, বিজলী ইত্যাদি পত্রিকাকেন্দ্রিক কবি-লেখক-শিল্পীর ছন্দ-স্পন্দ। সভ্যতার সমস্ত রকম বিকার তাঁদের একই সঙ্গে ব্যথিত ও স্বপ্নময় করে তুলেছিল।

যাই হোক, আগে 'বিরুদ্ধবাদ'-এর কথাই ধরা যাক। অচিন্ত্যকুমারের যে বিখ্যাত কবিতাটিকে ('আবিষ্কার, কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬) রবীন্দ্রবিদ্বেষের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়, সেই কবিতাটিতে কোথাও কিন্তু বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের জোরালো প্রমাণ নেই, বরং আছে এক দুর্দান্ত সাহসের সাধনা যা রবীন্দ্রনাথ সামনে থাকলেও একটি যথার্থ শিল্পীর 'অহঙ্কার' হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। —

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার
> যদি পাই যদি দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী
> কারেও ডরি না কভু, সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর স্বরনি।
>
> পশ্চাতে শত্রুর শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে—মোর পথ আরো দূর।

কবিতার বাকি দুটি স্তবক অপ্রয়োজনীয় ভেবে তুলছি না, কিন্তু যা আমাদের প্রয়োজন তা এই দুটি স্তবকেই আছে। কেবল মনে হয়, অহঙ্কার থাকা দরকার, কিন্তু অহঙ্কারের মাত্রাটা একটু বেশি এই যা।

কিন্তু 'অমাবস্যা' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থটির মধ্যেও নতুনত্ব ছিল। চৌত্রিশটি কবিতা একই গঠনভঙ্গিতে স্পর্শগ্রাহ্য অটুট কাব্য দেহে 'বাস্তব' ব্যর্থ প্রেমের কবিতা তখনকার অনেক কবিকেই—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বিশী ও অন্নদাশঙ্করের মতো কবিকে মুগ্ধ করেছিল। 'অমাবস্যা'র প্রেমিকা মানসসুন্দরী বা জীবনদেবতা নয়। চোখে দেখা বুকে চাওয়া দুর্বোধ দুর্লভ মানুষ-নারী। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যে, প্রেমের কাব্যে, এই বিচ্ছেদের স্তব, শরীরী রেখায় স্পষ্ট 'তনুসঞ্চারিনী'র ঘনসান্নিধ্য ও প্রতীক্ষাব্যাকুল প্রশ্ন ক্রমশই যেন বেড়ে যাচ্ছিল অমাবস্যার পরে চন্দ্রকলার মতো :

যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন
দু'চোখে দু'চোখ পাতিয়া শুধালে : কোথা ছিলে এতদিন?

(প্রথম যখন দেখা হয়েছিল : অমাবস্যা)

বোঝা যাচ্ছিল, একই প্রশ্নের পাণ্ডুলিপি তৈরি হচ্ছিল বনলতা সেনকে ঘিরে। জীবনানন্দের চিঠিতেই প্রমাণ, অচিন্ত্যকুমারের কবিতা তিনি মন দিয়ে পড়তেন। পূরবী-মহুয়ার রবীন্দ্রনাথও তো একই সময়ে নায়িকাদের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দেখতে শুরু করেছিলেন। এমনকি নায়িকাদের নানা বৈচিত্র্যে 'নাম্নী' করেও তুলছিলেন। কল্লোল-এর কবিরা আবার প্রেমিকার মধ্যে অপরিচিত অগাধ জীবনের স্বাদ চাইছিলেন, চাইছিলেন অরণ্যের চঞ্চল মর্মর লাবণ্য। তাই বলে ঘরের সীমায় সংসারিণীকে দেখালেও তাঁদের বড় কম আগ্রহ ছিল না। মনে পড়বে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছাদে যেও নাকো' কবিতার একটি লাইন : 'কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।' কিংবা অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র 'এত বড় এ নিখিলে' কবিতার দুটি লাইন : 'মেঘের আড়ালে রামধনু দেখ—ধরা দিতে অবনত / মনে হয় যেন তোমার খোঁপায় লাল ফিতাটির মতো।'

কিন্তু দেহবাদ, যেটা ছিল মোহিতলালের বলিষ্ঠ জীবনতৃষ্ণার একটা প্রধান অঙ্গ, কল্লোল-প্রগতি কালি-কলমের একাধিক কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে তা তীব্রভাবেই মিশে ছিল। বিশেষভাবে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, শিবরাম কিংবা মনীশ ঘটকের মধ্যে এই শরীরী ইন্দ্রিয়ময় তৃষ্ণা খুব গাঢ়ভাবেই ফুটে উঠেছিল। পূরবী-মহুয়ার কবিকে এ ব্যাপারে কল্লোল-যুগের কবিরা অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাবার দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

ক. তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি।
দেহের ধূপতি হতে জ্বলে ওঠে বাসনার ধুয়া
লেলিহ রসনা, তবু কালো চোখে কোমল করুণা।

('প্রিয়া ও পৃথিবী' : অচিন্ত্যকুমার)

খ. এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহ-মদা পান করি

('মোহমুক্ত' : বুদ্ধদেব)

গ. যে অরূপ বন্দী হোলো সুন্দর তনুতে
তারে আমি বেসেছিনু, চেয়েছিনু ছুঁতে,
চুমিতে চেয়েছি।

('আমি যে তোমারে ভালোবাসি', চুম্বন, শিবরাম)

৫. কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতির কবির দৃষ্টিতে আর একটি ঝোঁক দেখা যায় সভ্যতার গ্লানিবোধে। এই গ্লানিবোধে খানিকটা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আমাদের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—সামগ্রিক দুর্গতির ফল, খানিকটা গণ-সচেতনতা—যাতে এক

শ্রেণীর ভোগ-বিলাসের বৈপরীত্যে পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষের অমানুষিক অভুক্ত, কদর্য বিকৃত জীবন যাপনের চেতনা, ন্যূনতম স্বাভাবিক ভোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের হতাশা, অবিচ্ছিন্নভাবে শোষিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতি তীব্র সহানুভূতি ইত্যাদি চেতনা কল্লোল-যুগের কবিদের বিদীর্ণ করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে এমন চিন্তা পূর্ববর্তী কবিদের করে কাব্যে যে পাওয়া যাবে না তা নয় কিন্তু এই সময়ের কাব্যচর্চায় এটি একটি সাধারণ লক্ষণ বলেই মনে হয়। আবার এই 'নিষ্করুণ' সভ্যতার গভীর ব্যাপক দুঃখ চেতনার মধ্য দিয়েই আসে আরণ্যক উল্লাসের আহ্বান, 'স্বপ্ন-ময়ূর' ডানা মেলে উড়তে থাকে।

ক. নশ্বর মৃত্তিকা দেহে
জর্জর তৃষিত দীন যত নরনারী,
ধূলার মলিন অঙ্কে ধূলিমম শেয়ে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা, ক্রন্দন,
প্রতি রুদ্ধ দিবস-রাত্রির ঘূর্ণিত জীবনযাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমারে অর্পিনু আজি নহ জীবন-বিধাতা আমার।
('নমস্কার', বিজলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

খ. যাহারা না পেয়ে প্রেম ব্যভিচারী সেজেছে পিশাচ
মণির বিহনে যারা জুড়াইল কামনার কাচ
নিদ্রাহীন রাত্রি দাগি নেত্রে যারা নিরাশ্বাস ভরি'
স্তব্ধ এক জ্যোৎস্নারাত্রে চলে গেল আত্মহত্যা করি।
পঙ্কিল কদর্য রোগে পঙ্গু হল যারা
অপ্রচুর প্রাণ নিয়ে যারা তৃপ্তিহারা
তাদের বুকের রক্ত—যারা ব্যর্থকাম
মনোরথ-প্রিয়তমা, আমাদের মিলনের দাম।
(বাসর রাত্রি, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, দ্র. পূর্ববর্তী কবিতা)

এরই বৈপরীত্যে, হয়তো বা এই সার্বিক ব্যর্থতারোধের গ্লানি ভুলতেই উদ্দাম প্রেমের উল্লাস, সভ্যতার নামে যা ছিল বর্বরের অধিকার-প্রমত্ততার যুগ, কিংবা, এখনও যা টিকে

আছে দূর পলিনেশিয়া অঞ্চলে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা অক্লেশে বিলুপ্ত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হেইডি হাইডি হাই / অরণ্য ডাকে ওই যাই', কিংবা কালি-কলমে প্রকাশিত জীবনানন্দের 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার' কবিতার 'কোন্ সুদূরের তুরানী-প্রিয়ার তরে / বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে' অবশ্যই মনে পড়বে।

দারিদ্র্যের ব্যাপক জ্বালা স্বপ্নকে, স্বপ্ন-বাসরকে যেমন মিথ্যে করে দেয়, তেমনি আবার দারিদ্র্য-কে নিয়ে গর্ব বোধও আছে, তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের সমস্তরে নেমে আমার ঘোষণা আছে, কামার-কাঁসারি-ছুতোর মুটে মজুরের কবি হবার তীব্র চেতনাও আছে। মহাসাগরের নামহীন কূলে হতভাগাদের বন্দরে যারা আশ্রয় নিচ্ছে সেই আশ্রয়-নীড়টি যেন কবির সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূরবী-র 'তপোভঙ্গ' ঘটেছে অন্য কারণে :

> একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী
> লীলাঞ্চলে—
> মনে জানি পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত
> বাতায়ন তলে;
> সতীর্থের হৃদ্‌পদ্মে গন্ধরূপে ক্ষণিক স্মৃতি-স্বপ্ন—
> জানি, তাও ঝুট!
>
> ('আর কিছু নাহি সাধ', পৃথিবীর প্রতি, বুদ্ধদেব বসু)

যদিও, মনে রাখতে হবে, বুদ্ধদেবের এই তির্যক রবীন্দ্র-পর্যবেক্ষণ আগে বন্দীর বন্দনা-তে ছিল না, পরেও নেই। পরিপ্রেক্ষিতের সাময়িক নৈরাশ্য বা বিষণ্ণতা থেকেই এই আশাভঙ্গ ঘটেছিল। পরে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশেষ করে বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রোম্যান্টিকতাকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা বেড়েছিল, পরিপ্রেক্ষিত আরও জটিল হয়ে আসছিল বলে।

মানবতার এই খণ্ডিত রূপের বোধে বিধাতার প্রতি যেমন অভিমান আছে, অভিশপ্ত জীবনকে উপকরণ করেই যেমন বিধাতার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন আছে, তেমনি আবার মানুষের সহযাত্রী বিধাতাকে মানবতার অনন্ত সম্ভাবনার বীজ-প্রেরণা হিসেবেও দেখার চেষ্টা আছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'মানুষ' কবিতা সংকলনের 'বিধাতার চেয়ে বড়ো' কবিতায় দেখি —

> মানুষ যখন পথ চলে
> বিধাতা, দাঁড়ায়ে রহে ব্যগ্র কুতূহলে
> প্রাণে প্রাণে বহে তার হাত রাখি হাতে—
> 'এই পথ-সমাপ্তি-উৎসবে
> আমি পূর্ণ হবো, বন্ধু, তুমি পূর্ণ হবে।

এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও মোর চেয়ে।

৬. কিন্তু কল্লোল - কালি-কলম, প্রগতি ইত্যাদি পত্রিকার সবচেয়ে বড় 'আবিষ্কার' বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেছিলেন জীবনানন্দ ও শৈলজানন্দের নাম। কবিতায় জীবনানন্দ আর কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ। ওই যুগের কবিদের রবীন্দ্র-উত্তরণের চেষ্টা, রোম্যান্টিক স্বপ্ন, ব্যর্থতা, গ্লানিবোধ, আদিম উল্লাস সবই জীবনানন্দের মধ্যে ছিল, ভাষা-প্রকাশেও নৈকট্য ছিল। কিন্তু এমন এক অনুভবের প্রকাশ ঘটেছিল 'প্রগতি'তে প্রকাশিত (ভাদ্র ১৩৩৬) 'বোধ' কবিতাটিতে যা এই মুহূর্তেও আমাদের কাছে পরম আবিষ্কারের রোমাঞ্চ হয়ে আছে।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।

এই বোধের তাড়নায় কোনো অবসাদ নেই, শান্তি নেই, ঘুম নেই, নিছক শুয়ে থাকার স্বাদ নেই। মানুষ, মানুষী, শিশুদের মুখ দেখে আলোকিত হবারও কোনো উৎসাহ নেই। এই বোধই বাইরের সমস্ত রকম প্রাপ্তি ও সাচ্ছল্যকে যেন গ্রাহ্যই করে না। পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কাব্যে সভ্যতার অগ্রগতিকে অনেক মনীষার জয়ধ্বনি শোনা গেছে, কিন্তু এই বোধের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ তিনি পান নি। শতাব্দীর শেষেও আমাকে কাব্যচর্চায় মাঝে মাঝে এই বোধের তাড়না এসেছে। বোধ হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চাতেই তার স্পষ্ট ছায়া থেকে গেছে।

কল্লোল - কালি-কলম - প্রগতি - বিজলী ইত্যাদি পত্রিকার সামগ্রিক সাহিত্যচর্চা মিলিয়েই কল্লোলযুগ। এই যুগের কবিতা চর্চা আমাদের দেখিয়েছে কবির স্বাতন্ত্র্যের দুঃখসাহস, যে দুঃসাহসের মাঝে নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড কীর্তিতে শ্রদ্ধা রেখেও এগোতে হয়। চিনিয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সভ্যতার বৈনাশিক মূর্তি, সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মসর্বস্ব শোষণ-ক্রিয়া, বঞ্চিত মানুষের হাহাকার ও ধিক্কার, দুর্গতির মধ্যে বিধাতাকে ধিক্কার কিংবা সহযাত্রী হিসেবে বিধাতার কাছ থেকে বিধাতার চেয়েও বড় হবার শুভেচ্ছা আদায়। দেখিয়েছে সভ্যতার ইতিহাস থেকে নতুন 'বোধের' আবিষ্কার, ভাষায় শব্দগ্রহণে সংস্কারমুক্ত হবার চেষ্টা, প্রচলিত ছন্দের নির্দিষ্ট প্যাটার্নের বাইরে গদ্যের চাল দিয়ে আসা। এ সবই কবিতাকে একদিকে যেমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তেমনি পারিপার্শ্বিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ-সচেতন করে তুলেছে। কবিতায় স্বপ্ন-বাস্তব ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ যেমন পাশাপাশি সহাবস্থান করছে তেমনি গভীর বোধের জটিলতায় আঘাত দেবার ভাষাও খুঁজে নিচ্ছেন কোনো কোনো কবি, বিশেষ করে জীবনানন্দ।

ইতিহাসের মুখোমুখি ঃ যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি প্রতিভা তখন মধ্যগগনে। বাঙালীর কাব্য ঐতিহ্য রস ও রূপের তুঙ্গে পৌছেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। কবির আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের কাজও সম্পূর্ণ। সাফল্যে আর আত্মনির্ভরতায় কবি একেবারে টগবগ করছেন। প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবে শান্তিনিকেতন তখন একেবারে চাঁদের হাট। সেরা পরিসংখ্যানবিদ, পণ্ডিত আধুনিক কবি, খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী, গায়ক-গায়িকা সবার সম্মিলনক্ষেত্র শান্তিনিকেতন, তার ওপর বিদেশী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ত যাতায়াত। বিশ্বব্যাপী সৃজন ও মনন ধারা প্রতি মুহূর্তে অভিসিঞ্চিত করছে রবীন্দ্রনাথের মনকে। এমনই সময় বীণায় বেজে উঠল পাল্টা সুর।

শুধু সাহিত্য চর্চায় নয়, হিন্দু জাতীয়তার সাধন যজ্ঞের ঋত্বিকও তিনি। তাঁর স্বদেশী গান উজ্জীবিত করে তুলছে তরুণ-তরুণীর প্রাণকে। রাখী বন্ধন উৎসবে রাজপথে যৌবন জলতরঙ্গ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাজনৈতিক মঞ্চেও সাদর আহ্বান আসছে তাঁর। এই পরিপূর্ণ রবীন্দ্রায়নের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। প্রথমে বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদেরা পরে প্রতিষ্ঠাকামী কবি-সাহিত্যিকদের গোষ্ঠী। লক্ষণীয়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর তোপ দাগলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল ইত্যাদির মতো রাজনীতিকেরা, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অধ্যাপক আর বিলাত প্রত্যাগত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁদের সরব সম্প্রচারে শালীনতা ও শ্লীলতা নিয়ে 'গেল গেল' রব উঠল। বিচার্য—সত্যই কি সাহিত্য-শিল্পে এমন কোন crisis ছিল? আর এই বিষয়টির 'ব্রীফ' ধরেছেন• সেই সব ব্যক্তি, অভ্যাসে-অনুশীলনে-বোধে শিল্পের গভীর প্রদেশে যাঁদের যাতায়াত নেই। গানে-নাটকে সাহিত্যজীবী দ্বিজেন্দ্রলালও তো বাইরের ফেনিয়ে তোলা আবেগেই ভেসে বেড়িয়েছেন। তবে শিল্পের তলদেশে এঁরা নামার সুযোগ পেলেন কোথায়! স্পষ্টতই মনে হয়, এ হলো এক ছুতো। পুনরুজ্জীবিত হিন্দু জাতীয়তার পক্ষে শান্তিনিকেতন সমেত রবীন্দ্রনাথের ভাব বিস্তারকেব্রাহ্ম-সম্প্রসার মনে করে ভীতিজ্ঞান বশতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যকে যেকোন অজুহাতে এঁরা প্রত্যাঘাত হানার চেষ্টা করছিলেন। বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল এবং ডি. এল. রায় সম্বন্ধে একথা ভীষণ ভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও ইতিহাস যে কখনোই এঁদের হাতে ন্যস্ত করেনি তা অনায়াসেই বোঝা যায়।

কবি সাহিত্যিকের দল যে এই ধুয়োর সঙ্গে সুর মেশালেন তার কারণ অবশ্যই স্বতন্ত্র। আত্ম প্রকাশ চিন্তায় এঁরা একটা সঙ্কটের কবলে পড়লেন। এই পরিস্থিতির খানিকটা অংশ ইতিহাসের, বাকীটা এঁদের মানসিক ব্যাপার। জীবনের সর্ব অনুভবেই জুড়ে থাকা রাবীন্দ্রিক বিপুলতা এঁদের কাছে বোঝা বা প্রতিবন্ধক বলে মনে হলো। তাই ঐতিহ্যের পরমা

প্রতিমাকে অস্বীকার করতে না পেরে পাশে নালা কাটার কাজ এঁরা শুরু করলেন। বিশ্বযুদ্ধ এই সুযোগটুকু করে দিল অনায়াসেই। কল্যাণ, সত্য, মানবতার শ্রেয় ও প্রেয় ভাবরূপ আণব-অস্ত্রের আঘাতে যখন পর্যুদস্ত হলো, তখনই এই সুরের বাজনা দ্বিগুণ উৎসাহে বাজতে শুরু করলো। বিকল্প কিছু গড়ার সামর্থ্য নেই, অতএব এই ঐতিহাসিক নেতিবাচকতাকে কাজে লাগাও, বলতে থাকো রবীন্দ্র-ঐতিহ্য-নির্মাণের সবটাই অকারণ পণ্ডশ্রম। রবীন্দ্র বিরোধীদের আক্রমণের এই সীমাবদ্ধতাকে মানতেই হবে।

এবার প্রশ্ন ঃ (১) বিশ্বযুদ্ধ যদি না ঘটতো, (২) শান্তিনিকেতন যদি প্রাতিষ্ঠানিক আভিজাত্যে না পৌঁছতো, তাহলে রবীন্দ্র বিরোধিতা প্রায়-আন্দোলনের চেহারা পেত কি না। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা তুলি। রাজনীতিকরা বিশিষ্ট হয়ে ওঠার জন্য সব সময়ই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাকে তাঁদের সহজ রাস্তা হিসাবে বেছে নেন। এটাও অনেকটা তাই। বিশ্বযুদ্ধ না ঘটলে রবীন্দ্র-নির্মাণের মাঙ্গলিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগতো না। এবং শান্তিনিকেতনের সংহত প্রচার-গ্যারান্টি রবীন্দ্র সাহিত্যে না থাকলে একটা কায়েমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে জিগিয়ে তোলা সম্ভব হতো না।

যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল রবীন্দ্র বিরুদ্ধতার শানিত জোড়া ফলা। এঁদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সম্প্রচার মূল্য অসাধারণ। মানতেই হবে, একটা 'টেনশন' বা উত্তেজক ক্রিয়া এঁদের রচনা কর্মকে ঘিরে রয়েছে। এঁদের কাব্য কলার উচ্চকিত ভাবটাই তাই প্রধান। এই complain বা সম্প্রচারের ঐতিহাসিক মূল্য একালে অবশ্যই বিচার্য্য। আরও বিচার্য্য, এঁদের প্রতিবাদ প্রতিজ্ঞার কালের দামই বা কতটুকু। তৃতীয়ত বিচার্য্য, এঁদের প্রতিবাদ আংশিক না সম্পূর্ণাঙ্গ। নতুন ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন যদি করতেই হয় তবে ভাব ও পাঠ ভাষা সমেত কাব্য দেহের নতুন বিকল্প তৈরী করতে হবে। যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের লক্ষ্যে সমতা থাকলেও এঁদের অবস্থানে আলাদা বিশিষ্টতা রয়েছে। যতীন্দ্রনাথের আক্রমণ কার্যত এক লড়াই-এরই mockery। রবীন্দ্র চর্চিত প্রেম, প্রকৃতি, বিশ্ববোধ, কল্যাণ ধর্ম এবং সৌন্দর্য চেতনার বিরুদ্ধে তাঁর ধরে ধরে আক্রমণ। আক্রমণের ধরন চোখালো, যুক্তি তর্কের অবকাশ না রেখেই একেবারে বিষয়ের ওপর ফেটে পড়া। অনেকটা 'সুইসাইড-স্কোয়াডে'র এসপার-ওসপার ভঙ্গিমার মতো। রবীন্দ্রভাব বিলসনের অলসতার মধ্যে এই কটু কথার স্বাদ মুখ বদলের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মূল্যে এঁর কবিতার সজীবতা ধর্ম একেবারে অমোঘ।

মোহিতলাল কিন্তু এই ভঙ্গিমায় এগোননি। রবীন্দ্র ভাবমূর্তিকে চোখের সামনে রেখে তার রঙ-রাঙতা খসানোর দায় তিনি নেননি। তাঁর আক্রমণ আরো গভীরশায়ী। যে সুপটু অধ্যাত্ম-বাতাবরণ রবীন্দ্রনাথ গড়ে দিয়েছেন, দেহাতীত প্রেম আর মৃত্যুর মোহনমূর্তি রচনার বিভ্রম জাল তৈরী করেছেন, মোহিতলাল তাঁর সারহীনতাকেই প্রকট করতে চেয়েছেন। গোবিন্দ দাসের ভোগবাদী ধারাকে ফিরিয়ে এনে দেহ, রূপ এবং তজ্জনিত ভোগলীলার অবাধ অনুশীলনে তিনি স্তব্ধ করতে চেয়েছেন মৃত্যুর চোরা আক্রমণকে। দুঃখকে অতিক্রম করার জন্য মায়াবাদী পথকে সরাসরি অস্বীকার করে এক শ্মশানিক

ধারণার বিরুদ্ধে নয়, তিনি বিকল্প এক দর্শনের প্রবক্তা। যদিও যতীন্দ্রনাথের মতোই আত্ম প্রশ্নটি তাঁর সম্বন্ধেও করা যায়। এই কোমর বাঁধা আক্রমণের স্থায়িত্ব কতটুকু! এক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-বাণী অমোঘ। আধুনিকতা সাহিত্য বাহিত। একটা ধারার নাম হলে তার কাছে বরং কিছু প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে সচকিত আক্রমণ গড়ে তুলেও শেষ পর্যন্ত একই ভাব-পর্যবসানে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে কি বোঝাতে চাইলেন? তাঁদের প্রতিরোধ আক্রমণ কি প্রকট করে দিয়ে গেল না এই সত্যকে, অটল অভ্রংলিহ রবীন্দ্র সাহিত্যের বিকল্প গড়া সুদূর পরাহত ব্যাপার!

যতীন্দ্রনাথে তো কেবলই **negation**, তাঁর ঘুমিওপ্যাথি তো এক বানানো পলায়নী ব্যবস্থা। দুঃখের দৃষ্টান্তগুলিকে ভাবানুভূতির সামনে প্যারেড করালেই কি সংক্রমণের মুখ বন্ধ হবে! পাঁচীর ছেলের মরনার্তনাদ বা গোবি-সাহারার বুকে মেঘ ঘনিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি চাইলেই কি বর্ষার প্রাকৃতিক প্রভাবকে এড়ানো যাবে! যতীন্দ্র কাব্যের এই **mannerism** বেশ মুখরোচক হলেও একে মহিমা দানের কোন ভাঁওতা যতীন্দ্রনাথে কিন্তু নেই। তিনি কি পারেন আর কি পারেন না এ নিয়ে তাঁর নিজের সংশয় একেবারেই ছিল না। তাই আপাত দৃষ্টিতে **posing** থাকলেও তা ঘোষিত ক্রিয়াকর্মেরই অংশ। একটা উল্টোমুখী হাঁটার প্রতিজ্ঞায় ইঞ্জিনীয়ার কবি কিছু একটা দেখতে চেয়েছিলেন। সে নিশ্চয়ই প্রশান্তি বা সমস্যা মোচনের কোন দাওয়াই নয়। ভাবুন না, অবরুদ্ধতার মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথও আরব-বেদুইন হবার যে স্বপ্ন দেখেন তা অলীকই, তবু তাতে আত্ম বেদনার একটা উপশম হয়তো আছে। কিন্তু যিনি বাংলাদেশের সজল শ্যামলিমা ছেড়ে মরুদেশেই পরিক্রমা করেন, তাঁর অবস্থা যে পাতের ভাত ভুঁয়ে ফেলার মতোই। তাঁকে তৃষ্ণার দাহে দ্রুত সজল মেঘের কাছেই ফিরতে হবে। উৎকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়ার এই চাক্ষুস অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন আড়াল নেই যতীন্দ্র-কবিতায়। কাজেই আধুনিকতার খাল কাটা বোধহয় যতীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মোহিতলাল বরং ধারায় প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও স্থিতধী, সপ্রতিভ। তিনিও সাড়ম্বরে করোটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভোগবাসনার ঘোষিত চর্চায় নেমে ছিলেন। দেহ-দেবতার মন্দির স্থাপনা ছিল তার কাজ। বিস্মরণীর প্রবল ভোগোৎসারের পর স্মরজিৎকে গরল বলেই মনে হতে শুরু হয়েছিল স্মরগরল কাব্যে। তখন নিজেকে দেহী বলার জিদ না ছেড়েও অরতির চর্চা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। হেমন্ত-গোধূলি যে তাঁকে ক্রমেই স্মৃতি জর্জরিত করে ফেলছিল তাও আমাদের অভিজ্ঞতা। তথাপি মোহিতলালের কাব্যানুশীলনে আসন্ন আধুনিকতার একটা পথ রেখা পাওয়া যায়। আক্রমণের **strategy** হলো, একই সঙ্গে বহু শত্রুর সঙ্গে লড়তে নেই। যতীন্দ্রনাথের মতো আক্রমণকে বিষয়ান্তরে বিপুল উৎসাহে ছড়িয়ে ফেলে শক্তিক্ষয় করেননি মোহিতলাল। একটি কেন্দ্রিত লক্ষ্য পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন তিনি। এতে সংশয়-স্ববিরোধে কখনো কখনো আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর চলা একবারের জন্য থামেনি। শোপেন হাওয়ারকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে নচিকেতার

করেও তার দর্শনের সারবত্তাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই রকম, ভারতীয় দর্শনের জৈব জীবনকে অস্বীকার করার আহ্বানের তিনি পরিপন্থী, কিন্তু মৃত্যুর অবিনাশী রূপের কাছে তাঁর নত হবার ভঙ্গিমাটি তাঁর ভালো লাগে। বিষয়-দর্শনের এই ভাবনায় আধুনিক চিন্তার কিছু ছাপ আছে।

মোহিতলাল আর এক অংশে অগ্রসর। সযত্ন কাব্য দেহ নির্মাণ এবং কবি ভাষা সম্বন্ধে একটা ক্ল্যাসিক উত্তরাধিকারকে তিনি মান্য করেছেন। মধুসূদন থেকে মোহিতলাল ছুঁয়ে সুধীন্দ্রনাথে ঐতিহ্যের একটি স্পষ্ট স্রোতরেখা পাওয়া যায়। বাচনিক স্বভাবে যতীন্দ্রনাথও কাব্য সংস্কারের বাইরে আছেন এমন নয়। উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের ঘেরাটোপ ভেঙে যতোটা পারা যায় প্রত্যক্ষ অর্থ শাসনে তিনি শব্দরাজিকে বাঁধতে চেয়েছেন। মোলায়েম বা ললিত শব্দের মায়া তাঁকে ঘিরতে পারেনি। তবুও মোহিতলালে শব্দবিন্যাস, চরণ-সজ্জা ও স্তবক-গঠনের একটা ঋজু চেহারা পাওয়া যায়। ভাবকে অতিক্রমী হয়ে উঠতে দিয়ে অর্থকে খোয়ানোর ইচ্ছা তাঁর একেবারেই ছিল না। শুধু যতি নয়, ছেদের চিহ্নে অভিপ্রায়কে চেহারা দেবার একটা পদ্ধতি তার কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। এক সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পদ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত গদ্য-ছন্দে এভাবে বাঁধতে পারেননি।

মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ মিলে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা পৌরুষ গুণকে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পৌরুষধর্ম আধুনিকদের আরও সাহসিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। শুধু আবেগের দৃপ্ততায় যদি কাজ হতো তাহলে নজরুল ইতিহাসের পথচিহ্ন কাটায় আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন। কবিতা যে বক্তব্য বাহী মুটের কাজ করে না, অভিপ্রায় ও ভাষা নিয়ে তাকে সমর্থদেহী একটি জীবন্ত শরীর হয়ে উঠতে হয়, একথা অমান্য করার সময় আজও আসেনি। কবিতাও যদি তার সুঠাম বর তনু নিয়ে চলে ফিরে বেড়ায়, তবেই না আমাদের তৃপ্তি! নজরুলের কবিতা নিঃসন্দেহে আমাদের ভাবায়, অমোঘ শব্দাঘাতে আমাদের স্নায়ুকম্পন সৃষ্টি করে। কিন্তু তার আমেজ বা রেশ বেশীক্ষণ থাকে না। যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালে বক্তব্য ছাড়াও কাব্যের অঙ্গসজ্জা আরও অনেকক্ষণ আমাদের মনে জাগরূক থাকে।

আর একটি কথা। দুই কবির ক্ষেত্রেই কাব্য-বিবর্তন আমাদের বোঝায়, আমাদের অধ্যাত্মমুখী ধাতু প্রকৃতিকে অমান্য করার ক্ষমতা আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। জন্মান্তর, পরলোক, অনৈসর্গিক ক্ষমতায় বিশ্বাস আমাদের মনে পুরু পলির আস্তরণ জমিয়ে তুলেছে। আমাদের সাহিত্য ঠারে ঠোরে সেই পলিজাত ফসলই। ছাপমারা বস্তু তান্ত্রিকরাই যখন সংস্কার ও ঐতিহ্য ধারার মানরক্ষা করার জন্য অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে কৌশলগত ভাবে আপোষ-সমঝোতা করেন, সেখানে আলোচ্য কবিদ্বয় তা থেকে রেহাই পাবেন কোন জোরে! কি করব, যে চালকে কিছুতেই বদলানো যাচ্ছে না তার বাইরে থাকা তো ইতিহাসের সঙ্গ ছাড়া, অতএব বলছি—এবং দেখছি—কিন্তু সম্পৃক্ত নয়, এই লজিক বোধ হয় শতকরা নিরানব্বই জনের।

এসব কিছু সত্ত্বেও দুই কবি দারুণ ভাবে জনপ্রিয়। যতীন্দ্রনাথ Calchy শব্দ তৈরী করে প্রায় প্রবচনের মতো উচ্চারিত হচ্ছেন মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে। "বৌবাজারের মোড়ে / যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস থোড়ে", "প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি", "তুমি শালগ্রাম শিলা; / শোয়া বসা যায় সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যক্ষবাদী চাঁচালো শব্দের জোরে আমাদের ভাবাবিষ্টতায় বস্তুতন্ত্রের আঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে এসব ক্ষেত্রের মধ্যবিত্ত গৃহী বাঙালীর অভ্যাসের মধ্যেই আছে, বস্তু তন্ত্রের একটা হাল্কা ফ্যাশনেবল চাদরকে গায়ে জড়িয়ে রাখা। অক্ষম, প্রতিরোধহীন অসহায় মধ্যবিত্তের কাছে এসব অভিজ্ঞতা ক্ষণিকের 'মুখ চার'। নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল পড়ার পরে স্নায়ুতরঙ্গ কিছুক্ষণ কম্পিত হওয়া—এই আর কি! এসব প্রতিক্রিয়ার জের কতদূর পড়ালো, কি তার ভবিষ্যৎ এসব ভাবার মতো সময় কোথায় মধ্যবিত্ত মানুষের। একই ভাবে মোহিতলালও মধ্যবিত্ত ইচ্ছাকে আর এক দিক থেকে লালন করে জনপ্রিয় হয়েছেন। প্যাসন-বিবর্জিত কল্পনার মৌন মহিমা গৃহী মধ্যবিত্তের কাছে দীর্ঘদিন ভালোলাগার কথা নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের বরান্দে দীর্ঘকালের নিরামিষ ভোজনে আমাদের তৃপ্তি নাই ঘটতে পারে। সে জায়গায় নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে মোহিতলালের প্যাশন 'টনিকের' কাজ করেছে। পান্থ, স্পর্শরসিক, মোহ মুদ্গরের অনিবার্য ভোগোত্তেজনায় মন সাড়া দেয় না বলি কি করে। লক্ষ্য করবেন, উভয়ের ক্ষেত্রেই এঁদের কাব্যজীবনের প্রথমার্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমরা নড়ে চড়ে বসি এবং উত্তরার্ধে তাঁদের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসাটা আমাদের কাছে হতাশা ব্যঞ্জক বলেই মনে হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতা ঃ উৎস ও বিবর্তন

গৌরিকা ঘোষ

জীবনের বিচিত্র উপকরণ যখন কবির আত্ম-উপলব্দির আলোকে রূপ ও ভাবের সু-সম অন্বয়ে আপনাকে নিত্যকালীন রস-বস্তুতে পরিণত করে তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যা একটি বিশেষ মানুষের বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি, কবিতা হ'য়ে তা পৌঁছে যায় নিত্যকালের দরবারে। নিত্যতা তাই কবিতার প্রাণধর্ম।

কিন্তু সময়ের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। সময়ের রূপান্তরে যে ভাষা বদলায় কালের সেই অমোঘ ভাষা কথা বলে শিল্পীর সৃষ্টিকলায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমজানীতির জগতে ঘটেছিল চিন্তা ও মননের বিস্ফোরণ এবং বিশ্বযুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়েছিল বিশ্বমানব ও বিশ্ব-সভ্যতার ভিত্তিভূমি। যুগের এই নতুন ভাষা পাঠ করে কবিদের অন্তরে জেগেছে নতুন প্রশ্ন, নব অন্বেষা-অভিপ্রায়। বাঙালী কবিরাও এই নতুন জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়েছেন, সন্ধানে আকুল হ'য়েছেন। এই আকাঙ্খা এবং এ ঘটনা থেকে জন্ম নিল নতুন কালের নব জীবনবেদ— আধুনিক বাংলা কবিতা। রবীন্দ্র-প্লাবিত বাংলা কবিতা, রবীন্দ্র অন্যত্ব অর্জনের দুরূহ সাধনায় ব্রতী হল। বিশ্বের নব নব ঘটনা অভিঘাত কবি চিত্তে যে অনিবার্য চিহ্ন রাখল আধুনিক কবিতা সেই পরিবর্তিত মানসের ফসল। খুব সহজে আসেনি এ ফলশ্রুতি। মার্কস-এঙ্গেলস, ফ্রয়েড-ইয়ুং, বোদলেয়ার, এলিয়ট, ইয়েটস আবার সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, যতীন্দ্রনাথের কবিতা খুঁজেছেন নতুন সাহিত্যের বীজকণা। বিশ্ব সাহিত্য খুঁড়ে পেতে চেয়েছিল মানস অবলম্বন। তারপর প্রতিবাদ ক্লান্তি, শূন্যতা, বিস্ময়, আনন্দ-যন্ত্রণা, সমাজভাবনা, প্রত্যাশা-স্বপ্ন নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতা কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশের বছরগুলি পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে স্বাধীনতার দরজায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তি সময়ের কণ্ঠে এনে দিল নতুন ভাষা। স্বাধীনতা এবং তার আনুসঙ্গিক ঘটনা যে নতুন আবেগ, উদ্দীপনা, হতাশা-যন্ত্রণা, তিক্ততা অবসাদ এনে দিল তারই অভিপ্রকাশ ঘটল স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতায়। আধুনিক কবিতায় ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন, এসেছিল কালান্তর আর স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতা সেই কালান্তরের বিদ্যুৎবার্তাকে বুকে নিয়ে কবিতায় আনল এক নতুন বাঁক, ঘটল পর্বান্তর।

তাহ'লে কবিতা কি শুধু কালের ভাষা? আপাতভাবে এই রূপান্তর বিকাশ দেখলে একথা মনে হ'তে পারে বটে। কিন্তু যিনি কবি তিনি একই সঙ্গে সময়ের স্রোতে সন্তরক, আবার তটস্থ দর্শকও এবং শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টাও— সে দ্রষ্টার বীক্ষণে কালের খণ্ডসীমা হারিয়ে যায়। তিনি বিগত কালের উত্তরাধিকার, সমকালের ভোক্তা, ভাবীকালের নান্দীকার। ত্রিকালে যিনি বাঁধতে পারেন আপন সৃষ্টিকে তিনিই হন কালজয়ী স্রষ্টা। কবিতা তাই একালের, সেকালের এবং সর্বকালের।

দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার কাঁটা-পথ মাড়িয়ে অনেক দুর্দহনকে বুকে নিয়ে বহু সংগ্রামে, অনেক মূল্যে, অনেক ত্যাগে এসেছিল স্বাধীনতা— আকাঙ্খার স্বাধীনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পীড়িত ভারতবর্ষ মন্বন্তর ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীনতার, যে স্বাধীনতা সকল সমস্যার অন্ধকার দূর করবে— মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি জীবনকে আলো দেবে, প্রদীপ্ত করবে। কিন্তু স্বাধীনতা এল সাম্প্রদায়িকতার রক্তে লাল হয়ে— এল ভারতবর্ষের মানচিত্রকে পাল্টে দিয়ে। পাঞ্জাব, বাংলা বিভক্ত হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতে জন্ম নিল এক নতুন ইহুদি জাতি-রিফিউজি, উদ্বাস্তু। পূর্ব বাংলার শত শত মানুষ গৃহ হারিয়ে পরিচয় হারিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে এসে উঠল। টিকে থাকার তাগিদে আশ্রয় নিতে হ'ল রেলওয়ে প্লাটফর্মে, সরকারি ক্যাম্পে, ফুটপাতে জবরদখল বাড়ীতে। ছিন্নমূল, ঘর-খোয়ানো এ মানুষগুলিরও ছিল চার-দেওয়ালের নিরাপত্তা, ছিল সমাজ সংসার, মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বরিশালে, মৈমনসিংহের ঘরে-ঘরে, রাস্তায়-রাস্তায় এরাও ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহসী সৈনিক। মাস্টারদা, দেশপ্রিয়ের উত্তরাধিকার এঁদের ধমনীতে প্রবাহিত তবুও নিজভূমে এরা পরবাসী। পূর্ববঙ্গে যে সাহসী স্বদেশপ্রেমী গিয়েছিল দ্বীপান্তরে, স্বাধনীতা পেয়ে মুক্তির উল্লাস নিয়ে সে দাঁড়াতে পারল না পিতৃপুরুষের তুলসী মঞ্চের সামনে, নিতে পারল না ফসলভরা মাঠের ঘ্রাণ, নদী-অরণ্যের স্পর্শ। দুঃস্বপ্নভরা এক স্বাধীনতা স্বদেশ-স্বজন হারানোর এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে দেখতে হল মৃত্যু, রক্ত, দুর্নীতিভরা এক স্বাধনতাকে। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার প্রবল স্ফীতি, আবাসন সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের চাপে প্রতি মুহূর্তে পিষ্ঠ হ'তে থাকল। বাড়ীর ভাড়া হ'ল আকাশ ছোঁওয়া। একটুখানি মাথা গোজার আশ্রয় দুবেলার অন্নসংস্থান এর জন্য চলল প্রাণপণ সংগ্রাম। নারীরা জীবিকার সন্ধানে পথে বেরোল। পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজে নারীস্বাধীনতা ও নারীশিক্ষার প্রসারে পূর্ববঙ্গ-আগত নারীদের স্বাধীনতা ও শিক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে দেশবিভাগ জনিত সমস্যাগুলি।

স্বাধীনদেশের নাগরিকদের সামনে কোন জাতীয়-আদর্শ তুলে ধরা হয়নি। স্বাধীনদেশের নাগরিত হওয়ার শিক্ষাক্রম বা প্রস্তুতি পরিকল্পনা কার্যকরী হ'য়ে ওঠেনি একেবারেই। দারিদ্র,অসততা, ও মূল্যবোধহীনতায় জর্জরিত হ'তে থাকল গোটা জাতি। রাজনৈতিক ছিনিমিনির চাতুর্যে জীবনের সহজ বিকাশ রুদ্ধ। ক্ষমতাবানের অনুগ্রহে পুষ্ট হতে থাকে দুর্নীতি।

এই যুগ-রূপের প্রভাবে এবং প্রতিক্রিয়ায় রচিত হতে থাকল স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতা। স্বাধীনতাকে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসের উল্লাস যে কিছু লেখা যায়নি তা নয়— তবে স্বপ্নভঙ্গে বিলম্ব ঘটেনি। অতৃপ্তির আগুন কবিদের সমগ্র সত্তা জুড়ে। সমসাময়িক ঘটনার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলনকে কবিরা গ্রহণ করলেন আপন আধুনিকতায়। স্বপ্ননাশের যন্ত্রনায় কবিরা স্বভাবতই ক্ষোভ, প্রতিবাদ নিয়ে বলতে চেয়েছেন নতুন কথা। ক্ষোভ প্রতিবাদ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের আধুনিক কবিতায় আরো বেশিভাবেই ছিল। কিন্তু

চল্লিশের বছরগুলিতে প্রতিবাদের যে সোচ্চারতা তা মূলতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক বোধের সমষ্টিগত চেতনা থেকে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কবিরা সমাজ বিধৃত ব্যক্তিসত্তার আত্মগত উচ্চারণের প্রতি অধিক মনযোগী হয়ে'ছেন। সময়-স্রোতাপন্ন মানুষ, ঘুণধরা সমাজ মেকী জীবনযাত্রা নিজস্ব ব্যক্তিচেতনার দৃষ্টিকোণে তুলে ধরেন কবি। উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের সংকট, নীতিহীনতা এসবের শতসহস্র কম্পন ধরা পড়ে কবিতায়। কবিরা কেউ লাঠির ঘায়ে রচনাবলী পাপোষে লুটিয়ে দেন— কেউবা কাঁচের চুড়ির মত ঝনঝন করে ভাঙতে চান প্রচলিত নিয়ম-কানুন। অভিমানমিশ্রিত বিষাদ, স্মৃতি আতুরতা দেখা যায় পূর্ব বাংলা থেকে আসা কবিদের রচনায়। পশ্চিমবঙ্গের কবিরাও আর্ত হ'য়ে ওঠেন মানুষ মানবিকতার এই দুঃসহ অবমাননায়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী এই মানস প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়েছে। শত সমস্যার মাঝখানে ও স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার একটা আত্মমর্যাদাবোধের মানুষের অন্তরে একটি গর্বমিশ্রিত তৃপ্তি এনে দিয়েছে। তিক্ততার তীব্রতা কমতে থাকে। ব্যক্তিগত চেতনার অভিব্যক্তি, ব্যক্তি সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে বক্তব্য তুলে আনার প্রয়াস ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। চল্লিশের রাজনৈতিক চেতনাশ্রয়ী কবিতা ও সময়ে তেমন প্রাবল্যে আর চর্চিত নয়। যদিও সমাজভাবনা বা মানবিক চেতনা কোনটাই মূল্য হারালনা শুধু পালটাল উচ্চারণের দৃষ্টিভঙ্গি। এ সময়ের কবিরা প্রত্যয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দে— পরিক্রমা করেছেন কাফ্‌কা, কামু, সার্ত্রের জগতে, এলিয়ট, রিল্‌কের কাব্যভুবনে। বুদ্ধি, মনন ও আবেগে আন্তর্জাতিক বোধের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে কবিরা আত্মসত্তার মুখোমুখি হয়েছেন—আত্মশক্তিতে প্রত্যয় জেগেছে— তাই খুঁজেছেন আইডেন্টিটি।

ইন্দ্রিয়ঘন প্রেম, ব্যক্তিক নানা চেতনা, অনুভব-অনুভূতি কবিতায় উঠে আসছে। ষাটের বছরগুলিতে কবিতার এক অস্থিররূপ দেখা দিয়েছিল হাংরি প্রজন্মের কবিতায়। সমকালীন নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে তরুণ মনের এক জ্বালাভরা যন্ত্রণার ইতিহাস আছে হাংরি প্রজন্মের কবিতায়।

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের কবিরাও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লিখেছেন কবিতা। তবে তিরিশের কবিদের মধ্যে কবি বিষ্ণু দে স্বাধীনতা পরবর্তী দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সমস্যা আবার নবার্জিত স্বাধীনতা সম্পর্কিত আশা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, শিল্পোন্নয়ন এব সব কিছুকেই বক্তব্য করে তুলেছেন। চল্লিশের অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সঞ্চারিত করেছেন শিরা উপশিরায়। ক্ষুব্ধ আর্ত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলে ওঠেন— "এভাবে মানুষ নিয়ে খেলা/মানুষের স্বপ্ন সাধ বিশ্বাস সম্মান মনুষ্যত্ব নিয়ে/ ... এই খেলা ভয়ঙ্কর খেলা/ এর চেয়ে আর কি নরক স্বাধীন স্বদেশে।"

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়-পর্বের সকল অস্থিরতাকে আপন চেতনায় গ্রহণ করেও

স্থির সংযত কণ্ঠে আপন সামাজিক বিবেক ও নান্দনিক সংবিদকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ইতি-নেতির নিয়ত সংঘর্ষের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে যে আধুনিকতা, যা ধ্বংসের আগুন বুকে নিয়েও সৃষ্টির দিকে ধাবিত হ'তে পারে— শঙ্খ ঘোষ সেই আধুনিকতায় প্রাণিত। সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আত্মনিমগ্ন নির্জন বোধে এ দুয়ে ভারসাম্যে গড়ে ওঠে কবির এক 'তৃতীয় সত্তা'। সে-ই সত্তার বিচ্ছুরণে সব শ্রেণীর কবিতার শরীরে ও আত্মায় জ্বলে ওঠে শাশ্বতিক আলো।

সমাজ ও জীবন সমাজ এক মানবিক বিবেক কখনো ক্রোধে, কখনো ব্যাঙ্গে, কখনো অভিমানী ক্ষেভে, কখনোবা আর্তিতে টান টান হ'য়ে সময়ের সামনে মাথা তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। নিজেকে প্রশ্ন— "কোন কাজে লাগি তবে? কার কাজে? কতটুকু কাজে?" নিজেকে কাজে লাগান কবি। কবিতার অক্ষরে অক্ষরে জেগে ওঠে সেই কাজে লাগার সত্য ভাষণ— "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে

বিষের টোপর নিয়ে।" (যমুনাবতী)

কুচবিহারে পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোরীর রক্ত রাঙা এক মৃত্যু-মুহূর্ত কবিকে পৌঁছে দিল ব্যঙ্গতীর্যক এক প্রতিবাদে। এমনই আর এক মৃত্যু-ঘটনা কবিকে দিয়ে উচ্চারণ করায় অসামান্য কয়েকটি পংক্তি— "ময়দান ভারি হ'য়ে নামে কুয়াশায়/দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ/ তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে, ওকি কৃষ্ণচূড়া?/ নিচু হ'য়ে বসে হাতে তুলে নিই/ তোমার ছিন্ন শির, তিমির। (আন্দোলন) নকশাল আন্দোলনের দীপ্ত, দীপ্র, দৃপ্ত সেই ছেলেটি-তিমির— পুলিশের হাতে নির্মমভাবে নিহত। অভিজ্ঞতা হ'য়ে উঠল সংবেদন আর্ত এক চিরমুহূর্তের কবিতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেমন করে পৌঁছে যায় চিরায়তে তার নিদর্শন বহু আলোচিত "বাবরের প্রার্থনা" কবিতা। কবির কন্যা অসুস্থ, পিতৃহৃদয় দুশ্চিন্তায় ও সন্তানের আরোগ্য আকাঙ্খায় কাতর। এমনই এক মানসিকতায় পরন্ত সূর্যের সামনে জানু পেতে বসে প্রার্থনা করার আকুলতায় কবির মনে পড়ে পুত্রের আরোগ্য কামনায় বাবরের আত্মনিবেদনের কাহিনী। রচিত হয় "বাবরের প্রার্থনা" ইতিহাসের ব্যাপকতায় বিস্তার পেল ব্যক্তিগত আকুলতা। কিন্তু এ কবিতা বহুমাত্রিক তাই ব্যক্তিসত্তা নয়, ইতিহাস বিস্তারিত নয়— প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠল সভ্যতার বিবর্তন ধারায় সজাগ বিবেকী সত্তা। রুগ্ন পচনশীল, ক্রমক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা যেন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। সভ্যতার বিনষ্টির দায়ভার থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। তাই পূর্বপুরুষের ধ্বংসের বিনিময়েও তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রার্থনা করে সুস্থ নিরোগ জীবন,— ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর/আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।" স্বপ্নহীনতা আশাহীনতা সভ্যতার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করছে। এই বিনষ্টি থেকে রক্ষা করার উত্তরাধিকারের চোখে স্বপ্ন এঁকে দেবার আকূতি চিরকালীন শুভবোধের প্রার্থনায় পরিণত হ'য়ে উত্তীর্ণ হ'য়েছে চিরকালীনতায়। সমসময়ের বিবেক কথা বলে উঠেছে কবিতায়।

নবজীবনে, স্বপ্নময়তায় সভ্যতা প্রাণদীপ্ত হ'য়ে উঠুক— এই সত্য আকুতিই এ কবিতার মর্মকথা।

শুধু প্রার্থনা নয় কবির প্রত্যয়-দৃঢ় স্বপ্ন আছে পরবর্তী প্রজন্মকে ঘিরে— "তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি/ দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর করে/ নক্ষত্র বিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে/ আর যতদূর যা ধানে ভরে যায় ততদূর"। (হেতালের লাঠি)

শঙ্খ ঘোষের কিছু কবিতা উঠে আসে আত্মগত সত্তার নিভৃতি থেকে। যেখানে ধ্যানলীন নির্জনতা— "এমন মুহূর্তে আসে যেন তুমি একা/ দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, (অঞ্জলি)।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সমাজভাবনা বা আত্মগত উচ্চারণ কোনটাই সরল প্রবাহে ঋজুরেখ কোন গতিপথ তৈরী করে না। কবির অনুভবলোকে এই দুই চেতনার এক মিলনভূমি আছে সেখানে জেগে থাকে 'তৃতীয় সত্তা' যার 'পা তোলা' পা ফেলাতে গড়ে ওঠে এক 'তৃতীয় ভুবন'— "অসম্ভব তৃতীয় ভুবন জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে"। কবি বলেন — 'আর মধ্যজলে/ চোখে চোখে জ্বলে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন (ভূমধ্যসাগর)

আসলে কবির আছে সত্যানুভূতির এক প্রবল শক্তি— "মদ খেয়ে তো মাতাল হ'তো সবাই/ কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল।" এই 'নিজের জোর' কবিতাকে দেয় সত্যের অমোঘ স্পর্শ। সেই সত্যের দীপ্তিতে তাঁর কবিতা হয় না। রাজনীতির প্রচারপত্রে বা ক্ষণকালের ছবি বা ব্যক্তিকথার প্রাত্যহিকী। অথচ রাজনীতি বা ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা কোনটাই প্রত্যক্ষতা হারায় না। তবে শঙ্খ মৃদু স্বরে গভীর কথা বলতেই ভালবাসেন। লিখতে চায় নিঃশব্দে — নিঃশব্দ কবিতা, যে নিঃশব্দ আলো হ'য়ে জ্বলে ওঠে। শব্দে, ছন্দে, আঙ্গিক নৈপুণ্যে প্রাত্যহিক বাচন হ'য়ে যায় সকল কালের বার্তা।

প্রচলিত প্রতি তীব্র অনাস্থা, অবসিত মূল্যবোধের প্রতি বিতৃষ্ণা, বেনিয়মী জীবন যাপন নিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা পরবর্তী কালের এক আকাশ কাঁপানো কবি, শক্তির কবিতায় সমাজ আছে, আছে বিচ্ছিন্নতাবোধ আছে, জীবন অভিজ্ঞতার রূপায়ণ আছে, প্রেমাকৃতি আছে আর আছে যাওয়া আর পিছু-টানের টানা-পোড়েনে গড়ে ওঠা জীবনের চলিষ্ণুতার এক দার্শনিক উপলব্দি।

কবিতা শক্তির জীবনের সঙ্গে সমার্থক। কবিতার নির্মাণে আত্মনির্মিতি ঘটে আবার কবিতারই দর্পনে আত্মদর্শন। আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবি--- কবিতারই মুকুরে।

শক্তির কবিতায় বিচ্ছিন্নতা আছে - আছে অনন্বয় জনিত যন্ত্রণা, এ যুগের সব মানুষকে তার মনে হয় নিতম্ব শিকড়-হীন পরগাছা— "অন্য কোন গাছ থেকে উড়ে এসে ঘুড়ির মতন পালায় জড়িয়ে গেছে... সে যেন প্রকৃত কোন গাছের নিজস্ব ফুল নয়" শক্তি

জীবনকে পলে পলে দেখেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এ সত্য উপলব্দি করেছেন যে আজকের জীবন যেহেতু যন্ত্রণাভরা তাই জীবনকে পেতে হবে যন্ত্রনাকেও। যন্ত্রণার উপলব্ধিই জীবনকে সত্যভাবে পাবার অনুভব তৈরী করবে। তাই শরীর জুড়ে তিনি ছড়িয়ে দেন বিষ পিঁপড়ে, বলেন ''ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে/ বসিয়ে রাখে সারাজীবন। (বিষ পিঁপড়ে) বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা এভাবে ইতিবাচক অনুভবে ধরা দেয় কবির চেতনায়। এ জাতীয় সদর্থক চেতনাতেই কবির উচ্চারণ— ''রোদ্দুর অনেক দেয়, অন্ধকার দেয় তারও বেশী (ধ্বনি)

শক্তি বলেছেন— ''প্রতিটি অভিজ্ঞতা কাজে লাগে যদি লাগাতে জানে কেউ''। শক্তি কাজে লাগান তাঁর অভিজ্ঞতাকে। এলোমেলো নিয়মহারা যে জীবন শক্তি যাপনে করতেন তার অভিজ্ঞতা বক্তব্য হ'য়ে উঠে এসেছে কবিতায়। 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়'' দীর্ঘ শিরোনামের এ কবিতায় জীবন অভিজ্ঞতা কবির মৃত্যুচেতনার আশ্চর্য সংবাদ হ'য়ে ওঠে। সুরাপানে টলমল পায়ের তলায় টলে ওঠা ফুটপাথ বদল হ'য়ে ওঠে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের অবস্থা। মৃত্যুবোধ অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দেয় তাই 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল ক'রে। এভাবে মাতালের পায়ের তলার বদলে যাওয়া ফুটপাত আর অস্তিত্বের মূল নড়ে যাওয়া এক হ'য়ে যায়।

অভিজ্ঞতা জীবনের প্রতি নিবিড় মমতায়ও পৌঁছে দেয় কবিকে। কবির আছে 'পাঁড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ির মায়া'। এ কথা তাঁর জানা যে সবাইকে চলে যেতে হয়। কিন্তু অসময়ে, একাকী শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়া তো কাঙ্খিত নয়। তার সাম্যহীন জীবনযাপন ব্যক্তি কবিকে অমর্যদার ধূলোয় আবৃত করে দিচ্ছিল। সকল অনিয়মের মধ্যেও কবির অন্তরে ঘরমুখো মমতা লালিত হয়। তাই তাঁর মনে হ'য়েছে নেশায়, রুগ্নতায় নিজেকে শেষ না করে জীবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোই ভাল— বলে উঠলেন— ''যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?'' সর্বনাশের দিকে দ্রুত ধাবমান সত্তা এক মরিয়া শক্তিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জীবনের দিকে।

শক্তি তাঁর গভীর উপলব্ধি দিয়ে অনুধাবন করেন যে জীবনের মধ্যে আছে এক চলার বেগ থাকে রোধ করা যায়না — অথচ পেছনের মায়ার টান ও শিরায় শিরায় বেদনা জাগায়। যেতে যেতে ফিরে তাকালে পিঠে পড়ে চাবুক। যাওয়ার অনিবার্যতা আর ছাড়ার বেদনা দুটোই সত্য। যাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হয় মানুষকে— জেগে থাকতে হয়। এ বাসা তো থেমে থাকবার নয়। 'অবনী বাড়ী আছো' কবিতায় কবি আপন সত্তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে চলার সত্যকে তুলে ধরেন। এক সদা জাগ্রত, নির্মোহ। সেই সত্তা আহ্বান জানায় মায়াবদ্ধী নিদ্রিত সত্তাকে। রুদ্ধদ্বার সেই সত্তাকে আহ্বান ''অবনী বাড়ী আছো?'' জেগে আছতো প্রস্তুত তো এগিয়ে যেতে— ''আবেগহীন হৃদয়ে দূরগামী/ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি/সহসা শুনি রাতের কড়া নাড়া/অবনী বাড়ী আছো?''

বাইরের আর ভেতরের টানের আকর্ষণ-বিকর্ষণই জীবন— ''প্রসারণে ঔদাসীনতা

কোথাও বসে কাঁদছে/প্রশাখ ছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে।" কবি এক অবলম্বন খোঁজেন যা মোহ-নির্মোহের দ্বন্দ্বময় চড়াই-উৎরাই পেরোনোর শক্তি জোগাবে। ভালবাসাই শক্তির সেই অবলম্বন। তাই বলেন— 'ভালবাসা পেলে সব হবে। রূপে রূপে বারুদে এভাবে শক্তি পেতে চেয়েছেন জীবনকে— বৈরাগ্যে সংসক্তিতে, বিচ্ছিন্নতা সংলগ্নতায়, তিক্ততায় প্রসন্নতায়। আমাদের ঘুমিয়ে থাকা সত্তার দরজায় তাঁর কবিতা নিয়ত ঘা দিয়ে বলে — "অবনী বাড়ী আছে?

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের সংক্রবিধ সংকটে কাতর, ক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী হ'য়ে উঠেছেন কে সময় কালের কবিরা। তাদের অস্থিমজ্জায় গুমরে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা। সময়ের নাড়া-খাওয়া কবিদের মধ্যে একজন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পুরোন থেকে বেরিয়ে নতুন কথা বলার প্রয়োজন বোধ তৈরী হ'য়েছিল যুগ-মানসে। প্রয়োজন ছিল একটি বিদ্রোহের যা কবিতার ধারাকে মোড় ফেরায়। এই মোড় ফেরানোর কাজে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুনীল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম।

সুনীল শুধু কবি নন— অজস্র তাঁর গদ্যরচনা। কিন্তু কবি জানিয়েছেন— "শুধু কবিতার এই জন্ম এই বেঁচে থাকা।" প্রকৃতই কবিতাই তাঁর সর্বোত্তম প্রেম যেন তাঁর কৈশরের স্মৃতি-অভিমান মাখা বাংলাদেশে। সুনীল অসম্ভব জনপ্রিয় কবি— সঙ্গত যোগ্যতাতেই সেই জনপ্রিয়তা। সহজতার গুণে তিনি জয় করেছেন পাঠকচিত্ত। জটিল সময়ের অকৃত্রিম রূপকার হ'য়ে প্রকাশ্যে তিনি অজটিল। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের ভাবনায় ও ভাষায় তিনি বেঁচে আছেন এক অনবদ্য প্রাঞ্জলতা নিয়ে।

সুনীলের কবিতার মূলপ্রোথিত আছে 'ভালবাসা'য়। সে ভালবাসা কখনো শরীরী কখনো অশরীরী, কখনো নারীর প্রতি, কখনো কৈশোরের প্রতি। এই ভালবাসা তাকে জেদী, রাগী বানায় আবার অভিমানে আতুর করে। এ ভালবাসা চিরন্তন— "এর জন্ম হয়না, মৃত্যু হয় না।"

সুনীলের প্রেম কবিতায় শরীরী ভাবনায় অলজ প্রকাশ আছে। দুঃসাহসী সাবলীলতায় কবি বলেন— 'উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে গর্ভবতী হল" কিংবা 'এসো শরীর তোমায় আদর করি"। কিন্তু এ কেবল ছদ্মবেশ, সুনীলের প্রেম কবিতার আবেদন আরো গভীরে। সুনীলের প্রেম কখনো নীরাকে ঘিরে, কখনো নারীকে। 'নীরা' এইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে কবিতায়। নীরা একটি নাম নয়, একটি সত্তা। কখনো শরীরীভাবে পেতে চান কবি কখনো নীরা বিশুদ্ধতার প্রেরণা— 'যে-ই দরজা খুললে জন্তু থেকে মানুষ হলাম'। নীরা সামান্যা, আবার অসামান্যা, নীরা অশ্রু ও আনন্দ তাঁর প্রতিদিনের সন্ধ্যাগায়ত্রী, তাঁর চিরমুহূর্ত— "নীরা শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি সময় আজো থেমে আছে।" 'নারীর ভিতরে নারী'কেও খোঁজেন সুনীল, প্রত্যহই মনে হয়— 'নারীকে এখনও ভাল করে দেখা হয়নি।' আসক্তি-অনাসক্তি তামসিকতা ও সাত্ত্বিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে সুনীলের নারী ভাবনা। সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দেখেন নারীর সুন্দর দেহসৌষ্ঠব। নারী

দেহ, কামনা ও সুন্দরের মিলনে এক প্রতীতি হ'য়ে ওঠে যা কবিকে নিয়ে যায় ভালবাসার স্বর্নমন্দিরে। 'শরীরী-অশরীরী' কবিতায় কবি কথা— ''কবি ও সন্ন্যাসীই সন্ন্যাসীরই মতন সে হঠাৎ কখনো যোগভ্রষ্ট হ'য়ে কাম-মোহিত হয়— সেই বিস্মৃত মুহূর্তের লিপ্সা বড়ো তীব্র, তাকে অপমান কোরনা—'' আবার এই কবিই তো আমাদের জানিয়েছেন যে 'শরীর শেষে' তাঁর আশ মেটেনা' আসলে ভালবাসা তাঁর কাছে এক সত্যবদ্ধ অভিমান।

ধর্মঘটে, মিছিলে, দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত যে কলকাতাকে সুনীল পেয়েছেন প্রতিদিনের জীবন চর্চায় তার রূপ কবিতায় উঠে আসে সমাজ ভাবনার মানবিক বোধ থেকে। প্রচলিতকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন সুনীল— সোপার্টা ঘোষণায়। লাথির ঘায়ে রচনাবলী লুটিয়ে দিতে চেয়েছেন পাপোষে। কবির চারপাশে সর্বস্ব হারানোর রিক্ততা, জমি নেই, ঘর নেই বিশ্বাস নেই, মূল্যবোধ নেই। স্বপ্ন আদর্শ বিবেক নির্বসিত। কবির আর্ত করুণ জিজ্ঞাসা—'' এযেন স্বাধীনতা পরবর্তী কালের আত্মার এক আর্ত প্রশ্ন। কবি নিজেকেও দোষী করেন — ' তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়/... আমারও কথা ছিল তোমার পাশে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ানোর।''

কিন্তু সুনীলে আছে এক উদাসী বাউল সত্তা, এক অভিমানী রোম্যান্টিক বিষাদ, শৈশব, কৈশোরকে ফেলে আসার অভিমান গুজরে ওঠে তাঁর মনে। সামনের দিকে প্রসারিত পথ মাঝে মাঝেই ফিরে যায় কৈশোরের দিকে। কিন্তু যাওয়া তো যায়না তাই অভিমান— ''যেমন ঠিকানা হারানো বহু চিঠির উত্তর লেখা হয়না/ তবু জেগে থাকে অভিমান (চন্দন কাঠের বোতাম) কৈশোর যে শুদ্ধতার প্রতীক। যখন বর্তমান গ্লানিময় হয় তখন শৈশবই অবলম্বন।

কিন্তু সুনীল বর্তমানের আঘাতে পীড়িত হয়েও ভোগ করতে চান বাঁচার আনন্দ। কবি জীবনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন, দেখতে দেখতে চলা আবার চলতে চলতে দেখা— সে দেখার যেমন উঠে আসা দেশের নানা সংকট সমস্যা, তেমনি কত অনুপম মুহূর্ত ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার সমাজ সত্তা গর্জে ওঠে প্রতিবাদে, প্রেমিকসত্তা খুঁজে বেড়ায় শরীরী অশরীরীর মিলন ভূমি, আর রোম্যান্টিক সত্তা ঘুমিয়ে পড়ে রূপনারাণের কূলে। শব লেনাদেনা ছুঁড়ে ফেলে যখন এগিয়ে চলা পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, শুধু ভিজে ঘাস'। বেদনার মধ্য দিয়ে দেখেছেন ভালবাসাকে, জীবনকে পেয়েছেন 'ভালবাসা বেদনায়' তবু সব পাওয়া হয় কোথায়— তাই অভিমান বলে ওঠে— ''কেউ কথা রাখেনি।''

এই পর্বে আছেন আরও বহু প্রতিভার দীপ্তি, মনন সমৃদ্ধ, সময় বিশ্বস্ত কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিশুদ্ধতার সন্ধানী আলোক সরকার, মোহহীন নির্লিপ্তিতে জীবনকে আবিষ্কারের কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ। আছেন কবি শরৎ মুখোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, কবিতা সিংহ, তরুণ সান্যাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী প্রমুখ কবিরাও। এদের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতা বিচিত্র বর্ণে আত্মবিকাশ খুঁজেছে। পঞ্চাশের কবিতা তা মন ও মেজাজ নিয়ে এগিয়ে গেছে সমাজের দিকে। কিন্তু ষাটের বছরগুলিতে ঘটতে থাকল

নানা ঘটনার তরঙ্গ উৎক্ষেপ, কবিতার বক্তব্যেও উঠে আসতে চাইল নতুন কথা।

ষাটের তরুণ কবিদের মধ্যে জেগে উঠেছিল অস্থির এক জ্বালা। রাজনীতির চাতুরী, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, প্রত্যাখ্যান সর্বস্ব জীবনচর্যা, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তৈরী করেছিল এক অস্থির যন্ত্রনা। এই যন্ত্রনা তাদের সত্য সন্ধানে তাড়িত করেছে। এই অস্থিরতা এবং সন্ধান প্রয়াস থেকে জন্ম নিয়েছে হাংরি প্রজন্মের কবিতা। নিশ কলা রাজনীতি, মেকী ধর্মবোধ, মূল্যবোধহীন সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চেয়েছেন কিছু কবি। নিজেদের বলেছেন ক্ষুধিত প্রজন্ম। পাটনা ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত মলয় রায়চৌধুরী নামের এক তরুণ বিশ্বাস-খোয়ানো জীব পর্বভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে খাঁ খাঁ করা যন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছেন কবিতায়। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর কেটে গেছে তার জমার ঘর শূন্য। "মল মানসিক এই খাঁ খাঁ করা পরিস্থিতিতে পেয়েছিলেন নিজের বাড়ীতে আমেরিকান কবি গিনসবার্গকে। মানস সাযুজ্য খুঁজে পেলেন গিন্‌সবার্গের জীবনযাত্রায় এবং কবিতায়। পরিকল্পনা করলেন পত্রিকা প্রকাশের। পত্রিকার নাম হাংরি জেনারেশন। ১৯৬২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হল হাংরি জেনারেশান পত্রিকা— স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্ব শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা দেবী রায়। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে যুক্ত হ'য়েছেন আরো বহু কবি। প্রবল দুঃসাহস ও অসহিষ্ণুতা নিয়ে হাংরি আন্দোলনের কবিরা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে অস্বীকার করলেন রাজনীতির বন্ধ্যাত্বকে ব্যঙ্গ করলেন, সমাজের অসুস্থতাকে অনাবৃত করে দিলেন। এদের পোষাক পরিচ্ছদ,আচার আচরণ উদ্ভট। এদের কবিতা আমাদের অভ্যাসকে আহত করে তবু জানিয়ে দেয় অন্তর্লোক অনুসন্ধানী এই কবিরা কবিতার কাছেই শেষ পর্যন্ত ফিরে আসেন। পরিপার্শ্বের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা, এমনকি ঘৃণা নিজের প্রতিও তাই যেন বেপরোয়া নেশায় আত্মধ্বংসে নেমেছিল ওরা। এ পর্বের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং বিতর্কিত কবিতা 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'। কবিতাটির জন্য কবিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হ'তে হ'য়েছে। যন্ত্রণাদগ্ধ এক যুবকের অন্তরের জ্বালা আছে কবিতায়— 'মরে যাবো কিনা বুঝতে পারছিনা/তুলকালাম হ'য়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরকার সমগ্র অসহায়তায়'' এই কবিতার সামগ্রিক আমাদের অভ্যাসকে নাড়া দেবে কিন্তু শ্লীলতা অশ্লীলতা—সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নৈপুণ্যে মূল্যায়িত হয়। বিচ্ছিন্ন খন্ড মানুষের যন্ত্রণা হাহাকার হিসেব দেখলেল এ কবিতা যুগের দর্পণ, কবি আত্মার ক্রন্দন। তবুও যে প্রশ্ন থাকে না তা নয়। কিছু শব্দ অশ্লীল হ'য়ে উঠেছে কবিতার বক্তব্যের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে অন্বিত না হ'ওয়ায় শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায় প্রমুখ কবিরা ও হাংরি আন্দোলনের ঘোষিত ম্যাজিস্টেটোকে সামনে রেখে কবিতা রচনা করেছেন গড়ে তুলেছেন একটি যৌথ আন্দোলনের চেহারা। কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়নি এই আন্দোলন। অন্তরের জ্বালাটা ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু প্রকাশ চটক চমক ছিল অধিক, সুযোগের ডামাডোলে যা ঘোষিত হ'য়েছে তা পালিত হয়নি, গোষ্ঠিকেন্দ্রিকতা এবং গোষ্ঠিবিরোধ আন্দোলনে ঘুণ ধরিয়েছে। হুজুগের ডামাডোল। কোন পরিণত চিন্তায় পৌঁছতে দেয়নি। কিন্তু কারও কারও

মৌলিকতার উদ্ভাস যে ছিল না তা নয় কিন্তু তা দানা বাঁধতে পারেনি। অভিজ্ঞতার নামে উদ্দামতা, নেশাগ্রস্ততা তাদের বিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবু ষাটের বুকে কয়েকটি তাজা তরুণের সমস্ত ভণ্ডামির মুখোস খুলে দেওয়ার দুঃসাহসিক অকৃত্রিম আকাঙ্খার মূল্য কম মূল্যবান নয়। হাংরির স্থায়ী মূল্য ঐ আন্তরিক চাওয়ার মধ্যে।

এরপর হাংরির কবিরা ছড়িয়ে পড়েছেন— যার যার নিজস্ব কাব্যপথে। এ পর্বে গড়ে উঠতে থাকল শ্রুতি ও দৃষ্টি-নির্ভর আর এক কাব্য আন্দোলন। শ্রুতি আন্দোলন।

কিন্তু ষাটের সব কবিই কি হাংরি শ্রুতি বা কংক্রীট আন্দোলনের শরিক ছিলেনই তা নয়। ছিলেন অজস্র ব্যক্তিকবি। অধিক বিস্তারের অবকাশ নেই। শুধু উল্লেখ করি তুষার রায়ের কথা। জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং জীবনের বিপরীত মুখ দেখে ব্যঙ্গে বিদ্রুপে, ফেটে পড়া এই নিয়ে এসেছিলেন তুষার। জীবন তখন তাঁর চোখে 'ফর্দাফাঁই'। তারই ওপর আরোপিত হয় অস্তিত্ব— খুঁজতে থাকেন নিজেকে — 'ফর্দাফাই জীবনখান অলক্রিয়ার/ মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুন্ডু/স্থির রেল লাইনে ... কেননা হাতির শুড় বা টিকটিকির লেজ নয় যে তিড়িং লাফাবে। (মা কি ডাকছে)

তুষারের কবিতায় আগুন আছে, ব্যথা আছে— বিদ্রুপ আছে সেই ব্যথা থেকেই মমতা আছে তাই ব্যথা-যন্ত্রণা। নিজেকে খোঁজা এই বিরূপ পরিপার্শ্বে। তবুও ভালবাসা মরেনা। "সব দেখেশুনেই ভালবাসার ভার বহন করে কবি"। কেননা কবি জানেন জীবন সভ্যতার প্রতিও কবির করণীয়— "এইটুকুই তো সভ্যতা আশা করে তোমার কাছে। এক অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারও আছে কবির — কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ে কবির উচ্চারণ—

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে, এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেটে দেখে নেবেন পাপ চিল কিনা (দেখে নেবেন)

এ যেন গোটা ষাটের আত্মার আত্মবিশ্বাসের ঘোষণা অভিমানের আতুরতা— "ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা"।

পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি

সুতপা ভট্টাচার্য

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি পুস্তক সমালোচনায় প্রসঙ্গত বলেছিলেন—'কবি শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ নেই। বিশ্বসাহিত্যে কোথাও রমণী রচিত উল্লেখযোগ্য কবিতা নেই। এ দেশে মেয়েদের নামে কবিতা পাঠালে তা তৎক্ষণাৎ কাগজে ছাপা হয়, কিন্তু কদাচিৎ তা পাঠকের মনে ছাপ রাখে।' 'ধ্রুপদী' পত্রিকার যে সংখ্যায় এই মন্তব্য ছিল, তার পরের সংখ্যাতেই ছিল এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং বিষয়ে লেখা এবং তাঁর কবিতার অনুবাদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের অসারতা হয়তো সম্পাদক অজ্ঞাতসারেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এ কথা ঠিক, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্যই। তাঁকেও একদিন সখেদে বলতে হয়েছিল; ' *How strange?.... I look every where for grand mother and see none.*' হ্যাঁ, শেক্‌স্‌পীয়রের বোন যে শেক্‌স্‌পীয়রের তুল্য হতে পারে না, তার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান এই একটি কারণ—কোন পূর্বনারীর ঐতিহ্য সে খুঁজে পায় না। পুরুষ কবির ঐতিহ্যের মোকাবিলা করতে হয় তাকে। সে ঐতিহ্যে শুধু যে পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্বের সুর থাকে তাই নয়, সে ঐতিহ্য নারীকে সীমায়িত রাখতে চায় তার পছন্দসই সংজ্ঞায়—উর্বশী কিংবা লক্ষ্মীর চূড়ান্ত স্টিরিওটাইপে। সেই স্টিরিওটাইপের বিরোধিতা করা, নিজের যথার্থ স্বরূপ সন্ধান করা—সে বড়ো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে, যখন মেয়েরা আজকের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কারবদ্ধ, যখন অর্থনৈতিক তথা পারিবারিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে হাতে গোনা কয়েকজন, যখন মেয়েরা মিল খুঁজে পাচ্ছে না ব্যথায় আর বুদ্ধিতে, শক্তিতে আর ইচ্ছায়। আশ্চর্য নয়, পঞ্চাশের দশকের কবিতার পত্রিকাগুলি ওলটাতে মেয়েদের নাম সূচীপত্রে পাওয়া যায় না বললেই হয়। নবনীতা দেবসেন জানিছেন, তিনি যখন সবে লিখতে শুরু করেছেন, সেই পঞ্চাশের দশকেই, তখন 'আধুনিক' কবিতা লিখতেন মাত্র চারজন মেয়ে—রাজলক্ষ্মী দেবী, হেনা হালদার, শিপ্রা ঘোষ আর কবিতা সিংহ। নবনীতাকে নিয়ে এঁদের সংখ্যা হলো পাঁচ। এঁদের সকলেরই আধুনিকতার পরিচয় পঞ্চাশের দশকেই যে পরিস্ফুট হয়েছিল তা হয়তো বলা চলে না। ১৯৫৭-তে রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রথম কবিতার বই 'হেমন্তের দিন' প্রকাশিত হয়েছে, যদিও লিখছেন তিনি চল্লিশের দশক থেকেই। ১৯৫৭তেই প্রকাশিত হয়েছে শিপ্রা ঘোষের 'মেঘ সমুদ্রের স্বপ্ন'। নবনীতা দেবের 'প্রথম প্রত্যয়' বইটিতে প্রকাশকাল দেওয়া নেই, বলা আছে কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৭ থেকে ৫৯। হেনা হালদারের কবিতা বই আমি হাতে পাইনি, তবে উল্লেখযোগ্য অল্পকিছু কবিতা চোখে পড়েছে। কবিতা সিংহের কোনো কবিতাই সেসময় প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আত্ম-

অনুসন্ধানের যন্ত্রণাময় পথ-পরিক্রমার সূত্রপাত সেসময় একমাত্র তাঁর কবিতাতেই দেখেছি। পঞ্চাশের মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই প্রধানতম।

পুরুষতন্ত্র মেয়েদের প্রিয়ার ভূমিকায় স্ত্রীর ভূমিকায় মায়ের ভূমিকায় আদর্শায়িত করতে চায়। মেয়েরা অনেকদিন লিখেছেন সেই ভূমিকা থেকেই প্রধানত। হৃদয়াবেগকেই মেয়েদের স্বভাব বলে নির্দেশ করেছে পুরুষতন্ত্র। সে আবেগের পাত্র কখনো মানুষ, কখনো ঈশ্বর কখনো দেশ। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে পড়ে কামিনী রায়ের কবিতা। পঞ্চাশের দশকে যে মেয়েদের কবিজন্ম তাঁদের কবিতায় আবেগ ছিল না এমন নয়, প্রেমের কবিতা এঁরাও লিখেছেন, কিন্তু স্বরভঙ্গি বদলে গেছে ক্রমশ। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতায় তো প্রথম থেকেই ব্যথার সঙ্গে বুদ্ধিকে মেলাতে চাওয়া হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কবিতা বই 'ভাব ভাব কদমের ফুল'-এ সে প্রয়াস খুবই প্রত্যক্ষ।

আকাঙ্খার শেষ হবে আকাশটা ছোঁবে যেই, সিঁড়ি হবে পার
জানাশোনা গম্বুজের। অবিনাশী সময়ের করাতে কী ধার,—
আনন্দেরও শেষ হবে। বুদ্বুদে মিলিয়ে যাবে ইন্দ্রধনু মন।
—যন্ত্রণার শেষ নেই, যন্ত্রণাই শেষ সত্য। সে-ই তো জীবন।

যন্ত্রণাকেই শেষ সত্য বলে মানা, কেননা তারই মধ্যে থাকে 'সত্তার স্বাক্ষর'—এই বোধ রাজলক্ষ্মী দেবীর আত্ম সচেতনতার পরিচয় জ্ঞাপন করে। 'এখন আমাকে আর ধরবে না ঘুষঘুষে ট্রেনে, / রকেটের উন্মত্ততা আমার যে মজ্জায় লেগেছে' কিংবা 'মা গো, এক বৃহত্তর বাদরের ছবি মনে ভাসে, /হৃদয় আছাড় খায় বৃত্তাকৃতি দিগন্তের পাশে'— এসব পংক্তিতে মেয়েদের সীমায়িত অস্তিত্বের বেদনাবোধের ঋদ্ধ প্রকাশ দেখি। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির 'মাগো' সম্বোধন মেয়েলি কণ্ঠস্বরও তো চিনিয়ে দেয়।

শিপ্রা ঘোষ তাঁর 'বৃষ্টি' কবিতায় লিখেছেন; 'সে এক বৈরাগী মেঘ / গান গাহে তার মুগ্ধ সুরে। সেই মেঘ গলে গলে / বৃষ্টি হয় উদ্দাম দুপুরে'—রীতিমত রোমান্টিক এর স্বর। কিন্তু স্বর ভিন্ন হয়ে যেতে দেখি পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত এক কবিতা 'রাত্রির যন্ত্রণা'তে:

'তবু সে শোনে না কথা: যৌবনের বিলোল তৃতীয়
সাজায় নৈবেদ্যডালা: লাবণ্যের স্মৃতির মুকুল।
যন্ত্রণার বন্যা নামে যৌবনের মুকুল ছাপিয়ে—
যন্ত্রণার কান্না শোনে কল্পনার মাটির পুতুল।'

'রাত্রির যন্ত্রণা' কবিতাটিতে অবশ্য সমসাময়িক পুরুষ কবির প্রভাব স্পষ্ট। তবে পরবর্তী কালে ক্রমশই তাঁর কাব্যভাষা পরিবর্তিত হয়েছে। 'বিলগ্ন স্মৃতির দেহে অবৈধ মধুর কল্পনায় / নিমগ্ন আমার প্রেম : ভ্রষ্টলগ্নে কান্নার জোনাকি'—মাতালের উক্তি' নামের এই প্রেমের কবিতাটির ভাষা আগের যুগের প্রেমের কবিতার থেকে অনেকটাই আলাদা। এ কবিতায় সংস্কারবদ্ধ সে যুগের মেয়ের প্রেমাকাঙ্খার দ্বান্দ্বিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন শিপ্রা: আসঙ্গে নির্ভীক নই : যদিও-বা মুহূর্তের স্বাদে / জ্বলন্ত জটায়ু-তৃষ্ণা : ওষ্ঠে বক্ষে সংবৃত

প্রলয় :।' ক্রমে শিপ্রার কবিতায় হৃদয়ের তুলনায় মেধা প্রাধান্য পেতে থাকে, দেখা দেয় নতুনজাতের উপমা: 'উজ্জ্বল সবুজ দিন ভেনাসের সুতীক্ষ্ণ চিবুক' কিংবা '......বাদামী রংয়ের চুল বিস্তীর্ণ আকাশ, / কফি কিংবা সিগারেট : ফোঁটা ফোঁটা পাতাঝরা অসুস্থ বাতাস / স্ট্রবেরির লাল গন্ধ : সবুজ অতপ্ত রুক্ষ ঘাস।' কিংবা 'সুঠাম শরীর মৃত ঝিনুকের মতো / ছাইদানি হয়ে টেবিলে টেবিলে ফেরে'। কিংবা, একই কবিতার 'মাতাল জুয়ারী গণিকা রাতের আয়ু / পাঁজরে পাঁজরে রক্তের জাল ছেঁড়ে'। শিপ্রার কবিতায় প্রখর আত্মসচেতনতার প্রকাশ পেতে দেখি, ইয়েট্‌স্‌-এর '*What then*' কবিতার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে শিপ্রা যখন লেখেন :

প্লেটোর প্রেতাত্মার মত আমরাও প্রশ্ন করতে পারি তারপর?—শান্ত সন্ধ্যা! রোদ্দুরের তীব্র দুঃসাহস ম্লান হয়ে মুছে গেছে; শাণিত ইচ্ছার মগ্নতায় আমরা কি ভুলে গেছি পৃথিবীর আদিম বয়স! আত্মসচেতনতার একটা লক্ষণ এই যে দৃষ্টি তখন নিছক সুন্দরকেই দেখে না, হাত তখন নিছক সুন্দরকেই আঁকে না। শিপ্রা আবিষ্কার করেন : দুর্লভ দেহ কম্প্রমধুর লাস্যময় / শোণিতগন্ধ সন্ধ্যার তাপে বুভুক্ষর / অন্ধ বিকট রক্তলোলুপ প্রতিচ্ছবি; / তীব্র ঘৃণিত তুমি যে ছবির চিত্রকার।' 'ধ্রুপদী' পত্রিকায় প্রথম দিকে প্রকাশিত এসব কবিতায় 'মেঘ-সমুদ্রের স্বপ্ন'র কবিকে আর চেনাই যায় না। এসময়ের 'কোন প্রেতিনীকে দেখে' কবিতার পংক্তিগুলি এরকম—

> রুগ্নমৃত অন্ধকারে উদ্ভাসিত রক্তের দ্যোতনা
> ঘৃণিত বিষাক্ত তিক্ত মায়াময় পাণ্ডুর শয্যায়
> জান্তব ক্ষুধায় ক্লান্ত দেহে তাঁর সূর্যের চন্দন
> প্রদীপ্ত আলোর বন্যা দুকূল প্লাবিত করে যায়।'

'প্রেতিনী' শব্দের মধ্যেই আছে নারীর অন্যতার দ্যোতানা, সেইসঙ্গে 'জান্তব ক্ষুধায় ক্লান্ত দেহ'র সঙ্গে 'প্রদীপ্ত আলোর বন্যার দ্বন্দ্বময়তাও তো মেয়েলি জীবন-পরিস্থিতির দ্বন্দ্বময়তাই প্রকাশ করে। শেষ অবধি তবু শিপ্রাকে কবুল করতে হয় : 'তাছাড়া ও মহিলা কবির / লিরিক কবিতা যে তো নৈঃশব্দের যন্ত্রণা অপার।' শব্দ দিয়ে আর কতটুকুই বা সে যন্ত্রণা প্রকাশ করা সম্ভব?

শিপ্রা ঘোষের তুলনায় হেনা হালদারের কবিতা কমই পড়েছি। তার মধ্যে কোথাও কোথাও হৃদয় মেধার দ্বন্দ্বও তাঁর কবিতার আধুনিকতার সাক্ষ্য দিয়েছে। 'কিরাত' নামে একটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দিই : 'নেই তার স্মৃতি কিংবা প্রেম। তার সুতীক্ষ্ণ মনন / ছাড়িয়ে মনের সীমা ছাড়িয়েছে যেন অগনন/ সূচীমুখ শায়কের জ্বালা।' কোথাও বা তাঁর কবিতায় পেয়েছি চমক লাগানো চিত্রকল্প : 'এবং তোমাকে আমি ক্রমাগত ঝেড়ে ফেলতে চাই / কিছুতে পারি না'.....'চোখের মণিতে ক্ষুদ্র এক কণা বালির মতন', 'টাগরায় বেঁধা যেন সুক্ষ্ম কাঁটার দাপট'। কোনো কোনো কবির হয়তো একটিমাত্রই কবিতা খুঁজে পেয়েছি, এই কালস্রোত থেকে কোনোদিন যদি তাঁদের আরো কবিতা উদ্ধার করা যায়, তবে হয়তো তাঁদের সম্পূর্ণ কবিপরিচয় পাওয়া যাবে। 'কৃত্তিবাসের পাতা থেকে পাওয়া জয়শ্রী চৌধুরী

কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

'...........এইটুকু নদী
স্ফীত করে তোলে তবে, সব ক্ষতি এই
যদি আমি মেনে নিই, তবে নিমেষেই
আমার 'আমি'ও যাবে। তাই জানি, জানি
এরা নয় সত্য, শুধু সত্য মোর বাণী।'

'কবিতা' পত্রিকায় পেয়েছি আরতি আচার্য চৌধুরীর কবিতা 'সন্ধ্যা যখন নামলো'। ঘরের মেয়ে আর বাইরের মেয়ের বৈপরীত্য উপস্থাপিত এ কবিতায় : 'বাঁকানো আলের ধারে / উৎসুক চোখ নাচে / সন্ধ্যা যখন লাউ-মাচা বেয়ে / ধীরে এসে ঘরে থামলো'র পরের স্তবকেই সেই বীপরীত ছবি : 'তখন অন্য কোথাও, / পোকা-পড়া মেয়েগুলো / ঠোঁটে, গালে রং মেখে / তীব্র চাবুক হানলো / ময়লা হাওয়ার গলিতে।' এই কবিরও আরো কবিতা কখনো পড়বার সুযোগ পাব ভাবতে ইচ্ছে করে।

নবনীতা দেবসেনের অবশ্য বেশিরভাগ কবিতাই তাঁর কবিতা বই-এর দুই মলাটে স্থান পেয়েছে, যদিও তাঁর কবিতার থেকে গদ্যের বই অনেক বেশি। রোমান্টিক অনুভবের স্বীকৃতি আছে তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় :

'কালরাত্রে পারুলের ইচ্ছের অলখ্ অশ্রুজলে
অনিচ্ছা ধারাস্নান দেবদূতেরা করেছে সকলে—
তারপরে চন্দ্রালোকে কুহকের তুষার ছড়িয়ে
আমার নিদ্রিত ঘরে এলো তারা আশীর্বাদ নিয়ে।'

কিন্তু সেইসঙ্গে প্রথম থেকেই আত্ম-সচেতনতাও লক্ষ করার মতো; প্রেমের কবিতাতেও বিশেষ ঢেউ-তোলা আবেগ নেই :

সে আজো আকাশ, সে আজো সাগর, পাখি—
তবু কি চেনোনি চোখে গর্বিনী ভাষা
ভূমিষ্ঠ হতে হয়তো অনেক বাকি
অধৈর্য হয়ে হত্যা কোরো না আশা।'

নবনীতার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত দেবদূত'-এর কবিতায় দেখি আবেগের বদলে রূপ নিয়েছে অভিজ্ঞতা, মাতৃত্বের মতো একান্ত মেয়েলি অভিজ্ঞতাও। আরো দেখি, আঘাত পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে জেগে উঠেছে আত্মা-অন্বেষণ : 'নিরালম্ব, নিষ্কলঙ্ক, পরিচয়হীন / দীনতায় ডুব দিয়ে উঠে / আবার ফিরিয়ে পাবো কি আমার অস্তিত্বের গোড়া।' আত্ম-পরিচয় অন্বেষণের পথে এই কবি 'দর্পণ'-এর সত্যকে গ্রহণ করেন, সে সত্য আমাদের সমাজের যে-কোনো নারীর পক্ষেই সত্য—'জাত যে পিঞ্জরে, আকাশে ভয় তার / খাঁচাতে ফিরে যেতে রাজি সে সুতরাং'। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করেও তো তাঁকে আত্মপরিচয়-এর 'প্রাপ্তি'র কথা বলতে হয়, যা আগের যুগের কবির কবিতায় পাইনি—

এবার নিজেকে পেলে.....
অন্যের চৌকাঠে বসে গৃহস্থালি খেলা সারা হলো
এবারে নিজের ঘর কাড়ো।
এখন নিজের হাতে নিজেকে নির্মাণ—
সদর্পে হরণ করো নিয়তির শাড়ি।

'নিজের হাতে নিজেকে নির্মাণ'-এর সাধ যে মেয়ের, তাকে তো সচেতন হতেই হয় অন্যের হাতে তার যে নির্মাণ এতদিন সর্বগ্রাহ্য, তার বিষয়ে। তাকে অস্বীকার না করে সে আত্মনির্মাণের পথে যেতেই পারে না। নবনীতাকে তাই লিখতে হয় 'যে প্রতিমা গড়েছিলে সে আমার ছিল না কখনো / সে আমার প্রতিকৃতি নয়/...... দর্পণে দেখেছি আমি ইদানিং আমার স্বমুখ / সে মুখ তোমার চোখে পড়ে নি কখনো।' কী প্রতিমা গড়েছে পুরুষ, পুরুষতন্ত্র? পুরুষেরই জবানীতে সে কথা বলেছেন নবনীতা—'তোমরা কবিতা হবে, তোমরাই কবির সম্পদ.....'। নারী হবে কবিতা, নারী হবে রহস্যময়ী, নারী পুরুষকে ছায়া দেবে, আশ্রয় দেবে—এই হলো পুরুষের নির্মিত নারী। নারীকে তার আত্ম-অন্বেষণে এই নির্মাণকে ভাঙতে হয়। নবনীতার কবিতায় আছে এর উচ্চারণ। কিন্তু দৃপ্ত প্রতিবাদে আক্রোশে ক্রোধে এই নির্মাণকে যিনি চুরমার করতে চেয়েছেন, সভ্যতার বশ্যতা থেকে প্রকৃত রমনীকে বার হয়ে আসবার যিনি আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি কবিতা সিংহ।

(২)

বাংলা কবিতার ইতিহাসে পঞ্চাশের দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ। এই দশকের বাংলা কবিতার নতুন ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকারই পাতায়। কী তার বৈশিষ্ট্য? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় : বিদেশী ধাঁচে একটা কোনো বিশেষ নাম দিয়ে কাব্য আন্দোলন আমরা শুরু করিনি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা নিজেদের মধ্যে কোনো রকম পরামর্শ না করেই যে নতুন রীতিতে কবিতা লিখতে শুরু করে, তাকে বলা যেতে পারে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা। এই কবিতা শুধু সৌন্দর্যের নির্মাণ নয়, রূপকল্পের সন্ধান নয়, এইসব কবিতা যেন তাদের রচয়িতাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।'

হ্যাঁ, জীবনযাপনকে সরাসরি কবিতায় উপস্থিতি করার প্রয়াস, 'অস্তিত্বের ঝঙ্কার'কে বাজিয়ে তোলার প্রয়াস পঞ্চাশের কবিদের একটা সাধারণ লক্ষণ অবশ্যই। কিন্তু সে 'জীবনযাপন' সে 'স্বীকারোক্তি' একান্তই পুরুষালি। তার সঙ্গে অনেকটাই পৃথক কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর একমাত্র মহিলাকবি কবিতা সিংহর 'স্বীকারোক্তি', অস্তিত্বের প্রশ্ন যেখানে নারীর, সেখানে ঝংকার শব্দটি যেন বেমানান। সমাজের নারী-নির্মিতির বিরুদ্ধে সে যেন এক আক্রোশ। যে বৃষ্টি সচরাচর কবিতায় আসে প্রেমবিধুরতা নিয়ে, সে বৃষ্টি কবিতার কবিতায় যেন 'বন্য চোখের ঢাকা খুলে দেয়', যেন কোনো অপরূপ পশুকে জাগিয়ে তোলে। 'বৃষ্টি রঙের বন্যতায় ভাসাও' কৃত্তিবাসে প্রকাশিত কবিতা। যে 'ঈশ্বরতা' নারীর উপর আরোপ

করে আসছে সমাজ, তার মিথ্যাত্ব এই

কবি উপলব্ধি করেন ঃ

'হাত থেকে পড়ে গেছে সাধের ঈশ্বর!

খণ্ডগুলি অর্থহীন, অশ্রুজল! তাদের তুলো না,

শ্রান্তিহীন রক্ত ঝরে আর কত ক্রমাগত শর?

এই অসামান্য ক্ষত, মাত্র এই ক্ষতেরই তুলনা।

যদি এ অমৃত বিষ, তবে স্নানে কোন জলে নামি?

বোলো না প্রতিমা নয়, মৃত্তিকার রঙের ছলনা

এবং যেটুকু প্রাণ, ঈশ্বরতা সঙ্গে ধরি আমি

এ কঠিন সত্যে যাব,—আমারে সে অলোকে ডেকো না।'

আত্ম-আবিষ্কারের যন্ত্রণার তীব্রতা কবিতা যে সব শব্দে, প্রতিমায় প্রকাশ করেন, তার তুল্য কিছু আমি প্রতিষ্ঠান ভাঙতে চাওয়া পুরুষ কবিদের লেখাতেও পাইনি। কবিতা সেই প্রতিষ্ঠান-ভাঙা নারীর কথা বলেন, অন্ধকারই যার নিয়তি—'নিজের একেলা' নিয়ে নারীকে তার মধ্যে বসে থাকতে হয়।

চক্ষু ফুঁড়ে রক্ত ওঠে, অশ্রুতে অশ্রুতে

ভেসে যায় হৃদয় ব্যাণ্ডেজ!

নাকি চক্ষু নাকি-বা হৃদয় স্থান বদল করেছে?

নাকি এই মৃত্যু সন্নিধান অন্ধতায়,

চক্ষু হৃদয় অশ্রু রক্ত ক্রোম শেষ পর্বে মাখা মাখিয়ে?'

'কৃত্তিবাস'-এর পুরুষ কবিদের লেখা 'কবিতা' পত্রিকাতে দেখেছি, দেখেছি 'ধ্রুপদী'তে, কিন্তু দেখিনি কবিতা সিংহর কোনো লেখা। 'কৃত্তিবাস' ছাড়া তাঁর কবিতা দেখেছি 'শতভিষা'য়, এছাড়া দেখেছি 'দৈনিক কবিতা'য়, সে তো তাঁদের নিজেদেরই কাগজ। পঞ্চাশের দশকে নানান কাগজে তাঁর চমক লাগানো কবিতা প্রকাশ হলেও, কোন বই বার হয় নি। অথচ তাঁর সেসময়কার কবিতা পড়তে পড়তে শঙ্খ ঘোষের কিছু পংক্তি মনে পড়ে, 'কবিতার জগতেও কেউ যদি প্রতিষ্ঠান ভাঙতে চান তবে তাঁরাও প্রয়োজন কেবল নিঃশব্দে সেই কবিতা লিখে যাওয়া, যা সামাজিকদের পক্ষে অনায়াসে ব্যবহার্য বা আস্বাদ্য নয়, যা গোপন পদসঞ্চারে ঘিরে ফেলবে সবাইকে।' শঙ্খ অবশ্য কেবল পুরুষ কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গেই কথাগুলি লিখেছেন, অথচ এই একাকী নারীর প্রতিষ্ঠানবিরোধী কবিতার আন্দোলনের জন্যে কথাগুলি কতটাই সত্যি! হ্যাঁ, 'অনায়াস আস্বাদ্য' নয় তাঁর কবিতা, তাই ধ্রুপদী' বা 'কবিতা'য় তাঁর স্থান হয় নি, অথচ 'গোপন পদসঞ্চারে' সবাইকে না ঘিরে ফেলুক, পরবর্তী নারী কবি আর নারী পাঠককে অধিকার করে নিয়েছিলেনই তিনি।

তিনিই তো সৃষ্টি করলেন মেয়েদের নিজস্ব প্রেম কবিতা, আসলে যা প্রেমহীনতার কবিতা। 'আমি কাল রাত্রে কি যে তুমুল আকুল এক / বিরহের দোর ঠেলা বৃথাই, বৃথাই

বসে প্রত্যক্ষ করেছি / তারপর দারুণ লজ্জায় মরে গেছি / নিজের আমূল এই প্রেমহীনতায়।' (কালরাত্রে প্রেমহীনতায়) কিন্তু কেন? চিরকালীন প্রেমপ্রতিমা নারীকে আজ প্রেমহীন হতে হয় কেন? প্রেমের সাধ আর নেই তার? আছে, কিন্তু এতকালের পুরুষতান্ত্রিক প্রেমে তার যে অবস্থান, তাকে আর সে মানতে পারে না, সে আজ আর নিছক বিষয় নয় বলে, তার বিষয়ীতা তার কাছে আজ বড় বেশি প্রত্যক্ষ বলে। তাই তাকে আজ বলতে হয় 'আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ; জানলে না কাটামুন্ডে ঘোরে এক বাসন্তি-অসুখ' বলতে হয় : 'অন্ধকার আছে বলে হতে পারি চমৎকার দুই / প্রতিমার মত এই নীল মুখ তুমি দেখবে না / তোমার বাঁপাশে তাই নিশ্চিন্ত পুতুল হেন শুই' / কবিতার যে কবিতার নাম 'প্রেম', সে কবিতাতেও প্রেমের অপেক্ষায় থাকা একাকী নারীর দুঃখ-কথাই থাকে:

> সেই নারী অধঃনেত্রে পিছনে জগৎ রেখে স্থির
> পৃথিবীর মত সেই অন্য এক পৃথিবীতে একা
> চলে যাবে মুখ ঢেকে যদি মুখে শত মসীরেখা
> দুঃখগুলি, ভীতিগুলি তীক্ষ্ণ টানে এঁকে এঁকে রাখে।'

নারী বিষয়ী হতে চায় বলেই তার একাকিত্ব। বিষয়ী হিসেবে সে আত্মকর্তৃত্ব চায়। তাই পুরুষালি কর্তৃত্বের মধ্যে দিয়ে গড়ে-ওঠা তার উপস্থাপনাকে সে প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যাখ্যান করে পুরুষতন্ত্র নির্দিষ্ট তার ভালোত্বের আদর্শ, তার বিপরীতে গিয়ে সে সন্ধান করে তার আত্মপরিচয়। সে সন্ধানে থাকে তার অন্যতার বোধ—আদিম নারী হিসেবে, যাদুকরী হিসেবে, ডাইনি হিসেবে, দানবী হিসেবে কিংবা দানবীস্বরূপা দেবী হিসেবে। বাংলা কবিতায় নারীর সেই অন্যতার বোধ আমরা কবিতা সিংহর কবিতাতেই প্রথম পাই, পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতিবাদ করে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নতুন এক ঐতিহ্য :

> বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক
> অকালে নিহত তার মাতামহী রোগ রেখে গেছে
> ক্রুদ্ধ রক্তচাপ ওঠে, অগ্নি বমন ওঠে, রক্তকণা বাহিত ফোয়ারা
> বুকের তলায় তার মাথা কোটে জননীর বহ্নি কর্কট,
> সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর বঞ্চনা•
> সংসার সমাজ থেকে নিয়ে যায় খসায়ে তাহাকে।'

অকালে নিহত মাতামহী, জননীর বহ্নি কর্কট—'সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর বঞ্চনা' যে মেয়েকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে তো অন্য ঐতিহ্যের কথা ভাবতেই হয়, ভাবতেই হয় অন্যতার কথা। অন্যতার বোধ সেই অহংকার দেয় যার থেকে ঈশ্বরকে ইভ বলে 'আমিই প্রথম/ জেগেছিলাম / উত্থান যা / তারই ওপিঠ / অধঃপতন।' অন্যতার বোধ থেকেই কালীর সঙ্গে ঐকাকার হতে পারে রাগী রমনী : 'মন্দিরে যায়নি নারী দেখেনি সে অবিকল / তারই / নগ্ন কালো রক্তজিবে প্রতিমার / অদ্ভুত বিশাল / এলো চুলে কাল স্তর। খড়্গো জ্বলে লাল......'। অন্যতার বোধ থেকেই 'ডাকিনী যাদু'র গর্ব : 'দুই বাহু

আন্দোলিলে জানি হে সমুদ্র দুলে ওঠে / এমত ডাকিনী যাদু আছে বলে নহে ব্যবহার / কুঁড়িতে ভাঙিয়া দিও তেমন বাসনা যদি ফোটে।'

সেই অন্যতাকে মান দিয়েই নারীর নিজস্ব শরীর-অভিজ্ঞতাগুলিকে এই কবি কবিতায় তুলে আনেন। পুরুষালি যৌনতায় নারী দেহ তার নগ্নতা শুধু ভোগসামগ্রী মাত্র, সেই যৌনতা থেকেই তার শিল্প, তার কাব্য। কিন্তু নারীর যৌনতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর এমনকি তার নগ্নতাও তার নিজের অর্জন করা চাই, পুরুষের ভোগ থেকে যা পৃথক :

'তেমন বিনগ্ন হয়ে দাঁড়াতে কি পারবে সাবিত্রী?
কোনো মন্দিরের দেয়ালপরীর সাধিত ভঙ্গিমা নয়
বা বতিচেলির
অভ্যস্ত মোহিনী সেই বাসনা ভেনাস।
কোন কুট্টনী নগ্নতা নয়
নগ্নতার আচ্ছাদন নয়
যদৃচ্ছা দাঁড়াতে পারো দুবার খোলস ফেলে,
শেষবার নিজের নিকটে
তাহলে দর্পণ দেব চোখে চোখ দেখবে নিজেকে।'

নারীর শরীর অভিজ্ঞতা, পুরুষের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠতার অহংকার এই প্রথম কোনো নারী কবি ব্যক্ত করলেন, সেই সঙ্গে রাখলেন প্রতিবাদ, নারীকে হীনতা দেওয়া পুরুষতন্ত্রী ভাষার :

কিন্তু পুরুষ দেখ—'অসতী' নামক শব্দ পুংলিঙ্গহীন
এবং 'বেশ্যা' শব্দ, এবং 'ছিনাল!'
এভাবে চামড়া রাখো, দেহের, চোখের।
....
তোমার মজ্জায় ফোটে নৃমুন্ড শুক্রের গুচ্ছ
অপ্রতিরোধ্য বেগ, রক্তবীজ, বিষ্ণুর উরুতে নষ্ট
মধু ও কৈটভ।
বেজন্মা আগাছা ছোঁড়ে, যে ভাবে নিযুত বীজ
পথপার্শ্বে ইউরিনালে নর্দমা ব্লিচিং-এ
তুমি কি জানবে নারী কি ভাবে শরীরে তার
ঘোরায় সিন্দুর স্রোত, রক্তগুঁড়া—রজস্বলা দিন?
নিখুঁত বানায়ে ভাঙে, নিজের সৃজিত প্রাণ / নিজ অভ্যন্তরে.....

এই আত্মসচেতন নারী যৌনতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের নৈকট্য নয়, দূরত্বই দেখে :

'বীজরোপণের লাস্যে রমনীর গর্ভমূলে বলে যায় অন্ধপুরুষ
অন্ধ প্রহর থেকে মৃত্তিকা মোচন করে বীজের ভরণ

তবুও পুরুষ থেকে সমদূর রয়েছে রমনী
যেমন প্রেমের থেকে সমদূরে রয়েছে পুরুষ'

এই নারীকে কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সহ্য করে, তার গুণকে কি মান দেয়? কবিতা সিংহ কি কোনো উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন? ক্ষুধার্ত আন্দোলনের শক্তির কথা যাঁরা আলোচনা করেছিলেন, তাঁরা কি কবিতা সিংহের কবিতা নিয়ে কখনো আলোচনা করেছেন? অথচ কবিতা তো নিছক ভুল বলেন নি—'সাধারণত আমার লেখার উৎস ক্রোধ। প্রতিবাদ।' না, সম্মান নয়, অপমানই ক্রুদ্ধ নারীর, প্রতিবাদী নারীর প্রাপ্য—'অপমানের জন্য বারবার ডাকেন / ফিরে আসি / ঝাঁপ খুলে লেলিয়ে দেন কলঙ্কের অজস্র কুককুর—আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে।' 'যদি পৌত্তলিক হতেই হয় / অপমানই ঈশ্বর / হাত উঠুক—অভিশাপ নিতেও হাত খুলুক।' নারী কবির তাই ঈশ্বর নেই ঈশ্বরী আছেন—'তিনি তো ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুরা, তিনি— / তীব্র অপমান মুদ্রা, নীলবর্ণ করতলে করেন ধারণ / দুহাতে বিলান চিরনির্বাসন।

অপমানিতা নারীর সঙ্গে, সমাজ-নির্বাসিতা নারীর সঙ্গেই তাই এই কবি ঐকাত্ম্য অনুভব করেন। সেইজগৎ থেকে ভাষা আর স্বরভঙ্গি তুলে এনে বিদ্রূপের সঙ্গে ছুঁড়ে দেন পুরুষের দিকে :

উড়োনো চুমু ছুঁড়ে দে
শুধু তুই চুমু ছুঁড়ে দে
জ্বলছে হৃদয় দু হাজার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার

এই যদি তোর মনে ছিল
কেন মাইরি রং দ্যাখালি
বেরিলির ওই ভারি বাজারে
ঝুমকো জোড়া হারিয়ে এলি।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালা মুখ ঢেকে দিলে না
বদলে তার বদলে / রক্তে প্রেমের বিষ মিশালে?

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে? কাঁচ পোকার তিলক
চলতে ফিরতে টিপের ঝিলিক
ক্যামনে কাঁপে কবে জানতাম?

সমাজ-জীবনে, নারী-পুরুষ সম্পর্কে মেয়েদের অবস্থান বিষয়ে কবিতা সিংহ তাঁর

ক্রোধ উগড়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়। তিনি নতুন নারীকে আহ্বান করেছেন। অতীত কিংবা বর্তমানে আবদ্ধ না থেকে তিনি ভবিষ্যৎ নারীকে কল্পনা করে নিয়েছেন। সেই নারী, যার জন্য কবির প্রার্থনা

অন্তত একজন তার উদ্ধত মস্তক তুলে দীর্ঘ দাঁড়াক
অন্তত একজন তার বেণী খুলে হোক না পাঞ্চালি
অন্তত একজন তার রক্তফিতা খুলে হোক কুলকুণ্ডলিনী
অন্তত একজন তার মেরুরজ্জু টান করে জেনে যাক কি আনন্দে ফেলে
বিষছত্র দলিতা ফনিণী।'

এ নারীর 'দুই চোখ কাজল জানে নি'। 'নম্র চোখের কম্প্র কাজল রেখা' এর দুয়ারে যাচনা করা যাবে না। এ নারী জানে 'নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা'। এই নারীই ভেঙে দিতে পারে খান খান করে সমস্ত যৌন টোটেম, 'কবিতায় রমণী ব্যবসা'। নতুন যুগের নারী কবিরা 'চতুর্মাত্রিক তাকে সম্পূর্ণ দেখাবে'—এই ছিল এই কবির আশা।

সে তো খুব সহজ কথা নয়। সমাজের দিক থেকে সংস্কৃতির দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে প্রকৃত নারী হিসেবে সচেতনতা অর্জন করার প্রক্রিয়া মন্থর হওয়াই তো স্বাভাবিক। কেননা প্রতিপক্ষ তো আর চুপ করে বসে থাকবে না। এ চলা যে স্রোতের উজানে চলা। পঞ্চাশের দশকে মেয়েদের জীবন-পরিস্থিতিতে কবি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই সাধারণভাবে কঠিন ছিল—অনুকূল পরিবেশ, নবনীতার মতো, খুব কম মেয়েরই কপালে জুটেছে। তবু নবনীতাও বলেছেন মুদ্রণ-সংস্কৃতির জগতে কতটা অপমান তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে নারী কবি হিসেবে। ফলে তাঁরা নিজেদের নারী-কবির বদলে কবি হিসেবে পরিচয় দিতেই চাইতেন। ক্রমশ পরিস্থিতি পালটেছে। নারী-কবির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু নারীকবির নারীত্বকে নিজের মনোমত করে তোলার আয়োজনের কোনো ত্রুটি রাখেনা পুরুষতন্ত্র। তাই কবিতা সিংহর মতো ব্রাত্য কন্যা আজও বড় কম।

প্রসঙ্গ ও প্রকরণ : বাংলা কবিতা : উনিশ ও বিশ শতক

সুমিতা চক্রবর্তী

'প্রসঙ্গ' ও 'প্রকরণ'—এই দুটি শব্দে কী বোঝাতে চাই তা স্পষ্ট করে নিতে হবে প্রথমেই। এবং, যদিও আপাতদৃষ্টিতে খুব অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে, তবুও একবার বলে নিতে হবে 'কবিতা' বলতেই বা কী বোঝাতে চাই আমরা—যার সম্পর্ক-সূত্রে নির্ধারিত হবে 'প্রসঙ্গ' ও 'প্রকরণ'—এই দ্বিবিধ ধারণা।

কাব্য কী—এর উত্তর খুব সহজ বলে মনে হলেও—আমরা অন্তত তিনটি উত্তরে পৌঁছতে পারি যার একটি অপরটিকে ঠিক অস্বীকার না করলেও যেগুলি ঠিক একও নয়।

১. পাশ্চাত্য শিল্প-ধারণার প্রথম পর্বে আরিস্টটল্-এর অনুসরণে বলা যেতে পারে—ভাষার সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির অনুকরণাত্মক পুনঃসৃষ্টিকেই কাব্য রূপে নির্দিষ্ট করা যায়। এই সংজ্ঞা মোটের উপর একতম ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত।

২. প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। 'রস' হল উপভোক্তার চিত্তের অনুভব। ভাষার বিন্যাসে এমন কিছু গড়ে তোলা যা বাচ্য অর্থকে ছাপিয়ে গভীরতর ও বিস্তৃততর কোনো উপলব্ধিকে জাগালে তবেই 'কাব্য' হবে। এই সংজ্ঞাটিতে অনুকরণ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। আবার আরিস্টটল্ প্রদত্ত সংজ্ঞায় 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গার্থ' সম্পর্কে নেই কোনো স্পষ্ট উল্লেখ। তবু 'কবিতা' সম্পর্কে এই দুটি ধারণাই সমান্তরালে অবস্থান করতে পারে—একে অপরকে অস্বীকার না করেই।

৩. কবিতা কী—তার উত্তরে তৃতীয় সংজ্ঞাটির প্রবক্তা ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ। সর্বজন-জ্ঞাত এই সংজ্ঞাটি তিনি দিয়েছিলেন ১৮০০ সালে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্' নামক কবিতা-সংকলনটির ভূমিকায় (সংকলনটি কোলরিজ্ ও ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ-এর কবিতা নিয়ে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হলেও ভূমিকাটি সংযুক্ত হয় দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮০০ সালে।) তাঁর কথায়—প্রবল আবেগের (পাওয়ারফুল ফীলিংস্) স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ-ই (স্পন্টেনিয়াস ওভার-ফ্লো) হল কবিতা। সেই সঙ্গে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই আবেগ ঠিক তাৎক্ষণিক হলে চলবে না। মনের পাত্র পূর্ণ হবে আবেগের সঞ্চারে; সুস্থিত হবার অবকাশ দিতে হবে সেই আবেগ-কে। তবেই তা কবিতার উৎস রূপে যথার্থ উপলব্ধি হয়ে উঠবে (ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্রসংকুইলিটি)।

—এই তিনটি সংজ্ঞা থেকে 'কবিতা কাকে বলে' তার সর্বগ্রাহ্য উত্তরে যদি আমাদের যেতে হলে তাহলে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে কবিতা হল—ভাষা দ্বারা নির্মিত এক শিল্পরূপ। দ্বিতীয়ত, সেই শিল্পরূপ এমনভাবে কবি চিত্তের উপলব্ধি-নিষিক্ত যে তা পাঠক ও শ্রোতার চিত্তেও এমন অনুভূতির সঞ্চারে সক্ষম যা বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত।

এইখান থেকে সহজেই আমরা চলে যাব—কবিতার প্রকরণ ও প্রসঙ্গের ভাবনায়। 'প্রকরণ' হল কবিতার ঐ ভাষা-নির্মিত শৈল্পিক অবয়বের যাবতীয় করণ-কৌশল। প্রসঙ্গ কী? 'প্রসঙ্গ' হল কবিতার বিষয়বস্তু ও কবি-চিত্তের উপলব্ধির সমন্বয়। আরও একটি শব্দ আমরা পেয়ে গেলাম—'বিষয়বস্তু'। তাহলে কী 'বিষয়বস্তু' আর 'প্রসঙ্গ' এক নয়? অবশ্যই নয়। কবিতার বিষয়বস্তু আর প্রসঙ্গ—'সাবজেক্ট' আর 'কনটেন্ট্'—কিছু আলাদা। বিষয়বস্তু হল বিশ্ব-প্রকৃতির সেই সাবয়ব উপাদান অথবা সর্বজনস্বীকৃত ধারণা (আইডিয়া) যা ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে বর্তমান। প্রসঙ্গ হল সেই উপাদান ও ধারণার সঙ্গে শিল্পী-চিত্তের বিশেষ দৃষ্টিকোণের সংযোগের ফলে জেগে ওঠা এক নবতর ধারণা। উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। ধরা যাক 'ফুল' একটি বিষয় এবং 'দেশের স্বাধীনতা'—একটি ধারণা। সকল সচেতন মানুষের মনেই এই বিষয়বোধ ও ধারণা প্রতীয়মান। 'ফুল' নিয়ে কবিতা লিখলেন তিনজন কবি—

রবীন্দ্রনাথ : ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই
লাগে ভালো

অমিয় চক্রবর্তী : ধ্যানে নয়, টবে নয়, নয় মালায়,
বোতলে গন্ধ-ফোঁটায়
ফুলকে পাব বোঁটায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়: ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় বেশি
মিথ্যে কথা বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই
আমার টান নেই।

এই তিনটি কবিতাংশেরই বিষয়বস্তু হল 'ফুল'। বিশ্বের সেই প্রাকৃতিক উপাদান যার অনুকরণকে শিল্প বলে নির্দেশ করেছিলেন আরিস্টটল্। কিন্তু তিনটি কবিতার উপলব্ধি তিন রকম। প্রথমটিতে কবি-হৃদয়ের আনন্দ দ্যোতিত হয়েছে ফুলকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়টিতে, বিশেষভাবে ফুলের সাবয়বতা বিষয়েই কবির উপলব্ধি। তৃতীয়টিতে, মানব-সমাজ সম্পর্কে কবির কিছু বিরূপ ও আহত সংশয়ের বোধকে ধারণ করেছে ফুলের চিত্রকল্প। এখানে বলব—তিনটি কবিতাংশেরই 'বিষয়' এক কিন্তু 'প্রসঙ্গ' আলাদা। প্রসঙ্গটি হল বিষয়ের সঙ্গে কবিমানসের সমন্বয়। বিষয় 'নৈর্ব্যক্তিক'। প্রসঙ্গ কবির মনের উপলব্ধি-নিষিক্ত জীবনবোধ—ব্যক্তি-অনুভব-সাপেক্ষ। এই অনুভবই বাচ্য অর্থকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জিত হয়। ছড়িয়ে যায় শ্রোতা ও পাঠকের মনে।

'স্বাধীনতা' সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে রচিত দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।

বিমলচন্দ্র ঘোষ : নয়া দিল্লীতে মেকী স্বাধীনতা
সোনার পাথরবাটি

প্রথমটিতে শুনি পরাধীন দেশের সচেতন মানুষের হৃদয়ার্তি; দ্বিতীয়টিতে অনুভব করি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় মনে করে কবির ক্ষোভের স্পর্শ।

প্রসঙ্গ আর প্রকরণ সম্পর্কিত ধারনা পরিষ্কার করে নেবার পর আমরা দেখব কবিতার প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রকরণ অবিচ্ছেদ্যতা কীভাবে কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠছে। প্রধানত আমাদের অবলম্বন হবে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কবিতা। দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করবার আগে বলে নেওয়া যায় আরও একটি কথা। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—এই দুটি ভাবনাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। রাষ্ট্রিক প্রশাসনের চরিত্র অনুসারে, সামাজিক বিধি-বিধানের অভিমুখীনতা অনুসারে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—দুই-ই বদলে যেতে পারে প্রবলভাবে। সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাক। কাব্যের নায়ক কেমন হবেন—তার নির্দেশ দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদ্ স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন—সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পুরুষই হবেন কাব্যের নায়ক। এই প্রাকরণিক বিধান সেই বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজের, যেখানে শূদ্রের কোনো অধিকার ছিল না। আরিস্টটল্ বলেছিলেন—অভিজাত-বংশীয় মহৎ চরিত্রই হবে ট্র্যাজেডি-র নায়ক। সেই প্রাক্-খ্রিস্টিয় গ্রিক সমাজেও ক্রীতদাসের কোনো সামাজিক অধিকার ছিল না বলে তারা সর্বদাই নাটকের পার্শ্বচরিত্র। আজকের যুগে কোনো কবি বা কাব্যতত্ত্ববিদ্ এমন প্রাকরনিক শর্ত আরোপ করবার কথা ভাবতে পারবেন না। সংস্কৃত নাটকের প্রকরণ অনুসারে শিক্ষিত পুরুষেরা কথা বলবে সংস্কৃতে; নারী ও শ্রমজীবী সমাজের মানুষ কথা বলবে প্রাকৃতে। এই সব নির্দেশও সমকালীন যুগধর্মের প্রভাবেই প্রদত্ত হয়েছিল।

রেনেসাঁস-পর্বে যখন সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে অনেক বেশি তখন দেখেছি বদলে যাচ্ছে প্রকরণের ধারণা। শেক্‌স্‌পিয়র-এর নাটকে সাধারণ মানুষ কোথাও কোথাও মহৎ হয়ে উঠছে; মিলটন-এর কাব্যের নায়ক হচ্ছে সেটান। রোমান্টিক যুগে (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ) ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ স্পষ্টতই কাব্য-প্রসঙ্গ ও কাব্য-প্রকরণ নিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষের জীবন ও সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে। যুগধর্মের প্রভাবেই 'প্যারাডাইজ লস্ট' আর 'মেঘনাদবধ-কাব্য'তে যথাক্রমে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স আর অ[illegible]ক্ষর ছন্দ এত সার্থক হয়েছিল। সেখানে প্রয়োজন ছিল প্রথাকে কিছুটা স্বীকার করা, কিছুটা অস্বীকার করা।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে কলাবৃত্ত ছন্দের যে অনুপম লাবণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা

তাঁর মনের নিবিড় রোমান্টিকতার বোধের সঙ্গে গভীরভাবে লগ্ন। আবার সবরকম শব্দ-প্রয়োগে তাঁর যে দ্বিধা ছিল—নিজেই বলেছিলেন : ব্যাঙ, বাঁশ, কুমড়ো ফুল, কচু ইত্যাদি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন—তার ফলে আধুনিক জীবনের জটিলতা, বিপন্নতা, বৈনাশিকতার উপলব্ধি তাঁর কলমে ঠিক মতো ফোটেনি। তাঁর মনের অভিমুখীনতাই ছিল ভিন্ন। তাই তাঁর ভাষাও হয়েছে আলাদা। 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী চেটে নেয় জল'—এই ভাষা-প্রকরণ জীবনানন্দের লেখায় সম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখায় নয়।

রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিরা জীবনের প্রতিটি উপলব্ধিকে স্থান দিতে চান। এই সর্বগ্রাহিতা আধুনিক জীবনবোধের অন্যতম লক্ষণ। তাই কোনো শব্দ, কোনো চিত্রকল্প, কোনো ছন্দ ব্যবহারে বাধা নেই আধুনিক কবির। পাশ্চাত্য দেশে বোদল্যের-এর কাল থেকেই কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ধারণা। ইংল্যাণ্ড-এ চিত্রকল্পবাদী (ইমেজিস্ট) কবিদের ইস্‌তাহারে (১৯১৫) এই অভিমত নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট। কবিতার প্রকরণ হবে সর্বতোভাবে প্রসঙ্গের বাহন। তার বাইরে প্রকরণের কোনো পৃথক মূল্য নেই। আর, প্রসঙ্গ হবে কবিমানসের উপলব্ধির ধারক। প্রসঙ্গ-প্রকরণের অবিচ্ছেদ সর্বযুগের রসোত্তীর্ণ কবিতার পরিচয়।

কবিতার ভাষা, বাংলা কবিতা

পবিত্র সরকার

কবিতার ভাষা আলোচনায় প্রথম যে প্রশ্নগুলি আমাদের মনে আসে সেগুলি এইরকম: কবিতার ভাষা কি মুখের ভাষা থেকে আলাদা? কিংবা কবিতার ভাষা কি লিখিত গদ্যের ভাষা থেকে আলাদা? যে-কোনো মানুষই সহজবুদ্ধিতে এ দুটি প্রশ্নের যে-উত্তর দেবেন সেটাই সংগত উত্তর। হ্যাঁ, কবিতার ভাষা মুখের ভাষা থেকেও আলাদা, আবার লিখিত গদ্যের ভাষা থেকেও আলাদা। আমাদের অভিজ্ঞতা, সংস্কার এবং বিচার সব দিক থেকেই আমরা ওই এক উত্তরে পৌঁছে যাই। কিন্তু তার পরেই আরও দুটি প্রশ্ন উঠে পড়ে। এক, কবিতার ভাষা বাকি ওই দুটি ভাষা থেকে কেন আলাদা; এবং দুই, কীভাবে আলাদা হয়ে যায় কবিতার ভাষা, কোন্ কোন্ বিশেষ প্রকরণ-প্রক্রিয়ায় কবির ভাষা-ব্যবহার সরে আসে সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষা কিংবা গদ্যলেখকের কলমের ভাষা থেকে? আমরা এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে এ নিয়ে একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করব, তার পরে বাংলা কবিতার ভাষার ধারাবাহিক রূপ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ পার্থক্যের সূত্রগুলি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

এ সম্বন্ধে প্রথম এবং দীর্ঘদিন ধরে যিনি ভেবেছিলেন তিনি প্রাক্তন চেকোশ্লোভাকিয়ার বরিষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকবসন (*Roman Jakobson*)। ফের্দিন্যাঁ দ্য সোস্যুর-এর ভাষাতত্ত্ব থেকে সূত্র গ্রহণ করে তিনি বলেন, কবিতার ভাষা মুখের আর লেখার গদ্য থেকে দু-ভাবেই আলাদা। প্রথম আলাদা হয়ে যায় শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প (ইয়াকবসনের ভাষায় 'মেটাফর') ইত্যাদি নির্বাচনের দিক থেকে। অর্থাৎ কবি এমন সব শব্দ, উপমা ইত্যাদি নির্বাচন করেন যা সাধারণত মুখের কথা ও লিখিত গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। এটা হল ভাষার বৈকল্পিক বা *paradigmatic* অক্ষ থেকে নির্বাচন; একাধিক বিকল্প আছে ধ্বনি, শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির, তা থেকে কবি নির্বাচন করে নেন কবিতার জন্য বিশেষ বিশেষ ধ্বনিবিন্যাস (ছন্দ ও স্তবকবন্ধও এর মধ্যে পড়ে, যেমন পড়ে অনুপ্রাস ও অন্যান্য ধ্বনিসজ্জা), বিশেষ বিশেষ শব্দ, শব্দগুচ্ছ, উপমা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, কবির কবিতায় শব্দসজ্জা—ছত্রে, পঙ্‌ক্তিতে, স্তবকে শব্দগুলিকে পাশাপাশি সাজানোর ব্যাপারেও তাঁকে ভিন্নতা সন্ধান করতে হয় মুখের কথা বা লেখার গদ্য থেকে। এটা ভাষার *syntagmatic* বা আন্বয়িক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

বলা বাহুল্য, এ দুটো গভীরভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আমি অভিধান থেকে 'উজ্জ্বল' কথাটা নিলাম অনেক অন্য কথাকে বাদ দিয়ে, কিন্তু 'উজ্জ্বল'-এর পাশে 'গোধূলি' কথাটা খানিকটা কবিতার আভাস নিয়ে এল। কিন্তু ' উজ্জ্বল উদ্ধার' আর একটু

যেন কবিতার ভাষার ভিতরে নিয়ে যায় আমাদের।

এই প্রসঙ্গে এমন কথা উঠতে পারে যে, হ্যাঁ, এক সময় কবিতার ভাষা মুখের ভাষা বা লিখিত গদ্যের ভাষা থেকে আলাদা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন কি তা খুব বেশি আলাদা? এখন তো আমরা মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছি কাব্যভাষাকে, লিখছি 'গদ্য'-কবিতা—এখনও কি খুব প্রবলভাবে বলা সম্ভব যে এ ভাষাগুলির মধ্যে দূরত্ব আছে? বুদ্ধদেব বসু 'দময়ন্তী' কবিতা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩)[১] বইয়ের শেষে একটি গদ্যকথন যোগ করেছিলেন। পরে পত্যিক্ত এই রচনাটিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, তার সংকল্প ছিল, কবিতা রচনার সময় ''বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত'' হবেন না। তিনি, সাধু ক্রিয়াপদ 'হইব' 'বলিব' ইত্যাদি, এবং কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি', 'চলিছে', কাব্যিক শব্দ 'মম', 'কভু', 'যেথা', 'নারি', ইত্যাদি তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করবেন।[২] অর্থাৎ তাঁর *paradigmativ* নির্বাচন অন্যরকম হবে। তবু লক্ষ করি, তাঁর উদ্দেশ্য কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দেওয়া কখনই নয়। তিনি প্রথমত ছন্দ রক্ষা করার কথা ভাবছেন, প্রশ্ন তুলেছেন ''বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্য রীতির মিলনের শ্রেষ্ঠ বাহন কোন ছন্দ?'' তাঁর মতে পয়ার ছন্দই সেই উত্তম বাহন, তার পরেই ছড়ার ছন্দ।[৩] দ্বিতীয়ত, বাংলার মেয়েলি (*feminine*), অর্থাৎ দু-সিলেব্‌লের মিলকে পরিহার করে এক সিলেবলের—'বুদ্ধিতে / দিতে'-র বদলে 'ঝুঁকে / ডাকে'-র মিল—তাঁর পছন্দ।[৪] যদিও দ্বিতীয় ধরনের মিল তিনি যে শেষ পর্যন্ত খুব বেশি ব্যবহার করে উঠতে পেরেছেন তা নয়, আর বাঙালি কবিরাও খুব ব্যাপকভাবে এ সুপারিশ গ্রহণ করেছেন পরে, তাও চোখে পড়ে না। তবু কবিতার মিল সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী নন বুদ্ধদেব বসু, পরে যদিও গদ্য কবিতা লিখেছেন তিনি। তৃতীয়ত, 'রতি-হ্রস্ব' বা 'স্বতঃ শ্লথ' গোছের তৎসম শব্দ ব্যবহার তাঁর আপত্তি নেই, কারণ তার কাম্য,[৫] ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক''; তাঁর যুক্তি, সংস্কৃত শব্দ বেশী করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন?'' ফলে আমরা লক্ষ করছি, কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো 'আধুনিক' উকিল যিনি, তিনি অন্তত তিন দিক থেকে এ দুয়ের অল্পবিস্তর দূরত্ব রক্ষা করতে চান— ছন্দ, মিল বজায় রেখে এবং সাধারণভাবে অব্যবহৃত তৎসম শব্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা দাবি করে। মূলত বৈকল্পিক নির্বাচনের স্বাধীনতা সম্বন্ধেই তিনি বেশি সচেতন, এ আমরা লক্ষ করি।

বলা বাহুল্য, গদ্য ছন্দের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্র ক্রুসেডের কথাও এখানে স্মরণ করতে হবে। 'পুনশ্চ' (১৯৩২) বইয়ের কবিতাগুলি লেখার আগে ও পরে তিনি গদ্য ও পদ্যের ব্যাবহারিক তফাত, সৌন্দর্যগত এবং আবেদনগত বিভিন্নতা অভিজ্ঞতার স্তরভেদ ইত্যাদি নিয়ে চিঠিতে বক্তৃতায় রচনায় কী বিপুল শোরগোল তুলেছিলেন তা অনেকেরই জন্য। প্রবোধচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য অনুসারে ১৯৩২-এর জুলাই থেকে ১৯৪০-এর ডিসেম্বর

পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে মনোযোগের বিস্তার চোখে পড়ে, যদিও 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬)-তে সর্বাঙ্গীনভাবে এবং 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০) ও 'সানাই' (১৯৪০)-এ একটি-দুটি করে গদ্যকবিতা যোগ করার পাশাপাশি অজস্র মিল ও ছন্দের কবিতা লিখেছেন তিনি, সেটা তাঁর শেষ দশ বছরের কবিতার তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন 'পুনশ্চ'-এর কবিতাগুলি 'পদ্য' নয়, তবে নিছক গদ্যও নয়, 'রূপরসাত্মক গদ্য'। অন্যত্র তাঁকে বলতে দেখি, "ভাষার কক্ষে অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরের ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষার নয়, অন্তরের ভাবে"। তার পরেও তিনি লিখিত বা মৌখিক গদ্যের সঙ্গে তাঁর কবিতার গদ্যভাষার তফাত নির্দেশ করেছেন, "অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হতে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই বাড়বে না"। এবং এই প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁর কবিতার গদ্যভাষা বুদ্ধিপ্রধান নয়, রসবোধ-সূচক। তাতে একটা প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা," একটা "ভাববিন্যাসের শিল্প" আছে। কোনো গদ্যে তা নেই। প্রাহার ভাষাবিজ্ঞানীরা সাহিত্যের ভাষাই যে মুখের বা গদ্যের ভাষার তুলনায় বি-সারিত বা *deviant* সে কথা বারবার বলেন। গদ্যকবিতার ভাষাও তাই।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসু দুজনেই কবিতার ভাষা যে দৈনন্দিন বাগ্‌রীতি এবং প্রচলিত গদ্যের কাছাকাছি এসেও পৃথক থাকে, এ সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন এবং লেখ্য গদ্য থেকে দূরবর্তী। এমন-কী যে কবিতা গদ্যের আকারে, লাইন না ভেঙে পাতা জুড়ে লেখা হয়, সাধারণ গদ্য থেকে তার দূরত্বও আমাদের চোখে না-পড়ে পারে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'-র অনেক কবিতায়, কিংবা অরুণ মিত্রের এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

"ছেলেবেলায় আমরা শীতের সকালে হি হি করতাম। পাঁচিলটা রোদ আটকাত। তখন আমি মনে মনে এক তীক্ষ্ণ জেরার সামনে প'ড়ে যেতাম। কেবল প্রশ্ন। কেন এখানে এই পাঁচিল তোলা হয়েছে, কেন এটাকে কেউ ভাঙছে না, ইত্যাদি। অতশত কেনর উত্তর আমার জানা ছিল না। সেজন্য এক রকমের কষ্ট হত। তবে আসল কষ্ট ছিল শরীরে। যেখানে তাপ খুঁজছি সেখানে তাপ নেই। আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের পেছনে হটতে

হত। একেবারে পেছনে, যে-জায়গায় তেরছা একটু রোদ এসে পড়ত। সেটা একটা সীমান্ত তারপর আর সরা চলে না। তারপর খাদ। আমরা তারই ধার বরাবর বসতাম। এতো ভারী অদ্ভুত অবস্থা, আমি ভাবতাম, ওপাশে পাঁচিল আর এপাশে খাদ; তাহলে আমরা কোথায় আছি?"

(শীতের সকালে)[১১]

এ উদ্ধৃতি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বুঝতে পারছি যে, এতে আবেগ লুকোবার একটি সজ্ঞান চেষ্টা আছে, এবং উচ্চারণও বিশেষভাবেই কথ্য ও লৌকিক। তা সত্ত্বেও এর মধ্যবর্তী আবেগের মৃদু তাপ[১২] এবং প্রতীকনির্মাণের সহজ চেষ্টাটি একে মুখের ভাষা থেকে স্পষ্টতই আলাদা করে দেয়, আলাদা করে কেজো গদ্য থেকেও। আমরা কবিতা ও মৌখিক ভাষার প্রাথমিক তফাৎগুলির কথা নাইবা তুললাম। এতো সকলেই জানে যে, মুখের ভাষা বিষয়বদ্ধ কিন্তু বিষয়ের আলোচনায় তা সংহত ও *structured* নয়, কবিতার মতো তার আরম্ভ, বিস্তার ও শেষ নেই, কবিতার লাইনে সে সচরাচর গদ্যের লাইনের চেয়ে অনেক ছোটো, পাতার ডানদিকে খানিকটা সাদা জায়গা যে বাকি থেকে যায়, এবং আবৃত্তি করতে গেলেও যে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে সাধারণভাবে একটু থামতে হয় কমা-দাঁড়ি-সেমিকোলনের সংকেত ছাড়াই, এতেই বোঝা যায় কবিতা শব্দহীনতাকে[১৩] খুব পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে, মুখের ভাষা কখনোই এমনভাবে করে না। অর্থাৎ প্রয়োগে মৌখিক বাগ্‌রীতির খুব কাছাকাছি এসেও, গদ্যের বহিরঙ্গ মেনে নিয়েও কবিতার ভাষা মুখের ভাষা থেকে খানিকটা ব্যবধান সবসময়ে রক্ষা করে। ব্যবধান রক্ষা করে ব্যাবহারিক লিখিত গদ্য থেকেও, কারণ কেজো গদ্যের বিন্যাসে যুক্তির পরম্পরা ও বিস্তার থাকে, বক্তব্যের প্রসঙ্গটি-নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খল থাকে, কবিতায় তা থাকে না।

গদ্যকবিতার ভাষারই যদি এই আচরণ হয়, ছন্দোবদ্ধ প্রথানির্ভর কবিতার ভাষা সম্বন্ধে বেশি বলা বাহুল্য মাত্র। তা খুব স্পষ্ট এবং নিরুপিতভাবেই আলাদা। আমরা লক্ষ করব, ভাষার যে-ক'টি স্তর (*level*) আছে, সব ক'টিতেই কবিতার পরিচিত ভাষা আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। পরবর্তী অংশে শুধু ছন্দের কবিতা আলোচনা করে, আমরা এই বিভিন্নতার প্রতিটি স্তর লক্ষ করব।

২

প্রথমে ধরা যাক 'ধ্বনি' বা *sound*-এর স্তর। মুখের ভাষা, এমন-কী লিখিত গদ্যভাষার শব্দের ধ্বনিবিন্যাসকে কবিতায় একটু-আধটু অদলবদল করা হয়। এমন কথা বলার দরকার নেই যে, কবিতায় কেবল শ্রুতিসুখকর ধ্বনির বিন্যাস করতে হবে, যদিও একসময় স্পষ্ট শ্রবণরঞ্জন ধ্বনির বিন্যাস কাব্যভাষার অন্যতম শর্ত ছিল, কিকেরো (*Cicero*) থেকে ভারতচন্দ্র, অনেকেই তা বলে গেছেন। এই সাজানো ধ্বনির অভিঘাতে কবিতার ভাষা আলাদা হয়ে যায়, একথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এই অভিঘাত যে

মূলত দু-ধরনের, তাও স্পষ্ট। কখনো কখনো একই ধ্বনি বা অক্ষর বা তার চেয়ে বড়ো ধ্বনি-ইউনিটের পুনরাবৃত্তির ফলে শ্রুতি-সুভগতার সৃষ্টি হয়। এ হল ধ্বনির সংগতিময় বিন্যাস যার পরিচিত উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'চল-চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ'; কিংবা একাধিক ধ্বনির পুনরাবর্তনে আরেকটু জটিল উদাহরণ, খ্রিস্টোফার মারলোর—'*melodious birds sing madrigals.*' ধ্বনির বি-সংগতির বিন্যাসও আছে, যেখানে পাশাপাশি নানা বিষমজাতের ধ্বনিকে সাজিয়ে সংগতি ভাঙবার সচেতন চেষ্টা থাকে, তাতে আবার অন্যধরনের, এবং জটিলতার ও আরো তৃপ্তিদায়ক, শ্রুতিসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "কেকাধ্বনি" ('বিচিত্র প্রবন্ধ')[১৪] পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন যে, অতিনিয়মিত অতিনিরূপিত ধ্বনি-সংগতির চেয়ে, অনুপ্রাসের বর্তমানে ঠুনকো-হয়ে-আসা নিক্কণের চেয়ে, বিসংগতিময় ধ্বনি বিন্যাস কবিতাকে অনেক বেশি সম্ভ্রম দেয়।

কবিতার ভাষা নৈঃশব্দ্যকে ব্যবহার করে যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি করে, তার নাম ছন্দ। ছন্দ তৈরি হয় নিয়মিতভাবে ধ্বনি বা উচ্চারণ পরিহার করে, নৈঃশব্দ্যের একটা অন্তর্লীন প্যাটার্নের কাছে শব্দ বা ধ্বনিকে সমর্পণ করে, নৈঃশব্দ্যের দ্বারা শব্দকে নিয়ন্ত্রিত করে। ছন্দ যে কবিতার ভাষাকে আলাদা করে দেয় তা এতই স্পষ্ট যে, এ নিয়ে আর বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু ধ্বনির ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা আরো অনেক ভাবে মুখের ভাষার ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটা উপায় হল লোপ (*deletion*)। কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে অনেক শব্দের (*word*-এর) ধ্বনিগত চেহারা থেকে একটি বা দুটি ধ্বনি খসে যায়। যেমন ইংরেজি কবিতায় মিলের খাতিরে বা ছন্দের খাতিরে *over* হয়ে যায় *o'er, never* হয়ে যায় *ne'er, it is* হয়ে যায় *'tis, there is* হয় *there's, lord* হয় *lor', betwixt* হয় *'twixt;* বাংলাতেও 'উপরে'-র জায়গায় 'পরে, 'তোমায়'-এর জায়গায় 'তোমা', 'দেখিয়া'-র জায়গায় 'দেখি', 'পড়লি'-র জায়গায় 'প'লি', 'চিহ্ন'-এর জায়গায় 'চিন্', 'মুখখানি'-র জায়গায় 'মুখানি', 'গাইবে'-র জায়গায় 'গাবে' ইত্যাদি। আরেক উপায় হল সংযোগ (*addition*)। তাতে ছন্দের প্রয়োজনে একটি শব্দের সঙ্গে কিছু ধ্বনি বা সিলেব্‌ল যোগ করে তাকে একটু টেনে বাড়ানো হয়। পুরোনো ধরনের বাংলা কবিতায় 'ছিল নাক' 'হল নাক' ইত্যাদি প্রয়োগ, হপকিন্সের কবিতার *stress* বা শ্বাসঘাতের চিহ্ন দিয়ে অধুনা-বর্জিত উচ্চারণ পুনরুদ্ধার যেমন *bell-swarmed* (উচ্চারণ *swarm-d*), *wisped, lark-charmed* ইত্যাদি, বাংলা কবিতায় 'নো' 'গো' ইত্যাদি অতিরিক্ত শব্দ ভঙ্গ ব্যবহার। নজরুল 'পৌষ'-কে ভেঙে প্রায়ই 'প-উষ' করেছেন ছন্দের কারণে। আর তৃতীয় একটি প্রক্রিয়া হল রূপান্তরণ (*alternation*)। এতেও ছন্দ বা মিলের, বিশেষত মিলের অনুরোধে প্রচলিত উচ্চারণের হেরফের করা হয়, চালু ধ্বনিকে বদলে অন্য একটি ধ্বনির অবতারণা

করা হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'বালা' বা 'মালা'-র সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্য 'আলো'-কে 'আলা' অর্থাৎ 'ও' ধ্বনিটিকে এই জায়গায় 'আ'-এ রূপান্তরিত করেছেন। বা ইংরেজ কবি *that*-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্য এক সময় *got*-কে *gat* করেছেন এই ভাবে. অগ্‌ডেন ন্যাশ *talcum*-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্য *welcome*-কে *welcum* করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বাঙালি কবিতে এ ধরনের প্রয়োগ প্রচুর আছে, 'ভবভূতি'-র সঙ্গে মিল দিতে 'জুতা' না লিখে 'জুতি', 'কেটলি'-কে 'কাথলি' এই রূপান্তরণের দৃষ্টান্ত। অন্নদাশংকর রায় 'ইয়াহিয়া'-কে তিন মাত্রায় আনবার জন্য করেছেন 'এহিয়া'। ধ্বনির সুবিধা আদায় করবার জন্য কবিরা শুধু যে এই তিনটিমাত্র উপায়ের সাহায্য নেন তা নয়। তাঁরা চালু ও পরিচিত শব্দ ছেড়ে অনেক সময় পুরনো শব্দ গ্রহণ করেন (*archiasm*), যেমন ইংরেজিতে *thou, thee, durst, steven (time), efsoons (straightaway), Phosphor* (ভোরের তারা) , *unshent (unharmed)* ইত্যাদি। আবার কখনো তাঁরা নতুন শব্দ তৈরি করেন, যার নাম *neologism*, লিউইস ক্যারল প্রভৃতি যা করেছেন। আবার কখনো বা অন্য উপভাষা বা অন্য ভাষা থেকে শব্দ এনে বসান। যেমন স্কচ উপভাষার *scone*, ব্যবহৃত *gone* বা *shone*-এর মিল হিসাবে, *bronze*-এর সঙ্গে কেউ মিল দেন ফরাসি *onze*-এর। বাংলায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল দুজনেই এ ধরনের প্রচুর প্রাদেশিক শব্দ (*provincialism*) বা অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন। গত শতাব্দীর বা এই শতাব্দীর গোড়াকার মার্কিন কবিরা নিগ্রো উপভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন ঠিক এইভাবে। *Archaism* এবং *provincialism*-এর মধ্যে সীমারেখা সব সময় স্পষ্ট নয়, কারণ পুরনো শব্দই অনেক সময় উপভাষাগুলিতে থেকে যায়। কিন্তু এই উপায়গুলি রূপান্তর-নির্ভর নয়, নির্বাচন-নির্ভর। অর্থাৎ একটি শব্দ গ্রহণ না করে অন্য একটি শব্দ বেছে নিচ্ছি। এই বেছে নেওয়া ব্যাপারটা ধ্বনিতেও চলে, কিন্তু 'আলো'র বদলে 'আলা'তে যেখানে আমরা একই ধ্বনির ঈষৎ রূপান্তরিত একটি চেহারা পাচ্ছি, ঐ তিন ধরনের শব্দান্তরে, অর্থাৎ *archaism, neologism* এবং *provincialism*-এ—আমরা অধিকাংশ সময় নতুন একটি আস্ত শব্দ তুলে আনছি, পরিচিত শব্দটিকে বাদ দিয়ে। এই শব্দ নির্বাচন বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তাতে দেখব যে, শব্দ নির্বাচনেও ধ্বনির বিবেচনা খুবই কার্যকর থাকে। অর্থাৎ কবিতার মিল এবং ছন্দের মাত্রাও আমাদের বাধ্য করে একটা শব্দের বদলে আরেকটা বেছে নিতে। অন্যান্য (অর্থের, প্রতিক্রিয়ার) বিবেচনা তো আছেই।

৩

ধ্বনির স্তর পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই পদ গঠনের স্তরে। বাক্যে ব্যবহৃত হতে হলে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি লাগানো হয়, পরিণামে যা দাঁড়ায় তার নাম পদ—একথা আমরা জানি। মুখের ভাষা বা গদ্যের ব্যাকরণে পদগঠনের নিয়ম যে কবিতার ভাষায় সব সময় মানা হয় না, তার দৃষ্টান্ত অহরহ চোখে পড়ে। নিচের ডানদিকের প্রয়োগগুলি লক্ষ করি—

সাধারণ গঠন	কাব্যিক গঠন
গাহিতে [-ইতে]	গাহিবারে [-ইবারে]
থামাইয়া [-ইয়া]	থামায়ে [-এ]
আসিলাম [-ইলাম]	আসিনু [-ইনু]
তলায় [-ইতে]	তলে [-এ]
তাকে [-কে]	তারে [-রে]
মুচকে [-এ]	মুচকিয়ে [-ইয়ে]
জন্মে, জন্মিয়া [-এ, -ইয়া]	জন্মি, জন্মিয়ে [-ই, -ইয়ে]

শুধু প্রত্যয়-বিভক্তি নয়, স্ত্রীলিঙ্গ, নির্দেশক বা অন্যান্য ব্যাকরণগত চিহ্নও ছন্দ-মিলের কাব্যিক প্রয়োজনেই জুড়ে দেওয়া হয়, যেমন 'বিষাদিনী বীণা', 'অনাথিনী আশা'; 'মুখটি' না বলে 'মুখখানি', 'ফুলগুলি' না বলে 'ফুলকুল', 'ফুলচয়' ইত্যাদি। মাত্রারক্ষার কারণে অতিরিক্ত বিভক্তির প্রয়োগ ঘটে, যেমন 'সমুখেতে', 'বুকেতে', আবার কখনো-কখনো বিভক্তির লোপও ঘটে, যেমন 'বাঁশরি বাজিছে 'দূর দূর' ('দূরে দূরে' না লিখে), 'বসি মোর পাশ' ('পাশে' না লিখে)। নিশ্চয়ার্থক প্রত্যয় -'ই'র অকারণ প্রয়োগ ঘটে— 'নিরাশারই মতো', 'তোরি', 'তাহারি' ইত্যাদি। মাত্রার প্রয়োজনে 'রে', 'হে', 'লো', 'গো', 'তো', 'সে' ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, মধুসূদন বিশেষ্য-বিশেষণের আগে 'সু'-উপসর্গ প্রায় ব্যাধিগ্রস্তের মতো জুড়ে যান—'সুনাসীব', 'সুচারুহাসিনী', 'সুসিন্দুর', 'সুকনকাসন', 'সুপিকপুঞ্জ'। এর বিস্তৃত আলোচনায় পদগঠন-প্রক্রিয়ার প্রত্যয়ের আরো নানা সূক্ষ্মতর জটিলতা ধরা যায়, কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই।

৪

শব্দ বা পদ-নির্বাচনে আর ব্যত্যয় বা রূপান্তর নয়, সেখানে একটির বদলে আরেকটি শব্দকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গ। বাংলা কবিতার ভাষায় আমরা বিশেষভাবে 'কাব্যিক' (*poetical*) শব্দই কিছু লক্ষ করব। এগুলির গদ্যে বা মুখের ভাষায় ব্যবহার নেই, অন্তত মান্য বা স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় নেই বলেই এগুলি 'কাব্যিক'। বাংলায় ব্যবহৃত এরকম শব্দের উদাহরণ:

বিশেষ্য : নয়ান, স্বপন, সমীর, বধু, মরম, পয়ান, বিজন (=নির্জনতা), তরাস, দুখ, জোছনা, তটিনী, কানন, নিশাস, তৃষা, সলিল, পিয়াস, সজনী, দিনমান, চিত, বায়, লহরী, পুরব, বারতা, খেলেনা, গগন, কিরণ, আঁখি

বিশেষণ : আধো, চারি, আধেক, মৃদুল, শয়ান, একেলা, মলিন, সুকোমল, বিভল, স্তব্ধ, মগন, রত

সর্বনাম : আপনা, মম, তব, মোর, মোদের, তারে, যেথা, সেথা, কোথা, হোথা

ক্রিয়া (নামধাতু সহ) : কহা, (কওয়া), নারা (না পারা), রচা, হেরা, উজলা, জিজ্ঞাসা, নিবারা, ব্যাপা, নেহারা, শুধানো, নিমীলা, প্রবেশা, বাহিরা, পসারা, যুঝা, মুদা (= বোজা) , মুরছা, ভ্রমা, গ্রাসা, ঝংকারা, তেয়াগা, আওয়া ('আইন'-তে ক্রিয়ার এই রূপ), ডরানো, শিহরা, উচ্ছ্বসা

অনুসর্গ : পানে, সাথে, প্রায় (= মতো), মাঝার, তরে, হতে (= থেকে), পারা (=প্রায়), সম, লাগি, সনে, পরি (= উপরি), যথা, বাগে, সমুখে

ক্রিয়াবিশেষণ : সদাই, যেন, আরবার, যবে, কভু, ধীরে, অনিবার, বিরলে, নিরবধি, অনুক্ষণ, মিছা, সভয়ে, সতত, বুঝি, বিফলে, অমনধারা, নিভৃতে, পুন, মধুরে (মধুরভাবে)

তাছাড়া আছে 'কাব্যিক' সমাস। রবীন্দ্রনাথ থেকে তার কিছু উদাহরণ দিই : ঘুমঘোর, সমাধিশয়ন, কেশপাশ, আঁখিপাতা, রবিকর, বরষা-জল, জোছনালহরী, অধরপুট, পাষাণপ্রতিমা, গীতগান, জোছনাহাসি, তরুশাখা, হৃদি-মাঝে, সুখগান, মরীচিকা-সুরা, জগত-অতীত, অশ্রুবারি, অরুণকিরণ, হৃদয়-বাঁশি ইত্যাদি। পরবর্তী প্রবন্ধে ধ্বনির অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমাস-নির্মাণকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করেছে তার একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণভাবে লক্ষ করতে হবে যে, 'কাব্যিক' ও কবিত্বময় শব্দ মূলত শ্রুতি মাধুর্য, ধ্বনিসংগতি ইত্যাদি কারণে প্রয়োগ করা হয়, ধ্বনি তার একটি মৌলিক বিবেচনা।

৫

শুধু পদ-নির্মাণের বা পদ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে নয়, বাক্যে পদ সাজানো বা অন্বয়ের (*syntax*-এর) ক্ষেত্রেও সাধারণ ভাষার নিয়ম কবিরা প্রায়ই লঙ্ঘন করেন। অর্থাৎ বাক্যে যে শব্দের যেখানে বসার কথা তার সেই অবস্থানের হেরফের ঘটানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিচিত যে-পদ্ধতি, তার নাম বিপর্যাস বা *inversion*। এই বিপর্যাস নানা পদবন্ধের ক্ষেত্রেই ঘটে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের গদ্যেও এর নানা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমরা কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

	সাধারণ ক্রম	বিপর্যস্ত ক্রম
১.	বিশেষণ + বিশেষ্য	বিশেষ্য + বিশেষণ
	তরুণী উষা	উষা তরুণী
	প্রচ্ছন্ন সুন্দর প্রেমিক	প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর
	সেই ভালো কথা	সেই কথা ভালো
	কিংকিণীকণিতা বধূ	বধূ কিংকিণীকণিতা
	মায়াবিনী আশা	আশা মায়াবিনী
২.	কর্ম + ক্রিয়া	ক্রিয়া + কর্ম

	আইন পা-দুখানি পুজিতে	আইন পুজিতে পা-দুখানি
	উদ্ধার করি যে-বাণী	যে-বাণী উদ্ধার করি
	রচনার স্পর্ধা তব থামিতে না চায়	থামিতে না চায় রচনার স্পর্ধা তব
	প্রাণনাথে পাব	পাব প্রাণনাথে
৩.	কর্তা + ক্রিয়া	ক্রিয়া + কর্তা
	রঙপুর দেখা দিল	দেখা দিল রঙপুর
	কালের রথ তাহে চলেছে	চলেছে তাহে কালের রথ
	আমি নমি	নমি আমি
	এ চোর রামে ছলিল	ছলিল রামে এ চোর
৪.	অধিকরণ পদ + ক্রিয়া	ক্রিয়া + অধিকরণ পদ
	যুবতী পদতলে বসিলা	বসিলা যুবতী পদতলে
	শেষবেলায় ধরা দিয়েছি	ধরা দিয়েছি শেষবেলায়
	তোমার ঘরে এলাম	এলেম তোমার ঘরে
	পূর্বদিগন্তে দেখা দিল	দেখা দিল পূর্বদিগন্তে

৫. যৌগিক ও সংযোগাত্মক ক্রিয়ার দুই অংশের বিপর্যাস
ছিল না প্রয়োজন, লেগেছে দোল, উঠিল ডাক, এলে না ফিরে, রয়েছে পাতি, না কহিয়া কথা, উঠুক বিকাশি, গেল ডুবি, হয় যেন বোধ

৬. 'না' এবং বিশেষ্য ও সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান বিনিময়
না জানে, নাই সুদিনারা, তবু না হার মানে, তবু সে নহে বাণী, অর্থ তার নাহি জানি।

আরও অনেকরকম বিপর্যাসের উদাহরণ তোলা যায়। এর নানা পরম্পরা আছে, কিন্তু কবিতার *syntax*-এর এটিই প্রধান ব্যত্যয়ের নিয়ম।

৬

আবার একটু তত্ত্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক, মুখের ভাষা এবং গদ্যের ভাষা থেকে এই যে আলাদা হয়ে যাচ্ছে কবিতার ভাষা, এর চরিত্রটি কী? কারো মতে এর চরিত্র প্রাচীনতর ভাষার। টমাস গ্রে নাকি বলেছিলেন সমকালের ভাষা কখনোই কবিতার ভাষা হতে পারে না। তাই বলে কি সে ভাষা প্রাচীনতর হবে? আলোচনাসূত্রে আমরা দেখলাম যে, প্রথানুবর্তী কবিতায় অনেক সময় প্রাচীন কাব্যভাষার অনুসরণ চলে। গদ্য কবিতার বিচ্ছিন্ন অধ্যায় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ নিছক রীতির বা শৈলীর বিচারে প্রাচীন ও ধারাবাহিত

বাংলা কবিতার ভাষাকেই স্বীকার করেছিলেন। এবং প্রাচীন ফ্রেমেই কিছু কিছু নিজস্বতা সঞ্চার করেছিলেন। প্রাচীন এই ভাষার তুলনায় এর শব্দভাণ্ডার অনেক বড়ো, অর্থাৎ এতে 'দেখা' এই ক্রিয়াপদটির পাশাপাশি 'হেরা' 'নিরখা', 'নেহারা', 'লখা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদও আছে। তা ছাড়া আছে নানা মাপের নানা ওজনের শব্দ।

শব্দ	অক্ষর সংখ্যা *Syllable*	১	২	৩	৪	৫
সর্বনাম	এ		ইহা			
			তারা	তাহারা		
			ওদের	উহাদের	উহাদিগের	
ক্রিয়া	যাও		যাহ			
	চাই		চাহি			
			বলছে	বলতেছে, বলিছে	বলিতেছে	
				শুনছিল	শুনিতেছিল	শুনিতেছিল

কবিতায় যেখানে মাত্রার হিসেব খুব জরুরি, সেখানে সিলেব্‌লের দৈর্ঘ্যের খানিকটা স্বাধীনতা মূল্যবান হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই। ফলে বাংলা কেন, প্রায় সব দেশের কবিতাতেই প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির দীর্ঘ অনুবর্তন চলে। তার ব্যাপক পরিসরের মধ্যেই কিছু কিছু নতুন উদ্ভাবন ঘটে, কিন্তু তাতে মূল পদ্ধতিটি হঠাৎ আমূল বদলে যায় না।

সাম্প্রতিক ও 'আধুনিক' বাংলা কবিতায় এই প্রথাগত শৈলী পরিত্যক্ত হয়েছে, এমন আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু প্রারম্ভিক আলোচনায় এও দেখা গেছে যে, মুখের ভাষার যত কাছাকাছি আসুক কবিতার ভাষা খানিকটা দূরে থেকেই যায়, কখনো সম্পূর্ণ কথ্যতার স্তরে নেমে আসে না।

এই যে সামান্য পার্থক্যটুকু থেকেই যায়, এর চরিত্র কী? চেক ভাষা বিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভ্‌স্কি (*Ian Mukarovsky*) বলেছিলেন,[১৫] কবিতার ভাষা ভাষার একটা *norm* থেকে সরে যায়, সরে যায় সৌন্দর্যসৃষ্টির কতকগুলি বিশেষ প্রকরণ সমাধা করার জন্য। স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই সেই *norm*, কবিতার ভাষা স্ট্যান্ডর্ড ভাষার নিয়ম ভাঙে— *"the standard language is the bacground against which is reflected the esthetically intentional distortion of the linguistic components of the norm of the standard"*[১৬]। আমরা বাংলা কবিতার ভাষা থেকে ঐ দূরত্বনির্মাণ ও *distortion*-এর একটা মানচিত্রও মোটামুটি খাড়া করেছি। কিন্তু এতে কবিতার ভাষার স্বরূপ কী দাঁড়ায়? মুকারোভ্‌স্কি বলেন, কবিতার ভাষার কাজই আলাদা। কবিতার ভাষার কাজ হল,

অর্থের দিকে পাঠককে সোজাসুজি ঠেলে না দিয়ে, তার নিজের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এর নাম মুকারোভ্স্কি দিয়েছেন *aktualisace* বা *foregrounding*। বাংলায় বলা চলে প্রমুখণ। *"The function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance"*।[১৭] বিজ্ঞানের ভাষায়, কেজো প্রবন্ধের ভাষায় যা ঘটে তা প্রমুখণের ঠিক বিপরীত, তার নাম *automatization*। সেখানে ভাষার দিকে পাঠক ফিরেও তাকায় না, সোজাসুজি অর্থে পৌঁছে যায়। কিন্তু কবিতার ভাষায় সে ভাষার মনোহারিত্বে প্রথম ব্যাহত হয়।

মুকারোভ্স্কির এই কথা আজ সম্পূর্ণ মানা চলে কি না সন্দেহ। ইলিয়াস শোয়ার্টস (*Elias Schwartz*) নামে সমালোচক তাঁর একটি বইয়ে[১৮] খুব জোরালো একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তিনি রবার্ট ফ্রস্ট-এর সেই বিখ্যাত *"Stopping by the Woods"* কবিতাটি তুলে বলেছেন, এর ভাষায় এমন কী আছে যা শুধু ভাষাতে আমাদের আটকে রাখতে পারে? কিছুই না। কেবল প্রথম লাইনে (*Whose woods are these I think I know*) একটি বিপর্যাস আছে। তা ছাড়া দেখি, লাইনগুলি ছন্দে বাঁধা—কিন্তু কবিতার ভাষা হিসেবে এর ভাষার তো কোনো চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব কিছুই নেই। কাজেই ভাষা নয়, কবিতার পুরো সংগঠন, তার ছন্দ, তার প্রতীকিতা। (এখানে যেমন মৃত্যুর একটি গভীর প্রচ্ছায়া অনুভব করা যায়), তার অভিজ্ঞতা ও অনুভব—সব মিলিয়েই কবিতাটি হয়ে ওঠে। ভাষা বাহনের কাজ করে এবং ভাষার প্রয়োগের পিছনে আদিম ও মৌলিক প্রেরণা ভাবের বা অর্থের। কাজেই মুকারোভ্স্কির লক্ষণ-নির্ণয় কেবল বাইরের দিক থেকে, ভিতরের বা সৃস্টির দিক থেকে নয়। কোনো কবি সচেতনভাবে *norm* থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন বলে তাঁর কবিতা কবিতা হয় না; তাঁর কবিতা কবিতা হয়ে ওঠার পর দরকার মতো *norm* থেকে সরে যায় মাত্র। ভাষাবিজ্ঞান সেই সরে আসার ধরনটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে হয় তো, কিন্তু তা কেন কবিতার ভাষা হয়ে উঠল, এবং কবিতার ভাষার যথার্থ চারিত্র কী তা সে বলতে পারে কিনা সন্দেহ।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত

২. তদেব ৭১ পৃ.

৩. তদেব ৭২ পৃ.

৪. তদেব ৭৮-৮১ পৃ.

৫. তদেব ৭১ পৃ.

৬. দ্রষ্টব্য, 'ছন্দ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত), ১৯৭৬ কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৬২-২৬৪ পৃষ্ঠার তালিকা।

৭. তদেব ২০২-২০৩ পৃ.

৮. তদেব ২২১ পৃ.

৯. তদেব ১৭৭ পৃ.

১০. তদেব ২২১-২২২ পৃ.

১১. দ্র. 'অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ১৯৭২, কলকাতা, ভারবি, ১১৮ পৃ.

১২. এ বইয়েই 'এ জ্বালা কখন জুড়াবে' (৬৮-৬৯) অনেক বেশি আবেগময়।

১৩. যাঁরা কবিতায় শব্দ ও নিঃশব্দের পারস্পরিকতা বিষয়ে কৌতূহল পোষণ করেন, তাঁদের পক্ষে শঙ্খ ঘোষের দুটি বই—'নিঃশব্দের তর্জনী' (১৯৭১, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী) এবং 'শব্দ আর সত্য' (১৯৮২, কলকাতা, প্যাপিরাস) অবশ্যপাঠ্য।

১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৬১, ৭৩২-৩৫।

১৫. দ্র. *"Standard Language and Poetic Language", Freeman, Donald C.* (সম্পাদিত) *Linguistics and Literary Style, 1970, New York (Holt, Rinehart and Winston Ltd.), pp. 40-56.*

১৬. তদেব ৪২ পৃ.

১৭. তদেব ৪৩ পৃ.

১৮. *The Forms of Feeling 1972, New York, London (National University Publications), pp. 20-28*

কবিতার ভাষাবিশ্ব ঃ নৈঃশব্দের গ্রন্থনা

তপোধীর ভট্টাচার্য

'আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
কানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।'

'১৯৪৬-৪৭' নামে বিখ্যাত কবিতায় জীবনানন্দের এই উচ্চারণে যেন কবিতাতত্ত্বের নির্যাস দিয়ে গ্রথিত। দৈনন্দিন অস্তিত্বের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মাত্রা আর সেই মাত্রার প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন আততি ব্যক্ত হতে পারে যে ভাষায় তা নিছক বিবরণের নয়। তেমনি নয় স্যাঁতসেঁতে আবেগের কিংবা রূঢ় ও যান্ত্রিক প্রতিবেদনের। নয় শুধু নির্বাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত অবচেতনের অথবা সুবিন্যস্ত ও সুপরিমিত সুচেতনার। কবিতার ভাষা উদ্ভাসনী আলোর আবার পীড়িত ধুপছায়ার এবং নিবিড় নিরালোকেরও। কার্যকারণ সূত্রে অভ্যস্ত হিসেবি পৃথিবীর সংস্কার ও বিশ্বাসের অচলায়তনকে নির্বিচার মান্যতা দিয়ে নয়, বরং পদে-পদে প্রতিপ্রশ্ন তুলে ধরে আর স্থিতাবস্থাকে ভেঙে কবিতার নিজস্ব জগৎ গড়ে ওঠে। প্রতিমুহূর্তে আত্মবিনির্মাণ করে বলেই ঐ জগতের ভাষায় স্থির অনড় ধ্রুববিন্দু নেই কোনো। নইলে ঈশ্বর গুপ্তের পরে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরে জয় গোস্বামীকে পেতাম না। কিংবা একই কালপর্বে কবিদের মধ্যে এতো আশ্চর্য পার্থক্য ও সমান্তরালতায় গ্রথিত দ্বিবাচনিক ভাষা-পরিসর দেখা যেত না। যেমন : নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, অমিয়-সুধীন্দ্রনাথ, সমর-সুভাষ-অরুণ, সুনীল-উৎপল-বিনয়-শামসুর-শঙ্খ-অলোকরঞ্জন, রণজিৎ-পার্থপ্রতিম-অমিতাভ। এই তালিকাকে দীর্ঘ করা যায় আরো। কিন্তু নামের তালিকা তৈরি এ মুহূর্তে অম্বিষ্ট নয়; নাম শুধু স্বতন্ত্র বাচনিক আকল্পের প্রতিনিধিত্ব স্পষ্ট করার জন্যে।

কবিতার ভাষায় নৈঃশব্দ্যের গ্রন্থনা অপরিহার্য। যা পরিচিত তাকে অপরিচিত এবং যা অপরিচিত তাতে পরিচিতের আভাস তৈরি করে কবিতা নিজস্ব বাচনবিশ্বকে প্রতিষ্ঠা করে। এই যে 'প্রতিষ্ঠা' শব্দটি লিখলাম, তাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারণ অন্য সাহিত্য-মাধ্যমের তুলনায় কবিতা ত্বরিত বিনির্মাণের পক্ষপাতী। অপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে নয়, নতুন নতুন সূচনা-বিন্দু খুঁজে নেওয়ার তাগিদে। জীবন প্রতিমুহূর্তে নতুন হচ্ছে; তার মানে, পুরোনো পথরেখা মুছে দিয়ে নতুন পথের দিশা তৈরি করে নিচ্ছে পরক্ষণেই তাকে অস্বীকার করবে

বলে। এই দ্বিরালাপের সূত্রে জীবন যেমন নবায়মান, তেমনি বাচনও নবপ্রস্থানের দিকে চলেছে অহরহ। ভাষাকে আকরণের বাইরে ভাবতে পারি না; অথচ আকরণোত্তর বিন্যাসের দিকে এগিয়ে যায় বলেই বিবরণের বাধ্যবাধকতা থেকে কবিতার ভাষাকে মুক্ত হতে হয়। প্রয়োজনের সীমা আমাদের ব্যবহার-বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু দৈনন্দিনের অভ্যাস আমাদের চিন্তা-প্রকরণ কিংবা বাক্‌প্রকরণকে যত শৃঙ্খলিতই করুক না কেন, আশ্চর্যে পৌঁছাতে গেলে সমস্ত ধরনের শৃঙ্খল কিংবা শৃঙ্খলের দীর্ঘায়ত ছায়া প্রত্যাখ্যান করতেই হয়।

সময় ও পরিসরের নিরিখে নির্ণীত হয়, কোন্ কবি কতখানি বিনির্মাণ করে ভাষার স্থিতিস্থাপকতাকে কতটা বাড়িয়ে দেবেন। জীবনানন্দ জানিয়েছেন, কোনো নতুন কবি পুরোনো কবিদের তুলনায় ভাষার নতুন বিন্যাসই এনে দেন না কেবল, যথাপ্রাপ্ত জগৎকে নতুন ভাবে পরিকল্পিত করেন এবং সেই জগৎকে প্রকাশ করার জন্যে শব্দ ও অর্থের প্রচলিত অন্বয় থেকে অন্য আরেক সম্বন্ধ-শৃঙ্খল গড়ে তুলতে থাকেন। আবেগ ও প্রজ্ঞার অন্তঃসারকে কতদূর পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারলে শব্দের শিল্পও হয়ে ওঠে নৈঃশব্দের রচনা—তা জীবনানন্দের কবিতাবিশ্ব বারবার প্রমাণ করে। কবিতার জগৎ যে নিরন্তর পুনর্নির্মাণের জগৎ, তা জীবনানন্দ কবিতার নিজস্ব ধরনে আমাদের জানিয়েছেন :

> 'নতুন আকাঙ্খা আসে—চলে আসে নতুন সময়—
> পুরনো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
> নতুনেরা আসিতেছে বলে!' (নির্জনস্বাক্ষর)

আর, অননুকরণীয় প্রবন্ধের ভাষায় আজকের কবির সৃষ্টিবলয় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

'আমাদের যুগে আমরা কতকগুলো পুরনো সত্যকে নতুন করে গ্রহণ করেছি এবং উচ্চারিত করেছি সমাজের ও বস্তুবিশ্বের কতকগুলো নতুন সত্য।...., এই আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে আধুনিক কবি মন; সেই মনের থেকে উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় সৃষ্ট হয় যা—তাই কবিতা। যে কোনো সময়ের যে কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।'

(২)

'চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে' উঠা কাকে বলে, তা-ই তো বুঝে নিই শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' বা 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' এর বেশ কিছু কবিতায়। কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি' বা 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই', উৎপল কুমার বসুর 'আবার পুরী সিরিজ', জয় গোস্বামীর 'উন্মাদের পরিক্রম' এর অজস্র পাঠকৃতিতে। সমাজ ও বস্তুবিশ্বের কিছু কিছু নতুন সত্য এই কবিরা উচ্চারণ করেছেন

বলেই অনুভূতিপ্রদেশ থেকে উদ্‌ভাসনী আলো এসে পড়েছে ভাষায়। নতুন নতুন চিহ্নায়কের গ্রন্থনা তৈরি হয়েছে; নৈঃশব্দের পরিসর সম্পৃক্ত হয়েছে ঐ বিশেষ গ্রন্থনায়। কখনো কখনো কথাও যে হতে পারে নীরবতার অন্য নাম, তা কবিতার নিবিড় পাঠ থেকে বুঝে নিই। 'শুধু কথা, গান নয়—নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবার জীবন'—এরকম বয়ানের গভীর তাৎপর্য এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন জাগিয়ে তোলার মধ্যেই কবিতার ভাষার সার্থকতা। শব্দ দিয়েই নৈঃশব্দের বার্তা পৌঁছে দিতে হয় সংবেদনশীল পাঠকের কাছে। কবিতার মুহূর্তগুলি তাকে যখন যথাপ্রাপ্ত বাস্তব পুনর্গঠিত হতে শুরু করে। 'শব্দের অপরিমেয় অচল বালির মরুভূমি সৃষ্টি' ঝরার বিরুদ্ধেই কবি তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদ রচনা করেন কবিতায়। পাঠকৃতির নতুন বাক্‌সংগঠন মানে নতুন আস্তিত্বিক প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণের নান্দনিক ঘোষণা। সমালোচক ক্রিস্টোফার প্রেণ্ডেরগাস্ট এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন ঃ 'Variations in verb tense (and inood) register not only shifts of narrative perspective but also shifts of eseistential perspection'(১৯৯০:১২)। আবারও জীবনানন্দের কবিতাবিশ্ব থেকে দুটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝে নিতে পারি :

'বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি।' (আট বছর আগের একদিন)

এবং

'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভের চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়,
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে,
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে-ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ওপাশের পাইস-রেস্তরাঁতে।' (ঘোড়া)

এই দুটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি, বাস্তবের গভীরে রয়েছে বাস্তবাতিযায়ী মাত্রা আর শব্দের ভেতরে শব্দাতিযায়ী দ্যোতনা। স্বভাবত এই সূত্রে প্রকট হয়ে পড়ে অস্তিত্বের অন্তর্নাট্য যাকে প্রকাশ করা সম্ভব কেবল চিহ্নায়কের গ্রন্থনায়। এই পরিস্থিতিতে মূর্ত ও বিমূর্ত জগতের ব্যবধারবিধি বদলে যায়, তাদের মধ্যে নতুন ধরনের সেতু তৈরি হয়; আবার চিরাচরিত বস্তু সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয়ে সংকেতের পরাজগৎ দেখা দেয়। দ্বিবাচনিক চেতনার প্রেক্ষিতেই

বড়ো যেখানে সম্ভাবনা ও অসম্ভাব্যতার সংজ্ঞা পাল্টে যায়। সচেতন গদ্যভঙ্গি দিয়ে অনায়াসে কবিতার ভাষায় অন্তর্ঘাত করা যায়। আসলে এতে চিহ্নায়িত পরাভাষার উপকূল প্রসারিত হয় এবং শাব্দিকতার নির্মোক ছিন্নভিন্ন করে জেগে ওঠে নৈঃশব্দ্যের বিপুল পরিসর। একাজ জীবনানন্দ একা করেন নি, অন্য কবিরাও যে করেছেন—তার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ

ক.

'হ্যাণ্ডস্ আপ'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান—ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতর জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু—সুতরাং মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়।' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়: সে বড়ো সুখের সময় নয়,সে বড়ো আনন্দের সময় নয়)

খ. 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে—

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!' (শঙ্খ ঘোষ : রাঙামামিমার গৃহত্যাগ)

গ. তারপর ঘাসের জঙ্গলে পড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্ত দিনের চটি। এবং
আকাশ—আজ দেবতার ছেলেমেয়ের নীলশার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকতো।
সজলের বৌ আর মেয়েটি থাকতো। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবশহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দুজন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।
আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।'
(উৎপল কুমার বসু : পুরী সিরিজের শেষ কবিতা)

ঘ. 'বিগত সহস্র এক জীবনের কথা কিছু মনে করতে পারছি না গৌতম, তুমি শ্মশানে আমার বন্ধু ছিলে একবার তুমি বৃষ্টিতে আমার দেহ ফেলে রেখে পালাওনি সজ্ঞানে আমি তোমাকে জানাতে চাই আজ আমার জ্বলন্তমাথা জেগে ওঠে ঊর্ধ্বাকাশে আমার জীবিত মাথা দেহহীন পড়ে থাকে চিরকাল প্রান্তরের শেষে শুধু বিস্ফারিত চোখ লক্ষ্য করে রাত্রিদের অন্ধ জলাভূমি

থেকে চন্দ্রকরোটির নীচে কালো মোষের কঙ্কালগুলি ডানা মেলে উঠেছে আকাশে.....' (জয় গোস্বামী : রাত্রি, ১৮ই জুন)

যে কোনো পাঠকের নজরে পড়বে কত আলাদা এই চারজন কবির বাচন। বিবরণের একটা আদল আছে হয়তো; কিন্তু এ যে পরাবিবৃতির চিহ্নায়িত জগৎকে সঞ্চারিত করার জন্যে—তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমাদের শুধু লক্ষ্য করতে হয় কীভাবে কূটাভাস ও বিপ্রতীপতার সমারোহ দিয়ে তৈরি ভাষাভুবনেও এককেজন কবি এককে ধরনের অভিজ্ঞান খোদাই করে যান। জন্মান্ধ মেয়েকে জ্যোৎস্নার ধারণা দেওয়ার জন্য রাত্রির মরুভূমি জাগিয়ে রাখার কথা যিনি লিখতে পারেন, সেই কবি কখনো কী নিছক শব্দের গ্রন্থনা করতে চান? আসলে এই বাক্‌ব্যবহার তো শব্দান্তবর্তী নীরবতাকে প্রকট করার জন্যেই পরিকল্পিত 'গুম স্তব্ধতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে মেঘ তার শ্রাবণ সমেত / বাক্স ও পঁটুলি নিয়ে'—এও নিরুপম নীরবতার ভাষিক অনুবাদ। কবি মাত্রেই নৈঃশব্দ্যের অনুবাদক কখনো, কখনো বা ভাষ্যকার। কবির বাচনে ভাষাহীনতার সীমানা চিনিয়ে দেয় ভাষা কিংবা উল্টো করে বললে, ভাষার সীমান্তগুলি দেখিয়ে দেয় সরব নীরবতা। এই মৌন অনুভূতির বিশিষ্ট এক ধরন লক্ষ্য করি শঙ্খ ঘোষের কবিতাবিশ্বে যখন তিনি লেখেন : 'এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো / শব্দহীন হও (আয়ু)। কিন্তু এই শব্দহীন হওয়ার আকাঙ্খাকেও ব্যক্ত করতে হয় শব্দের মধ্য দিয়েই। অবশ্যই যান্ত্রিক শব্দের মধ্য দিয়ে নয়। কেননা জীবনের নির্যাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ও যান্ত্রিক প্রকরণ-সর্বস্বতার দাপট যথার্থ কবির ঈপ্সিত হতে পারে না।

(৩)

উপন্যাসের পাঠকৃতি যেমন গড়ে ওঠে ঔপন্যাসিকতার বহুস্বরিক গ্রন্থনায়, কবিতার বয়ানও তেমনি কাব্যিকতার নিবিড় উপস্থাপনায় জন্ম নেয়। কাকে বলব এই কাব্যিকতা, তার মীমাংসা-সূত্র পেয়েছি এই নিবন্ধের সূচনায়, জীবনানন্দের বাচনে। নিরর্থক বা একরৈখিক তথ্য সন্নিবেশে ভারাক্রান্ত আমাদের জীবন; তাতে আর যাই হোক, ইপ্সিত জ্ঞানের উদ্ভাসন ঘটে না। আহরণ-জীবী সভ্যতায় সংকলিত জিনিসের ভিড় বেড়ে যায় শুধু। এই ভিড়ও সাম্প্রতিক মানুষের অনস্বীকার্য অভিজ্ঞতা নিশ্চয়; কিন্তু সেইসব অভিজ্ঞতার সাংবাদিক-সুলভ উপস্থাপনায় কাব্যিকতা থাকে না। যথাপ্রাপ্ত বাস্তব যখন অভ্যাসের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরই ভেতরে আবিষ্কার করে অনাবিষ্কৃত অপরিচিত পরিসর, সেই মুহূর্তই কাব্যিকতার জন্ম-মুহূর্ত। একে প্রচলিত বাক্ ব্যবহার দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না বলেই সূক্ষ্ম ও তির্যক উপস্থাপনার উপযোগী অনুপম বাচনের রীতি খুঁজে নিতে হয়। শাব্দিকতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন নৈঃশব্দের শতদল-ঝর্ণার ধ্বনি উৎসারিত হয়ে ওঠে তখন। এব্যাপারে প্রত্যেক সার্থক কবির পদ্ধতি যে আলাদা এবং আলাদা হওয়ার পরেও যে রয়ে যায় সম্ভাবনার অনন্ত পরিসর—তা প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তগুলির নিবিড় পাঠ থেকে বুঝে নিতে পারি। অর্থাৎ 'কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিঙড়ে

নিয়ে অভিনব বাচনিক বিন্যাসের ধারাবাহিক পরিশীলন কবির পক্ষে অনিবার্য। বহুমাত্রিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞান থেকে উপকরণ ও নির্যাস শুষে নিয়ে পাঠকৃতি গড়ে তোলে তার নিজস্ব চিহ্নায়ন। প্রতিটি বস্তুই সংবেদনশীল কবির পক্ষে চিহ্নায়ক, তবে তার ব্যবহার-বিধি জানতে হয়।

ক্রিয়া-বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি দিয়ে বস্তুকে বিবৃত করা হয় না কেবল, বস্তুর অন্তঃশায়ী চিহ্নায়কদের জাগিয়ে তোলা হয়। অনুভূতিদেশ থেকে পাওয়া আলো তথ্যকে সত্যে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের পথেই আসে কাব্যিকতা। এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল থাকে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস জুড়ে; তখন ক্রিয়া নিছক ক্রিয়া আর বিশেষণ নিছক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দকে অনবরত নতুন প্রাণ দিয়ে সঞ্জীবিত করে নৈঃশব্দ্য, এই উপলব্ধি কাব্যিকতার অভিজ্ঞান। প্রশ্নটা সহজ বা জটিল হওয়ার নয় কেননা খুব আটপৌরে সহজ বাচনে ও পরাবাচনের দ্যুতি যে পাওয়া যেতে পারে, তা জীবনানন্দ দেখিয়েছেন অজস্রবার। 'সে কেন ডালের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' কিংবা 'আকাশের ওপারে আকাশ / বাতাসের ওপারে বাতাস'—এর মতো বাক্-ব্যবহারে তার অসামান্য নিদর্শন রয়েছে। অরুণ মিত্রের ভাষায় এ যেন 'পালকের মতো কথা'। আবার জটিলতা সম্পর্কিত আধুনিকোত্তর ধারনার গভীরে না গিয়েও বলা যায়, পরাপাঠনের বিদ্যুৎ স্পর্শে জয় গোস্বামী-রণজিৎ দাশ-দের কবিতার ভাষা প্রবলভাবে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত।

এদের বয়ানেও নৈঃশব্দ অন্তর্বয়ন হিসেবে উপস্থিত; তবে তার ধরনটি সময় ও পরিসরের নবায়মান দ্বিরালাপে অনুভূত ক্রমাগত পার্থক্য-প্রতীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ধরা যাক্ এই ক'টি কবিতা পঙ্ক্তি ঃ

ক. 'চল্লিশ বছর আমি ঘুরে ঘুরে যা দেখেছি, সমস্ত তোমার
প্রণয়দ্বিধার দৃশ্য। কোনও জলাশয়, কোনও বাস্তবতা দেখিনি কোথাও।
ধাইবুড়ি, ফেরিঘাট, সূর্যাস্ত, রোশনচৌকি, রাত্রির গম্বুজ
যেটুকু বাস্তব, সেও রূপকের বাস্তবতা—তোমার নির্দেশে,
কাকতাড়ুয়ার মতো দৃশ্যমান, শূন্যতার আনাচে-কানাচে।
(রণজিৎ দাশ : আগুন ও জলের কবিতা)

খ. 'দুঃস্বপ্ন ভেঙে যায়। ভেঙে যায় আয়না ও আত্মপরিচয়
চূর্ণ-বিচূর্ণ এক কাঁচ আর কাতরতা, ভাঙা গানের কলির মতো,
ছড়িয়ে থাকে সারা বিশ্বময়
বুঝতে পারি, মৃত্যু বলে কিছু নেই, শুধু ম্যাজিক আছে, রূপান্তর আছে—
কেবলই অশ্রুর খোঁজে, শিশিরের খোঁজে, ক্রুশবিদ্ধ রক্তবিন্দুর খোঁজে।'
(রণজিৎ দাশ : অশ্রুহীন একুশদিন)

এই যে চিহ্নায়কের পরে চিহ্নায়ক তরঙ্গায়িত অস্তিত্বের মূর্চ্ছনা তৈরি করছে, তার ধ্রুবপদ : 'রূপান্তর আছে'। এই রূপান্তরের সঞ্চারই কাব্যিকতার মূল প্রেরণা। 'পথ থেকে পথে / রাংতা কুড়োনো এক ফুটপাত-বালকের মতো' ক্লান্তিহীন কবিসত্তা পরিক্রমা করে।

কোনো কিছু 'বলা'র জন্যে নয়, অনুভূতির পরম্পরা এবং অস্তিত্বের ভেতরকার অজস্র অন্ধবিন্দু ও অপর পরিসরের উপলব্ধি সঞ্চার করার জন্যেই লেখেন কবিরা। তাঁদের কাব্যিকতায় 'চিতাগ্নিসক্ষম আত্মা'র বিষাদ থাকে, উদাসীনতাও থাকে। থাকে সত্তার নগ্ন উন্মোচন এবং 'কাল্পনিক রূপমরীচিকা'র প্রত্যাশাও। কোনো এক মুহূর্তে তাঁর মনে হয় 'সমস্ত কাব্যই বুঝি ছদ্মবেশী ইন্দ্রিয়প্রবন্ধ' আবার অন্য-কোনো মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করেন ত্রিশঙ্কু অবস্থানে 'একটি কালো ও স্তমিত বিয়োগচিহ্নের মতো'।

এইসব অভিব্যক্তি জুড়ে রয়েছে শব্দের শব্দাতিযায়ী প্রবণতা। অভ্যাসের সীমানা পেরিয়ে যাওয়াতে দেরিদা-কথিত 'ungrammaticality' এর বিচিত্র ধরন লক্ষ্য করি। প্রচলিত বাক্-ব্যবহারের ইচ্ছাকৃত বিপর্যাসে পদান্বয়ে যে আততি তৈরি হয়, তাতে তাৎপর্যের সংগঠন আমূল বিনির্মিত হয়ে যায়। আসলে শব্দাশ্রিত তাৎপর্যের অন্বয়রীতিকে অনবরত ধ্বস্ত করতে করতে জেগে ওঠে কাব্যিকতা। নতুন নতুন সাংকেতিক তাৎপর্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা কীভাবে বাচনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তার প্রতি ইশারা করার চেষ্টায় কাব্যিকতার জন্ম। সংযোগের এই নতুন প্রকরণে সবচেয়ে আগে যা অস্বীকৃত হয়, তাহলো প্রণালীবদ্ধ সাহিত্যিকতা। পরাবাচনের নতুন নন্দনের দিকে ইশারা করেই কাব্যিকতা নিজের অভিনব-উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাঠকৃতির তাত্ত্বিকেরা যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে 'macro-micro textual continuum' (Dijk : 1972:92) বলেছেন, প্রকৃত কাব্যিকতার উৎসে রয়েছে সেই প্রবণতার সূক্ষ্ম ও নিবিড় অভিব্যক্তি। স্বভাবত কবিতায় মৌলিকতার নিদর্শন সম্পর্কিত পুরোনো ধারণা ও আমূল বদলে গেছে। বাচনের মধ্যে এখন একই সঙ্গে দেখতে পাই বিস্তার ও সংকোচন কিংবা কেন্দ্রাতিকা ও কেন্দ্রাভিকা প্রবণতা নির্মিতির কুশলতা ও বিনির্মাণের তাগিদ। আসলে প্রতিটি পাঠকৃতিই মহাপৃথিবী ও অণুবিশ্বের পুরোনো অভিজ্ঞতা ও নতুন উপলব্ধির টানাপোড়েনে আকীর্ণ। আন্তোনিয়ো গার্সিয়া-বেরিয়ো এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন : 'For the modern artistic consciousness the anxiety of artistic merit is established by the degree of each text's exclusion preferrably in terms of its inacroteset with respect to the space conventionalized by typologies of preceding macro-textual solutions.'(১৯৯২ : ৮৪)

(৪)

এই মন্তব্যের নিরিখে জয় গোস্বামীকে 'প্রলাপ লিখন'-এর বয়ানে কাব্যিকতার নব্য আধুনিক ধরন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। প্রাগুক্ত টানাপোড়েন কত বিচিত্র ভাবে ব্যক্ত হতে পারে, এই দীর্ঘ কবিতায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে :

'শোনো এ দীনের বাণী, কবিতা কল্পনালতা শোনো
হাই আর ক্ষুধামান্দ্য, ছন্দ আর নিঃশ্বাস গোধূলি
দোকান আর নোংরা ফুল, জালা আর টিনের গেলাস

চা আর চায়ের ভাঁড়, ভাঁড় ভাঙলে মালিকের চড়
সাট্টা আর তাসবংশ, পয়সা আর পয়সার জোর
শুঁড়ি আর শুঁড়ির সাক্ষ্য, জন গোঁসাই, 'যামিনী বিভোর....'

এ তো সময়েরই ভাষা; দৈনন্দিন বাস্তব থেকে কুড়িয়ে আনা অনুপুঙ্খ দিয়ে তৈরি চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় ফুটে উঠেছে এই বার্তা : উচ্চবর্গীয় আভিজাত্য খচিত সময়ের সমান্তরালে রয়েছে আটপৌরে ব্রাত্য নিম্নবর্গীয় অপর সময়ের কার্নিভাল-তুল্য উপস্থিতি। আজকের কবি কবিতা-কল্পনা-লতাকে সেই উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে বাচনে আপাত-তুচ্ছ বস্তুকেও চিহ্নায়কে রূপান্তরিত করেছেন।

পরবর্তী স্তবকগুলির নিবিড় পাঠ থেকে বুঝে নিই, সাধারণভাবে যে-সব শব্দকে নিতান্ত লঘু ও গভীরতর ভার বহনে অক্ষম বলে মনে হয়—কবির সূক্ষ্ম ব্যবহার-বিধির কল্যাণে সেইসবও 'Privileged verbal structure' হয়ে উঠতে পারে। গার্সিয়া-বেরিয়ো ভেবেছেন : 'The asthetic effect of poeticity takes shape through a privileged verbal structure, which by definition cannot be reduced to any prior conventional foresight.' (তদেব : ৮৯)। জয়ের এই দীর্ঘ কবিতাটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে পূর্ব-নির্ধারিত বাক্‌বিধি থেকে ক্রমাগত মুক্ত হয়ে যাওয়াই কবির অভিপ্রায়। কাব্যিকতার নান্দনিক প্রতিক্রিয়াও এইসূত্রেই গ্রথিত। এইজন্যে জয় কিংবা রণজিৎ অথবা শক্তি বা উৎপল এবং এরকম অন্য মৌলিক কবিরা অনবরত সেই পাঠকৃতি রচনা করে চলেন যার আকল্প হুবহু পুনরাবৃত্ত হয় না এবং যাকে পূর্বানুমানও করা যায় না। তাই প্রতিটি মুহূর্তেই নতুন অর্জন এবং বিনির্মাণ সমান্তরাল ভাবে সত্য। 'প্রলাপ-লিখন' এর প্রতিটি স্তবকে এই সত্যের বিস্মরণ ঘটেছে। বাচনের পুনরাবৃত্তিহীন প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি এভাবে :

'বস্তুপিণ্ড ক্ষয়শীল। মনপিণ্ড গা'বমি গা'বমি।
পরমুখাপেক্ষী দিন, অপরে নির্ভরশীল বেলা
বয়ে যায়, চেপে বসে, ঘন্টী মারে, পরিচিতিদের
প্রভুদাস নাম নিয়ে সর্বজন সমক্ষে দাঁড়ায়
ক্রোধ। প্রতিশোধ। ক্রোধ—মধ্যিখানে এক অস্ত্রহীন
ভগবান বসে থাকে, তার মুখ চাটে সোনার হরিণ

জনকজননী হাওয়া, বয়ে এসো, সে-চোখ মুছাও
যে-চোখ চোখের জল কি জিনিস ভুলে গ্যাছে তাও
জনকজননী মেঘ, ছায়া করো পড়োশির বাড়ি
ছায়া করো পাড়াময়, পাশাপাশি আমার ছাদেও
দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যেয়ো, বেশিক্ষণ থাকতে বলবো না।.....'

তাত্ত্বিকেরা যাকে 'Poetica–narative fictionality' বলেন—এখানে তার

অসামান্য দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। এধরনের কাব্যিকতায় ভাষার ব্যবহারিক ধরন আমূল পাল্টে যায় এবং মৌলিক পরা-আখ্যানের ছায়ায় নিবিড়তর হয়ে ওঠে শব্দ ও নৈঃশব্দের যুগলবন্দি। বিভিন্ন উৎসজাত শব্দাবলী কবির নিজস্ব অধিবাস্তবের ইঙ্গিতে কীভাবে অনায়াসে অন্যোন্য সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে, চেতনা মিশে যেতে পারে অবচেতনে আর বিবৃতি সম্পৃক্ত হয়ে যায় প্রতীকিতায়—তা জয়ের কবিতা-বিশ্বে লক্ষ্য করি। ব্যাকরণের পদান্বয়-বিধিকে কবি-কল্পনার নিজস্ব পদান্বয় নিরন্তর বিনির্মাণ করে চলে আশ্চর্য পুনর্নির্মাণের তাগিদে। এই প্রক্রিয়া, আগেই লিখেছি, মৌলিক, পূর্বানুমানহীন ও পুনরাবৃত্তির বাইরে। যদি কখনো পুনরাবৃত্তি দেখি, আমরা বলি, কবি শাব্দিকতার ফাঁদে পড়েছেন। নৈঃশব্দ্যের অপার জলধি মন্থন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

কবিতাবিশ্ব চিরকালই নির্মীয়মান থাকে কারণ কাব্যিকতার উৎস অনন্ত এবং অভি-প্রতিও সীমাহীন। বাচনের নতুন বিন্যাস নৈঃশব্দ্যের সীমা নির্দেশ করে না, তার সম্ভাবনার কর্ষণ যোগ্যতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে শুধু। আমরাও কবিতা পড়ি এই সম্ভাবনার নিকর্ষ সম্পর্কে নতুনভাবে অবহিত হওয়ার জন্যে। চমৎকার মন্তব্য করেছেন গার্সিয়া-বেরিয়ো : 'Poeticity translates a cosmovision to the testenal discourse' (তদেব : ৯১)। ঠিক। এই প্রত্যয়ে পুনঃদীক্ষিত হওয়ার জন্যেই আমরা প্রত্যেকে প্রিয় কবিদের রচনা পড়ি। নিজেদেরই বলি ঃ

> 'প্রতিভা, বেরিয়ে পড়ো ঝাড়া হাত-পা পথিক আর পথ—
> তৃপ্ত থাকবে 'না' আর খণ্ড কবিতায় ভবিষ্যৎ
> —'জীবন, মহাকবিতা, তিক্ত অতিরিক্ত স্বপ্ন শ্লেষে
> লিখিত হয়েই আছে', যাও তুমি উদ্ধার করো পাঠ।'
>
> (জয় গোস্বামী : প্রলাপলিখন)

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ ভারতীয় প্রেক্ষিতে

বিপ্লব চক্রবর্তী

'বাঙালি ভোলে না কভু কর্তব্য তার জন্মভূমির প্রতি'— এ উক্তি বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রাহ্মনিয়া ভারতীর। 'ভারতমাতার অমূল্য পতাকা' কবিতায় কবির এই উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতী নিজে ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি। উনিশ শতকের বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর ওপর পড়েছিল। শুধু ভারতী নন, উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিক বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অনুপ্রাণিত বা আলোকিত হয়েছেনও বলা যায়।

আধুনিক ভারতীয় কবিতার উন্মেষ ঘটেছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। সে সময়ে বাঙালি কবিদের রচনা অন্যান্য প্রদেশের কবিদের প্রেরণা দান করেছিল। আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেরণা ও অবদান অনস্বীকার্য। তথাপি ভারতীয় সাহিত্য তথা ভারতীয় কাব্যধারার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাষার কবি সাহিত্যিকদের সামগ্রিক সৃষ্টি প্রবাহে। তাই আধুনিক ভারতীয় কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতার যোগাযোগের স্বরূপ বোঝা প্রয়োজন।

উনিশ শতকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশে বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, তামিল তেলুগু, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, কন্নড়, মালয়ালম প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার লেখকেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে ভারতীয় কবিতায় যেসব প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তা হল এইরকম ঃ

১. ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবগাথা রচনা।
২. বিদেশী শাসকের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ।
৩. পরাধীন জাতির দুঃখ দৈন্যের বর্ণনা।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনামূলক আখ্যান রচনা।
৫. জাতীয় মূল্য বোধের প্রতিফলন।
৬. জাতীয় বীর নায়ক চরিত্রের বর্ণনা।
৭. ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে আশাবাদী মনোভাব।

এই সব লক্ষণ সবভাষাতেই সমানভাবে প্রকাশ পায়নি। অনেকক্ষেত্রে বাঙালি কবিদের রচনা অন্যদের প্রেরণা দিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চেতনা উনিশশতকের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান স্বরূপলক্ষণ হয়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে অবশ্য তা ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা মাত্র। মূলত সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রেই এই ধরনের চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়ে ওঠেনি। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে যত — উপন্যাস বা নাটক রচিত হয়েছিল কাব্যকবিতা তত নয়। কারণটাও খুব স্পষ্ট। প্রচার মূলক কাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহ ছিল না নিশ্চয়ই। তবে গুজরাতি কবি নর্মদের মত কোনো কোনো সংস্কারবাদী কবি অবশ্যই এ বিষয়ে সৃষ্টিশীল ছিলেন। এই বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বীরেশ, দয়ানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকদের প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত আধুনিক কবিতাতেও ছিল।

আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে। শুধু জাতীয়তাবাদ বা সমাজ সংস্কার নয়। কাব্যের প্রকার ও প্রকারণ নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্য অনেক ভারতীয় লেখককে অনুপ্রেরণা দান করেছিল। তার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার মিশ্রণ ঘটেছিল স্বাভাবিক কারণে। কালক্রমে গীতিকবিতা ও খ' কবিতায় আধুনিক ভারতীয় কবিতার পথ প্রশস্ত করেছেন। ১৮৮৭ সাহে গুজরাতি কবি নরসিমহারাও ভোলানাথ দিবেদিয়া 'কুসুমমালা' গীতিকাব্য সংকলনটি প্রকাশ করেন। আর বিহারীলালের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তথাপি মহাকাব্য লেখার প্রবণতা কমে যায়নি। ভাইবীর সিংহ (পাঞ্জাবী), অঙ্গনঘল সিং (মনিপুরী), সুবেন্ত মোহন ঝা সুমন (মৈথিলী), লক্ষ্মী প্রসাদ দেবকোটা (নেপালী)। ফতুরানন্দ (ওড়িয়া) প্রমুখ কবিরা মহাকাব্য রচনায় আধুনিক ভারতীয় কবিতায় যশস্বী হন।

দুই

অস্বীকার করা উপায় নেই যে মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্য রচনা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনেক কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিচের ছকের দিকে তাকালে তা বোঝা যাবে ঃ

	কবি ও কাব্য	ভাষা ও প্রকাশকাল	মূল বাংলা রচনা	রচনার ধরণ
১.	ভারতেন্দুর 'ভারত ভিক্ষা	(হিন্দী (১৮৭৫)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত ভিক্ষা	অনুপ্রাণিত রচনা
২.	মাধবানুজ-এর মেঘনাদ বধ	ম রাঠি (১৮৯৮)	মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধকাব্য'	অনুবাদ
৩.	মাধবানুজ-এর সোম আনি তারা	মরাঠি (১৯০১)	মধুসূদনের সোমের প্রতি তারা'	অনুবাদ
৪.	দৌলতরাম পা' ার 'ইন্দ্রজিৎবধ'	গুজরাতি (১৮৮৭)	মধুসূদনের মেঘনাদবধ	অনুপ্রাণিত
৫.	রমাকান্ত চৌধুরীর 'অভিমন্যু বধ'	অসমীয়া (১৮৮৮)	ঐ	অনুপ্রাণিত
৬.	ভোলানাথ দাসের 'রাবণবধ'	ঐ	ঐ	ঐ
৭.	রাধানাথ রায়-এর মহাযাত্রা	ওড়িয়া (১৮৯৯)	ঐ	ঐ
৮.	উল্লুর-এর গুরুনাথন	মালয়ালম	রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'	অনুপ্রাণিত

প্রধানত দু'ধরণের রচনা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত — অনুবাদ ও অনুপ্রাণিত রচনা। দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র, কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিলেন। মধুসূদনের মহাকাব্যিক শৈলী অনুসরণে অনুবাদ ও অনুপ্রাণিত দু'ধরনের রচনা কম রচিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও অনুসরণ আধুনিক ভারতীয় গীতি কবিতার পথ উন্মুক্ত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরবর্তীকালের ভারতীয় কবিদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালয়ালম কবি শঙ্কর কুরূপ ১৯৫৯ সালে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজমের গভীর প্রভাব পড়েছিল কুরূপের রচনায়। মালয়ালম ভাষার আর একজন কবি উল্লুর পরমেশ্বরম আয়ারের নামও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তার 'গুরুনাথম' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার পরোক্ষপ্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রায় প্রতিটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই রবীন্দ্র প্রভাবিত কবির সন্ধান পাওয়া যায়। নিচের ছকের দিকে তাকালে তা বোঝা যাবেঃ

	কবির নাম	ভাষা	মূল বাংলা রচনা
১.	শঙ্কর কুরূপ	মালয়ালম	রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজমের দ্বারা প্রভাবিত
২.	উল্লুর পরমেশ্বরম	ঐ	'জীবনদেবতা'র পরোক্ষ প্রভাব
৩.	বি. বি. বোরকর	মরাঠি	গীতাঞ্জলি
৪.	বি. আর তম্বে	মরাঠি	ঐ
৫.	জি. আপ্পারাও	তেলুগু	গদ্যকবিতা
৬.	নিয়াজ ফতেপুরী	উর্দু	'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ
৭.	ফারুক গোরখপুরী	ঐ	ঐ
৮.	শান্তি ভেঙ্কটেশ আইয়েঙ্গার	কন্নড়	রবীন্দ্র জীবনী প্রণয়ণ
৯.	মধুসূদন রাও	ওড়িয়া	ঈশ্বরবোধ প্রকৃতি বর্ণনা

এই তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা সম্ভব। তবে তার পরিবর্তে এটুকু বললে আপাতত যথেষ্ট হবে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব ভারতীয় কবিতার বিচিত্র ও বহুমুখী হয়েছে।

৩

শুধুমাত্র প্রভাবের পরিমাপ করলে বাংলা কবিতার ভারতীয় প্রেক্ষিত বিচার সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বাংলা কবিতার প্রভাব একটা সময় অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিদের ওপর পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আধুনিক কাব্য কবিতার ধারা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়েছে। সব ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ও রূপ একরকম হয়নি। তবে বিশ শতকের কাব্য ধারার বিচারে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কাব্য কবিতায় কতকগুলো সাধারণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষার কাব্যধারার প্রধান প্রধান যুগগত বৈশিষ্ট্যগুলোর

তুলনামূলক আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ হিন্দী কবিতার কথা বলা যায়। আধুনিক হিন্দী কবিতার ইতিহাসে ছায়াবাদ, প্রগতিবাদ, নই কবিতা, ইত্যাদি নানা ভাগ দেখা যায়। ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্থ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', মহাদেবী ভার্মা প্রমুখ কবিদের রচনা সর্বত্র এক রকম ছিল না। তবুও এঁদের রচনার কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ ছিল। যেমন—

১. নিয়ন্ত্রিত ছন্দ ও তালের ব্যবহার

২. একধরনের অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ

৩. খড়িবলি ভাষায় রচনা ও উৎকর্ষ

৪. ব্রজভাষার সঙ্গীতময়তা ও সুরের ব্যবহার

৫. একাধিক অর্থগত স্তরের বিন্যাস

উল্লেখ করা চলে যে ছায়াবাদী কবিরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও বোধের কাব্যিক প্রকাশ অবশ্য সবার ক্ষেত্রে সমান ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রায় কছাকাছি সময়ে হিন্দী এবং কোনো কোনো ভারতীয় ভাষার কবিতায় প্রগতিবাদের ছোঁয়া লাগে। কন্নড় কবিতাকে যদি প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর —দু'টি যুগে ভাগ করা যায় তবে প্রগতিশীল কবিতার স্থান হল এ দু'য়ের মাঝখানে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের কবিতাকে বলা নব্যোদয় কবিতার যুগ। এযুগে জাতীযতাবাদী রোমান্টিক কবিতার প্রাধান্য। ঠিক যেমন হিন্দীতে ভারতেন্দু যুগে ঘটেছিল। প্রগতিশীল কবিরা তাতে নতুন সুর যোজনা করেন।

শুধু হিন্দী বা কন্নড় নয়, ভারতের অধিকাংশ ভাষার কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তিরিশ এবং পরবর্তীকালের কবিতায় প্রগতিবাদের প্রকাশ ঘটেছিল। অধিকাংশ কবিরাই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা, আশা ও সংগ্রামকে ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রগতিবাদী কবিদের কাব্যরচনার প্রবুদ্ধ করেছিল।

প্রগতিবাদী কবিদের মধ্যে হিন্দীতে নাগার্জুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে প্রগতিবাদের প্রকাশ একই সময়ে ও সমভাবে ঘটেনি, কিন্তু প্রগতিচিন্তার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল। প্রথম দিকে প্রগতিবাদী আন্দোলন সুসংগঠিত ছিল না। চল্লিশ পরবর্তী কালে ভারতীয় কবিতায় প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতা অবশ্য এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

'জয়ন্তী' (১৯৪৪) পত্রিকায় প্রকাশিত কমল নারায়ণ দেবের — 'প্রগতিবাদী কবিতার টেকনি ক প্রবন্ধটি অসমীয়া প্রগতি কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। ভবানন্দ দত্তের 'রাজপথ', অমূল্য বরুয়ার 'কুকুর' প্রভৃতি কবিতায় ধনী দরিদ্রের ব্যবধান, ও শ্রেণী চেতনার প্রকাশ ছিল। পরবর্তীকালে হেম বরুয়া, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, হীরেন গোঁহা, প্রমুখ কবি লেখকরা সমৃদ্ধ করেছেন প্রগতিবাদী অসমীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক পরাধীনতা — এসবই ছিল প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রধান বিষয়। সমাজ বাস্তবকে তুলে ধরাটাই ছিল লক্ষ্য। তার সঙ্গে মিশে ছিল আশা ও বিশ্বাস ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। চল্লিশের যুগে প্রগতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বহু বাঙালি ও অবাঙালি কবি-সাহিত্যিক। IPTA, YCI প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর অবদান ও স্মরণযোগ্য। ফলে চল্লিশের বাংলা কবিতায় নতুন সুর শোনা গিয়েছিল। শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রগতিবাদী কবিরা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের জীবনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রগতিবাদী কবি ও কাব্যের নির্বাচিত তালিকার দিকে তাকালে তা বোঝা যাবে ঃ

	কবি ও কাব্য	বিশিষ্ট কাব্য	ভাষা	প্রকাশ
১.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিক	বাংলা	১৯৪০
	কুসুমাগ্রহ	বিশাখা	মরাঠি	১৯৪২
	বিন্দা করন্দিকর	স্বেদগঙ্গা	মরাঠি	১৯৪৪
	আন্নাভাউ সাঠে	শহীর	মরাঠি	১৯৪২ (?)
	দিনকর (রামধরিষ)	হুংকার	হিন্দী	১৯৫০
	নাগার্জুন	আকাল	হিন্দী	১৯৪৪
	মুক্তিবোধ (গজানন)	তার সপ্তক (সং)	হিন্দী	১৯৪৩
	মনমোহন মিশ্র	মুক্তিসঙ্গীত	ওড়িয়া	১৯৪৪ (?)
	দাশরথি	অগ্নিধারা	তেলুগু	১৯৪৯
	শরচ্চন্দ্র মুক্তিবোধ	'যান্ত্রিক'	মরাঠি	১৯৫৭
	শ্রীশ্রী	ঝঞ্ঝা	তেলুগু	১৯৭৬

বলাবাহুল্য, এই তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাত্র কয়েকটি ভাষার কয়েকজন নির্বাচিত কবির কাব্যেরই উল্লেখ করা হল। তবে শেষোক্ত কাব্যটি একটা সাম্যবাদী তেলুগু কবিতার সংকলন। প্রগতিবাদী কবিতা আন্দোলন যে থেমে যায়নি, তা নতুন ভাবে ও ভাবনায় বিকশিত হয়ে চলেছে এ সংকলন তারই প্রমাণ। এমন সংকলনের অনেক উদাহরণ পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলোতেও পাওয়া যায়।

৪

স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতীয় কবিতার ইতিহাসে 'নতুন কবিতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে এই নতুন কবিতা বর্ণিত। কন্নড় ভাষায় এর নাম 'নব্য কবিতা' ওড়িয়া ভাষায় 'নতুন কবিতা' আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫৫ সালে গুরুপ্রসাদ মহান্তি ও ভানুজী রাও সংকলিত 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হবার পর। পরবর্তীকালে গুরুপ্রসাদ মহান্তি, রমাকান্ত

রথ নতুন কবিতাকে সমৃদ্ধ করেন।

তামিল ভাষায় ১৯৫৯ সালে এল্যুট্টু পত্রিকা প্রকাশিত হলে নতুন কবিতা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কবিতাকে বলা হয়েছে 'পুটুকু' বা 'পুটুককুরলকর' (নতুন স্বর)। কে. এল সুব্রাহ্মনিয়াম, বেনু গোপালন, সুন্দর রামস্বামী প্রমুখ কবিরা নতুন কবিতার বর্ণময় শিল্পী। মালয়ালম ভাষাতে নব্যোদয় কবিতার বহু বিস্তার এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিভিন্ন ভাষায় যে নতুন কবিতা লেখা হয়েছিল তা নিতান্ত অকারণ নয়। বরং পূর্ববর্তী ধারার কবিতাকে অস্বীকার করে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণাই নতুন কবিতার মূলে। হিন্দীতে নয়ি কবিতা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। প্রযোগবাদের প্রতিক্রিয়ায় সম্ভবত নতুন কবিতা লেখা শুরু হয়। গিরিজা কুমার মাথুর, ধরমবীর ভারতী, মদন ব্যামায়ন কুনওয়ার নারায়ণ প্রমুখ কবিরা নয়ি কবিতা আন্দোলন কে সমৃদ্ধ করেন।

১৯৬৩ সালে 'তেসরো অয়ম' পত্রিকাটি নেপালি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি বৈরাগী কানহিল ও গল্পকার ঈশ্বর বল্লভ ও ইন্দ্রবাহাদুর রাই এ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। প্রথম সংখ্যায় বৈরাগী নিজে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন — 'মেতে কো মনছে কো ভাষণ'। নিজের মনের কথা লিখে এই কবি সেদিন নেপালী নতুন কবিতার সূচনা করেন।

কি ছিল এই নতুন কবিতায়? ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার নতুন কবিতা কি একটিই আন্দোলন? তার কাব্যিক প্রকাশও একই রকম? এই সব নানা প্রশ্ন উঠতে পারে নতুন কবিতা সম্পর্কে। উঠবেই। আরও প্রশ্ন হতে পারে বাংলা নতুন কবিতা বলে কিছু আছে নাকি?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বাংলা কবিতার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যগুলো বোঝা দরকার। প্রথমে দেখা যাক নতুন কবিতা বইতে বিভিন্ন ভাষায় কী বোঝানো হয়েছে। দু'একটি উদাহরণ দেব।

ওড়িয়া কবিতার ক্ষেত্রে সত্যযুগ, সবুজযুগ ও নবযুগ পেরিয়ে নতুন কবিতার সূচনা। সত্যযুগের জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস। তাঁর বন্দীর আত্মকথা (১৯২৩) , কারা কবিতা (১৯২৮) ওড়িয়া কবিতার স্তম্ভ। তার পর এল সবুজযুগ। অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিন্দীচরণ প্রমুখ কবিরা নতুন স্বর সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন সেদিন। নবযুগের কবি শচি রাউথ রায় লিখলেন 'পল্লীশ্রী' অথবা 'বাজি রাউথ' (১৯৩৮) এর মত বিশিষ্ট কাব্য। 'পা৺লিপি' (১৯৪৭) কাব্যে নতুন আশা ও বিশ্বাস ধ্বনিত হল। তারপর এল নতুন কবিতার যুগ।

ওড়িয়া নতুন কবিতা সংকলনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানা বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটলো গুরুপ্রসাদ মহান্তি 'সমুদ্রস্নান' প্রভৃতি কাব্যে ভালবাসার ধারণাকে কোন রোমান্টিক বিষয় করে তুলতে চাননি। গুরুপ্রসাদের 'বিষাদ এক ঋতু', সৌভাগ্য মিশ্রের অন্ধ মৌমাছি রমাকান্ত রথের 'সপ্তম ঋতু' প্রভৃতি কাব্যে মানবমনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নৈরাশ্যবোধ, অস্তিত্বের অর্থসন্ধান প্রভৃতি নানাভাবে ও ভাষায় ফুটে উঠল। পাঞ্জাবী নতুন কবিতার লেখক মনজিৎ সিং কাছির তো নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলতে চান।

কন্নড় 'নব্যকবিতা' পরীক্ষা করলে দেখা যায় পাশ্চাত্য ভাব ও ভাবনার সঙ্গে সেখানে মিশে আছে অন্তর্মনের ভাবনা। অস্তিত্ববাদী চেতনার ও প্রকাশ ঘটেছে। শব্দ ব্যবহার অনেকসময় বক্তব্যকে দুবোর্ধ্য করে তুলেছে। আশার চেয়ে হতাশাবোধের ব্যাপকতা দেখা যায়। অন্যদিকে নেপালী নতুন কবিতায় এলিয়ট নেরুদা, সার্ত্রে, কাম্যু প্রভৃতি পাশ্চত্ত্য কবিদের প্রভাব যেমন আছে, বাংলা মার্কসবাদী কবিদের প্রভাবও তেমন অনুভব করা যায়। অসিত রাই, শরদ ছেত্রী প্রমুখ কবির রচনায় তার প্রমাণ মিলবে। আবার চার ছত্রের 'মিনি' কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নেপালী কবিরা নতুনত্বের সূচনা করেন।

হিন্দী 'নয়ি' কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে মিশে আছে দেশীয় জলবায়ু। অস্তিত্ববাদের ছাপ পড়েছে ঠিকই তবে তা নতুন হয়েছে দেশীয় পরিবেশের প্রভাবে। ষাট-পরবর্তী হিন্দী কবিতায় 'অকবিতা', 'অস্বীকৃত কবিতা' প্রভৃতি নানা অভিধা লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চাশ পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তা নতুন কবিতার অভিধার পাবার যোগ্য। হাং রি, শাস্ত্রবিরোধী উত্তর আধুনিক প্রভৃতি ভাবনা ও আন্দোলন তারই বিভিন্ন দিক বলা যায়। আসল কথা হল, বাংলা কবিতা অন্যান্য ভারতীয় কবিতার মত থেমে নেই। তার গতিপথ নতুন আবিষ্কারের নিত্য স্পর্শে বহমান, প্রাণবন্ত।

পাঁচ

দলিত কাব্য আন্দোলনের কথা না বললে বাংলা কবিতার ভারতীয় প্রেক্ষিতের কথা সম্পূর্ণ হবে না। মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য আন্দোলনেও মূল শক্তি হল কবিতা। নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের যন্ত্রণা আজ প্রতিবাদী ভাষা পেয়েছি দলিত কবিতায়। দলিত কবিতা তথা সাহিত্যের চার প্রধান লক্ষণ হল[৮] এই রকম—

১. আত্মজ্ঞান
২. আত্মশোধন
৩. বিদ্রোহ
৪. ঘৃণা

এই সব লক্ষণ দলিত কবিদের রচনায় স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। নামদেব দশালের 'গোলপীঠা' কাব্য সংকলনে কবি লিখেছেন—

এই ঘোর বন্দী দশা কত দিন আর সইবে
ঐ দেখো, ঐ দেখো, মাটি জেগে উঠেছে অহংকারে
জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর হয়েছে আমার আত্মা
রক্তের ভেতরে অসংখ্য সূর্য
এখন এই শহরে আগুন লাগিয়ে চল—[৯]

শুধু নামদেব নয়, দয়া পাওয়ার, বাবুরাও বাগুল, অর্জুন ডাঙ্গলে, যশোবন্ত মনোহর,

কেশব মেতাম, রাজা ঢালে, চোখা কাম্বলে প্রমুখ মরাঠি কবিদের দানে দলিত কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে দলিত কবিতার সূচনা হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দলিত কবিতা আন্দোলন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাংলা কবিতাও পিছিয়ে নেই। তবে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই দলিত কবিতার বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে বেশি। গুজরাত, কন্নড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে দলিত কবিরা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছেন এটা খুবই আশার কথা।

ছয়

আধুনিক বাংলা কবিতার ভারতীয় প্রেক্ষিত বিচার করলে এই কথাটিই স্পষ্ট হয় যে বাংলা কবিতা কোন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়। অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে যে ভাব ও ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছে বাংলা কবিতাতেও তার অনুরণন শোনা যায়। সামগ্রিক ভাবে আধুনিক ভারতীয় কবিতার নানা রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় বাংলার মত অন্যান্য ভাষার কবিতাতেও। অনেক সময় ভাব সাদৃশ্য এত বেশি যে বলে না দিলে দু'টি ভাষার আধুনিক কবিতা পৃথক ভাবে চিনতে কষ্ট হয়। বীরেশ্বর বরুয়ার একটি অসমীয়া কবিতা এইরকম—[৪]

খণ্ড পরিচয়ের অক্ষরগুলো
আঙুলে নিয়ে গুনছি
সৌজন্য সাক্ষাৎ অথবা
হাতে তুলে দেওয়া এক কাপ কফি
এসবই সিজমোগ্রাফের হিসাবে ধরা পড়ে না।
কর্মফল? ভাগ্য? এই সব হিসাবের পাতা
অন্ধকারে মুছে যায়।
স্বপ্নগুলোকে কেই বা পারে
টুকে রাখতে
গিরগিটির লেজের মত নেচে যাওয়া ডালের পাতায়!

এ কবিতা পড়ে পাঠকের যদি মনে পড়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা—[৫]

তেমন কোনো কড়ার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই—
থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হলে দেখা হয় না।

তবে আধুনিক ভারতীয় কবিতার সেই পাঠককে দোষ দেওয়া যাবে না।

আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজীবনের উপাদান নির্ভর শৈলী হল লোকাভরণ। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের রচনায় লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায়।[৬] কবিরা লোকজীবনের নানা উপাদানকে কবিতার শিল্পনির্মাণের

অবিভাজ্য অংশ করে তুলেছেন। ফলে লোকাভরণ শৈলীগত বিশিষ্টতার সার্থক নামান্তর হয়ে উঠেছে।

লোকাভরণ প্রধানত অন্বয়ী ও অনন্বয়ী—এ দু'ধরনের হতে পারে। অন্বয়ী লোকাভরণ কোন কবিতার পদান্বয়ে, বাক্যান্বয়ে, ভাবান্বয়ে, অবধারণে অথবা পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়। অনন্বয়ী লোকাভরণে মূল লোকোপাদানটি কাব্যকায়ার সঙ্গে অন্বিত হয় না। কিন্তু অন্বয়ী লোকাভরণে তা কাঙ্খিত পদ বা বাক্যের অন্বয়ে প্রকাশিত। কোনো কবিতা সামগ্রিক ভাবে লোকোপাদানে নির্মিত হলে লোকাভরিত কবিতার সৃষ্টি হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'দশানন', 'কালা ধলা ভাই আমার'; জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ও অন্যান্য কাব্যের অনেক কবিতায় লোকাভরণের শৈলী রক্ষা করা যায়। বিষ্ণু দে'র 'সাত ভাই চম্পা', সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী' প্রভৃতি কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চল্লিশ পরবর্তী কবিরা বাংলা প্রবাদ ও রচনায় বহুমাত্রিক বিস্তার দেখা যায়। অন্যান্য ভারতীয় কবিদের রচনায় লোকাভরণের প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে, বাংলা কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কতটুকু এসব প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় কবিতার তুলনামূলক গবেষণাতেই পাওয়া সম্ভব।

সাত

আধুনিক ভারতীয় কবিতার রূপ বড় বিচিত্র। নানা ভাষায় নানা রঙে নানা ভঙ্গিতে তার প্রকাশ। সব প্রাদেশিক ভাষায় একসাথে তার বিকাশ ঘটেনি। আবার সর্বত্র তার প্রকাশ একরকমও নয়। মণিপুরী, নেপালী প্রভৃতি ভাষায় আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে ধীরে। বিশিষ্ট মণিপুরী কবি ও সমালোচক ই. নীলকান্ত সিং একটি প্রবন্ধে পূর্ব ভারতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় আধুনিক মণিপুরী সাহিত্যের ক্ষীণ অথচ প্রবহমান ধারাকে মণিপুরের নমবুল নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১]

কোনো কোনো ভারতীয় ভাষায় মহাকাব্য রচনার প্রবণতাও লক্ষ করা মত। উনিশ শতকে বাংলা কাব্যে মহাকাব্য রচনার যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে। বাঙালি কবিরা গীতিকবিতার পথ বেছে নেন। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলেও কোনো কোনো ভাষায় মহাকাব্য রচনার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ মৈথিলী বা ওড়িয়া কবিতার কথা বলা যায়। বিশিষ্ট মৈথিলী কবি সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন'-এর লেখা 'দত্তবাটি' একালের একটি বিশিষ্ট ভারতীয় মহাকাব্য। অষ্টাদশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবই স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খাই গুরুত্ব পেয়েছে এ কাব্যে। তবে পৌরাণিক পটভূমিতেই অযোধ্যার রাজা মৃগাঙ্ক দত্ত ও উজ্জয়িনীর শশাঙ্কবতীর প্রণয় এই কাব্যে মূল। অযোধ্যাবাসীর দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক ভাবাবেগেই মধ্য আধুনিক ভারতবাসীর স্বর শোনা যায়। মৈথিলী সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত এ কাব্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কবি কৃষ্ণনন্দন সিং-এর 'স্বাধ, স্বহ, ভগৎকর'

মহাকাব্যটিও পৌরাণিক পটভূমিতে রহিত বিশিষ্ট মহাকাব্য, তবে পাশাপাশি মহেশ্বরী সিং, মহেশ ও কেশর ঠাকুর সম্পাদিত 'পদ্যলতিকা' আধুনিক মৈথিলী কবিতার বিশিষ্ট সংগ্রহ। বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের তেলুগু মহাকাব্য 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষামু' (১৯৭২) ও অতুলনীয়।

আধুনিক ওড়িয়া কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ মহাকাব্য রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী। ফতুরানন্দের লেখা 'সহি-মহাভারত' ওড়িয়া মহাকবি সরলা দাসের মহাকাব্যের আদলে লেখা আধুনিক মহাকাব্য। কটক শহরের সহি-গোষ্ঠীর জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই বিশাল-কাব্য সমাজের নিম্নতর মানুষেরই জীবনালেখ্য।

মহাকাব্য লেখার প্রবণতা থাকলেও ছোট কবিতাও লেখা কম হয়নি। জানকী বল্লভ পট্টনায়কের সিন্ধ উপত্যকা (১৯৮৭) সমসাময়িক জীবন ও ঘটনার সাহিত্যিক রূপায়ণ। আধুনিক ওড়িয়া কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছেন এমন কয়েকজন কবির মধ্যে আছেন হরিহর মিশ্র (ছাউনি মণ্ডপ), বিপিন বিহারী খামবি (মধ্যাহ্নের রঙ), কমলাকান্ত লেঙ্কা (দুঃখ সহ কথকতা), হৃষিকেশ মল্লিক (ধানসৌতা ঝি) প্রমুখ কবিরা।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে যে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের (AIPWA) সম্মেলন হয়েছিল তখন ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখকরা সংগঠিত হতে পেরেছিলেন। সাজ্জাদ জাহীরের প্রচেষ্টায়, বিশেষত লণ্ডনে রালফ ফক্সের ও অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে কথাবার্তার পরই AIPWA-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রগতিবাদী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে। তবে এই সংঘের প্রতিষ্ঠার আগেও ঝাবেরচাঁদ, মেঘ্বনি, উমাশঙ্কর যোশী, হীতেশ্বর বরুয়া প্রমুখ বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিরা ভারতীয় কবিতার সীমা অনেকটাই প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখ বাঙালি কবিদের প্রত্যক্ষ অবদান আধুনিক ভারতীয় কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং উন্মুক্ত করেছে নতুন নতুন দিগন্ত। বৈদ্যনাথ মিশ্র দু'টি ভাষায় কবিতা লিখেছেন— মৈথিলীতে 'যাত্রী' ছদ্মনামে ও হিন্দীতে 'নাগার্জুন' ছদ্মনামে। ভারতীয় প্রগতিবাদী কবিতায় তার অবদানও স্মরণীয়। 'নবোদয়' থেকে 'নায়' কবিতার ধারায় আধুনিক কবিতা এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথে।

তেলুগু কবিতায় একসময় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে 'ভাব কবিতা' লেখা হত। এই রোমান্টিক কাব্য আন্দোলন 'কল্পনিকোদ্যমম' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু এ দশকের শেষে দীর্ঘ এবং গাথা কবিতা লেখা হতে থাকে। বিখ্যাত তেলুগু কবি ও উপন্যাসিক বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ একদা 'অন্ধ্র প্রশস্তি' (১৯২৭) কাব্যে রচনা লিখে তেলুগু কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তার বিখ্যাত মহাকাব্যিক রচনা 'রামায়ণ কল্প-বৃক্ষম' (১৯৭২) তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। কন্নড়, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার মতই তেলুগুতেও দীর্ঘ কাব্য ও মহাকাব্য রচনার প্রবণতা এমনিভাবে আধুনিক ভারতীয় কবিতায় বিশিষ্টতা পেয়েছে। ঠিক যেমন গালিবের গজল অথবা ইকবাল কবিতার স্থান। মহম্মদ ইকবাল ভারতীয় কবিদের মধ্যে উর্দু ও পারশি উভয় ভাষাতেই কাব্য রচনা করেন। উর্দু কবিতায় গালিবের পরেই ইকবালের স্থান তর্কাতীত।

আধুনিক ভারতীয় কবিতা বিচিত্রগামী ও বহুমুখী। রোমান্টিক, প্রগতিবাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি কোন একটি অভিধায় তাকে বোঝা যাবে না। তার গতিও সরলপথে প্রসারিত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। অথচ সর্বত্র যে সাদৃশ্যযুক্ত এমনও বলা যাবে না। তবে একথা সত্য যে আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে আধুনিক ভারতীয় কবিতার স্বরূপ বোঝা জরুরী।

'নবোদয়' থেকে 'নায়' কবিতার ধারা পথ বেশ জটিল। শুধু প্রাদেশিক ভাষায় নয়, ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষাতেও ভারতীয় কবিতা লেখা হয়েছে এবং হচ্ছেও। ভারতীয় কবিতার নানা স্তর, নানা বর্ণ ও বিস্তার বিস্ময় করে। স্বদেশী বিদেশী নানা প্রভাব পড়েছে ভারতীয় কবিতায়। একজন ভারতীয় কবি যেন বারবার তার নিজের বাড়িতে স্বস্থানে ফিরে আসতে চায় নানা বিরোধী ভাব ও ভাবনার অবসানে। স্বজাতি, স্বদেশ, আর আত্মপরিচয়ের কথাটাই ধ্বনিত হয় বারবার। নেপালী কবি দুবের 'এক গোর্খা সৈনিকের ঘরে ফেরা' কবিতায় যেমন লেখা হয়েছে—

আমার দেশের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব রক্ষায়
ব্যস্ত ছিলাম দেশের সীমান্তে
ত্রিবর্ণ পতাকা তুলে ধরেছি বারবার
বনে, পাহাড়ে, নেফার মরুতে, লাদাকে, রাজস্থানে
কিন্তু যখন বছর শেষের ছুটিতে ফিরে এলাম গাঁয়ের বাড়িতে
আমার গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে
আমার বাড়ি আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে
আমার ধানক্ষেতে শত্রুর পতাকা পতপত করে উড়ছে
আমার বৃদ্ধ বাবা মা রেফিউজী ক্যাম্পে মৃত্যুর দিন গুনছে
আমার ঘরের মেয়েরা
ধর্ষিত হওয়ার লজ্জা ঢাকতে আত্মঘাতী হয়েছে
আমাকে দেখে সমস্ত উত্তর-পূর্ব অঞ্চল চীৎকার করে বলছে—
'বিদেশী! ফিরে যাও, বিদেশী, ফিরে যাও'।
জিজ্ঞাসা করি দেশের সরকার, সংবিধান আর সব যত চুক্তিকে
"আমি কে? বলতো আমি কে?"
কালা আর অন্ধ হয়ে যেন সবাই
চুপ করে তামাশা দেখছে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি আশায় বুক বেঁধে ঃ
কেউ আমার হয়ে বলবে নিশ্চয়
কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দেবে নিশ্চয়ই।"

এই সংশয় আর বিশ্বাস, আশা ও আত্মপ্রত্যয় বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় কবিতা অশ্রুত নয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দ্রষ্টব্য, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ভারতীয় প্রেক্ষাপট, বিপ্লব চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ২০৪।
২. দলিত সাহিত্য : একটি বিতর্ক, ঐকতান, দলিত সাহিত্য বিতর্ক সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ক ৪-৫।
৩. গোলপীঠা, নামদেব দসাল। অনুবাদ বর্তমান লেখকের।
৪. লিলির তাবেলি : বীরেশ্বর বরুয়া, অনুবাদ লেখকের।
৫. সুদেষ্ণা নেই, হেমন্তের অরণ্যের আমি পোস্টম্যান।
৬. লোকাভরণ ঃ বাংলা কবিতার শৈলী, বিপ্লব চক্রবর্তী, কলকাতা, ২০০১।
৭. Monipuri Among Eastern Literatures, Prachi Ed. Surendra Jha 'Suman', Sahitya Akademi 1992, P.171
৮. অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব
(জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কবিতা)

মঞ্জুভাষ মিত্র

এই লেখাটির নাম হতে পারত আধুনিক বাংলা কবিতা ও আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতা—একটি তুলনামূলক আলোচনা। কিম্বা হয়ত এর নাম হতে পারত আধুনিক বাংলা কবিতায় আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতার ভাবানুষঙ্গ। সাহিত্যে প্রভাবের আলোচনায় সাদৃশ্য আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাদৃশ্যই একটা মূল ভিত্তি যা দুজন কবি-লেখককে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। বিংশ শতকের বাংলা কবিতা পড়বার সময় জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটসের, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মের, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপকিন্সের, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এজরা পাউণ্ডের, বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এলিয়টের সাদৃশ্য অথবা কবিধর্মের সামীপ্য পরিশীলিত পাঠকের চোখে অবশ্যই পড়বে। অনুসন্ধানে তৎপর হ'লে বোঝা যায় প্রতি ক্ষেত্রেই বঙ্গীয় কবি তাঁর প্রিয় কবির দ্বারা স্বচ্ছন্দে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁর নিজস্ব ইচ্ছাই এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে। তিনি বিস্মিত পুলকিত হয়ে দেখেছেন ওই কবির সঙ্গে তাঁর একটা সহমর্মিতা আছে, দুটি কবি-আত্মের মধ্যে একটি অদেখা যোগসূত্র ক্রমশ দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতকীয় সময়কাল ও নবীন চিন্তাবিপ্লব এই মেলবন্ধনের প্রক্রিয়াকে অনায়াস করে তুলেছে, তা আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় বোঝা যায়।

বিশ্বসাহিত্যের ভূগোলে যদি পরিক্রমা করি, কবিতার সমালোচনার বিকীর্ণ ক্যানভাসে যদি চোখ রাখি তাহলে দেখি প্রভাবমূলক আলোচনা সবসময়েই হয়েছে। এনিড স্টার্কির লেখা *From Eliot to Gauiter* অথবা সার-মরিস সিগিল ব্যোরার লেখা *The Heritage of Symbolism* ইত্যাদি বইয়ের নাম সহজেই মনে পড়বে। বিদগ্ধ সমালোচকের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট কবিকে আলোকিত করা, অগ্রজের কাছে ওই কবির ঋণ কতটা তার নিরূপণ এ ক্ষেত্রে একটা উপায় মাত্র। গোটের বিশ্ব-সাহিত্যের বা *Weltanschauung* এর ধারনাটা তাই গ্রহণযোগ্য; সাহিত্য এক ও অখণ্ড এবং সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব বহমান ঐতিহ্য; দেশে দেশে কালে কালে মানুষের চিন্তার মধ্যেও সমান্তরালতা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। এইসব পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব কথাটা কোনো সঙ্কীর্ণ নেতিমূলক তত্ত্বের প্রয়োগ বোঝায় না বরং তা এক উদার বিশ্বভূমিক সৌন্দর্যবাদের আলোকে বাংলা ভাষার 'কবিতাকে জানানোর প্রয়াস সূচিত করছে।

পথটা যিনি দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন শতাব্দীর কবি টমাস স্টার্নস এলিয়ট। তাঁর *Tradtion and the Individual Talent* নামক প্রবন্ধটি এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলছেন, আমরা সাধারণত কোন কবির প্রশংসা করি তাঁর লেখার যে অংশগুলো আর

কারো সদৃশ নয় তাদের কথা মনে রেখেই। কিন্তু নির্মোহভাবে অনুসন্ধান চালালে বোঝা যায় তাঁর কবিতার সেই অংশগুলোই শ্রেষ্ঠ যেখানে মৃত কবিরা—তাঁর পূর্বগামীরা বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন। এরই নাম দিয়েছেন এলিয়ট 'কবিতার ঐতিহ্য' যা ব্যক্তিগত প্রতিভার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই 'ঐতিহ্য' শব্দটির মধ্যে গভীর গভীরতর তাৎপর্য আছে এবং এই ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য নয় বরং পরিশ্রমে লব্ধ। *"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his alone, You must get him for contsast and comparison, among the dead"* —পাঠকের কাছে কোন কবি কোনো শিল্পী এককভাবে তাঁর সম্পর্কে অর্থ উদ্ঘাটন করতে পারেন না। তাঁর তাৎপর্য, তাঁর আস্বাদন মৃত কবিশিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্কের অনুক্রমেই আবদ্ধ হতে পারে। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একলাভাবে একজন কবির মূল্যায়ন করা যায় না, বিগতদিনের ও অজস্র কবিলেখকদের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনা এ ক্ষেত্রে খুবই জরুরী—এলিয়টের এই বক্তব্য আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয়ান প্রভাবের আলোচনায় প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ভাবলে অবাক লাগে জীবনানন্দ দাস থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবিরা রবীন্দ্রসৃষ্ট ভাষাভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও কেউই রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন না, আসলে নিজস্ব মৌলিক আলোতে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে তাঁদের এই আচরণই ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। আজ সবাই জেনে গেছে নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিত্রয়ী ভাবের দিক থেকে প্রত্যেকেই রবীন্দ্রবিদ্রোহী কিন্তু আঙ্গিকপ্রকরণে তারা রোমান্টিক কাব্যবলয়কেই পরিক্রমা করেছেন। বিংশশতকের আধুনিক বাংলা কবিতার আদিসূত্রধার কবিসঙ্ঘ ভাবের দিকে শুধু যে নতুন ও ভিন্ন পথে গেলেন তা নয়, তাঁরা কবিতার কলাকৌশলেও অন্যধরণের মাত্রা ও বৈচিত্রী খুঁজলেন। রোমান্টিকতাকে বিদীর্ণ করে এবং রোমান্টিকতার প্রতি স্পর্ধারূপেই যে তাঁরা উদিত হয়েছেন একথা কালের পুতুল, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, স্বগত, কবিতার কথা প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস প্রমুখেরা খুব জোরের সঙ্গেই বলে গেছেন। অন্তর্দৃষ্টিবলে তাঁরা বুঝেছিলেন নতুন সময়ের নতুন যন্ত্রতন্ত্রের তাঁরাই হবেন ধারক ও বাহক।

''যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্মসুর বজায় রেখে চলেছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায়, একে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে।'' রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্মুখে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ওইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঞর্থক মননবিচিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।'' জীবনানন্দ দাশের কবিতার কথা গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক প্রবন্ধের এই বাক্য দুটি মূল্যবান এইজন্য যে এতে আধুনিক কবির আদর্শ হিসেবে রবীন্দ্রকাব্যকে গ্রহণ

করার ব্যাপারে যেমন অনীহা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি বিদেশী কবিদের কাছে সচেতনভাবে ঋণগ্রহণের প্রসঙ্গটিও এসে গেছে। বিশেষ করে এটাও লক্ষনীয় এখানে এখন তিনজন কবির উল্লেখ আছে—ভারলেন, ইয়েটস ও এলিয়ট—যাঁরা প্রত্যেকেই জীবনানন্দের কোন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় প্রগাঢ়ভাবে অন্তঃপ্রেরণার কাজ করে গেছেন। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিতার যে শিল্পনিদর্শন নির্মাণ করেছেন ও যা নিয়ে কাব্য করে গেছেন, ইয়েটস প্রভৃতিও প্রায় সেই একই শিল্পদর্শনের নির্মাতা ও প্রবক্তা।

জোলফ চিয়ারির বইটির নামই *Estheties of Modornism*। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব সম্বন্ধে বিন্দু বলতে গেলে আধুনিক কবিতা তথা আধুনিকতার সংজ্ঞা ও শিল্পতত্ত্ব দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পূর্ববর্ণিত 'কবিতার কথা' প্রভৃতি বইপত্র, বুদ্ধদেব বসুর ক্রান্তিকারী 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক কবিতার সংকলন, ক্লীন্দু ব্রুকস-এর *'Modern Poetry and the Tradition'*, এফ আর লীভিস-এর *New Bearings is English Poetry,* এডফান্ড উইলসন এর *Axe's castle,* টি. এস. এলিয়ট এর *Selected Essays* এর কোনো কোনো প্রবন্ধ, অক্তাভিও পাজ-এর *'Children of the Mire'*, এবং এঁদেরও আগে এডগার অ্যালান পো-র *'Composition of Poetry'* প্রভৃতি রচনাবলী ও শার্ল বোদলেয়ারের 'লা আর্ট রোমান্টিক' ও *'Curiosites Aestneiques'* গ্রন্থে বিধৃত শিল্প বিষয়ক নিবন্ধগুলি কেউ যদি পাঠ্য করেন তিনি আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবশ্যই স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হবেন এবং একজন আধুনিক কবির পক্ষে প্রভাব ব্যাপারটা কেন এত জরুরী তাও বুঝতে পারবেন। দু'এক কথায় বলা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উদগত এক বিশেষ ধরণের কবিতাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতায় অথবা পাচ্ছি কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব অর্থাৎ সুন্দরের পাশাপাশি কুৎসিতের ভিতর থেকেও সৌন্দর্য আকর্ষণ করে নেয়া অথবা সুন্দর ও কুৎসিতকে সমভূমিক দৃষ্টিতে দেখা। এটা ভাবের দিক থেকে। ভাষার দিকে কাব্যিক মসৃণ শব্দের পাশাপাশি আখ্যানে রুক্ষ্ম কর্কশ শব্দের ব্যবহার, কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি করে তোলার প্রবণতা রয়েছে আধুনিক কবিতায়।

আধুনিক কবিতায় আপৃথিবী কবির প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে নগরজীবনের বীরগাঁথা—সমালোচক যাকে ইংরেজীতে বলেছেন—*"Heroism of Modern Life"*। একটা কারণ নগর জীবনের যত সুন্দর ও অসুন্দরের এতবড় সঙ্গমস্থল আর নেই, মানুষের মনের অসুস্থতার এত বড় দর্পণও আর নেই। এখানেই বিচূর্ণ আত্মর প্রতিফলন ঘটে গেছে। বোদলেয়ারের প্যারিসছবি, র‍্যাবো-র নগরচিত্র, লা-ফর্গ ও করচিয়ের-এর নগরভিত্তিক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন, এলিয়টের ওয়েস্টল্যাণ্ড, জীবনানন্দ-এর একরাশ মিনার মনুমেন্টভরা কলকাতা, বিষ্ণু দে-র জন্মাষ্টমীর কবিতাপট সবই নগরজীবনকে প্রতীকের মত ব্যবহার করেছে এবং বিশ্বকবিতার পাঠক অনুভব করবেন এই সংকেত এর আদি উদ্ভাবক বোদলেয়ারের এত কাউকে কাউকে বলা গেলেও কেউই প্রায় এককভাবে নিজেকে আবিষ্কারক বলে দাবী করতে পারেন না বরং নানা কবির নানান আবিষ্কারের পালাতেই

গাঁথা পড়েছে আধুনিক মানুষের যাপিত নগর জীবনের মহাভাষ্য। অগ্রজের কাছে পরবর্তীর ঋণ স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছে।

নগরবাসী কবির শারীরিক অক্ষমতা, বিষাদ, অনুতাপ ও নৈঃসঙ্গ কি ভীষণ বেদনায় আর্ত হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ রয়েছে শার্ল বোদলেয়ারের *Spleen* কবিতাগুচ্ছের একটিতে।

নীচু আর ভারী এই আকাশ যখন এক ঢাকনার মত চেপে ধরে আত্মাকে যে দীর্ঘকাল চিন্তায় পীড়িত এবং যেখানে মানুষের চক্ষু দিয়ে যতদূর দেখা যায় সে বিছালো অদ্ভুত আঁধার এক রাত্রির চেয়েও বেশী বিষাদে খচিত পৃথিবী যখন বদলিয়ে হয়ে গেছে নির্জন কারাগার ঘর সেইখানে স্যাঁতানো আঁধারে তার ভীতু ডানা নিয়ে আশা এক বাদুড়ের মত হয়ে দেয়ালের বুকে করে ঝাপ্ট আঘাত ক্ষয়িষ্ণু ভিতর ছাদে মাথা ঠোকে বারবার গিয়ে যখন সঘন বৃষ্টি বিস্তার করেছে তার অফুরাণ ধারাপাত অনুকরণ করেছে গরাদগুলোকে যেন বিশাল করার আর যত মাকড়সা নীরব ও ঘৃণাযোগ্য প্রাণী আমাদের সারামন ঘিরে ফেলে বুনে বুনে জালগুলো অজস্র অপার হঠাৎ কোথায় কতিপয় ঘন্টা বাজে ভয়ানক ক্রোধে আকাশের দিকে যেন ছুঁড়ে দেয় ভীষণ গর্জন আত্মাদের স্বরণ করিয়ে দেয়—চিরকালের যতন শাস্তিপ্রাপ্ত যারা একগুঁয়ে ভাবে তারা শুরু করে তাহাদের গূঢ় অভিযোগের বচন বৈজয়ন্ত ঢাক অথবা বাজনা ছাড়া শবযাত্রাগুলি ধীর শোভাযাত্রা করে আমার নির্জন আত্মার ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে কাঁদে আশা পরাজিত; যন্ত্রণাও ক্রুর স্বেচ্ছাচারী তার কালো পতাকাকে আমার মাথার খুলির ভিতর অকস্মাৎ প্রোথিত করেছে (*Spleen : Spleen et Ideal*) অনুবাদক—মঞ্জুভাষ মিত্র।

আরো পরে এই মানুষকে '*Civing dead*' 'জীবন্ত যে মৃত' বলে সম্ভাষণ করেছেন টি এস এলিয়ট—এই জীবন্ত মৃত বলা বাহুল্য কবিরই নির্যাতন আত্ম, শহর কারার ব্যাথাবন্দী। 'বোদলেয়ার নামক অসামান্য প্রবন্ধ লিখে এলিয়ট গুরুর ঋণ ও সামান্য শোধ করেছিলেন। ১৯২২ সালে *The Wastle hand* এর প্রথম অংশ *The Burial of the Dead*—এ এলিয়ট লিখেছিলেন

Unreal City,

Under the brown fog of a winter dawn, A crowd flowed over london Bridge, so many, I had not thought death had undone so many. Sighs, shout and infrequent were exhaled, and each man fixed his wyes before his feet.

শীতসকালে বাদামী কুয়াশার লহরে ঢাকা অবাস্তব শহর। লণ্ডন ব্রীজের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে অগুনতি জনতা। জনতা না মৃত্যু এতজনকে শেষ করে গেছে। তারা ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে—হাঁফাচ্ছে, প্রতিটি মানুষ দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছে তার পায়ের আঙ্গুলে। অর্থাৎ তারা চলেছে মাথা নীচু করে।

নগরমানুষের এই প্রেতমিছিলকে বিশ্ব আধুনিক কবিতায় বিংশ শতকের কবিতায় বার বার দেখা গেছে। এ হয়ে উঠেছে প্রিয় প্রতীক অথবা চিত্রকল্পের মত—বিষাদের

ভালোবাসায় পড়ে ছিলেন যাঁরা, আত্মাকে চিরে চিরে পথনির্মাণে ব্রতী ছিলেন যে সব কবিরা-তাঁদের কাছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে এই নগর-দর্পণের ছবি উদ্ধার করে দিচ্ছি—

> অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
> কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে— ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
> কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
> এই যে ট্রাকের লাইন ছড়িয়ে আছে
> পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্ত এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
> অনুভব করে হাঁটছি আমি (ফুটপাথে ঃ মহাপৃথিবী)

স্পষ্টতই এখানে আধুনিক ফাঁপা মানুষের, জীবন্মৃতের মুখ দেখতে পাচ্ছি এ মুখ কবিরই মুখ।

'পাবলো নেরুদার 'পথে হেঁটে যেতে যেতে' বলে একটি অসাধারণ কবিতার কথা মনে পড়ছে। সেখানে তিনি বলছেন : 'আমি এই মানুষী অস্তিত্ব নিয়ে ক্লান্ত। এমনটা হয় যে আমি দরজীর দোকানে যাই সিনেমায় যাই একেবারে কুঁচকিয়ে ছোট হয়ে, একটা ফেল্টের তৈরি রাজহাঁসের মত মূল উৎস জল ও ছাই-এর উপর দিয়ে যে চলেছে। .... আমি কিছু চাই না, শুধু শান্তি চাই পাথরের ও পশমের; আমি প্রতিষ্ঠান দেখতে চাই না, বাগান নয়, মালপত্র নয়, কাঁচ বা এলিভেটর নয়—কিচ্ছু দেখতে চাই না। আমার পা দুটো আর নখগুলো আমাকে ক্লান্ত করে; আমার চুল আর আমার ছায়া। আমি যে মানুষ, এই ব্যাপারটাই আমাকে ক্লান্ত করে।' (*Scanning the century : The Penguin Book of the Twentieth Century in Poetry* দ্রষ্টব্য)। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অথবা সমর সেনের কোনো কোনো কাব্যপংক্তি। চিন্তার সমান্তরালতা—সহজেই অনুমেয়। বিষ্ণু দে-র পূর্বলেখ কাব্যের 'চতুর্দশপদী' কবিতার অষ্টক অংশ 'চৌরঙ্গী' থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

> এ ঘন প্রহরে
> ইশারা বিছায় পথে কোন ধ্রুবতারা।
> উদভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
> নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
> সহে না খুবই এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
> স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
> সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
> লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
> নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতা আতুর —

বলাবাহুল্য বোদলেয়ার, এলিয়ট প্রভৃতি পূর্বযাত্রীরূপে কবিতা লিখে না গেলে এই নগরকীর্তন সম্ভব হোত না। বাঙ্গালী কবিরা কিছুটা নিজেদের হৃদয়ে অনিবার্য তাগিদ

অনুভব করেছেন আর কিছুটা পরিগ্রহণ করেছেন বিদেশী কবিদের কাছ থেকে। এভাবেই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অলৌকিক ভাব রসায়নের সমীকরণে এক নতুন কবিতা পথের সন্ধান পেয়েছেন। মনস্তত্ব, অবচেতনা, নির্যাতিত আত্ম, বিপ্লবের স্বপ্ন, সংশয়, জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধিবাদ, আত্মনাভির চারদিকে পরিক্রমা অথবা ভ্রমণ, সংকেত, চিত্রকল্প, *Allusion* বা পাঠচিহ্নের ব্যবহার, গদ্যছন্দ, ভাষার গদ্যময়তার অবতারণা, শব্দপ্রয়োগে ব্যাকরণ-লঙ্ঘন, ভাবের ক্ষেত্রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যাওয়া, বিপরীত আরোপ, স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী, পাপপুণ্যের সমভূমিক ব্যবহার, বক্তৃতাবর্জন, নারীকে জ্যোতির্ময়ী দেবী রূপে না দেখার প্রবণতা, আপাত কাব্যিক মনোরমকে বর্জন এমনি নানা বিষয়ে সুষ্ঠবিশযুক্ত মধ্যবর্তী বাঙালী কবিরা ইয়োরোপ-আমেরিকার কবিদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। নগর দর্পণ আমি শুধু বহুর মধ্যে একটি উদাহরণরূপে ব্যবহার করলাম। আমার 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব' গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিংশ শতকের কবিতা প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণীয়—ডারউইনের *Genesis of the Species*, কার্ল মার্কসের কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো ও *Das Kapital*, ফ্রয়েডের *Introductory Lectures on Psychoanalysis* ও *Interpretation of Dreams* এবং আইনস্টাইনের *Theory of Relativity* দ্বারা গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা, আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতা—দুই-ই আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বকে অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে বিদেশী কবিতা, বাংলা কবিতা পাশাপাশি 'টেকসট্' হিসেবে সতর্কভাবে পাঠ করলে এক শিল্প থেকে আর এক শিল্প কিভাবে প্রাণ পায়, গড়ে ওঠে তাও সহজেই বোঝা যায়—একে বলতে পারি কবিতায় শিল্পলোকের উপাদানের ব্যবহার, শিল্প থেকে উপাদান নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে নতুন শিল্পের যাত্রা করা। একটা কবিতাকে আগাগোড়া অনুকরণ করে কিভাবে একটা নতুন কবিতা লেখা যায় তার আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ জীবনানন্দ দাশের 'হায় চিল'। *Yeats*-এর *'He Reproves the Curlew'* এবং 'হায় চিল' পাশাপাশি পড়লে একসাথে দুটো ভালো কবিতা পড়বার আনন্দ পাওয়া যায়। অনুসরণ বঙ্গীয় কবির লেখনীতে অবশ্যই মৌলিক পদবী পেয়েছে। একে বলতে পারি নতুন নির্মাণ। কৌতূহলী পাঠক যদি দান্তে আলিঘিয়েরীর 'ডিভাইন কমেডী'র *Henry Francis Cary* কৃত ইংরেজী অনুবাদে চোখ রাখেন সহসা একটি বাক্যের সম্মুখীন হবেন শুরুর দিকেই সেই যেখানে ভার্জিলের সঙ্গে দান্তে তাঁর নরক-পরিক্রমা শুরু করেছেন—

I should ne'er
Have thought that death so many had despoil'd.

নরকে শাস্তিপ্রাপ্ত অগুন্তি মৃতকে দেখেই কবির এ মন্তব্য। সেই সূত্রতে পাঠক প্রবেশ করবেন টি. এফ. এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এর জগতে এবং দেখবেন দান্তের পংক্তিটিকে প্রায় হুবহু এলিয়ট ভাষান্তরণে গ্রহণ করেছেন *'I had not thought death had undone so many'*। বলাবাহুল্য এলিয়ট এটা করেছেন আধুনিক নগরদর্পণকে প্রতিবিম্বিত করবার জন্য এবং এ বলিষ্ঠ ব্যবহারে এলিয়টের কবিতা অধিকতর মননশীল হয়ে উঠেছে, তাঁর

মৌলিক আবেদন হয়েছে বহুগুণিত।

আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের উপর ইয়োরোপীয় কবিদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় চিত্রকল্প, সংকেত ও অবচেতনা অর্থাৎ *Imagism, Symbolism* ও *Surrealism* এই তিনটি কাব্যান্দোলনই তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করেছে। "ইয়েটস্, বোদলেয়ার এবং পো-ই জীবনানন্দকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন"। (আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র)। অমিয় চক্রবর্তীকে ছুঁয়ে গেছেন হপকিন্স ও এলিয়ট, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এলিয়ট-বোদলেয়ার-মালার্মে-হাইন-রিশ হাইনে, বুদ্ধদেব বসুকে এজরা পাউণ্ড-র‍্যাবো-বোদলেয়ার-রিলকে-হোল্ডারলিন এবং বিষ্ণু দে-কে এলিয়ট-এলুয়ার-আরাগঁ-লোরকা বেশী পথ দেখিয়েছেন।

আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর একটি গদ্যগ্রন্থে অক্তাভিও লাজ—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মেক্সিকোর বিখ্যাত স্প্যানিশ কবি—বলেছিলেন 'ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও পশ্চিমী দুনিয়ায় একটিই মাত্র আধুনিক কবিতা আছে' (*'Children of the Mire'; Trans. by Rachil Philips)*। তাঁরই প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই সারা বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় একটিই মাত্র আধুনিক কবিতা আছে এবং এই কবিতা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন কালে আবদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে সহজ সতেজ ভাবের বাণিজ্য ও আদানপ্রদানের পথ খোলা আছে। তুলনামূলক সাহিত্যেরও প্রথম সোপান এখানে।

Bibliography : গ্রন্থপঞ্জী

T. S. Eliot : Selected Essays

জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা

Cleales Baude laire : The Flowers of Evil (New Directions)

T S. Eliot : The Waste Land The Penguin Book of the Twentieth Century Poetry

বিষ্ণু দে : পূর্বলেখ—বছর পঁচিশ

দান্তে আলিঘিয়েরী : *Divine Comedy*

Octavio Pan : Children of the Mire

সন্ধিক্ষণের কবিতা

অলোক রায়

সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচলিত যুগবিভাগের রীতি সাহিত্যব্যাখ্যায় সব সময়ে সাহায্য করে না। 'আদি যুগ' কালনির্দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু 'মধ্যযুগ' কেমন করে নির্দেশ করব তা বুঝতে পারি না। ইউরোপে মধ্যযুগকে একসময়ে ধর্মান্ধতার কাল বলা হত। কিন্তু মধ্যযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়নি এমন নয়। মধ্যযুগে দেবতাবাদ থাকলে তার পাশাপাশি মানবতাবাদ ছিল। মধ্যযুগের ঠিক অবসান কবে হল আমরা জানি না। ইউরোপে রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা বলা হয়েছে। কিন্তু অধুনা পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন মধ্যযুগেও রেনেসাঁসের অনেক লক্ষণ দেখা গেছে। আর ইউরোপে যাকে রেনেসাঁস বলে আমাদের দেশে তা আদৌ ঘটেনি, ঘটা সম্ভব ছিল না। ফলে ইংরেজ-শাসনকে আধুনিক যুগের সূচনা বলা বিভ্রান্তিকর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে লেখা হয়েছে তেরো থেকে আঠারো শতক মধ্যযুগ, আর উনিশ-বিশ শতক আধুনিক যুগ। কিন্তু ইতিহাসের ধারনায় এবং সাহিত্যের ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ থেকে গেছে। কেউ যদি বলেন, একুশ শতকের সূচনায় আজও আমাদের দেশে মধ্যযুগের অবসান হয়নি, তাহলে কী খুব ভুল বলা হয়। এমনি নানা প্রশ্ন ছাত্রদের মনে দেখা দেয়। অধ্যাপককেও তাই নতুন করে ভাবতে হয়। উজ্জীবনী পাঠমালা যদি সেই কাজে অধ্যাপকদের সাহায্য করে তবেই এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), তখন জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য অতিক্রম করে তা বাংলা কাব্যধারারও সন্ধিক্ষণ সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ সালে, বিংশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ১৯২২ সালে, মৃত্যু-পরবর্তী গ্রন্থের হিসেব নিলে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'। মোটের উপর তাই বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর সত্যেন্দ্রনাথের কাল, এই সময় তাঁর সতীর্থ-সহযোগী কবি ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়। সাধারণভাবে এই কবিপঞ্চককে রবীন্দ্র-বৃত্তের কবি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই ধরনের শ্রেণীনির্দেশের হয়তো উপযোগিতা আছে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সব কিছু বিচারের প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য—কিন্তু কবি বা কাব্যের পরিচয় এভাবে মেলে না। অন্য দিকে 'কল্লোল'-এর সময় থেকে সচরাচর আধুনিক কবিতার জন্ম ধরা হয় বলেই প্রাক্-'কল্লোল' কবিরা অনাধুনিক বলে পরিগণিত হন। 'কল্লোল'-এর প্রকাশ ১৯২৩ সালে, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। যুগবিভাগের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক—এ দিক থেকেও বিশ শতকের

প্রথম পঁচিশ বছর তথাকথিত 'পুরোনো' কবিদের রাজত্বকাল।

অবশ্য কবিদের এই নতুন-পুরোনো শ্রেণীভাগ নিতান্ত সাল-তারিখের নিরিখে অসংগত ও অসম্ভব। 'কল্লোল' পত্রিকায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধাচরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, হেমেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জসীমউদ্দিন, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দত্ত প্রভৃতিও কবিতা লিখেছেন, যাঁরা অনেকেই ছিলেন শতাব্দীর প্রথমপাদের বাংলা কাব্যধারার অনুবর্তী। অন্য দিকে 'কল্লোল' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্র-প্রশস্তি (ভাদ্র ১৩৩২)। আসলে তখনও সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সহযোগী কবিরা অপাংক্তেয় বিবেচিত হননি, বরং 'কল্লোলীয়'-কবিদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অ প্রতিরোধ্য। ১৯২২ সালে নজরুল ইসলামের কবিতায় সত্যেন্দ্রানুসরণ খুবই স্পষ্ট—

অধর নিস্‌পিস্‌
নধর কিস্‌মিস্‌
রাতুল তুল্‌তুল্‌ কপোল—
ঝর্‌লো ফুলকুল,
কর্‌লো গুল্‌ভুল
বাতুল বুল্‌বুল্‌ চপল।

'বদন-চন্দ্রমা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯।

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া;
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া।।
ঐ তমাল-তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢল ঢল কায়া।

'স্তব্ধ বাদল', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

শুধু নজরুল ইসলাম নন, তরুণ জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসুও অন্তত সাময়িক ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এমন কি আরো পরবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতায় সাময়িক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ছন্দাশ্রয়ী প্রকাশও সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ সত্যেন্দ্রনাথের 'ধর্মঘট' ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'উনত্রিশে জুলাই' কবিতা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

তা হলে ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর

যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা কি সকলেই "রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন"? অবশ্য এক হিসেবে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য; সে কালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের বড় কাছাকাছি ছিলেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয়-রবীন্দ্রনাথ যেমন অসম্ভব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা-ছন্দের অনুসরণও এ কালে স্বাভাবিক। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তিরিশের দশকের এমন কি চল্লিশের দশকের কবিদের রচনাতেও দেখা যাবে। বুদ্ধদেব বসু, যিনি মনে করেন "রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না", তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ সম্বন্ধেও হয়তো অনুরূপ মন্তব্য করা সম্ভব।রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে চাওয়া অবশ্য দোষের নয়, অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন, যেমন শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমথনাথ রায়চৌধুরি, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়ম্বদা দেবী, সুখরঞ্জন রায়, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গ ধর রায়চৌধুরী, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্থান হলেও বাংলা কাব্যের গতিপরিবর্তনে বা প্রভাববিস্তারে এঁদের ভূমিকা নগণ্য। বুদ্ধদেবের অভিযোগ এই কবিদের সম্বন্ধে কিছুটা গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধেও এমন কথা বলা অন্যায় হবে যে-কথা সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ইনি খাঁটি কবি না সেইটেই হল আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না।" আসলে কবিতাবিচারে এই 'খাঁটিত্বে'র প্রসঙ্গ উঠলেই বিপদ, কারণ 'খাঁটি তৈল বা খাঁটি ঘৃতে'র মতো 'খাঁটি কবিত্বে'র বিচার চলে না। সেখানে পক্ষপাত আসে; কোনো কারণে কারো রচনা ভালো না লাগলেই তার পিঠে 'অকবি' ছাপ মেরে দেওয়াও সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। কবিতার ভালো-মন্দ বিচারে একাধিক মানদণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যুগরুচি ও ব্যক্তিরুচির প্রভাবও সেখানে স্মরণীয়। এ অবস্থায় আলোচ্য কবিদের রচনা আজকের দিনে আমাদের তেমন আকর্ষণ করে না বলেই তাঁদের কাব্যপ্রয়াসকে ব্যর্থ বলা যায় না।

অন্য দিকে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস শুধু সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নয়, স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব হিসেবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাংলা কাব্যধারার এক সন্ধিক্ষণের কবি বলতে পারি তাঁদের। রবীন্দ্রযুগে তাঁর কবিতাচর্চা করেছেন বটে, কিন্তু রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করাই তাঁদের একমাত্র কবিকর্ম ছিল না। হয়তো স্পষ্ট বা সুচিহ্নিত নয়, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ এই কবিদেরও ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেম ও নিসর্গ-প্রকৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ, স্বদেশ ও সমাজ, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস, অর্থাৎ রোমান্টিক কবিতার প্রচলিত বিষয়বস্তুই এঁদের কবিতার অবলম্বন। আর, রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত ছন্দ ও কবিভাষার ব্যবহার না করেও কারো রেহাই নেই। ফলে যদি কখনো বিচ্ছিন্নভাবে এঁদের রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনির মতো শোনায় তার জন্য এঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সচেতনভাবেও এঁরা কখনও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন—বিশেষভাবে যাঁরা তাঁর নিকট-সান্নিধ্য পেয়েছেন, যেমন যতীন্দ্রমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু একটা বিরোধ ছিল, যাকে স্ববিরোধও বলতে পারি—মুখে ও লেখায়

বার বার রবীন্দ্র-প্রশস্তি রচনা, কিন্তু নিজেদের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ। দৃষ্টান্ত হিসেবে কালিদাস রায়ের পরিণত বয়সের আত্ম-বিশ্লেষণ স্মরণ করতে পারি,

> গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারি নি। তাঁর পদাঙ্ক-পরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চলে গিয়েছেন কি না। তবে তিনি যে বলেছিলেন—একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা, সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূরে এগিয়ে এসেছি—যুগযাত্রার পতে নয়, জীবনের যাত্রার পথে।...আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারো, এমন কি কবিগুরুর রচনারীতির আমি জ্ঞাতসারে অনুসরণ করি না—জানি না রচনারীতির বৈশিষ্ট্য আমার কিছু আছে কি না।[১]

অবশ্য কেউ এমন কথা বলতে পারেন, কালিদাস রায় জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে কবিগুরুর 'অনুকরণ' করেছেন, এবং অনুকারক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। কিন্তু কালিদাস রায়ের কাব্যজগৎকে কোনো অর্থেই রাবীন্দ্রিক কাব্যজগৎ বলা যায় না, এবং যদি কালিদাসের কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি তা হলে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-প্রশস্তিকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে—"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালোবাসার উজ্জ্বলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"[২] ভালোলাগা-মন্দলাগার কথা বাদ দিলে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে 'বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জে'র কথা মনে পড়ে না। অন্য দিকে কালিদাস, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, এমন কি করুণানিধানও তাঁদের জীবনের প্রধান অংশটি কাটিয়েছেন শহরে; তাঁদের কবিতাতেও, বিশেষত কালিদাসের কবিতায় শহরজীবনের কথা এসেছে বারবার। কাজেই 'পল্লী-কবি' ছাপ মেরে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখাও অসমীচীন। আর সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও শহরজীবনের স্থান খুব বেশি নয়। আসলে গ্রাম ও শহর নয়, এমনকি বর্ণনীয় বিষয়ও নয়—কবির বিশিষ্ট দৃষ্টি ভঙ্গিই বিচার্য। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই কবিদের সাদৃশ্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি তাঁদের সমবেত এবং কখনো স্বতন্ত্র কাব্যশৈলীও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষ দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম 'সবিতা'র মতো করুণানিধানের প্রথম কাব্যগ্রন্থকেও স্বদেশপ্রেমের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের আগে এ ধরনের স্বদেশপ্রেমের কবিতা সুলভ ছিল না। তরুণ করুণানিধানের

কণ্ঠে তখনই শোনা গেছে—

মরা নদী ভরে গেছে আজিকার বানে
কে তিষ্ঠিবে বলো এই দুর্নিবার টানে!
থর থর করতলে ধরিয়াছি হাল,
তুলে দে মেঘের কোলে নির্ভরের পাল।

কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনে হলেও, সন্ধিক্ষণকে তিনি তখনই প্রত্যক্ষ করেছেন—

আসিয়াছে দুঃসময়, বড় দুঃসময়—
স্তম্ভিত হইয়া আছে আসন্ন প্রলয়।

এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছেন—'আমরা সবাই মায়ের সন্তান।' 'বঙ্গমঙ্গলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে (১৩১২), সেখানে নতুন কবিতা সংযোজনে ও পুরোনো কবিতার রূপান্তরে কবির স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই করুণানিধানকে শুধু রূপমুগ্ধ স্বপ্ন পথিক বলে পরবর্তী বাংলা কাব্যান্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে অন্যায় হবে।

আধুনিক কালে আমরা কবির involvement বা commitment-এর কথা বলি। শতাব্দীর সূচনায় বাঙালি কবিরা সে দিক থেকে জাতীয় জীবন ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বিশেষ মতামত পোষণে ও প্রকাশে বিরত ছিলেন না। স্বদেশ বা সমাজ চেতনার স্বরূপ নিয়ে অবশ্যই তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এই কবিদের আন্তরিকতা বা প্রত্যয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা লালপরী-নীলপরীর কবি বলে জানলেও, তিনি কিন্তু কখনোই গণবিক্ষোভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ বা গান্ধিজির আহ্বান তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিচলিত করেছে, এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে অন্তত তিনি রবীন্দ্রানুসারী নন, সে কথা সকলকে মানতে হবে। লক্ষণীয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তসুলভ সাবধানী মনোভাব বা কলাকৈবল্যবাদী কাব্যসংস্কার অগ্রাহ্য করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের দিনে তিনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন—

যে খুসি টিট্‌কারি দিক
অন্তরে বুজেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ।

তেমনি অহসযোগ-আন্দোলনের দিনেও তিনি বলতে পেরেছেন—

ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।

১৯১০ সালে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণের যে নতুন আইন ঘোষিত হল, তাতে যে-কোনো

রচনাই 'বিদ্রোহাত্মক ও আপত্তিকর' বলে নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কতকগুলি রূপক-কবিতা লেখেন, যার মর্মার্থ দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল না— 'কয়াধু', 'স্কন্ধযাত্রী', 'ভীমজননী', 'অরুন্ধতী', 'গিরিরাণী' প্রভৃতি—এগুলি পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অনুরূপ ফরাসি 'প্রতিরোধে'র কবিতা-নাটকের কথা মনে পড়ে। সে সময়ে এগুলি লেখা কম সাহসের কাজ ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন "He was a fiery Nationalist, almost a revolutionary", তখন তা শুধু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে নয়, কবিজীবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সে যুগে চরমপন্থী দলের দিকেই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল—ব্যঙ্গকবিতা 'নরম-গরম সংবাদ' সত্যেন্দ্র-কাব্যধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়।

৩

রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের কথা মনে রেখেও স্বীকার করতে হয়, তাঁর কাব্য মূলত অন্তর্মুখী। রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনো উত্তেজনা বোধ করলেও, বা সামাজিক অন্যায় ও মিথ্যাচার তাঁকে পীড়িত করলেও, কবিতা লেখার সময় বাইরের জগতের উত্তেজনা ও কলরব তিনি পরিহার করতে চাইতেন। কিন্তু রবীন্দ্রযুগের কবিরা এ দিক থেকে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের মতো সমাজসচেতন, এমন কি বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবীচিন্তাচেতনারও প্রকাশ ঘটে তাঁদের রচনায়। অবশ্য স্ববিরোধ ছিল, কিন্তু মনে হয় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগ এঁদের কবিতায় বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্ক অনেকটা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিগ্রো কবির লেখা কবিতা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রচনা, বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়তো অন্য ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙালি কবিদের অনেক সময়ে মধ্যবিত্ত সংস্কার ও স্বার্থচালিত কবি বলে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী কালের কবিরা কি সকলেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন? অন্য দিকে 'বিষয়বস্তু'র জন্য কোনো কবির প্রশংসা বা নিন্দা নিরর্থক, তাও জানি। তবু যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য না লেখার জন্য বিহারীলাল প্রশংসা পান, রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়গত অভিনবত্বও এক সময়ে চমক সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের একেবারে প্রথমজীবনের কবিতায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান বাদলরাম হালওয়াইর ধর্মঘটের অবতারণা, বারাঙ্গনাকে স্বাগত জ্ঞাপন, কিংবা 'সাম্য-সাম' রচনা খুবই অসামান্য ঘটনা মনে করার কারণ আছে। ১৩১৩ সালে কিংবা তার আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন ভয়-হারী,
> সাম্যের মহা সঙ্গীত সব গাহ মিলি' নরনারী।....
> মানি না গীর্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
> দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর;

পরবর্তী কালে নজরুল ইসলামের একাধিক কবিতায় যে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখা যায় তাকে তাই পূর্বপ্রস্তুতিহীন মনে করতে পারি না—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান....
কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বারা।

সত্যেন্দ্রনাথের 'কুস্থানাদপি' কবিতারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতায়—

শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাক' কোনো গ্লানি।
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয় নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যে 'শুচি', 'প্রথম পূজা'র মতো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তার বহু দিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দেবতার স্থান' বা 'নাভাজীর স্বপ্ন'। সত্যেন্দ্রনাথের 'শূদ্র' বা 'মেথর' কবিতার কথাও আমাদের প্রসঙ্গত মনে পড়বে। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের সমাজচেতনা তাঁদের আদর্শবাদের প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুঁজে লাভ নেই। এক দিকে অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ও দুঃখী-দুর্গতজনের প্রতি মমত্ব, অন্য দিকে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের কবিতার প্রধান বিষয় ও অনুপ্রেরণা। ভক্তকবি কুমুদরঞ্জনও তাই লেখেন—

আকাশস্পর্শী স্পর্ধা যাদের যারা ঘোর জড়বাদী,
লুণ্ঠিত ধনে কায়েমী স্বত্বে সেজে থাকে বনিয়াদী।
তাহাদের কেশ করিয়া আকর্ষণ,
জাগায় বক্ষে বিবেকের দংশন
যায় তাহাদের ধ্বংসের বীজ বপনযজ্ঞ সাধি'।

'কেয়াফুলে'র কবি যতীন্দ্রমোহনকে লিখতে হয়—

শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে;
কে খাটে, কেই বা খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়!
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে।

এবং মনে রাখতে হবে এই কবিতাগুলি এঁদের রচনাধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই ধারাই পরবর্তী কালে যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় পরিশোধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম দিয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের কবিদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—ভগবদ্‌ভক্তির প্রাবল্য তাঁদের রচনাকে সুদূরতা দিয়েছে; ভগবৎবিশ্বাস থেকেই তাঁদের রচনায় এসেছে এক ধরনের প্রত্যয় ও প্রসন্নতা। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও, বিশেষত 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের রচনায় ঈশ্বরাকুতি প্রবল। সুতরাং রবীন্দ্রযুগের কবিরা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখা ভালো, ভক্তিমূলক কবিতারচনায় রবীন্দ্রযুগের সব কবির সমান আগ্রহ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বালকবয়সে নিজেকে না কি 'নাস্তিক' বলতেন, অবশ্য যথার্থ নাস্তিকতার পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সমকালের কবিদের রচনায় কোথাও পাওয়া যাবে না। তবে সত্যেন্দ্রনাথের সহস্রাধিক কবিতার মধ্যে ভক্তিমূলক কবিতার সংখ্যা সত্যই কম। বরং এক ধরনের সংশয়বাদের সাক্ষাৎ মেলে সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন—

> গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
> গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভবন ভরি'!
> রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
> হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।
>
> যে দিকে তাকাই কেবলই যে ছাই পড়িছে ঝরি'!
> ক্লান্ত পরান, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি;
> 'কি হবে গো!'—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি,
> মধ্য-সাগরে ছিদ্র তরণী যায় যে নাবি!
>
> স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মতো আসিছে ঘিরে,
> নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে;
> কোথা সাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী!
> লোনা জলে এ কি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি! (সংশয়)

এখানে 'কাণ্ডারী'র উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাকে ঠিক 'রাবীন্দ্রিক' মনে হয় না। বরং 'ভব-কাণ্ডারী' সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণারই সমর্থন মেলে।

কিন্তু করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস নিঃসন্দেহে ভক্তকবি। তাঁদের কাব্যভাণ্ডারের একটা বড় অংশের প্রধান অবলম্বন ভগবদ্‌ভক্তি। বিশেষত শেষ জীবনে করুণানিধান যেমন 'গীতায়ন'-'গীতারঞ্জন' রচনা করেছেন, তেমনি অন্য কবিরাও হরিনামসংকীর্তনে আগ্রহী হয়েছেন। কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে কথা তাঁদের তিনজন সম্বন্ধেই সত্য—"এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্ত কবি। ভক্তি বস্তুটি এ যুগে উপহাস্য।" তারপর তিনি ভক্তিমূলক

কবিতার সমর্থনে অনেক বাক্যব্যয় করেছেন। কিন্তু তর্ক করে তো কবিতা ভালো-লাগানো যায় না। এঁদের কবিতা আধুনিক পাঠকের ভালো-না-লাগার কারণ 'ভক্তি'র আতিশয্য নয়—রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'-পর্যায়ের গান বা 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিতা আজও 'উপহাস্য' নয়। ভালো-না-লাগার কারণ স্বতন্ত্র, কিন্তু এখানেই রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রযুগের কবিতায় ঈশ্বরাকুতির যে সুর প্রাধান্য পেয়েছে তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'পড়ে-পাওয়া-ধন' নয়। ভক্তিমূলক কবিতার ঐতিহ্য বাংলা দেশে সুপ্রাচীন। কালিদাস রায়ের 'নন্দবিদায়' কিংবা 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' এক সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রানুসরণ নয়। এই সময়ের কবিরা স্বতন্ত্র একটি ভাবাদর্শ ও কাব্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন বলেই তাঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই আদর্শ আজ আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ সুনিবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত সংগীত, কবিগান, যাত্রা-পাঁচালী করুণানিধান-কালিদাস-কুমুদরঞ্জনের কবিতার অন্যতম ভাবপ্রেরণা। কুমুদরঞ্জন তাঁর কবিজীবনের ইতিহাস বর্ণনাকালে জানিয়েছেন—

> আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন (বালক বয়সে) আর কোন কবিতার খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, বাউল, ফরিকদের গীত ও রাখালদের গানই আমার প্রিয় ছিল।...রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে দেরিতে পরিচয় হয়। তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্তনগান প্রথম যেদিন শুনি—আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশি বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্তনগান আত্মসাৎ করিয়াছে।....আমি ভক্তমাল, চৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পতরু ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হয় সত্য, কিন্তু ''রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাদৃশ্য বাহ্য; অন্তস্তত্ত্বে তিনি বৈষ্ণব-অসদৃশ 'রবীন্দ্রনাথ'। বৈষ্ণব মাধুর্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী এবং এই সৌন্দর্যবাদ আবার ঐশ্বর্যবাদে সমাহিত....তাঁহার ভগবান রসের নহে, ভাবের।''[১] রবীন্দ্রনাথ তাই 'বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার'-এ যে-তাৎপর্য খোঁজেন তা করুণানিধানের 'বৈষ্ণব কবি'র কল্পনার সঙ্গে মেলে না—

> রাধা হয়ে বিরহের শাঙন্ রজনী
> জাগিয়াছ একাকিনী পল গণি, গণি',
> ফিরিয়াছ কেঁদে কেঁদে যমুনার কূলে
> না হেরি' তমাল-নীলে তমালেরি মূলে।

কুমুদরঞ্জন শুধু মুখেই বলেন না, ''বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় আমি সব রসই পাইয়াছি।

ভগবান্ 'রসো বৈ সঃ' এটা যেন জানিতে পারিয়াছি।'' তাঁর কবিতাতেও সেই রসের সাধনাই প্রকাশ পেয়েছে—

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী সে রসের মোরা।
স্মরণে তাঁর পরশ-মধু, নামে ঝরে পীযূষধারা,
মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ, পেয়ে তাঁহার গীতের সাড়া।
কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা পাঞ্চজন্য যেথায় বাজে,
গাণ্ডীবে ভীম টংকারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে,
আমরা তাহার ধার ধারি নে, খুঁজি কোথা তমাল-ছায়ে,
মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনাকে বাঙালি কবিরা গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলবেন ''যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,/মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে/ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা/উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদধারা/নাহি চাহি নাথ!' কিন্তু করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস সেই 'ভাবোন্মাদমত্ততা' একান্ত কাম্য বিবেচনা করেছেন, তাঁরা বলেন—

নারি আনন্দ প্রকাশ করিতে নিজে
মুখে খেলে জ্যোতি নয়ন উঠে যে ভিজে,
শিহরে পুলক রোমাঞ্চ কলেবর।[১]

৫

আসলে নিসর্গপ্রকৃতি বা নরনারীর প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তি বা সমাজমনস্কতা যেমন কোনো বিশেষ দেশকালের সম্পত্তি নয়, তেমনি কোনো বিশেষ ব্যক্তির উত্তরাধিকারও নয়। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, কিন্তু একমাত্র প্রকাশশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব নির্দেশ করা সম্ভব। সেখানেও সে প্রভাব সর্বাঙ্গীণ বা সচেতন বলা যায় না। মধ্যযুগীয় এবং উনিশ শতকীয় বাংলা কাব্যের ভাষা ছন্দের প্রতিও তাঁদের সমধিক আকর্ষণ ছিল। কোনো দেশের কোনো কাব্যধারাই পূর্বতন কাব্য-ঐতিহ্য অস্বীকার করে অগ্রসর হয় না। অন্য দিকে এর মধ্যে 'খাঁটি বাঙালিয়ানা'র উত্তেজনাও কাজ করেছিল।

রবীন্দ্রযুগের কবিরা কখনো সচেষ্টভাবে রবীন্দ্র-কবি-ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করলেও, তাঁদের রচনার একটা বড় অংশ লোকায়ত-ঐতিহ্য-পুষ্ট। তাই এঁদের রচনায় ছন্দের শিথিলতা বা ভাষার গ্রাম্যতা অনেক সময়ে একালের পাঠককে আহত করে। বুদ্ধদেব বসুর মতো কেউ এই কারণেই এঁদের 'স্বভাবকবি' আখ্যা দিয়ে অপাংক্তেয় জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং মন্তব্য করেন ঃ ''তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ,—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে আর

তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা।" বলা বাহুল্য এই ধরনের সরলীকরণ রবীন্দ্রযুগের কবিপঞ্জককে বুঝতে আদৌ সহায়তা করে না, আর সত্যেন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রমোহনের মতো কবি সম্বন্ধে কথাগুলি আদৌ প্রযোজ্যও নয়।

সাহিত্যে সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা বেশি দামি, না চাতুর্য এবং কৃত্রিমতা বেশি জরুরি—এ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা আপাতত অবান্তর। আধুনিক কবিতা অবশ্যই সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রথম দিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, এবং তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। কিন্তু কবিতা যদি কাগজের ফুল না হয়, তা হলে তাকে মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করতে হবে। এ দিক থেকে বাঙালি-সমাজ ও সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিতার বিচ্ছেদ ঘটেনি। হয়তো পল্লিগ্রামের সঙ্গে যোগ ও দেশজসংস্কার-নির্ভরতা এ ব্যাপারে কবিদের সাহায্য করেছিল। কবিভাষাও সেখানে খুব সহজেই মুখের ভাষার কাছাকাছি আসতে পেরেছে। মধু-হেম-নবীনের তৈরি-করা-কবিভাষার তুলনায় তাকে সারল্যের নামান্তর মনে হলেও, কাব্যবিচারে ব্যর্থ বলা যায় না। কুমুদরঞ্জন তাই সহজে লেখেন—"দু'দণ্ডেরই আলাপই খুব / বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব / অকুলের কোন কেঁদুলিতে করবো গিয়ে পারণ গো।" কিংবা "গুন্‌গুনানির উনঘুনানি আর ছিল না কাজ রে।" এ গান অবশ্যই সে কালের রাজসভা বা এ কালের কফি হাউসের জন্য লেখা নয়—"দীনপল্লির মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে?" কিন্তু হাট-মাঠ-বাটের ভাষা আধুনিক কবিকেও অন্য ভাবে আকর্ষণ করে।

যতীন্দ্রমোহন বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক পল্লি-কবি না হলেও লোকায়ত কাব্যসংস্কার রক্ষা করেছেন, বিশেষত বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌বিধির ব্যবহারে। প্রত্যেক ভাষা যেমন অনুবাদ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি দেশজ শব্দভাণ্ডার ও প্রয়োগ-বিধিকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করে। এখানেও কবির শিল্পবোধ কাজ করে, কারণ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা কবিরই কাজ। যতীন্দ্রমোহন কেবল বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, চাষার মেয়ে, মালোর মেয়ে, অন্ধ বধূ বা কাজলাদিদিকে নিয়ে কবিতা লেখেন না, নিজস্ব কবিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনেই এখানে পল্লি-ঘেঁষা বিষয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়। "পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌লে কি! / আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুরঝি—ও মা, এ যে ঝরা বকুল!—নয়?" কিংবা "বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই— / মা গো, আমার শোলোক-বলা কাজলা-দিদি কই?"—এমন ভাষা ও ভঙ্গি কারো অনুকরণ নয়, অথচ এর অভিনবত্ব চট্ করে ধরাও যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত কবি, এই খ্যাতি তথ্যভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও, লক্ষণীয়, বাংলা ভাষার দেশজ শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌বিধির ব্যবহারেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্য চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোকায়ত কাব্য-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমান সচেতন ছিলেন। ফলে পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ বিচ্ছেদ ঘটে নি, বরং পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে যোগেই তা নতুন তাৎপর্য লাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু ভাষা-ব্যবহারে নয়, লাচাড়ি-ছন্দের আধুনিক রূপান্তরেও তাঁর সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। 'বাউলের সুরে' তিনি কখনো

লেখেন—"কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা— / ফিঙে গাছে গাছে নাচে?" কিংবা 'পাল্কীর গানে' খুব সহজেই ব্যবহার করেন 'আদুল গায়ে', 'উড়ছে কতক ভনভনিয়ে', 'গরুর বাথান—গোয়ালখানা', 'মট্‌কা থেকে', 'ন্যাংটা খোকা', 'মাথায় পুঁটে', 'দিচ্ছে চালে পোয়ালপুছি', 'ফ্যান্‌সো ভাতে'র মতো শব্দ। 'কাব্যের অধিকার' বাড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেক দিন, সেই গদ্য-ছন্দে 'পুনশ্চ' লেখার কাল পর্যন্ত। কিন্তু তার অনেক দিন আগেই পদ্যছন্দে আমরা ময়রা মুদি, হাটুরে, বাসন-মাজা বহুড়ী, দোকান ঘরের গুরুমশাই, ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে ডাকপেয়াদার সাক্ষাৎ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ এখানে অন্তত উত্তমর্ণ নন; রবীন্দ্রযুগের কবিরা সচেতনভাবেই মুখের ভাষা ও কবিতার ভাষাকে মেলাতে চেয়েছেন; এবং আধুনিক কবিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের অনুসরণ করেছেন।

৬

রবীন্দ্রযুগের প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য আলাদা ভাবে দৃষ্টান্তসহ দেখাবার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটুকু অন্তত স্পষ্ট হয়েছে, শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের প্রধান পাঁচজন কবি একটি স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শের সন্ধান করেছেন, যেখানে লোকায়ত সংস্কার এবং রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলন-চেষ্টা ছিল। রবীন্দ্রপ্রভাবও কখনো কাজ করেছে, কিন্তু সেটাই এ যুগের কবিদের বা কাব্যধারার প্রধান পরিচয় নয়। বরং বলা যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে এঁদের অবস্থান, এক ধরনের 'তিক্ত দ্বিধায়' এঁরা সীমাবদ্ধ—সে জন্য তাঁদের সাফল্য প্রশ্নাতীত না হলেও, প্রাচেষ্টার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এবং এই দিক থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সন্ধিক্ষণের কবিরা বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারেন।

অনুধাবনীয় আলো অনুধাবনীয় অন্ধকারে প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোনো কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলে, সেই সব কবিতা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান শুরু হলে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তা নিয়ে পরীক্ষার উত্তর লিখতে আরম্ভ করলে, সেই কবি ও কবিতার অপমৃত্যু হয় বলে অনেকে মনে করেন। পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা-নির্ভর কবিতা তথ সাহিত্য-বিষয়ক চর্চার সীমাবদ্ধতা স্মরণে রেখেও তেমন সংশয়বাদীদের সবিনয়ে জানানো যেতে পারে যে অ্যাকাডেমিক অনুশীলনের বাইরে সবকিছুই অত্যন্ত মূল্যবান ও শিরোধার্য যমন মনে করাও বোধহয় অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘাজাত। বোধহয় এমনও বলা যেতে পারে যে ঈস্কিলাস-সফোক্লিস-ইউরিনিডিসদের অবিস্মরনীয় নাটকগুলি যেভাবে সময়ের উজানে আমাদের কাছে বাহিত হয়ে এসেছে তার পেছনে অ্যাকাডেমিক আগ্রহ ও অনুশীলনের অবদান ছিলো অনস্বীকার্য।

একজন কবি বা লেখকের কোনো বিচার বা মূল্যায়ন তাঁর সময়কালে হতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছু বছর কেটে গেলে, সময়ের বেশ কিছুটা দূরত্ব তৈরী হলে তবে তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতায় পর্যালোচনা হওয়া সম্ভব। এ-রকম একটি অভিমতও দীর্ঘদিন ধরে চালু। একজন কবি বা লেখককে তাঁর সম-সময়ের পাঠকেরা পড়বেন ও বিচার করবেন এবং তাঁর উত্তর কালের পাঠকেরাও পড়বেন ও বিচার করবেন, সেটাইতো স্বাভাবিক। কোনো পাঠ বা মূল্যায়ন তো সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয় যে সময়-দূরত্বের কল্পিত লক্ষ্মণ রেখা দিয়ে তার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। সমকাল ও উত্তরকালে নানাভাবে পঠিত ও মূল্যায়িত হতে হতেই তো একজন কবি বা লেখক অমরত্বের দাবীদার হয়ে ওঠেন।

ঠিক এই জায়গা থেকেই আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনাটি শুরু করতে পারি। যে শক্তি-সুনীল-শঙ্খ-অমিতাভ অথবা আরো পূর্ববর্তী অরুণ মিত্র-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের নিয়ে বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে আলোড়ন হয়েছে ও হচ্ছে কবিসভায়, পত্র-পত্রিকায়, কফি-হাউসের আড্ডায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অ্যাকাডেমিক চর্চাকেন্দ্রে তাঁদের শ্রম ও সৃজনের বহু বিচিত্র অনুপুঙ্খগুলি নিয়ে আরো বেশী করে মনোনিবেশ করলে আমাদের লাভ না ক্ষতি? আলোচনার শুরুতে তাই 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেন?' জাতীয় প্রশ্নটিকে একটু ঘুরিয়ে নিতে পারি এইভাবে যে 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় নয় কেন?'

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে দুটি নাম ঘিরে পাঠক-সমালোচকদের প্রবল জিজ্ঞাসা ও তুমুল বিতর্ক আমাদের নতুন সহস্রাব্দের সূচনাবর্ষ পর্যন্ত তাড়িত করেছে তার একটি জীবনানন্দ দাশ হলে অন্যটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রথম জনের কবিতা বিষয়ে লক্ষ্য

করা যায়নি, যেখানে দ্বিতীয়জন তাঁর বহুবর্ণময়, বহু বিতর্কিত জীবনযাপন বৈশিষ্ট্যে এবং অতিপ্রজ সৃজনের আশ্চর্য কুহকে জীবৎকালেই কিংবদন্তী। প্রথম জনের কবিতার আশ্রয়েই আরো অনেকের মতো দ্বিতীয় জনের আত্মপ্রকাশ, যদিও সেই আশ্রয়ের বাইরে স্বনির্ভর পদক্ষেপ ও স্বতন্ত্র কবিত্বশক্তিতে তিনি, তাঁর কথাতেই, 'অতিজীবিত'। রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার বিস্তৃতি উপত্যকায় দাঁড়ালে 'জীবনানন্দ' ও 'শক্তি'নামাঙ্কিত দুটি শিখর পাঠক সাধারণের আরোহণের অভীপ্সাকে যার পর নাই জাগ্রত করে তোলে।

পর্বতারোহণের আগে অভিযাত্রীকে জেনে নিতে হয় তার গন্তব্য শিখর সম্পর্কে। এখানেও আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যের কয়েকটি দিক্‌চিহ্ন সাজিয়ে নিয়ে অগ্রসর হতে পারি ঃ—

(১) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সর্বতোভাবেই আত্মজীবন নির্ভর, স্বগতকথনধর্মী, স্বীকারোক্তিমূলক। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এমন অকপট ধারাবাহিকতায় আর কোনো কবি তাঁর কবিতার পর কবিতায় এভাবে আত্মজীবন ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের যাবতীয় আবেগ-সংরাগ, শারীরিক-মানসিক যাবতীয় আর্তি, আততি ও বিপর্যয়, রাগ-অনুরাগ, প্রেম-যৌনতা, মমত্ব-উৎকেন্দ্রিকতা, সৃজন ও নৈরাজ্যের আপামর ওলোট-পালোট শব্দ ও চিত্রকল্পের আশ্চর্য কুহকে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

(২) তাঁর কবিতার এই অ-লজ্জ, শুচিবায়ুতামুক্ত, ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা আগ্রাসী আত্মপ্রক্ষেপময়তার কথা ভাবলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিগত শতকের পঞ্চাশ ও ষাট দশকের আমেরিকান *'Confessional Party'*-র মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রবার্ট লাভয়েল, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ, জন বেরিম্যান ও মিলভিয়া প্ল্যাথ প্রমুখ কবিরা যে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয়। এঁদের মধ্যে 'হাউল'-এর কবি গিন্‌স্‌বার্গের সঙ্গে শক্তি ও তাঁর 'কৃত্তিবাসী' সহচরদের সখ্য তো প্রায় ফ্যানটাসির পর্যায়ভুক্ত।

(৩) 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা, গিন্‌স্‌বার্গ-অরলভ্‌স্কির কলকাতায় আসা, হাংরি অজন্মের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি সূত্র ধরে শুরু করে আমরা ক্রমে শক্তির কবিতার পরিক্রমায় অগ্রসর হলে একটু একটু করে আবিষ্কার করতে থাকি এক ধরনের 'ম্যালিগন্যান্সি'[১]। ভাষা-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ ও ভাষ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন ও মনন, নীতি-নৈতিকতার সুস্থিত ঘেরাটোপ স্বেচ্ছাচারীর তুমুল খেয়ালে ভেঙেচুরে এগিয়ে চলার এক আততায়ীসুলভ প্রবণতা। জীবনের প্রতি আন্তরিক আসক্তি সত্ত্বেও বিসদৃশ, অসুন্দর, সন্দেহভাজন, ভনিতাসর্বস্ব, বিপর্যয়কর যা কিছু তাকে উন্মোচিত করার এক নিষ্ঠুর, প্রগল্‌ভ কার্যক্রম। হয়তো এ সবেরই বীজ ও প্ররোচনা ছিলো জীবনানন্দের কবিতায়। তবু রাগ, হিংসা, নেশাগ্রস্ততা, যৌনাচার, কাপট্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ যেভাবে শক্তির কবিতায় এসেছে, যেভাবে ঝঙ্কারময় তৎসম শব্দের পাশাপাশি যথেচ্ছভাবে অশিষ্ট ও গ্রাম্য শব্দ বসিয়ে শক্তি বাংলা কবিতার পাঠক-সাধারণকে উত্তেজিত করেছেন, তাতে করে জীবনানন্দ-উত্তর কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম গোড়া-পত্তনকারী বলে তাঁকে ভাবাটা অযৌক্তিক নয়।

(৪) কবিতাকে রাজনীতি, সমাজদর্শন, বৌদ্ধিক প্রচার ইত্যাদির প্রয়োজনে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন শক্তি। কেবল শক্তিই নয়, সাধারণভাবেই 'শতভিক্ষা' ও 'কৃত্তিবাস'-এর মতো পত্রিকাকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠা পঞ্চাশের কবিতায় তার পূর্ববর্তী দুটি দশকের উদ্দীপ্ত গণ-সংবেদিতা তথা সোচ্চার সমাজমনস্কতা থেকে অনেকটাই ব্যক্তিগত, আত্মমগ্ন, নির্মাণসচেতন শিল্পের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা ছিলো। ১৯৬২-তে কবিতা বিষয়ক একটি গদ্যে শক্তি লিখেছেন—'কবিতার কোনো বাস্তবিক উদ্দেশ্য নাই। কবিতা কবিগণের কাছে একপ্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার। কবিতা ঘোরতর অসামাজিক। অবশিষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজসেবা। কবিতা একধরনের ব্যাকরণ যা কেবল অনিবার্যভাবে সাহিত্যের ভাষা শিক্ষা দেয়।'[২] অবশ্যই ঐ বিশেষ সময়ের আবহে বলা এইসব কথায় কিছু ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন আছে, আছে প্রচলিত বিশ্বাসকে আক্রমণ করবার যৌবনকালীন দ্রোহবাসনা। তবু উদ্দেশ্যমূলক বা *'didactic'* শিল্পের দায় থেকে সরে যাবার যে প্রস্তাবনা শক্তির ঐ ভাষ্যে ছিলো তাকে সবটাই ভঙ্গিপ্রধান খেয়ালিপনা বলে মনে করবারও কোনো কারণ নেই। এর বছর দশক বাদেই প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন শক্তির অন্যতম সহযাত্রী, পঞ্চাশের অন্যতম বিশিষ্ট কবি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'দেশ' পত্রিকার ১৯৭২-এর সাহিত্য সংখ্যায়—'আমরাই বোধহয় কৃত্তিবাস ও শতভিষা কবিপত্রের লক্ষ্মীছাড়ার দল—শুরু করে দিয়েছিলাম অ-তাত্ত্বিক (*Non-ideational*) কবিতা লিখতে'। এই প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন অন্যত্র আরো বলেছিলেন—"এই কবিরাই (অর্থাৎ অ-তাত্ত্বিক কবিতার রচয়িতারা) আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম 'কবিতা বাংলে দেবে না মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে' (আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ) এই ধারণার কাছাকাছি থেকেই কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন।"[৩] তাঁদের কবিতা সম্পর্কে শক্তি, অলোকরঞ্জন প্রমুখ যা বলতে চেয়েছেন তার প্রাসঙ্গিক অভিমুখটি মোটের ওপরে ধরা গেলেও সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত বা প্রামাণিক নির্ণয় খুব সহজ নয়। কবিতার এই 'হয়ে উঠতে থাকা' কি প্রকৃতই দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ প্রভাব অগ্রাহ্য করে নির্ভার ও নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে? কবিতায় ভাষা ও আঙ্গিকে কি ধরা পড়ে না সম-সময়ের বহুমাত্রিক দোলাচল ও আততি? শক্তি যতই বলুন না কেন তাঁর কবিতা কেবল 'এক প্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার' অথবা 'ঘোরতর অসামাজিক'?

(৫) অলোকরঞ্জনের সঙ্গে একটি বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি যে কবি হিসেবে শক্তি ছিলেন এক 'স্বশিক্ষিত' বা *'autodidact'*[৪] রচয়িতা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের মতো কবিতা রচনাতেও যিনি নিয়ম-নীতি-অনুশাসন-শৃঙ্খলার নিম্নসীমা লঙ্ঘনে বেপরোয়া। জীবন ও মৃত্যু, আসক্তি ও বৈরাগ্য, নির্মাণ ও নৈরাজ্য ইত্যাকার পরস্পর প্রতিমুখী টানের মধ্য দিয়ে তাড়িত ও আলোড়িত হতে হতে যেন চকিত বিদ্যুৎ-উদ্ভাসের মতো অনুভূতির রহস্যজটিল শব্দলিপি রচনা করে গেছেন। কবিতা তথা শিল্প-সাহিত্যে যাঁরা 'আধুনিকতাবাদী' তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই সচেতন, মগজ প্রধান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান ও অনুশীলনের একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যের মালার্মে-রিলকে-

পাউণ্ড-এলিয়ট কিম্বা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী এমন কি জীবনানন্দ দাশেও এই সচেতন সন্ধান ও চর্চা আমাদের নজরে পড়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্ভবতঃ এই বৌদ্ধিক অনুশীলনের ঘরানার কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত বলে মনে হয়। রিল্‌কে শক্তির অন্যতম প্রিয় কবি ছিলেন; বদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভেরলেন প্রমুখ ফরাসী কবিদের প্রসঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে শক্তির কবিতাতে এসেছে; পাশ্চাত্যের কবিদের রচনার সার্থক তর্জমাও করেছেন তিনি। তবু তাঁদের রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে কোনো লক্ষণীয় আত্মীয়তা শক্তির কবিতায় দেখি না। অলোকরঞ্জনের দেওয়া 'অটোডিড্যাক্‌ট্' অভিধাটি সে-কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'নিজের রক্তার্জিত অনুশীলনের স্বরলিপিই ছিল শিক্ষানবীশের সমীপে তাঁর শিক্ষকতার ভিত্তি'।[৫]

(৬) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু এবং তাঁর কবিতার সম্পাদক ও সংগ্রাহক সমীর সেনগুপ্ত মত প্রকাশ করেছেন যে 'বিষয়হীনতা' শক্তির কবিতার 'প্রথম ও প্রধান লক্ষণ'; বলেছেন, 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে। ....তাঁর কবিতার কোনো সারমর্ম করা যায় না, ...তাঁর সব কবিতাই যেন পার্থিব ও অপার্থিবের সীমারেখার ওপর রচিত'।[৬] এসব মন্তব্য আবারও সেই ম্যাকলিশের কবিতার 'হয়ে উঠতে থাকা'-র দিকে ইশারা। এবং এ সব কথার মধ্যে অবশ্যই কবিতা বিষয়ক কিছু মৌল ও অনতিক্রম্য সত্য আছে। প্রকৃতই কি কোনো সার্থক কবিতার সারমর্ম করা যায়? প্রকৃত কবিতা কি সর্বদাই তার বাহ্য বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যেতে চায় না? দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আড়াই হাজারেরও বেশি কবিতায় শক্তি লিখেছেন নানা বিষয় নিয়ে। প্রেম, নারী, যৌনতা, প্রকৃতি, পর্যটন, জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর, মানুষ ইত্যাদি কত না বিচিত্র বিষয় ও প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তবু যদি বলি যে 'বিষয়হীনতা' তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণ, সেক্ষেত্রে 'বিষয়হীনতা'ই হয়ে দাঁড়াবে বিষয়। আর তাছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে ঐ 'হয়ে উঠতে থাকা'র সঙ্গে বিষয়ের যোগ আছে।

এতক্ষণে মনে হয় আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামক শিখরটি আরোহণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি সেই বেস ক্যাম্পে যেখান থেকে মূল যাত্রার রুট-ম্যাপটি আমাদের নাগালে এসেছে। আমরা আরোহণ করতে চাইছি আর্চিবল্ড ম্যাক্‌লিশের কবিতার 'হয়ে উঠতে থাকা'র সূত্রটি অনুসরণ করে। ১৯২৬-এ তাঁর *'Ars Poetica'* শীর্ষক রচনার একটি কবিতার শেষ দুটি ছত্রে ম্যাকলিশ বলেছিলেন—*'A poem should not mean/But be'*. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ থেকে আমরা কবিতার হয়ে ওঠার রহস্যটি বোঝার চেষ্টা করবো। কিভাবে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের প্রসঙ্গ-নির্দেশিত ভাষা বা *'referential language'* থেকে কবি নানা ভাবে সরে যেতে চান আবেগ-অনুভব-মনন-নির্ভর এক সৃজনশীলতার দিকে—এক *'creative'* ও *'performative language'*-এর দিকে, যেখানে কী বলা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে বলা হচ্ছে। অথবা কিভাবে বলা হচ্ছে কেবলমাত্র তারই স্তরে স্তরান্তরে লুকিয়ে আছে কী বলা হচ্ছে তার সমস্ত সম্ভাবনা ও

বিকল্প। শব্দ, শব্দার্থ, পদান্বয় ইত্যাদির নানা বিচ্যুতি, শব্দের দ্বারা শব্দের অতিনির্ণয়, চিত্রকল্প ও প্রতীকের বহু বিচিত্র কুহকমায়া, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি মিলে কবিতার ভাষা কিভাবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু নির্বাচিত কবিতা থেকে আমরা তার একটা ধারণা পেতে পারি। শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র পূর্বে উল্লেখিত একটি মন্তব্য 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষার এই অনুসন্ধানে আমাদের যাত্রারম্ভের সংকেত বলে বিবেচিত হতে পারে। অথবা আমরা ম্যাক্‌লিশের মতো করে বলা সুজান ল্যাঙ্গার-এর একটি মন্তব্যকেও এ প্রসঙ্গে সবুজ আলো বলে ধরে নিতে পারি—*'Though the meterial of poetry to verbal, it impact is not the literal assertion made in the words, but the way the assertion is made'.*

এই আলোচনায় প্রথমে বেছে নিচ্ছি শক্তির জনপ্রিয়তম কবিতাগুলির একটি, 'আনন্দ-ভৈরবী'। এক গভীর, আত্মমগ্ন, বিষাদময়, স্মৃতিমেদুর প্রেমের কবিতা। ছয় মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা কুড়ি পংক্তির এই কবিতা পাঁচটি স্তবকে সমবিভক্ত। প্রথম স্তবকের চারটি ছত্র কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ফিরে এসেছে পঞ্চম স্তবক রূপে। প্রতিটি স্তবকের প্রথমে তিনটি পংক্তি সমদৈর্ঘ্যযুক্ত দুটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্বের সঙ্গে একটি দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। তিনটি পংক্তির শেষে এই অপূর্নতা আর তার পরেই চতুর্থ হ্রস্ব পংক্তিটি মিলে যেন কবিতার গতিক্রমে আবেগার্ত হৃদয়বেদনার ছোঁয়াটি লাগিয়ে দিতে চান কবি। ছন্দকে এভাবেই কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে একাত্ম করে কবিতার 'হয়ে উঠতে থাকা'কে নির্ভার করে দিয়েছেন শক্তি।

কবিতাটি, অনুমান করা যায়, কোনো এক বিরহী প্রেমিকের স্বাগতকথনের ঢংয়ে লেখা এবং তার স্মৃতিবাহিত বিষণ্ণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ধরণের আর্ত নমনীয়তা কবিতার ভাষার আবহটি চিহ্নিত করেছে। প্রথম ছত্রে লক্ষ্য করুন 'এলায়ে পড়েছে'। তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তিতে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার 'সেকি জানিত না এমনি দুঃসময়....' এবং তার পরের পংক্তিতেই চলিত রীতির ক্রিয়া—'লাফ মেরে ধরে....'। এভাবে সাধু-চলিতের মিশ্রণে যে গুরুচণ্ডালী তা শক্তি জীবনানন্দের অনুসরণে ব্যবহার করেছেন তাঁর বহু কবিতায়, বিশেষতঃ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে।

তৃতীয় চতুর্থ স্তবকে দুই দুই চার বার এসেছে জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যাংশ 'সে কি জানিত না'। কবিতার প্রেমিকের হৃদয়বেদনা এই বাক্যাংশে অনুযোগ হয়ে বেজেছে। একটি পংক্তি বা তার অংশকে একাধিকবার ব্যবহার করে লিরিক ধুয়া তৈরি করা শক্তির কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানা ধরণের পুনরক্তি দিয়ে কবিতার ভাষায় যে সমান্তরালতা সৃষ্টি করা যায় সে ব্যাপারে শক্তি ছিলেন নিপুণ কারিগর। আমরা যারা 'আনন্দ-ভৈরবী' মন দিয়ে পড়েছি বা শুনেছি শক্তির গলায় তারা আরো জানি যে দুটি স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'সে কি জানিত না' স্বরগ্রামের উত্থান ও পতনে কিভাবে কবিতার প্রেমিক পুরুষটির হৃদয়ের বিরহ-বিষাদের লেখচিত্রের ইঙ্গিত দেয়।

বিশেষ লক্ষ্যনীয় কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শব্দ ও শব্দানুষঙ্গ—'গোঠ', 'রাখাল ছেলে', 'মোহন-বাঁশি' ও 'বটের মূল', সব মিলিয়ে যেন একটি প্রাচীন, পুরাণ প্রতিম, প্যাস্টোরাল আবহ। সেই দূরবর্তী রাখালিয়া আবহ থেকে ঠিক পরের স্তবকেই কবি আমাদের নিয়ে আসেন সব-সময়ের অস্থিরতা ও বিপন্নতার দৃশ্য চিত্রকল্পে—'সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়/ লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি'। অতীত ও বর্তমান, 'হৃদয়পুর' ও 'রাজধানী', অনাধুনিক ও আধুনিক, এইসব বিপ্রতীপতার বিরোধের সঙ্গে ওতোপ্রোতো হয়ে যায় ভাষার গুরুচণ্ডালী। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে 'সে কি জানিত না' দিয়ে পরপর চারটি প্রশ্ন, কিন্তু কোথাও কোনো প্রশ্নচিহ্ন নেই। চতুর্থ প্রশ্নটি বিশেষভাবে আমাদের কাব্যভাষা বিষয়ক আলোচ্য প্রসঙ্গটিকে তীব্রভাবে উসকে দেয়—

'সে কি জানিত না, আমি তারে যত জানি/আনখ-সমুদ্দুর'। গোটা কবিতায় শক্তি কেবলমাত্র দুটি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি স্বল্প বিরতি সূচক 'কমা', উদ্ধৃত অংশে 'সে কি জানিত না'র পরে এবং একটি পূর্ণচ্ছেদ কবিতার শেষে। পর পর তিনবার প্রশ্নচিহ্নবর্জিত জিজ্ঞাসার পর চতুর্থবারে এই স্বল্প বিরতি যেন এই স্বগত জিজ্ঞাসাকে কিছু স্বাতন্ত্র্য দিচ্ছে এবং এও লক্ষনীয় যে এখানেই কবিতার প্রেমিক চরিত্রটি প্রথম ও শেষবার উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমি' ব্যবহার করেছে—'আমি তারে যত জানি....'। খেয়াল করুন, 'তারে', 'তাকে' নয়। 'এলায়ে', 'বরষা' ইত্যাদি কিছুটা কোমল ও পদ্যগন্ধী শব্দের সঙ্গে 'তারে' এই সর্বনাম যেন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় শব্দ নির্বাচন, নির্মাণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক সহজাত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন শক্তি। 'আনখ-সমুদ্দুর' শব্দটির ব্যবহার সেই জাদু ক্ষমতার একটি নির্দশন। 'আনখ-সমুদ্দুর' অর্থাৎ নখ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত। 'আপাদমস্তক', 'আসমুদ্রহিমাচল' ইত্যাদির মতোই যেন আনখ-সমুদ্দুর'। কিন্তু এখানে তার প্রিয় নারী সম্পর্কে প্রেমিক পুরুষটি যখন বলেন, 'সে কি জানিত না, আমি তার যত জানি/ আনখ-সমুদ্দুর' তখন শব্দটি ঠিক কী অর্থ বহন করে? স্তবক শেষের হ্রস্ব পংক্তির জায়গায় বসে শব্দটি যেন কোনও দূরাচারী জলকন্যার মতো পাঠককে হাতছানি দেয়। তখন আমরা বুঝতে পারি 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে', এ মন্তব্যের সারবত্তা।

'উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল/আনন্দ-ভৈরবী'। কবিতার শিরোনাম রূপে ব্যবহৃত কী এই 'আনন্দ-ভৈরবী'র দুটি শব্দের হাইফেন-চিহ্নিত যৌগ যা হতে পারে আনন্দের রাগিনীবিশেষ, কিংবা দশমহাবিদ্যের অন্যতম রূপের আদলে কল্পিত এক নারীমূর্তি, কিংবা শেষ-আষাঢ়ের 'বরষা-পীড়িত' এক ফুলেরই নাম। এইসব বিকল্পের মধ্য দিয়েই কবিতার অন্তর্বস্তু গড়ে উঠতে থাকে ব্যঞ্জনার্থের নানা চোরা স্রোত ধরে। কিছুতেই কোনো সারমর্ম বা সরলার্থের দিকে যাওয়া যায় না।

এখান থেকেই আমরা চলে যেতে পারি শক্তির আর একটি বহুপঠিত ও বহুশ্রুত কবিতায়—'অবনী বাড়ি আছো?' আবারও একটি জিজ্ঞাসা, যদিও পূর্ববর্তী কবিতার তুলনায় এখানে জিজ্ঞাসা অনেক বেশি জোরদার। তিনটি অসম স্তবকের এই কবিতায়

প্রতি স্তবকের শেষে ধ্রুবপদের মতো বেজেছে এই প্রশ্নটি। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে পাই যে হিজলিতে দীর্ঘ তিন মাস অবস্থান কালে কবিতাটি রচিত হয়েছিলো মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ে এক ঘোর-লাগা অবস্থায়।' এ কবিতায় শব্দ নির্বাচন ও যোজনার মধ্য দিয়ে আত্মসংকট, স্বপ্নময়তা ও নাটকীয়তার টানাপোড়েনে যে ভাবমন্ডলটি আভাসিত হচ্ছে তাতে শব্দার্থ ও যুক্তিপরম্পরার কোনো সুনিশ্চিত বোধগম্যতা পাওয়া কঠিন। অবনী নামধারী কোনো ব্যক্তিবিশেষ ও তার রুদ্ধদ্বার গৃহের বাইরে সন্ধানী কণ্ঠস্বর, এসবের কোনো তথ্যগত ভিত্তি এ কবিতার প্রকৃত ভরকেন্দ্র নয়। বরং শাব্দিক তথ্য ক্রমেই অবান্তর হয়ে যায় 'চিহ্নায়ক' বা 'Signfier' সমূহের বহুমাত্রিক গ্রন্থনার গূঢ় রহস্যে। নিশুত রাতে ঘুমিয়ে থাকা নিরাপত্তা-নির্ভর জনবসতির ছবি, অবিরাম কড়া নাড়ার শব্দ এবং অবনীকে খুঁজে ফেরা অনুসন্ধানকারী, খানিক রহস্য-গল্পের মতো এটুকু কাহিনীসূত্র কবিতাটির আকর বলে মনে হয় না। এক অবচেতন আত্মনাট্যের যেন এগুলি ন্যূনতম তথ্যসূত্র। এইসব তথ্যচিহ্নের আড়ালে থাকে এক গভীরতর মানবিক সংকেত, এক অনিকেত সত্তার আর্ত আশ্রয় সন্ধান। বিশেষতঃ 'অবনী' নামবাচক বিশেষ্যটি যখন 'পৃথিবী' বা 'ধরনীর' অর্থ বহন করে। কবিতার ভাষাবয়নে 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নায়িত' (Signified)-এর সেতুবন্ধ এবং তার বার্তাটি পাওয়ার জন্য চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার রহস্য উন্মোচন—'অবনী বাড়ি আছো?'র মতো কবিতা পাঠককে সেই সৃজনশীল পাঠ ও অনুভবের দিকে প্ররোচিত করে।

এবার আমরা কবিতাটির 'হয়ে উঠতে থাকা'র দিকে তাকাই। 'দুয়ে এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া'। নিদ্রামগ্ন জনবসতির একটি ছবি। শক্তি লিখলেন 'দুয়ার'; 'দরজা'; 'দ্বার'; 'কপাট' ইত্যাদি নয়, 'দুয়ার' যা বিকল্পগুলির তুলনায় কিছুটা কাব্যিক ও ধ্বনিময়। 'আটকে' বা 'বন্ধ করে' না লিখে লিখলেন 'এঁটে', যা দৈনন্দিন ব্যবহারের গার্হস্থ্যময়তাযুক্ত শব্দ, বেশ আটপৌরে এবং প্রচলিতভাবে কাব্যিক নয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া'। দৃশ্য চিত্রকল্পের পর শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা। কিন্তু তাতে চিহ্নায়কের রহস্যময়তা লক্ষনীয়। 'রাতের কড়ানাড়া' মানে কি 'রাতই কড়া নাড়ছে, না রাত্রিকালীন কড়ানাড়া? অথবা এমনও কি হতে পারে না যে রাতের দরজাতেই কড়া নাড়ছে অচেনা আগন্তুক? আবারও সেই শব্দ বিন্যাসের গূঢ় তলে নিশ্চিত অর্থের সমস্যা।

প্রথম স্তবকে অবনীর প্রতি আর্ত, উচ্চকণ্ঠ প্রশ্ন ও কড়ানাড়ার শব্দ মিশে যেভাবে নিরাপদ নিশিনির্জনতাকে ভেঙে দেয়, তারই বিপরীত আবহ দ্বিতীয় স্তবকে: শান্ত, সজল, সবুজ প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ। 'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/ এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে/ পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস/দুয়ার চেপে ধরে—'। বারোমাস বৃষ্টি পড়ে, এ কোন্ চিরসজল দেশ? আকাশে সঞ্চরমান মেঘের দলকে কবি যখন 'গাভীর মতো চরে' এই উপমা দেন তখন সেই চিরসজল দেশের চিরমেঘমেদুর আকাশ যেন পরিণত হয় তৃণভূমিতে। এই উপমার পরেই যখন সবুজ নালিঘাসের গররাজি হয়ে দুয়ার চেপে ধরার ভঙ্গিটি সমাসোক্তির সার্থক প্রয়োগে মানবিকীকৃত হয়ে যায়, তখন শব্দার্থকে অতিক্রম করে

তথ্যাতিগ চিহ্নায়নের বয়নসূত্রটির আন্দাজ পাওয়া যায়। কাব্যভাষার আপাতগ্রাহ্যতার অন্তরালে এভাবেই পরাভাষার এক স্বতন্ত্র পরিসর উঁকি দিয়ে যেতে থাকে।

কবিতাটির শেষ স্তবকের প্রথম দুটি ছত্রে উচ্চারণ হয়ে ওঠে আরো বিষাদময়, জটিল ও আত্মঅনুভবময়—'আধেকলীন—হৃদয়ে দূরগামী/ব্যাথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি'। এখানে 'আধেকালীন' কি 'হৃদয়'-এর বিশেষণ? সেক্ষেত্রে তো দুয়ের মাঝে 'ড্যাশ' চিহ্নটি থাকার কথা নয়। 'দূরগামী' শব্দটি কি ব্যথার দূরে যাওয়া বোঝাচ্ছে? রুদ্ধদ্বার ঘরে 'আধেকলীন' সত্তা এবং দূরে চলে যাওয়া ব্যাথার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া—এ সবের শাব্দিক ও তথ্যগত আরণের আড়ালে খেলা করে অবচেতন রহস্য। আর সেই ঘুম আবার ভেঙে যায় 'রাতের কড়ানাড়া'য়। তবে '<u>কেবল</u> শুনি'-র পরিবর্তে এখন '<u>সহসা</u> শুনি'।

কবিতা ভাব দিয়ে হয় না, হয় শব্দ দিয়ে। চিত্রকর দ্যাগার প্রতি কবি মালার্মের এই কটাক্ষের কথা আমরা সবাই জানি। তবু প্রশ্ন থাকে কবিতা লেখা হয় শব্দ দিয়ে বলতে ঠিক কী বোঝায়? গল্প, উপন্যাস, দৈনন্দিন কাজের হরেক রকম গদ্য, মুখের কথা ইত্যাদি সবই তো গড়ে ওঠে শব্দ দিয়ে। আর তাছাড়া কোনো ভাষাতেই কেবলমাত্র কবিদের ব্যবহারের উপযোগী বা তাদের জন্য সংরক্ষিত কোনো শব্দভাণ্ডার নেই। তবু কবিতায় শব্দেরা যেভাবে আসে ও যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে এক প্রায়-অনিবার্য সৃজনী শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত হয়, শব্দের অভিধা-অর্থ অথবা ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে তাকে ধরা যায় না, শাসন করা যায় না। নতুন শব্দেরা যেমন আসে তেমনি আবার পুরনো শব্দেরাও নতুন করে বেঁচে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কার বা পরিমার্জনার খুব বেশি সুযোগ থাকে না। শব্দার্থকে ছাপিয়ে ওঠে ব্যঞ্জনা বা অনুষঙ্গ, শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনায় তৈরি হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ। চিত্রকল্পের অভিনবত্ব ও তীব্রতায়, ছন্দের চমৎকারিত্ব ও লাবণ্যে, চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের বহুমাত্রিক বয়শিল্প কবিতার ভাষায় সঞ্চার করে এক রহস্যকুহক। ক্ষেত্রবিশেষে উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতির স্পষ্টতা থাকলেও মোটের ওপর বলা যায় যে কবিতার ভাষা যতখানি রহস্যসৃজনের ভাষা, ততখানি রহস্যমোচনের ভাষা নয়। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ইংরেজ লেখক জর্জ পুটেনহ্যাম তাঁর 'The Art of English Poesie' গ্রন্থে কাব্যভাষার এই রহস্যময়তা ও গোপনীয়তার কথা বলতে গিয়ে এক ধরণের 'doubleness'-এর কথা বলেছিলেন যা মূলতঃ শাব্দিক তথা আলংকারিক। অর্থাৎ আবারও আমরা কবিতায় কী বলা হচ্ছে তার চাইতে কিভাবে বলা হচ্ছে সে দিকেই অনুসন্ধানের নির্দেশ পাচ্ছি।

কবির সত্যাগ্রহ ও শব্দাগ্রহ এক ও অভিন্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিন্নতার কিছু আন্দাজ পেতে আমরা কবি শঙ্খ ঘোষের একটি ভাষ্য দিয়ে শুরু করতে পারি—'প্রকৃতি যেভাবে শুকনো ঘাসের কাছে যায়, কবিরা তেমনি শব্দের কাছে' লিখেছিলেন একদিন এই কবি। সব কবিই সেভাবে শব্দের কাছে যান কিনা জানি না, কিন্তু শক্তি যেন প্রায় প্রকৃতির প্রাণ আর প্রাচুর্য নিয়ে ঝুঁকে পড়েন শব্দের দিকে, সজীব করে তোলেন তাঁর সমস্ত সংসার। এই প্রাচুর্য এমনই যে তার স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়লে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দিশাহারা লাগে কোনো পাঠকের। কিংবা অজস্র পাতা ঝড়ে পড়া সুঘ্রাণ বনের মধ্যে একলা

হেঁটে যাবার মতো অনুভব হয় তার''।[১] কিভাবে শক্তি ঝুঁকে পড়েছিলেন শব্দের কাছে, কিভাবে ভরে তুলেছিলেন তাঁর কবিতার সংসার তার কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ঃ—

(১) যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি।.....আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। (জরাসন্ধ / হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)।

(২) লালসাময় তড়িৎ তুমি কিছু-কিছু অশ্রুবেদনার্ত (সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী/ঐ)।

(৩) নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার (চতুরঙ্গে/ঐ)।

(৪) অলস অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো নখে নখে, তীরে/ দাঁড়িয়ে পড়েছে সাদা গাছগুলি, উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া (ঝর্ণা/ঐ)।

(৫) বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূণ্য নদীতটে (ভ্রান্তি/ ঐ)।

(৬) যে বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনব্যবহিত কর হতে / তোমাতেই ফিরে যায়.... (দেবদূত/ঐ)।

(৭) হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও / যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে দূরে/ আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালো জল—/ হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে ঘুরে (ছায়ামারীচের বনে/ঐ)।

সব কটি উদাহরণই শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' থেকে সংগৃহীত। কাব্যভাষার রহস্য বিষয়ক আলোচনায় হয়তো এটিই শক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কথ্য গদ্যরীতিতে লেখা 'জরাসন্ধ' কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি মোট আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। একবার বিশেষণরূপে ও বাকি সব ক্ষেত্রেই বিশেষ্য পদ হিসাবে। কিন্তু উদ্ধৃত অংশে 'অন্ধকারের মতো শীতল' উপমাবাচক বিন্যাসটি লক্ষ্য করুন। 'শীতল' স্পর্শের অনুভূতি সাপেক্ষ, যেখানে 'অন্ধাকার' বহন করে কৃষ্ণ দৃশ্যপটের অনুভব-অভিজ্ঞতা। তারপর শক্তি নিয়ে আসেন 'অনঙ্গ অন্ধকার' শব্দবন্ধে প্রত্যঙ্গহীন, অবয়বহীন, কিমাকার অন্ধকারের এক ভয়ানক প্রেত-অভিজ্ঞতা। ধ্বনিময়, ঝংকারময় তৎসব শব্দসমূহের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য আধুনিক বাংলা কবিতার এক লালিত উত্তরাধিকার। উদ্ধৃত অংশগুলিতে সেই উত্তরাধিকার মনস্ক কবির পরিচয় পাই 'রিক্ত', 'লালসাময়', 'অশ্রুবেদনার্ত', 'প্রায়ান্ধকার', 'উপঢৌকন', 'অনব্যবহিত' ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু 'চতুরঙ্গে' কবিতার ঐ পংক্তিতে—'নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার'—কিভাবে 'প্রায়ান্ধকার' বিশেষণ পদটি তার ব্যাকারণ-শাসিত অবস্থান থেকে সরে গিয়ে উচ্চারণটিতে কবিতার কাঙ্খিত রহস্য এনে দিলো তা তো আমাদের ভেবে দেখতেই হয়। 'ঝর্ণা' কবিতার দুটি ছত্র পরীক্ষা করুন। ভালোবাসা ঝর্না তৈরী করেছিলো। এখন ভালোবাসা তাকে নদীরূপ দিচ্ছে; আর সেই আশ্চর্য অতি-ভৌগলিক নদীকে দেখে 'শাদা গাছগুলি' অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ছায়ার কারুকাজ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ তো গেলো কবিতায় বর্ণিত

ছবি থেকে বুঝে নেবার চেষ্টা। কিন্তু 'উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া'-র মতো চিত্ররূপময়তার কি কোনো সারার্থ সম্ভব? এবারে 'ভ্রান্তি' কবিতার পংক্তিটিকে দেখুন—নদীতটের শূন্যতার অবহে 'মরীচি' অর্থাৎ 'আলো' যেন পরিণত হয়েছে মরীচিকায়। কিন্তু এও তো সেই কবিতার ভেতর থেকে গ্রহণযোগ্য অর্থ নিষ্কাশন। কবিতা থেকে গেছে শব্দ বিন্যাসের অন্তরচারী ধ্বনিত, দোলায়িত, প্রলম্বিত আবহমণ্ডলে, জীবনানন্দের বিখ্যাত পংক্তিটির মতো 'চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা') (বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূণ্য নদীতটে'।

একটু আলাদা করে দেখা যাক্ 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতার উদ্ধৃত অংশটি। 'উট' স্বাভাবিকভাবেই মরুদেশের বাহন এবং 'যোজনান্তকর কাঁটাগাছ' সেই মরুদেশেরই চিহ্ন। সেই মরু-বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে রয়েছে 'কুয়োতলা কালো জল', যার কথা আমরা পাই শক্তির 'কুয়োতলা' শীর্ষক আত্মজৈবনিক আখ্যানে। কিন্তু কী অর্থে 'উট' গভীর ধমনী'? অথবা 'গভীর উট' বলতেই বা ঠিক কী বোঝায়? অর্থাৎ কল্পদৃশ্যগুলির মধ্যে কিছুটা উদ্ভটত মিশিয়ে দিয়ে, যুক্তি গ্রাহ্য অর্থ-পরম্পরাকে কিছুটা নাড়িয়ে দিয়ে কবি যেন পাঠককে খানিক হেঁয়ালির সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে চান। এ কবিতার পরবর্তী স্তবকে ভিড় করে আসে আরো কিছু উদ্ভট ছবি যাতে শব্দের অর্থ ও বিন্যাসগত অসঙ্গতি এক ধরণের যুক্তিক্রম-রহিত, প্রায়-পরাবাস্তববাদী স্বয়ংক্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করে—'কী ধার উজল অবিরত টিলা পরে/ টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।/ অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে / বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন বাড়ে রাত'। তবে লক্ষনীয় এই যে শব্দার্থ ও বিন্যাসের এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও কবিতায় নিরূপিত ছন্দ ও অন্ত্যমিলের শৃঙ্খলটি কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি। ফলে শক্তির বেশ কিছু কবিতায় চিত্রকল্প ও প্রতীকে উদ্ভটত্ব ও যুক্তিক্রম লঙ্ঘনের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ফরাসী কবিতার পরাবাস্তববাদীদের সমগোত্রীয় বলে শক্তিকে চিহ্নিত করা চলে না।

বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ও কবিতা বিষয়ক টুকরো লেখায় শক্তিবলেছেন একটা ঘোর-লাগা মানসিক অবস্থার কথা, যে আবিষ্ট অবস্থা থেকে তাঁর কবিতাগুলি জন্ম নিয়েছে। কয়েক মিনিটে প্রায় কোনো কাটাকুটি ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে একটি কবিতা। পরেও তার কোনো সংশোধন বা পরিমার্জনার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। 'পরাবাস্তবতা' বা 'সুররিয়ালিজম্'-এর দাশনিক বোধ শক্তির সামগ্রিক কাব্যচর্চায় সেভাবে প্রতিফলিত না হলেও কবিতার সৃজন প্রক্রিয়ায় এক অবচেতন, অতীন্দ্রিয় রহস্যের ছোঁয়া তিনি অস্বীকার করেন নি—'আমার যা কিছু লেখা সে সব তো সচেতনভাবে লিখি না—কে যেন লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ—হঠাৎ একটা সময় আসে, এমন একটা গূঢ় অবস্থার মধ্যে চলে যাই। তখন লেখা হয়'।[১০] অথবা 'লেখা ব্যাপারটাই আমার মনে হয়—আমি যেন একটি পুকুরের মধ্যে ডুব দিলাম, উঠলাম না, যতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ততক্ষণ যা দেখলাম, জানলাম তাই লিখে ফেলা'।[১১] এমন আবিষ্ট অবস্থায় কবিতারচনার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে ইংরেজী তথা ইওরোপীয় কবিতার ইতিহাসে মূলতঃ রোমান্টিক

কবিদের প্রসঙ্গে, ব্লেক, কোলরিজ, ইয়েট্স, হ্যোল্ডারলীন প্রমুখের ক্ষেত্রে।

অথচ আবিষ্ট হয়ে সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় কবি যতই কবিতা রচনা করুন না কেন, সেই সৃজন প্রক্রিয়ায় নির্মাণের ন্যূনতম শৃঙ্খলা, ভাষা-ছন্দ-অবয়বের কিছু পরিকল্পনা থাকেই, অথবা বলা যায় থাকতেই হয়, যদি তাকে কবিতা হিসাবে কোথাও পৌঁছতে হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় উচ্চতা বোহেমিয়ানা সত্ত্বেও শব্দমনস্কতা, চিত্রকল্প-প্রতীকের অনবদ্য কারিগরি, নিরূপিত ছন্দ ও ছন্দভাঙায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে কবিতাশিল্পের চর্চায় তিনি যথেষ্ট শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। কোনো সোচ্চার ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে কবিতাকে ব্যবহার করতে চান নি। পরোক্ষ টান-টোনের মধ্য দিয়ে, শব্দ প্রয়োগের সমস্ত সম্ভাবনাকে তিনি দিয়ে গেছেন জীবনের 'জলজ দর্পণ' হয়ে ওঠার স্বাধীনতা।

ফিরে আসি 'প্রকৃতির প্রাণ আর প্রাচুর্য নিয়ে' শক্তির শব্দের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রসঙ্গে। 'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি' বলেছিলেন যে কবি তাঁর সেই অমিতব্যয়ীতার প্রগল্‌ভ স্বীকারোক্তির কথা ভাবলে আমাদের তো এটাও ভাবতে হয় যে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে গেলে উপার্জনের প্রাচুর্য থাকাও জরুরি। শক্তির কাব্যভাষার রহস্য সৃজনধর্মীতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তাঁর শব্দের বিস্ময়কর প্রাচুর্য। ঐতিহ্যানুসারী ওজনদার তৎসম শব্দ-ভাণ্ডারের পাশাপাশি তদ্ভব অর্থাৎ আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের শব্দ, গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শব্দ, অশিষ্ট বা ইতর শব্দের অ-লচ্ছ বাহুল্য, ইংরেজি ও অন্য বিদেশী ভাষার নানা স্বাদ ও বর্ণের শব্দ—সব মিলিয়ে শব্দের এক অবিশ্বাস্য, বর্ণাঢ্য মিলন মেলা। এক সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততা ও শুচিবায়ুহীনতায় সব ধরনের শব্দকে যেভাবে তাদের ব্যাকরণ ও সংস্কারশাসিত অর্থের পাহারাদারি থেকে শক্তি মুক্তি দিয়েছেন বহুস্তর ব্যঞ্জনার রহস্যে, উপার্জনের সেই সাবলীল নিশ্চয়তা না থাকলে কি খরচ করা যেত ঐ 'রূপবান কথার মোহরগুলি'?

তবে কেবলই যথেচ্ছভাবে শব্দ খরচ করে গেছেন শক্তি, এ তাঁর স্বভাবসুলভ প্রগল্‌ভতার উচ্চারণ। অসংখ্য শব্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি মহৎ কবির প্রতিভা ও দায়িত্বে। খরচ হয়ে যাওয়া শব্দগুলি জমা পড়েছে, ধৃত রয়েছে অগুনতি পাঠকের অনুভব ও স্মৃতিতে। ভাষা ও সংস্কৃতির নানা স্তর থেকে লক্ষ্যভেদের অব্যর্থতায় শব্দগুলিকে তুলে আনা এবং অভাবনীয় চৈতন্যময় উচ্চারণে তাদের প্রয়োগে যেমন এক বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শক্তি, তেমনি শব্দের অন্তর্লীন রহস্যকুহকের নানা দিক নিয়ে লিখেছেন এমন বেশ কিছু কবিতা যা আধুনিক শব্দবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় গভীর অভিনিবেশ দাবী করবে। মনে করুন তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৯৫ সংখ্যক রচনাটি—'শব্দগুলি সুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে / আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড় / সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে.... / অবশ্য জানি শব্দ কতো আদর্শ-নির্ভর- / শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাঁসে-কাঁদে, হিসি করে বুকে / খুচরো করে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ, / তাকে করে তামা, গায়ে জামা

নেই, নুব্জ নতমুখ— / এভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে!' মানুষের একেবারে সহজ গার্হস্থ্য জীবনের ছবিতে এখানে দেখা হয়েছে শব্দকে। শক্তি এখানে শব্দের সাংসারিক ধর্মে বিশ্বাসী। কোনো অসম্ভব উচ্চাকাঙ্খা নেই তাঁর; বরং ক্রমে অবসিত হয়ে আসার অনুমতি, এক স্বাভাবিক মৃত্যুবোধ যেন তাঁর শব্দবোধেও সংক্রামিত। শব্দের প্রয়োজন, শব্দের শক্তি, শব্দের জীবন-মৃত্যু, যন্ত্রণা-উদ্দীপনা, ভাঙা-গড়া নিয়ে নানাভাবে ভেবেছেন শক্তি। ব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে, অর্থের সংকোচন বা অবনমন হতে হতে, শব্দ একদিন অবসিত হয়। সে রকমই ক্লান্ত, অবসন্ন শব্দের বেদনা অসম্ভব মানবিক আবেদনে ধরা পড়েছিলো 'সোনার মাছি খুন করেছি'র 'ক্ষমা করো' কবিতায়—'...শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে / যেখানে মূল শব্দ উঠে আসে / উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ / মুখ লালায় দেয় ভরিয়ে / কাঁধে মাথা রেখে বলে: / ক্ষমা করো—আর বাজতে পারি না'।

'কবিতা' নামক বানীশিল্পের অমোঘ উপকরণ শব্দ। নির্মাণের সেই উপকরণ নিয়ে এতো আন্তরিক ও নিবিড় মানবিক অনুসন্ধান খুব বেশি নির্মাতার কলমে উঠে এসেছে বলে মনে হয় না। শব্দকে মানুষের মতো করে দেখা এবং মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, ক্ষয়-ক্ষতি, যন্ত্রণা-উপশম দিয়ে চিহ্নিত শব্দের বারোমাস্যা শক্তির কাব্যভাষার এক অভিনব মাত্রা ঃ—

(১) 'আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে........ / যে আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম..... / .....এখন তার দুঃখে আমি দুঃখী, অনুতাপী— / ....একদিন পিরে যেতে হবে প্রসিদ্ধ যৌবনে / ....অবাধ্য শব্দ ক্রমাগত সাজিয়ে মহান / আবার বানাতে হবে নিজহাতে নিজেরই সমাধি......'। (ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ / প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই)

(২) 'শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে..... / এক নিদারুণ রোদ এসে ডাল মুড়িয়ে নেবার কালেই / শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে! / শব্দ এমন যখন-তখন শট্‌কে পড়েন দূরে / হয়তো ভাবেন, পারলে যাবেন এড়িয়ে রোদ্দুরে / কখনো কোনো গাঁয়ের মধ্যে / যেখানে নেই আস্ত রোদের হানা / সব কিছু সাত-টুকরো এবং তরল কাণ্ডখানা!' (শব্দ গেছে / কবিতার তুলো ওড়ে)

(৩) 'শব্দের নিজস্ব কিছু ক্ষিদে আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি আছে; / ....শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছ মাংস খায় /..... স্তূপাকরা অন্নে-শস্যে, শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ আছে। / তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনটি বা / যুগলে মানায় কাউকে, অন্যে বসে নিভৃতি, বিরহে— / এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা / মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে / বালু নিয়ে অকারণ, বল নিয়ে, ইয়ো-ইয়ো নিয়ে—/ সেই স্বাভাবিক খেলা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি / একদিন, তারপর মিশে গেছি তাদের সহিত ঃ / আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে / এই বলে; ব্যবধান না রেখে অন্দরে চলে গেছি'।

(মিশে গেছি শব্দের সহিত / এই আমি যে পাথরে)।

(৪) 'শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে। / বর্ণমালা ঘর দুয়ার, কিছু কিছু নিয়ে বনভূমি— /..... মডেল টাউন যেন, গড়েছে নিঃসঙ্গ তিলোত্তমা! /..... অমরত্ব চাই বলে অধিকাংশে শব্দ তোলে দাবি / অঘোষিত শব্দ চোখ মুদে থাকে পাতার আড়ালে। /.... শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে— / দেখে আসি'। (চলো দেখে আসি / কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে)।

'আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে'—এই কথা বলে যে কবি ঢুকে পড়েন শব্দের অন্দরমহলে, তাঁর শব্দ প্রকরণই কবিতার সেই হয়ে ওঠার চাবিকাঠি। কবিতা রচনার একেবারে আদিপর্ব থেকেই অভিজাত, ঝঙ্কারময় তৎসম শব্দের ব্যবহারে শক্তি আধুনিক কবিতায় তাঁর কীর্তিমান পূর্বসুরীদের পদচ্ছাপ অনুসরণ করেছিলেন। ধ্বনিময়, ওজনদার বিশেষণ ও বিশেষ্য শব্দের চমকপ্রদ সন্নিহিতি তাঁর কাব্যভাষায় নিশ্চিতভাবেই এনেছে এক মধুর গাম্ভীর্য। 'প্রভেদজটিল, অবগুণ্ঠিত সড়ক', 'পলালমণ্ডিত কেশমালা', 'ফেনাবগাঢ় রাত', 'অমনযোগিতাময় সিঁড়ি', সৃপ্যমান জগৎসংসার,' 'অনুধাবনীয় অন্ধকার', 'তৃষিত কল্পনাপ্রবণতা', 'উত্থানক্ষমতাহীন মেরুদন্ড', কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা', 'বিপুল অঙ্গমিশ্র' ইত্যাদি অজস্র শব্দবিন্যাস শক্তির কবিতার পর কবিতায় উচ্চারণের গম্ভীর, কাব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বরগ্রামটি চিহ্নিত করেছে। আবার তারই পাশাপাশি গ্রাম্য, অশিষ্ট, ইতর শব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগে শব্দের কৌলিন্যপ্রথা তথা বর্ণাশ্রম ভেঙে দিয়েছেন শক্তি এক আততায়ীসুলভ নিষ্ঠুরতায়— 'শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল / দেহের বিহ্বল মুত'; পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে করতে দিকবিদিকহারা'; 'ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার / আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার'; 'হাত মারে, হেগে যায়'; 'উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মত্ত'; 'পোড়ার মুখো মিনসে / মা গো কী তার হিংসে'; 'কেলিয়ে কাতরিয়ে পড়বে সম্ভাবনা'; '....মুখোমুখি / দাঁড়াই জীবনে, চোখ মারি... / নিজের পেন্টুলে মুতি'; 'নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে আইঢাই করতে করতে মাগভাতারে পথ / পাড়ি দিচ্ছে, মোটরে'; 'এলটে পর্যন্ত পরনের তেনি তোলা'। কাব্য সুষমাময়, রুচিশীল শব্দ ও বাক্ প্রতিমার সংসারে তথাকথিত অন্ত্যজ অপশব্দের এমন অসংকুচিত অনুপ্রবেশ শক্তির আগে বাংলা কবিতায় দেখেছি বলে মনে হয় না। এও সম্ভবতঃ শক্তির জীবন ও রচনার প্রকাশ কর্মকার যে 'ম্যালিগন্যান্সি'র কথা বলেছিলেন তারই লক্ষণ। উত্তর-আধুনিকতার অন্তর্ঘাতমূলক প্রবণতার কিছু স্পর্শও কি এতে পাওয়া যায় না?

কবিতায় শব্দ আর অর্থকে আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। ঠিক যেমন রেখাচিত্রে আলাদা করা সম্ভব নয় রেখা ও চিত্রকে; রেখাই চিত্র, আবার চিত্রই রেখা। ভারতীয় আলংকারিকদের অন্যতম কুন্তক শব্দ আর অর্থকে পরস্পরের সঙ্গে দন্দ্বে লিপ্ত দুই যোদ্ধার সঙ্গে তুলনা করে তাদের 'পরস্পরস্পর্ধিত্ব' ও অন্যূনাতিরিক্তত্ব'-র উল্লেখ করেছেন। কবি পল ভালেরি শব্দ ও অর্থের দোটানা এবং কবিতার ভাষার স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে একটি দোদুল্যমান পেণ্ডুলামের রূপক ব্যবহার করেছেন—'Think of Pendulum

oxillating between two Symmedrical points. With one of these points, associate the ideas of poetic form, the face of rhythm, the sonority of Syllebles.....With the other poeit....associate the intellectual efect, the isions and feelings the, for you, make up the 'content', the meaning of the given poem;....between the form and the content, between the sound and the sense... an oxillarion is set up...'[২২] কবিতায় তাই শব্দেরা অর্থের ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ থাকে না। আপাত অর্থের সীমা পেরিয়ে দূরতর কোনো তাৎপর্য, ভাষার আপাত স্বচ্ছতা অতিক্রম করে কোনো ভাষাতীতের ইঙ্গিত দেয় কবিতার ভাষা। পুরোপুরি বোঝার আগেই তা বেজে ওঠে। স্মরনীয়, কবি এলিয়টের সেই বহুল প্রচারিত উক্তি—'Genuine poetry can commeericate before if is understood.'

শব্দ ও অর্থের এই 'পরস্পরস্পর্ধা', পেণ্ডুলামের দোলাচল, ভাষা থেকে ভাষাতীতে সেই রহস্যযাত্রা আরো অনেক মহৎ কবির মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যভাষারও সামান্যলক্ষণ। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে কয়েকটি আশ্চর্য পংক্তি। শক্তি যখন লেখেন 'অথির বিচুরি মাকু', কিম্বা 'পরিত্রাণহীন খাটা পায়খানা' কিম্বা 'চন্দ্রমল্লিকার মাংস' কিম্বা 'রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো', তখন বিদ্যুচ্চমকের শিহরণ খেলে যায় যেন। এমন প্রয়োগ কি গদ্যে সম্ভব? অথবা শক্তি যখন 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' কাব্যের 'পেতে শুয়েছি শব্দ' নামক আট লাইনের কবিতায় 'শব্দ' এই শব্দটিকে ঘুরেফিরে আটবার ব্যবহার করেন, কিম্বা 'আমি চলে যেতে পারি'-র 'মানুষ বিষয়ে' শীর্ষক ছ'লাইনের কবিতায় 'মানুষ' শব্দটি যখন ব্যবহারে করেন তেরোবার, তখন কী মনে হয় না যে কবিতা প্রকৃতই 'হয়ে ওঠে' এবং তার নির্মাণরহস্যের উপভোগ ও মূল্যায়ণ তার বিষয়-বক্তব্যের সার-নিষ্কাশন অপেক্ষা অনেক জরুরি?

শেষ করার আগে খুব সংক্ষেপে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। প্রায়-বয়ঃসন্ধিকালেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েও পরে রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন শক্তি। তাঁর কবিতায় দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতার, রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ও ভন্ডামি বারবার উন্মোচিত হয়েছে ধারালো ব্যঙ্গে, নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণায়। তবু সমসময়ের বহু ছাপছোপ আছে শক্তির কবিতায়। প্রথাগতভাবে তাঁকে 'সমাজসচেতন' বা 'দায়বদ্ধ' জাতীয় তক্‌মা দেওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে তাঁর বহু কবিতায় সমাজ, সমকাল, মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ বিম্বিত হয়েছে। লক্ষনীয় এই যে সেইসব কবিতাতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর রহস্য সৃজনের কাব্যভাষাটি চিনতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না ঃ—

(১) 'একটি ভিখারি ছেলে <u>ভালোবেসে দেখেছিল ভাত</u> আর পরখ করেছিল / <u>জ্যোৎস্নায় জুড়ানো ধানগাছগুলি</u> ধানের গোড়ায় স্তব্ধ জল ভরা / <u>মাখনের মতো</u> / মাটির সাবলিলতার <u>চিকন-কাঁপানো ধান</u>, ধানগুলি ভাত হতে পারে?' ('সীমান্ত প্রস্তাবঃ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন' / অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

(২) 'শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে হত্যা করে বাধ্য রাজনীতি। / এও কি মানুষে করে? যে মানুষ বসেছে হৃদয়ে!' ('তীক্ষ্ণ তরবারি' / প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই)

(৩) 'অস্ত্র নদীর কাঁধ থেকে আজ জনমানুষের গায়ে পড়ে / গোপন পিঠে এবং মিঠ মাথার ওপর ঘূর্ণিঝড়ে / যেমন ধুলো, অনেকগুলো হিংস্র পোড়ায় দৃষ্টিতে খর / মানুষ নামের জাতক জানে সব যুগে এই ভ্রান্তিমুখর.....'। ('ঐ যেখানে অস্ত্র' / সুখে আছি)

(৪) 'সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি / বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী / বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর রইলো আস্ত / হাত বাড়ালে টিকোনো দায় স্বাধীনতার স্বাস্থ্য।' ('সাম্প্রতিকী ১৯৬৬' / ঈশ্বর থাকেন জলে)।

(৫) 'টালিখোলার ওপরে পড়েছে রোদ, অনেকদিন পরে, আমাদের ঘরে ভাত ফোটানো হচ্ছে / .... কালো তিজেলে ফুটছে ভাত / জোর বরাত, আমাদের ঘরে রোদ্দুর এসেছে / ভাতের গন্ধে পেটে ভোঁচকানি লাগে, রাগে / গা জ্বলছে, পেটে জ্বলছে খাণ্ডর / ... এই তো / ভাত নেমেছে .... / ভালোই, অনেকদিন বাদে ভালো —আসছে / তাকে ডাকি'। ('তাঁকে ডাকি' / জ্বলন্ত রুমাল)।

(৬) ছেলেটা খুব ভালো করেছে শক্ত পাথর ভেঙে / মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো' ('ছেলেটা' / ভাত নেই পাথর রয়েছে)।

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের 'এপিটাফ' কবিতায় শক্তি এক আত্ম-প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন যাতে ছিলো এক 'কবি ও কাঙাল'-এর কথা। সে মারা গেলে 'মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ, / কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না / সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না, টাকা দাও / নতুবা ভাঙ-চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা, / চট্‌জলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে'। এই আত্ম-চিত্রণে হয়তো কিছু বাড়িয়ে বলা, কিছু মজা ছিলো। তবু এর ভেতরে 'কবি' ও 'কাঙাল', এই দুই বিপরীতমুখী অস্তিত্বের এক আশ্চর্য সহবাসের কথা আছে। কবি, যিনি বেপরোয়া, প্রতিষ্ঠানিক বাণিজ্যের কর্ণধারদের কাছে যিনি অস্বস্তিকর, হয়তো বা বিপজ্জনকও বটে, যিনি দৈনন্দিন জীবনের দাবী আদায়ে সোচ্চার; অন্যদিকে কাঙাল, যিনি অবিরত পুড়তে থাকেন জীবনযাপনের প্রবল বাসনায়। একজন রাগী, উচ্চকণ্ঠ, অন্যজন কিছুটা দুর্বল, অসহায়। এই দ্বৈত অস্তিত্ব আর তার অলঙ্ঘনীয় সংঘাত এক রক্তমাংসের মানুষের জীবনলিপী। যিনি সৃজনের স্পর্ধিত উচ্চারণে নিজেকে মেলে ধরতে চান, তারই ভেতরে লুকিয়ে থাকে এক নিভৃতচারী অচিন মানুষ। এই বিপ্রতীপতাই জীবন, এই বিপ্রতীপতাই সৃজন। আর তাই যে কবি 'গাছ', 'বৃষ্টি', 'চাঁদ', 'অনন্ত' ইত্যাদির মতো প্রতীক বা চাবি-শব্দগুলি বারবার বাজিয়ে তোলেন তাঁর কবিতায়, তাঁকে বারবার দাঁড়াতে হয় 'পাথর', 'চিতা' আর 'অন্ধকার'-এর সামনে। সম্ভ্রান্ত ও কুলীন শব্দের সঙ্গে প্রায়শই ঢুকিয়ে দিতে হয় কর্কশ ও অশিষ্ট শব্দকে। আসন্ন মৃত্যুর বিষঘুম থেকেই উচ্চারণ করতে হয়—'আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে / শুধু জাগরণ চাই বারেক জীবন'।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. শক্তির বন্ধু ও বিখ্যাত চিত্রকর প্রকাশ কর্মকার তাঁর শক্তি বিষয়ক স্মৃতিলেখায় 'ম্যালিগন্যান্সি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন শক্তির স্বভাব ও সৃজনের গভীরে থাকা এক অস্থির বোহেমিয়ানাকে বোঝাতে। সূত্রঃ 'আমার বন্ধু শক্তি কিম্বা আপাতত মুখ লুকোনো খরগোশ উজ্জ্বল পশমের বাইরে চঞ্চলভাবে', কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২।।

২. 'কবিতার প্রতি সমীহ', অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, জানুয়ারি ১৯৯০।।

৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, স্থির বিষয়ের দিকে, ১৯৭৬, পৃঃ ২৯।।

৪. এই কাব্য এই হাতছানি, দেবতোষ বসু সম্পাদিত, ১৯৯৭, ভূমিকা, পৃ. ৭।।

৫. তদেব

৬. ভূমিকা, অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৪।।

৭. Suzanne Langer, Philosophy in a New Key, fuoted in Philip Davies Robets, How Poetry works, 1986, P. 62.

৮. মাবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবন ঘসে আগুন জীবন ঘসে কবিতা', বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫।।

৯. 'শক্তির কাছাকাছি', সমরজিৎ ও ইলা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), ১৯৯৬, পৃ. ৭৪।।

১০. 'এই কাব্য এই হাতছানি', পৃ. ১২৮।।

১১. তদেব, পৃ. ১২৩।।

১২. Paul Valiry, 'The Art of Poetry', 1958, P. 209-10.

বাংলা কবিতায় রাজনৈতিক উপাদান (১৯৭০ - ২০০০)

হিমবন্ত বন্দোপাধ্যায়

শিল্প সাহিত্যের জন্ম সময় ও সমাজের যুগ্ম করতলে। তার কেন্দ্রে থাকে মানুষ। মানুষকে নিয়ে, মানুষকে ছাড়িয়ে যে জীবন চলেছে, সাহিত্য তাকে ব্যাখ্যা করতে চায়। বুঝতে চায় সমাজ সময়ের ভালো মন্দকে। সেই সূত্রে, স্বাভাবিকভাবেই শিল্পসাহিত্য নন্দনদর্শনে চলে আসে আন্তর্মানবিক সম্পর্কের নানামুখী বুনন, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বাত্মক অবস্থিতি, তার নানা তল এবং স্তর, তার উচ্চাবচতা, তার আকাঙ্খা ও আততি। এই সবটা নিয়েই তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব। রাজনীতি, সেই অর্থে তাকে 'করতে' হয় না, রাজনীতির মধ্যেই সে হয়ে ওঠে। এই স্বতঃসিদ্ধতাকে দেখেই গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল মানুষকে 'রাজনৈতিক প্রাণী' (*Zoon Politikon*) বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তারপর সভ্যতার পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে তার অগ্রগমন তার ইতিহাস। হাজার বছর ধরে তারপর পথ হাঁটা পৃথিবীর পথে। কলাশিল্পগুলির মধ্যে কবিতা বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। সামান্যতম সামাজিক বিচলনও কবিকে অস্থির করে। সভ্যতার সংকট সময়ে, মানবেতিহাসের মলমাসগুলিতে—অনুকম্পারীজন জানেন—কবিতা কীভাবে ধারণ করে সেই টানাপোড়েন এবং তার ফলশ্রুতিতে। অশান্তির আঘাতে সে রুদ্রবীণা বাজে, তার মৃদুতম তরোঙ্গচ্ছাস কবিতার অক্ষরে অক্ষরে অনুরণিত হয়, জীবনকে শুদ্ধতর রূপে গড়ে নিতে কবি কখনো বা সচেতন অভিপ্রায়ে, আবার কখনো নিজের অজান্তে হয়ে ওঠেন দিকদর্শক, অধিনেতা। কবিতার সমৃদ্ধ ইতিহাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার গণনাতীত দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে, দেশে দেশে। কবিতায় রাজনীতি চলে আসে এভাবেই, জীবন যাপনের নিজস্ব শর্তে, সচেতনতায়, জীবনের স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়ায়। জলের থেকে যেমন মাছকে পৃথক করা যায় না, ঠিক সেইভাবেই.....। আধুনিক কালের কবিতায় এই সচেতন স্বভাব সহজবোধ্য কারণেই ঢের বেশি। বাংলা কবিতাও, বলা বাহুল্য, তার ব্যতিক্রম নয়।

সময়ের এই দিকচক্রবাল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বাংলা কবিতার সত্তর দশকে চোখ রাখা মানে তো এই সেদিনের কথাকে পুনর্বার স্মরণ। যে সময়ের দূরত্বকে সাদারণত ইতিহাসের আশ্রয় মানা হয়। 'সত্তর' সময়ের ততোটা 'দূরতর দ্বীপ' নয়; ততোটা ধূসর নয় প্রত্নময় নয় তার স্মৃতিসত্তা। তবু বাংলা কবিতার ইতিহাসে সত্তর শুধুমাত্র কালখণ্ড নয়, এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। যে ইতিহাস একই সঙ্গে বীরত্ব ও গরিমার, আবার অন্তর্ঘাত এবং অত্যাচারের। বারুদের গন্ধে ভরা পথঘাটে গ্রামেগঞ্জে সদর মফস্বলে মেশা মুক্তির

নেশায় মাতা তরুণের স্বপ্নে এবং স্বপ্নভঙ্গে যার পরিচয়। এত বড় উত্থান এবং এতখানি অপচয় কখনো কি দেখেছে এই দেশ? এই মৃত্যু উপত্যকা কি কারও দেশ ছিল তখন? ছিল বোধ হয়। তাদের সমবেত প্রতিরোধেই তো সেই লাশবিপনির চরিত্র গেল বদলে, সে তো সত্তরই। এই উথালপাথাল সময়ে সুতরাং রাজনীতি, কবিতা এবং জীবনযাপন যে মিলে মিশে যাবে, এবং হয়ে উঠবে নতুন এক মাত্রা—এমনটাই প্রত্যাশিত। না, সত্তরের কবিতা প্রত্যাশাভঙ্গ করে নি। 'খুব রঙ্গে ভরা' এই পশ্চিমবঙ্গের অদূরে ঠিক তখনই চলেছে আর এক মুক্তিযুদ্ধ, রচিত হয়ে চলেছে আর এক শৌর্যময় ইতিহাস। পূর্বপাকিস্তানের বাংলাদেশ হয়ে ওঠাও কম রোমহর্ষক নয়। এই সব মিলিয়ে, পূর্বপশ্চিমে দুই হাতে কালের মন্দিরা বেজেছে তখন—ডাইনে বাঁয়ে। এই সব মিলে গেছে সত্তরদশকের কারুবাসনায়। তার কবিতাতে।

।। দুই ।।

"গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখলো ডি আই বি-র লোক
স্টেটসম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিলো,'আর নয় এবার ফিরে যা'—
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়
রিভালবার গর্জে ওঠে....

অধ্যাপক বলেছিলো, 'দ্যাটস্ রঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিই নি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে',
চটকলের ছকু মিঞা, 'এবার প্যাঁদাবো শাহা হারামি ও. সি.কে!
উনুন জ্বলে নি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকে ছিল তারা।"

সত্তরের এই অতি জীবন্ত ছবিটি কবিতায় এঁকেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। ষাটের কবি হলেও সত্তরের কবিতায় তাঁর স্মরণীয় সক্রিয়তা ভোলার নয়। আসলে রাজনৈতিক ভাবে সত্তরের ভূকম্পনের এপিসেন্টার তো ষাটের শেষেই। এই সময়ের জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এইরকম ঃ

ষাট	সত্তর	বিশ্বপরিস্থিতি
১। চীন-ভারত যুদ্ধ ('৬২)	১। নকশাল আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও দমনমূলক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস	১। মহাকাশে মানুষ ('৬১)
২। কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ ('৬৪)	২। বিধানসভা নির্বাচন ('৭২)	২। চাঁদে মানুষ ('৬৯)
৩। পাক-ভারত যুদ্ধ ('৬৫)	৩। জরুরী অবস্থা ('৭৫)	৩। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ('৬৫)

ষাট	সত্তর	বিশ্বপরিস্থিতি
৪। দ্বিতীয়বার কম্যুনিষ্ট পার্টিভাগ নকশালবাড়ি আন্দোলন ('৬৭)	৪। বিধানসভা নির্বাচন : বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ('৭৭)	৪। ফ্রান্সে ছাত্র আন্দোলন ('৬৭)
৫। যুক্তফ্রন্ট সরকার (শুরু ও শেষ)		৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এছাড়াও গণতন্ত্র হত্যা দেশে দেশে : ইন্দোনেশিয়া (সুকর্ণ) কঙ্গো (প্যাট্রিস লুসুম্বা), চিলি (আলেন্দে) ইত্যাদি
৬। কংগ্রেস ভাগ ('৬৯)		

গোটা পৃথিবীর এই অস্থিরতার ঋতুতে, এই ঘনঘন মাথা নাড়ার দিনগুলিকে এই বাংলার গ্রাম-শহরের শুনশান, সন্ত্রস্ত চেহারা শুধু সেলুলয়েডে নয়, বেঁচে আছে জীবিত জনের মনে মনেও। রাত ঘন হলেই পুলিশ গাড়ির আচমকা আনাগোনা আর চেনা অচেনা পায়ের দুদ্দাড় দৌড়। তারপর বোমা ও গুলির শব্দ। পরদিন খবরে বা খবরের কাগজে সত্য-মিথ্যা অর্দ্ধসত্যে ঠাসা ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর, মৃত্যুর পরিসংখ্যান। ট্রাম, বাস, স্কুলবাড়িতে আগুন, মিছিলে টিয়ার গ্যাস, ট্রাফিক পুলিশের মাথা কাটা লাশ, হাত বাঁধা যুবকের মৃতদেহ—বেওয়ারিস, পাইপগান-বোমা-থার্ড ডিগ্রি, সি. আর. পি-র কুম্বিং অপারেশন, পাড়াছাড়া আর পুলিশফাঁড়িতে ধর্ষণের বিচিত্র নির্মম কোলাজ। একদিকে স্বপ্নদর্শী যৌবন, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি, একদিকে বীরত্ব অন্যদিকে ব্যর্থতা, একদিকে গণউত্থান অন্যদিকে গণহত্যা এবং আরও বেশি করে—গণতন্ত্রহত্যা। এই ছিল এই সময়ের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ও আবহ।

সত্তর, এই সিকি শতাব্দীর দূরত্বে এখন ইতিহাস। কিন্তু আশি-নব্বই? সময়ের এই ঘনিষ্ঠতা কি সময়কে বোঝার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়? একথা ঠিকই, এসেকেলেটরের নিম্নতম ধাপে পা রাখলে সেই চলমান সিঁড়ি যেমন পথিককে পৌঁছে দেয় ভিন্নতর উচ্চতায়, অনায়াসে, সময়ও তেমন করিৎকর্মা। নতুন সহস্রাব্দীতে কী চমৎকার চলে এলাম আমরা—এভাবেই হয়তো আবহমান ইতিহাসের অঙ্গে লিপ্ত আমরা। তত্ত্বগতভাবে একথা হয়তো ঠিক। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের যুগলক্ষণ এতো সহজে শনাক্ত করা যায় কি? আশি-নব্বইয়ের কবিতার স্বভাবচরিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই খট্‌কা থেকেই যায়। স্থির সময়াঙ্কে স্থাপন করার মতন প্রামাণিক ভিত্তি পেয়েছে কি আশি-নব্বই?

তবু একথাও ঠিক, সত্তর দশকের থেকে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক নানা কারণে আশি এবং নব্বইয়ের দশক, তার কবিতা, তার কবিতায় জমে ওঠা রাজনীতির ধরন অনেকটাই আলাদা। সেগুলি চিহ্নিত করার আগে আশি নব্বইয়ের সমাজ রাজনীতির একটি রেখাঙ্কন করা প্রত্যাশিত, এখানে সেই প্রধান ঘটনাগুলি সংকেতিত হল ঃ

প্রাদেশিক ও জাতীয় ঘটনা	আন্তর্জাতিক ঘটনা
১। স্বাধীনতা-উত্তর কালে সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ, আই.এম.এফ থেকে, ৫০০ কোটি ডলার ('৮১)	১। মিখাইল গরবাচেভ রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ('৮৭)

প্রাদেশিক ও জাতীয় ঘটনা	আন্তর্জাতিক ঘটনা
২। জাতীয় দূরদর্শনের সম্প্রচার ('৮২)	২। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন শুরু, পোল্যাণ্ড, ক্ষমতায় লিচ ভ্যালেন্সা ('৮৯)
৩। ইন্দিরা গান্ধী হত্যা ('৮৪)	৩। চিনে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে গণহত্যা ('৮৯)
৪। শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান, রাজীব গান্ধী হত্যা ('৯১)	৪। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ('৯১) বরিস ইয়েলেৎসিন
৫। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ('৯২)	৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী সরকারের পতন নেলসন মেন্ডেলা-('৯১)
৬। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় ('৯৮)	৬। উপসাগরীয় যুদ্ধ ('৯৪)

আমরা দেখেছি, উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সময়ের কবিতায় প্রভাব বিছিয়েছে। রাজনীতির চেনারূপ অনেক ক্ষেত্রে কবিতার মাঝে বদলে গেছে; সরাসরি রাজনৈতিক অতিপ্রত্যক্ষতায় শিল্প নিছক শিল্প থাকে না বলেই কুশলী কবি কিছুটা ঘুরপথে কবিতায় রাজনীতির উপাদান ব্যবহার করেছেন—বিশেষত নব্বইয়ে।

।। তিন ।।

কবিতার এই দশকওয়ারি অলীক সীমারেখায় অনেক আবশ্যিক সত্য ধরা দেয় না—একথা আমরা জানি এবং মানি। শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' ছাড়া সত্তরের রাজনৈতিক কবিতার মূল্যায়ন কি সত্যিই যথার্থতা খুঁজে পায়? অথবা, অমিতাভ দাশগুপ্তের এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্রুদ্ধ অথচ অনিবার্য কবিতা বিনা? মুণ্ডহীন ধড়গুলির 'আহ্লাদ' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে তীব্রতায় ধরে রেখেছেন আর সঞ্চারিত করেছেন উত্তর প্রদেশের জন্য—আর কি সত্যি কোনও তুলনা আছে? কিংবা অরুণ মিত্র, এই সংযত লেখালেখির সংবেদনশীল স্রষ্টাকে ভুলে যাবে কি করে সত্তর?

তবু সত্তরের কবি তো মূলত তাঁরাই, যারা এই আগ্নেয় সময়ে এলেন প্রথম, রচনা করলেন নিজেদের পৃথক অথচ সার্থক আত্মপরিচয়, কবিতাস্বাক্ষর। অন্তত এইভাবে বিভাজনেই প্রতিটি দশকের নতুন কবিদের নতুনত্বকে বুঝে নিতে পারি আমরা। এই সময়ে সক্রিয় সিনিয়ার কবিদের, অতএব, সংশ্লিষ্ট আলোচনায় উহ্য রাখাই সমীচীন বিবেচিত হল।

সত্তরের কবিরা সংখ্যায় অল্প নয়। তাদের সব কবিতাই এখন নানা কারণে সহজপ্রাপ্য নেই। কিন্তু সেই কালের ক্যানভাসে যাদের ছবি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা—রাজনীতির মধ্যে এবং বাইরে—তাদের নামের একটি তালিকা এখানে রাখা হল। এই তালিকা সম্পূর্ণ, এমন হঠকারী দাবী অবশ্য কারই বা করার দুঃসাহস হবে! কতকগুলি উপবর্গে তাদের স্থাপন করা হল, এক লহমায় তাদের শনাক্তকরণের সুবিধার জন্য ঃ

রাজনৈতিক কবি (যাঁরা অকালপ্রয়াত)	রাজনৈতিক কবি (যাঁরা বেঁচে রইলেন)	সত্তরের নারীকবি	সত্তরের পুরুষ কবি
১। দ্রোণাচার্য ঘোষ	১। নবারুণ ভট্টাচার্য	১। জয়া মিত্র	১। অমিতাভ গুপ্ত
২। মুরারি মুখোপাধ্যায়	২। সৃজন সেন	২। অনুরাধা মহাপাত্র	২। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
৩। তিমির বরণ সিংহ	৩। সব্যসাচী দেব	৩। রমা ঘোষ	৩। অনন্য রায়
৪। অমিয় চট্টোপাধ্যায়	৪। সুশীল পাঁজা	৪। জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়	৪। বীতশোক ভট্টাচার্য
	৫। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। নমিতা চৌধুরি	৫। তুষার চৌধুরী
	৬। বিপুল চক্রবর্তী		৬। দেবদাস আচার্য
			৭। কমল চক্রবর্তী
			৮। সুব্রত রুদ্র
			৯। অজিত বাইরী
			১০। একরাম আলি
			১১। নিশীথ ভড়
			১২। রণজিৎ দাশ
			১৩। নির্মল হালদার
			১৪। ধূর্জটি চন্দ
			১৫। সুরজিৎ ঘোষ
			১৬। সোমক দাস

সত্তরের ঘটনাপঞ্জীর তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই দশকের শেষাংশে একধরনের স্থিতাবস্থা ফিরে এসেছিল বাঙালির জীবনে। জনপ্রীতিতে অগ্রগণ্য সত্তরের তরুণতর কবিদের লেখার চলনেও সেই সত্য ভাষা পেয়েছে। এদের মধ্যে আছেন ১। জয় গোস্বামী ২। মৃদুল দাশগুপ্ত ৩। সুবোধ সরকার ৪। ব্রত চক্রবর্তী ৫। অরনি বসু প্রমুখ।

নিছক কবিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দ্রোণাচার্য ঘোষ বা মুরারি মুখোপাধ্যায়ের কিংবা তিমিরবরণ সিংহের কবিতা অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। মনে হবে শুদ্ধ নন্দনের চেয়ে সেখানে কাঁচা শ্লোগান অনেক বেশি। কিন্তু যে তরুণ স্ফুলিঙ্গেরা ক্ষণকালের ছন্দ নিয়ে সাহিত্য করেছিলেন মূলত মতাদর্শকে প্রকাশের অভিপ্রায়ে এবং জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মর্যাদা—তাদের কবিতার মাপকাঠি শিল্প নৈপুণ্যের প্রথাগত কেতাবে না থাকাই সম্ভব। নিতান্ত বধির পরিপার্শ্বকে নিজেদের কথাগুলি শোনাতে এরা কখনো কখনো কর্কশভাবে গলা চড়িয়েছেন, যেমন সত্তরের শহীদ কবি আর এক শহীদ খাদ্য আন্দোলনের মৃত কিশোরকে স্মরণ করেছেন 'পড়ে আছে নুরুলের শব' কবিতায় :

> "পৃথিবীর শেষ স্বপ্নে পড়ে আছে নুরুলের শব
> মাছি শুধু একা একা উড়ে যায় দুপুরের ঘ্রাণে
> মানুষের কাছে খাদ্য চেয়ে চেয়ে হয়েছে নীরব
> বুলেট দিয়েছে খাদ্য অসম্ভব কিশোরের প্রাণে।"

(দ্রোণাচার্য ঘোষের কবিতা : সম্পাদনা-রতন শিকদার)

এই কবিদের উল্লেখ ছাড়া সত্তরের সমদর্শী স্মৃতিতর্পন হতেই পারে না, যেহেতু এরা ইতিহাসেরই অংশ। তখন মৃত্যু ছিল হাজারদুয়ারী। কোন্ দ্বার বন্ধ করে তাকে রুখবে মানুষ? তাদেরও বাঁচার কথা ছিল না তবু কেউ কেউ কোনক্রমে বেঁচে গেলেন। রাজনৈতিক শত্রু আর রাষ্ট্রীয় সেনার সাঁড়াশি আক্রমণের মাঝেও কী করে যেন বেঁচে গেলেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কবি সমীর রায় লিখলেন 'রণপায়ে হেঁটে যাব', সৃজন সেন লিখলেন 'থানাগারদ থেকে মাকে'। রাজনীতির নিজস্ব বোধ হয়ে উঠলো সেখানে কবিতার সোচ্চার নির্মাণ, যেমন :

"তুমি তোমার দু-চোখ ভরে আগুন ধরে রাখো
হৃদয়কলস পূর্ণ করে রাখো প্রবল ঘৃণা,
বীজ ও মাটি শস্য দিয়ে যাচাই দ্যাখো
প্রেমিক আমায় বলরে তুমি দেশপ্রেমিক বিনা?"

(অনুরোধ : থানাগারদ থেকে মাকে)

যখন জন্মভূমির মাটি বধ্যভূমির কাদায় পরিণত, সেই ভয়ানক রাক্ষসীবেলায় নবারুণ ভট্টাচার্য লিখলেন "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না"। স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের দ্বিমুখী টান এই সব কবিতায় ভাষাশরীর পেয়েছে। রাজনৈতিক প্রত্যয় এবং শ্রেণীদৃষ্টিকোণ আছে সুশীল পাঁজার কবিতাতেও। সময়ের তথ্যনিষ্ঠ ভাষ্য কখনো কখনো হয়ে উঠেছে কবিতার কাঙ্খিত উচ্চারণ। যথা—

"অনির্বাণের দিদির চিঠি পাই
তেসরা জুনের বিষণ্ণ বিকেলে
তোমার বন্ধু আর নেই
পয়লা মে'র ভোর রাতে
প্রেসিডেন্সী জেলে—"

("প্রেসিডেন্সী জেলে রক্তাক্ত দেহে অনির্বাণ")

সেই সময়ের একদিন প্রতিদিন ঠিক এই রকম স্থিরচিত্রের মতন করে নয়, কিছুটা কৌণিক প্রতিচ্ছায়া গায়ে মেখে উঠে এসেছে সব্যসাচী দেব-এর কবিতায়। তাঁর 'প্রতিশ্রুতি সময় স্বদেশ' এই সময়ের ক্রোধ এবং কামনা দিয়ে গড়া।

।। চার ।।

সত্তরের যে কবিরা আজ বিশেষভাবে স্বীকৃত, তাদের লেখায় রাজনীতি এবং সমাজবীক্ষণ একটু জটিল সংশ্লেষ রচনা করেছে। একটা প্রতিবাদের লগ্ন ছিল যখন প্রতিবাদ না করাটাই হত অপরাধ। তারপর যখন স্বদেশের বুকে রক্তদাগ্ একটু যেন ফিকে, প্রশমিত তার স্নায়ুর প্রদাহ—সেই স্বাভাবিক সুস্থতা আর সুস্থিতির ঋতুতে সত্তরের রাজনৈতিক কবিতার কণ্ঠস্বর বদলে গেল প্রত্যাশীর স্বপ্ন-নির্মাণে। এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রণজিৎ দাশের কবিতায়, যেমন :

"মাটি ও সূর্যের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শেফালিশাখা, তাই বেয়ে বেয়ে
শুঁয়োপোকাটির সঙ্গে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তারই মতো
স্থূল ও মন্থর, ও পাখিদের খাদ্য হয়ে, আত্মবিষ সহ
যদি তার মতো কোনও অবিশ্বাস্য রূপান্তর পেয়ে যাই, শুধু এই লোভে।"

রাজনীতির মূলগত প্রেরণা অথবা তার মৌলিক উপাদান না বদলেও সত্তরের শেষ থেকেই অধিকাংশ সত্তরের কবির কবিতায় রূপান্তরের রং লেগেছিল। হয়তো তাই পরবর্তী কালে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন সৃজনের স্বতন্ত্র ধারা। উত্তর আধুনিকতা কিংবা প্রতি কবিতা, অথবা নারীবাদী বিতা ভাষ্য ষই সময় তাদের চর্চার বিষয় হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে, তবে আগের মতো সোজা সরল রেখায় নয়, ত্যারছা ঘুরপথে। ফলে কবিতার অবয়বে শিল্পিত স্বভাবের ছাপ পড়েছে। যেমন কবি নির্মল হালদার যখন বলেন, "বাবু মশাই আমি নির্মল হালদার" তখন তাঁর শ্রেণী অবস্থান চিহ্নিত হয় সেই সচেতন অভিপ্রায়ে। এই কবি, অতঃপর যখন লেখেন "অনামপিণ্ডদ", যখন লেখেন ঃ

"মাটি বিক্রি করতে গেলে মনে হয়
মাকে বিক্রি করছি
মায়ের চোখ নেই মুখ নেই হাতপা নেই
মা কেবল বুক পেতে দিয়েছে
এক কুড়ি মাটির দাম আটা আনা।"

সেটা তখন অনুপ্রসঙ্গক্রমে শহরবাসের গ্লানি, হৃদয়হীন নাগরিকতা এক জাতীয় বৈরী সময়ের স্বপত কথন হয়ে ওঠে। এই যে উচ্চারণ, এর আড়ালে থাকা সময় ও সামনের রাজনৈতিক মূল্যায়ণ পাঠকের আগোচরে থাকে না। লক্ষ্য করা গেছে, সত্তরের অনুজ কবিদের লেখালেখির মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আগুন ক্ষীণ, এমনকি নির্বাসিত। কারত কারত কবিতায় তা বীতস্পৃহ অনিচ্ছায় ফেলে পড়েছে। সুবোধ সরকারের একটি কবিতা বইয়ের নামে স্পষ্ট সেই নিষেধচিহ্ন, 'রাজনীতি করবেন না'। তাঁর 'মরুভূমির গোলাপ' গ্রন্থের প্রথম কবিতা এইরকম ঃ

" মাছ আলা কবিতা পড়ে না
মধু বিক্রেতাও কবিতা পড়ে না
মুমূর্ষু কিশোর, ভাই তুমিও পড়ো না
জ্যোতিবাবু কবিতা পড়ে না।" (রাক্ষস খোক্কস)

অ্যান্টি পোয়েট্রির সোচ্চার সমর্থক এই কবির এই অ্যান্টি-পলিটিক্স হয়তো সত্তরের ক্রমাগত ভ্রাতৃঘাতের এক প্রতিক্রিয়া, ব্যাকল্যাশ। একদিকে যেমন দ্রোহাত্মক উচ্চারণমালা স্তিমিত হয়ে আসছে, অন্যদিকে তৈরী বৌনতা ও হিংস্র অবচেতনের আখর মালা—অনন্য রায়ের সুররিয়াল সৌন্দর্য নির্মাণে, তুষার চৌধুরীর স্ববিরোধী, সংকর চিত্রকল্পের বুদ্ধিদীপ্ত কারুকাজে।

এই নতুন নির্মাণ পথের দুই অসমান্য ক্ষমতাবান উত্তরসূরী জয় গোস্বামী এবং মৃদুল

গোস্বামী এবং মৃদুল দাসগুপ্ত। মৃদুলের 'জলপাই কাঠের এস্রাজ 'কিংবা 'এভাবে কাঁদে না'তে রাজনীতি দৃশ্যত, নেই। আছে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। জয়ের কবিতাতেও অতি অনুভূতিশীল এক তরুণের পছন্দ অপছন্দের দুনিয়া মায়াবী আলো-আঁধার নিয়ে উপস্থিত। সেখানে অনুপুঙ্খ রচনার অনবদ্য শক্তির সঙ্গে মিলেছে সুররিয়াল ভয় ও ত্রাসের ছবি—কখনো কখনো। উদাহরণ হিসেবে 'প্রত্নজীব' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা উদ্ধৃত হল ঃ

'মুখ নেই পেট নেই। শুধু এক আস্বাদ
জেগে আছে। আরকের মধ্যে
শুয়ে আছি সারাদিন, সারাদিন
পাহাড় সুপুরী গাছ, শ্যাওলা ও কুয়াশার
মাঝখানে থকথকে পেট্রল।" (প্রত্নজীব ঃ জিভ)

ভয়ঙ্কর ছিন্নমস্তা রক্তক্ষয়ী এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেছে যে কিশোর, তার স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে এই ছেঁড়া খোঁড়া অনুভব অস্বাভাবিক নয় হয়তো। হয়তো এও একরকম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া—বিপরীত আবেগে ভারসাম্যহীন মেদুরতাই তার স্বভাব। আমরা দেখবো, এরকম প্রত্যাখ্যানের পথ ধরেই আশি নব্বইয়ের কবিতা প্রধানত হেঁটে এসেছে। এবং তাদের কাছে জয় গোস্বামী একজন আইকন, মাইল ফলক।

॥ পাঁচ ॥

আশি নব্বই , আশি নব্বই—এভাবে দুটো আলাদা দশকের কথা বারবার একসাথে উল্লেখ করা হচ্ছে কেন, এই জিজ্ঞাসা অসঙ্গত নয়। আসলে গত পনেরো বিশ বছরে সত্যিই এদেশের আর্থরাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড়ো কোনও পরিবর্তন হয়নি। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের শাসন প্রক্রিয়া যেমন একই রকম থেকেছে, গ্রাম শহরের শ্রেণী রাজনীতিতে মূলত একই রকম থেকেছে। মাঝে কলকারখানা একটু একটু করে বন্ধ হয়েছে, বেকারী বেড়েছে, নগর ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে তার আয়তন, গ্রামীন পরিবেশেও লেগেছে নাগরিক দূষণ—প্রমোটারদের হয়েছে পোয়াবারো। জমির দালালি আর তোলাবাজি এক নতুন পেশা হয়ে উঠেছে—কোথাও কোনও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিরোধ বিনা। সত্তরের মতো বড়ো মাপের আন্দোলন আশি-নব্বই দ্যাখেনি। দেখেছে মূলত শান্তির বাতাবরণ। দেখেছে কেরানিকুলের চমৎকার বাড় বৃদ্ধি, বর্ধিত মহার্ঘভাতা, কমপিউটার স্কুলে বাধ্য বালকের নিরুত্তাপ যাত্রা। এই অভিন্ন আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল আশি-নব্বইয়ের কবিতাকে একটি অভিন্ন বন্ধনীর মানে রাখতে পরামর্শ দেয় আমাদের। একই রকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা এই দুই দশকের কবিতার কথাভাষাও মোটামুটি একই রকম। পার্থক্য আছে হয়তো, কিন্তু তা যৎসামান্য।

সমাজের বুকে আগুন না থাকলে কবিতার মাঝে তার উত্তাপ থাকবে কি করে? আন্দোলন বিমুখ আশি-নব্বইয়ের কবিতায় রাজনীতি আবেগ কমে গেছে, কোথাও কোথাও শাসকের রাজনীতি হয়েছে বিদ্রূপবিদ্ধ। এই সময়ের প্রধান কবিদের একটি সম্ভাব্য তালিকা

এখানে প্রস্তুত করা হল :

আশির প্রধান পুরুষ	প্রধান মহিলা কবি	নব্বইয়ের প্রধান পুরুষকবি	প্রধান মহিলা কবি
১। রাহুল পুরকায়স্থ	১। মল্লিকা সেনগুপ্ত	১। পিনাকী ঠাকুর	১। যশোধরা রায়চৌধুরী
২। জয়দেব বসু	২। সুতপা সেনগুপ্ত	২। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়	২। পৌলমী সেনগুপ্ত
৩। অরুণাংশ ভট্টাচার্য	৩। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়	৩। বিভাষ রায়চৌধুরী	৩। মন্দাক্রান্তা সেন
৪। জহর সেন মজুমদার	৪। মহুয়া চৌধুরী	৪। আবীর সিংহ	৪। সেমন্তী মিত্র
৫। সংযম পাল	৫। অহনা বিশ্বাস	৫। রূপক চক্রবর্তী	৫। রোশনারা মিশ্র
৬। নাসের হোসেন	৬। রূপা দাশগুপ্ত	৬। সুমিতেশ সরকার	৬। মৌলি মিশ্র
৭। ঋজুরেখ চক্রবর্তী		৭। সাম্যব্রত জোয়ারদার	
৮। সুব্রগুণ		৮। প্রসূন ভৌমিক	
৯। রতনতনু ঘাটী		৯। রুদ্রপতি	
১০। অমিতেশ মাইতি		১০। রজতেন্দ্র মুখার্জী	
		১১। মানস কুমার চিনি	
		১২। সুদীপ্ত মাজি	

লক্ষ্য যদি কবিতায় রাজনৈতিক ভাষ্য হয়, মেনে নেওয়া ভালো আশি নব্বইয়ের তুখোর রাজনৈতিক কবিতার নির্মাতা জয়দেব বসু। জয়দেবের 'মেঘদূত' কিংবা জীর্ণপাতা ঝরার বেলায়' যেন রাজনীতির এক বিপরীত প্রহরের অতন্দ্র প্রহরী। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অন্ধত্ব বোধ হয় এই কবি সাধ করে মেনে নিয়েছেন, ক্ষেত্র বিশেষে কবিতায় স্বতঃসৃজনের পরিবর্তে তাঁর দক্ষ কারিগরি অধিকারীজনের অজানা থাকে না। তবে জয়দের তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে একরোখা, সরকারপন্থী বাসধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যে সময় পূর্ব ইয়োরোপ সমেত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র চোখের সামনের ভেঙে পড়লো, সেই আশির শেষ এবং নব্বইয়ের শুরুর ক্রান্তিলগ্নে, এদেশে এভাবায় সেই ভাঙনের কোনও মহৎ প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি কি? কবিতায়, সমকালীন কবিদের কলমে।' না, সেভাবে দেখিনি। আশ্চর্য এই যে সব কিছু এই সময়ে কেমন অদ্ভুত গা সওয়া হয়ে গেছে—কোনও কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না আর। এই নীরবতা আর শীতল সহনশীলতা কী এক ধরনের রাজনীতি নয়?

ঠিক এইরকম পটপ্রেক্ষিতে জয়দেবের 'সৌতিকথন' কবিতাটির তাৎপর্য আরও অসামান্য মনে হবে। ইতিহাসের দূরতম প্রান্ত থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার এই পতনের একটি অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছেন কবি; খুব কী অতিরঞ্জন হবে, যদি বলি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্তে'র পর রাজনৈতিক দীর্ঘকবিতার এই জাতের মননশীল উন্মোচন আমরা 'সৌতিকথন'য়েই পেলাম! আমরা 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মাথায় রেখেই একথা বলছি।

এই সময়ের অন্য প্রায় সকলের কবিতাতেই রাজনীতি এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার সমালোচনা হয়ে। এটা হয়তো অস্বাভাবিক নয়। নব্বইয়ের বিশিষ্ট কবি শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় এই সূত্রে এমনকি সুকান্তের চেনা কবিতাকেও কিছুটা অনুসঙ্গে বদলে নিয়ে লেখেন :

"শোনরে শিকল, শোন রিং মাস্টার
কত মার খেয়ে হাঁকার ভুলেছি, হিসেব রেখেছি তার
নদী জঙ্গলে মরু পাহাড়ের যদি আমি কেউ হই
মারের মুখের ওপরে ছুঁড়বো উনিশশো নব্বই

. . . . .

লেখো এফ আই আর, লেখো আমাদের সকলের নাম
আমরাই গুলতানি মেরে ক্যান্টিন জমিয়ে রাখতাম
লিখুন ওসি সাহেব, স্পষ্ট করে লিখুন এস.আই
আমরাই ভোটের দিন দল বেঁধে ছাপ্পা মারতে যাই
কোমরে মেশিন গুঁজে গান শুনি, আশ্চর্য সময়
আমাদের পাস করলে চাকরি হয় না, পার্টি করলে হয়...।"

রাজনীতির বকলমে নোংরা দলবাজির বিরুদ্ধে এই সময়ের অধিকাংশ কবিই বীতস্পৃহা সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ পুরনো অগ্নিবর্ণ দিনগুলির জন্য ভিতরে ভিতরে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন। উদাহরণ স্বরূপ সাম্যব্রত জোয়ারদারের 'স্ট্যাচু' কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

"রেল কোয়ার্টারগুলো শহীন বেদির কালো স্ট্যাচু
ঘুলঘুলিদাঁতের থেকে কবুতর উড়েছে প্রচুর
এই দৃশ্য করতালি বাতাসে মেশায় আরো কিছু
মিথের মতন, যেন মৃতের মায়েরা কতদূর
জানালা রেখেছে খুলে, পাখিরা খুঁটেছে আতপের
বিধবা শাড়ির পার, চাবিগুলি কোথায় হারায়...।"

আশি-নব্বইয়ের এক সমুজ্জ্বল সাংস্কৃতিক প্রাপ্তি কবি ও গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়। এখানে, এই ভাষায় তাঁর কিংবদন্তিতুল্য প্রতিষ্ঠা কিছুটা বিলম্বে যদিও। এই নাগরিক কবিয়ালের সুরে ও স্বরে সমাজ-রাজনীতির অন্ধকার বৃত্তগুলি ক্ষমাহীনভাবে চিহ্নিত হয়েছে, মৌন সহ্যাতুর শিক্ষিতজন পেয়েছে প্রতিবাদের নিজস্ব ধরন। তাঁকে বাদ দিয়ে এই কালখণ্ডের কবিতায় রাজনীতির সচেতন অভ্যর্থনা বা সেই নিয়ে লিখে বৃথা।

আশির গোড়া থেকেই বাঙালি সমাজে কেরিয়ার সর্বস্বতার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে। মেধাবী তরুণ রাজনীতিকে ঘৃণা করতে শিখেছে—তার চোখে ইউ এস ডলার আর গ্রীণকার্ডের স্বপ্ন। পৃথিবীটা একটু একটু করে লাল হয়ে যাচ্ছে—তবে তা সংগ্রামের লাল নিশানে নয়, কোকাকোলার প্রচুর বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে সময়ের মুখ ঢেকে যাচ্ছে। নিজেরটা আগে বুঝে নেওয়ার ধূর্ত এই উদ্যোগ, নীতি আদর্শের এই জলাঞ্জলিপর্ব রূপক চক্রবর্তীর কবিতাতে আত্মপ্রকাশ করেছে ঃ

"যা আমি মধ্যরাতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম শহরের রাস্তায়

যাতে
লেখা ছিল লখিন্দরের কেরিয়ার গুছিয়ে দিতে গিয়ে নিরালা
সুরম্য
ফ্ল্যাটে কিভাবে প্রযোজকদের স্ট্রিপটিজ দেখিয়েছিল বেহুলা
কোমরের
ভাঁজে ভাঁজে ঝড় তুলে, কিভাবে সে খুশি করেছিল দাউদভাইকে।"

রাজনীতিও যখন কেরিয়ার, সাপলুডোর সেই সামাজিক ছকে কবি দিশেহারা। তার কাছে সাপের মুখ আর উত্থানের মই একাকার। অনেক সময় তাই 'বিপ্লবী' কবিকেও বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দরজায় চুপি চুপি টোকা দিতে দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার চরিত্রও তাই দ্রুত পালটে যায়। বড়ো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষণ এবং পুরস্কারে ভরপুর কবি আর কতোটাই বা প্রতিবাদী হতে পারবেন? তাঁর তীব্র শব্দ বমন নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যত্র, অন্য তর্জনী শাসনে চালিত হয় 'বিদ্রোহ'—রিমোট কনট্রোল্ড কবির বিদ্রোহ। কবিতায় কড়াপাকের অবচেতন আর যৌন মন্ত্রনার, অতএব, বিস্ফোরণ দিকে দিকে। কি সাংঘাতিক প্রেমের প্রহর এখন, আনন্দিত এই বাজারে। মন্দাক্রান্তা এ সময় বিশেষত মন্দাকান্তা সেনেদেরই যেন। যথার্থ রাজনৈতিক কবিতা লুপ্ত পূজাবিধির মতো ক্রমশ যেন অজ্ঞাত এবং রহস্যময় হয়ে যাচ্ছে। জ্বালানিই নেই, আগুন জ্বলবে কিসে?

।। ছয় ।।

ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যখন 'রবীন্দ্রোত্তর' আধুনিকতার স্পষ্ট পরিচয় সঙ্গে নিয়ে নতুন কবিরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহিলাকবি ছিলেন না। বাংলা কবিতার এই নিরঙ্কুশ পুরুষতন্ত্র পরবর্তী দিনগুলিতে দ্রুত বদলে গেল। সত্তর আশি নব্বইতে নারীকবিদের সংখ্যাগত বাড়বৃদ্ধিই শুধু নয়, তাঁদের কবিতার নান্দনিক উৎকর্ষও পৃথক আলোচনার গুরুত্ব দাবী করে।

অথচ নারীকবিরা রাজনীতির প্রচলিত ধরনে সাধারণত কবিতা লেখলেন না, বরং পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি এবং তার সুবিধাভোগ তাঁদের প্রতিবাদের প্রধান বিষয় হল। যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নারীর পরিত্রাণহীন সামাজিক অবস্থানের জন্য তাঁরা পুরুষতন্ত্রের আবহমান আগ্রাসনকে চিহ্নিত করলেন। ফলে তাঁদের নারীবাদী কবিতায় রাজনীতি এক নতুন মাত্রা এবং চেহারা পেয়েছে। এই সময়ের একজন প্রধান কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লেখেন ঃ

"মজুরী যা পাই তার আধাভাগ বাবু নিয়ে যায়
পরদিন রঙ মেখে আবার দাঁড়াই ইন্দ্রলোকে
প্রথম ইন্দর ছিল পাশের বাড়ি কালোভূত
মাটির তলার রেল দেখানোর নাম করে সেই
এখানে আনল, এই সোনাগাছি, গাছি গাছি টাকা।" (আবিয়া)

আজকের এই পণ্যমনস্ক পৃথিবীতে নারীর সামাজিক অবস্থান যশোধরা রায়চৌধুরীকেও বিব্রত এবং বিরক্ত করে। তাঁর কবিতা বইয়ের নাম 'পণ্যসংহিতা', অনায়াসে। সময়ের চতুর রাজনীতি নারীকে কোন্ অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে বন্দী করতে চায় তা তাঁর একাধিক কবিতার উপজীব্য। মেয়েদের ক্লান্তিহীন রূপচর্চা আর আত্মকেন্দ্রে লগ্ন হয়ে থাকার ভ্রান্ত বাসনাকে কবি 'বিশেষ ত্বক সংখ্যা' কবিতায় বিদ্রূপ করেছে এই ভাষায়:

"ত্বক মানে শিল্প। আর অনুভূতি। চূড়ান্ত নিভিয়া
আমাদের যে কোন সম্পর্ককে দেয় অনাবাসী ঔজ্জ্বল্য।

. . .

সময় এখন মসৃণ গণ্ডদেশের
সার্বিক সাফল্য লক্ষ্য করে কেতাথতা বর্ষণ করে।
কেন না ত্বক। সম্ভব হয়, মানুষের সুনিশ্চিত শ্রেণীবিভাজন
কেন না ত্বক।"

এখানে অবলীলায় কবি বাজার অর্থনীতির ষড়যন্ত্রী মূল্যবোধের সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক এবং বর্ণভিত্তিক রাজনীতির আত্মীয়তার স্বরূপকে চিনিয়ে দিয়েছেন। এই সময়ের অধিকাংশ নারী কবির কবিতাতেই দেখা ও দেখানোর এই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়েছে। রচিত হয়েছে রাজনৈতিক কবিতার এক অর্থবহ নতুন নিরিখ।

।। সাত।।

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায় / বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়?" একদা নিদারুণ সংশয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবি জীবনানন্দ। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সত্যি সত্যি বিশশতকের নিষ্ক্রমণ ঘটলো। বিশ্বায়ন, ক্লোন, জিনম্যাপ নিয়ে এল নতুন মিলেনিয়ামের উত্তর-আধুনিকতা। ই-কমার্স আর ইন্টারনেটে যেন দিগন্ত ছয়লাপ। এখন কবিতার কি হবে? কবিতায় রাজনীতির উপাদান কতোটুকু থাকবে? সব কিছু মেনে নিতে নিতে প্রায় কোলকুঁজো, কলোনিয়াল আইডেনটিটির অনুগত সেবাদাসেরা কি নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে—যেভাবে সত্তরে বজ্রনির্ঘোষ বধির মুহূর্তকে টানটান করেছিল? নাকি, সুখচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাওয়াই তার নিয়তি! জানি না, আমরা অপেক্ষায় রইলাম। একবিংশের বাংলা কবিতা অপেক্ষায় থাকলো।

বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিনের ইতিবৃত্ত

সন্দীপ দত্ত

বাংলাভাষায় কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক কবিতার আন্দোলন বাংলাভাষায় যদিও শুরু হয়েছে ৩-এর দশকে তবু বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাস কবিতাচর্চার যে ক্ষীণ ধারা ছিল সেটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাভাষায় প্রকাশিত এ কটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন, সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদকীয় সমস্তই পদ্যঢঙে লেখা হতো। পত্রিকার নাম 'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী'। সম্পাদক পাঠতীচরণ দাস। উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা সাময়িক পত্রের পথ চলার শৈশবে বাঙালির পদ্যচর্চার একটি মজার দিক লক্ষ্য করি। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কবিতা কুসুমালী 'মাসিক পত্রিকাটি সেদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য কাগজ। 'সম্ভব শতক'-এর কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে 'বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমন্ডলীর কল্যাণ বর্ধনই এতৎ পত্রিকার উদ্দেশ্য'। বাংলা কবিতার 'উৎকর্ষ সাধন' হয়েছিল কিংবা 'জনমন্ডলীর কল্যাণ বর্ধন হয়েছিল কিনা তা বিতর্কের ব্যাপার, তবে এটা ঠিকই এইসব কাগজের মধ্য দিয়েই কবিতাচর্চার স্রোত বইয়ে দেওয়ার সাধ্যমত প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ১৮৬২ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র সারদাকান্ত সেন 'চিত্তরঞ্জিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যেখানে উদীয়মান তরুণ কবিদের নতুন কবিতা ও অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ প্রকাশ পেত। এছাড়া এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিতার 'কাব্য প্রকাশ' (১৮৬৪) পদ্য প্রকাশিকা (১৮৬৮), 'বীণা' (১৮৭৮), কৌমুদী (১৮৭৮), দুঃখিনী (১৮৭৮) 'কিরণ' (১৮৮৩) প্রভৃতি। আধুনিক কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কবিতা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনের বর্তমান সংখ্যা হবে আনুমানিক দুশো। এই যে শুধু কবিতা ও কবিদের কাগজ-এর প্রকৃত শুরু 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকার মাধ্যমে। 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশের পেছনে আছে একদিকে প্রতিবাদী ও অন্যদিকে সাংগঠনিক ভাবনা। বাংলাভাষায় প্রকাশিত বেশিরভাগ পত্রপত্রিকায় কবিতার স্থান ছিল তাচ্ছিল্যে ও ঔদাসীন্যে। গল্প বা উপন্যাসের শেষে পাদপূরণ করতেই যেন অষ্টপদী বা চতুর্দশপদী পদ্য বা কবিতা। সম্পাদক (!) কখনো বা অস্ত্রোপচার করে কাঁচি দিয়ে কেটে যতটা লাইন প্রয়োজন কৃপা করে জুড়ে দিতেন। এরই প্রতিবাদ 'কবিতা'র আত্মপ্রকাশ। পাঁচমিশেলী পত্রিকার গল্প, রম্যচরনা, ভ্রমণকাহিনী, ধারাবাহিক উপন্যাস টুকিটাকি খবরের ভীড়ে হারিয়ে যেত কবিতা, যদিও একথা ঠিক, যে 'কবিতা'র আগে প্রকাশিত কল্লোল (১৯৩২) কালিকলম (১৯২৬), পরিচয় (১৯৩১) পূর্বাশা (১৯৩২) কবিতার মর্যাদা দিয়েছিল যথাযোগ্য ভাবেই। তবু 'কবিতা' বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও কবিতার ইতিহাসে এটি বিশিষ্ট

অধ্যায়। পত্রিকার শুরুতে প্রথম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন সমর সেন। পরে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন সম্পাদক থাকেন ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত। এরপর বুদ্ধদেব বসুই 'কবিতা'র সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থাকেন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। কবিদের কবিতা প্রকাশের জন্য যে পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা হ'ল, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আসা কবিতাগুলি তিনি নিজে পাঠ করে মন্তব্য লিখতেন, সম্ভাবনাময় কবিকে উৎসাহিত করতে অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠিয়ে অন্য কবিতা চাইতেন অথবা কবিতার শব্দ বা ছন্দগত ভুল-ভ্রান্তিগুলি যতটা সম্ভব ঠিকঠাক করে কবিকে দিয়ে পরিমার্জিত করে তবে সেই কবিতা প্রকাশ করতেন। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটনার দায়িত্ব নিয়েছিল পরিচয় পত্রিকা। 'কবিতা' পত্রিকা বিদেশী কবিতা ভাবনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অনুবাদ ও বিদেশী কবিদের সম্পর্কে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা মার্কিন সংখ্যা, ইংলিশ সাপ্লিমেন্ট সংখ্যা, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, আন্তর্জাতিক সংখ্যা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যা।

'কবিতা' পত্রিকার ধারায় পরবর্তীকালে প্রকাশ পেল প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকা (১৯৪০) আধুনিক কবিতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'নিরুক্ত' একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ৫ বছর আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকা পত্রিকাটিতে মৌলিক কবিতা ছাড়াও অনুবাদ কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রকাশ পেত। তৎকালীন প্রায় সব কবিরাই কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিতা গোষ্ঠীর কবিরা 'নিরুক্ত'তে কোনো রচনাই লেখেন নি। অতি আধুনিক কবিদের যারা বিরোধী ছিনেল তাদের লেখা 'নিরুক্ত'তে ছাপা হতো। কবিতা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করাও হয়েছে সম্পাদকীয়তে। বলার কথা এই 'কবিতা'র অন্যতম প্রধান সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কবিতা' ছেড়েছিলেন মতাদর্শের বিরোধিতার কারণে।

সমসাময়িককালে উল্লেখযোগ্য কবিতা বিষয়ক পত্রিকা শুদ্ধসত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকা (১৯৪১)। 'একক' কবিতার দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা। প্রায় ৫৯বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশ পেয়েছেন সম্পাদকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। পরেও দুটো সংখ্যা প্রকাশিত। একটি বিশ্ব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির তোয়াক্কা না ক'রে বিক্রির ফললাভের আশা না করে, বিজ্ঞাপন না পেয়ে শুধু কবিতাযজ্ঞের এই আহুতি প্রাণিত করে বাংলাভাষার লিটল ম্যাগাজিনের গৌরবকে।

৫-এর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিতা পত্রিকা অলোক সরকার, দীমঙ্কর দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্র সম্পাদিত 'শতভিক্ষা' (১৯৫১) পরে অভিরূপ সরকার ও সুরজিৎ ঘোষ এবং শেষভাগে মৃণাল দত্ত পত্রিকাটি কয়েক বছর সম্পাদনা করেন। এই দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিন 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩)। সম্পাদক ছিলেন দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী ও সুলীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরে শেষোক্তজন সম্পাদনা করেন। নানা

সময়ে অনেকেই সম্পদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। 'কৃত্তিবাস' প্রকাশ পেয়েছিল তরুণ কবিদের মুখপত্র হিসেবে। প্রতিষ্ঠিত বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের প্রবন্ধই ছাপা হয়েছে, কবিতা নয়। তরুণ কবিদের টাটকা কবিতায় কৃত্তিবাস সগৌরবে ঘোষণা করেছিল প্রচ্ছদে 'শেষ পৃথিবীর কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে...। 'কৃত্তিবাস' মূলত কবিতারই কাগজ তবু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গদ্যকারও। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প প্রকাশ পেয়েছে কৃত্তিবাস। একটা গোটা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কলমকুমার মজুমদারের 'সুহাসিনী পমেটম'। তবে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় গদ্যচর্চার অবকাশ বিশেষ ছিল না।

৫-এর দশকে এই দুটি কাগজ 'শতবিষা' ও 'কৃত্তিবাস' প্রায় ৩ দশক ধরে প্রকাশ পেয়েছে। পাঁচের দশকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিন তরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত উত্তরসুরি (১৯৫২), মনীন্দ্র রায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টেপাধ্যায় সম্পাদিত 'সীমান্ত' (১৯৫৩) জগদীন্দ্র মন্ডল ও সমর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ময়ূখ' (১৯৫৩) শান্তি সেন সম্পাদিত 'কবিপত্র' (১৯৫৭)। 'উত্তরসুরি' শিবনারায়ণ রায় নারায়ণ সম্পাদনায় প্রবন্ধ পত্রিকার কাগজ হিসেবেই প্রকাশ পায়। পরে তরুর ভট্টাচার্য সম্পাদক হওয়াকালীন কবিতাপত্র হিসাবেই প্রকাশ পায়। এঁদের জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সীমান্ত ১ম পর্যায় প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত, ৩য় পর্যায় ১৯৮৬ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম 'কবিতা সীমান্ত'। 'ময়ূখ' জীবনানন্দ'র বহু কবিতা প্রকাশ করেছে। এঁদের জীবনানন্দ সংখ্যাটি আজো গবেষক পড়ুয়ার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে। 'কবিপত্র'- আসলে প্রকাশ করেছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায় নিজেই। নানা সময়ে সম্পাদনার সূত্রে জড়িয়ে নিয়েছিলেন অনেককে। শান্তি সেন ছিলেন সাহিত্য উৎসাহী পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িওলা। প্রথম সংখ্যারা সম্পাদক হিসেবে তাঁরই নাম রেখেছিলেন। পরে কবিপত্র'র সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন কখনো তরুণ সান্যাল, কখনো তুষার চট্টোপাধ্যায় কখনো শৈবাল মিত্র, কখনো সমর গঙ্গোপাধ্যায় কখনো সৌমিত্র বসু। ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে আজো কবিপত্র প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমানে রেজিস্ট্রিকৃত নাম 'কবিপত্র প্রকাশ'। গল্প সংখ্যা, শিল্প সংখ্যা বিষ্ণু দে সংখ্যা এরা প্রকাশ করেছিলেন। ৮-এর দশকে ফাউ লিটারেচার আন্দোলনে 'কবিপত্র প্রকাশ' যুক্ত হয়।

বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিন ৬ ও ৭ দশক বিশিষ্ট অধ্যায়। এই সময় পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। শুধুমাত্র কলকাতা নয় শহরতলী ও গ্রামবাংলা থেকে কবিতা পত্রিকা প্রকাশের হার বাড়তে থাকে। কলেজস্ট্রীটের কফি হাইসে মফঃস্বলের তরুণ কবিদের ভীড় বাড়তে থাকে।

৬-এর দশকে কত রকবের যে পত্রপত্রিকা বেরিয়েছেন! একদিকে যেমন কবিতা পত্রিকা বেরোচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায়, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিনে দিনে (কবিতা ঘন্টিকা, কবিতা সাপ্তাহিকী, কবিতা টেলিগ্রাম, দৈনিক কবিতা, কবিতা সাপ্তাহিকী প্রভৃতি), অন্যদিকে চলেছে হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, ধ্বংসকালীলন প্রভৃতি সাহিত্য আন্দোলন।

৬-এর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিন কম নয়। এগুলি হ'ল যোগেন চৌধুরী, গৌরীশংকর দে ও সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নান্দীমুখ' (১৯৬০), প্রফুল্ল কুমার দত্ত ও রেখা দত্ত সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' (১৯৬০), রোহিন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা পত্র' (১৯৬০০ সুশীল রায় সম্পাদিত 'ধ্রুপদী' (১৯৬০) সামসুল হল ও প্রতিমা কর সম্পাদিত নক্ষত্রো রাত (১৯৬০) দুর্গাদাস সরকার ও দিনেশ দাস পরে শান্তনু দাস সম্পাদিত 'গঙ্গোত্রী' (১৯৬১) তরুণ ভট্টাচার্য ও অরুণ কুমার সরকার সম্পাদিত 'উচ্চারণ' (১৯৬১), অসীমকৃষ্ণ দত্ত সম্পাদিত 'কবিকণ্ঠ' (১৯৬৩), শান্তিলাহিড়ী ও মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' (১৯৬৪), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'অলিন্দ' (১৯৬৪) পুষ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'শ্রুতি' (১৯৬৫), পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ সম্পাদিত সিংহাসন (১৯৬৫) জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' (১৯৬৫) গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত 'অনুভব' (১৯৬৫) শুভঙ্কর ঘোও ও অভিজিৎ সরকার সম্পাদিত 'অত্বর' (১৯৬৫) বিমল রায় চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক কবিতা' (১৯৬৫০ মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেতকী' (১৯৬৫), শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা সাপ্তাহিকী' (১৯৬৬) অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা পরিচয়' (১৯৬৬) বণিক রায় সম্পাদিত 'লা পয়েক্তি' (১৯৬৬) বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'এষা' (১৯৬৬) রাণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জিগীষা (১৯৬৭) মাণিক চক্রবর্তী সম্পাদিত 'নির্বেদ' (১৯৬৯) প্রভৃতি।

বর্তমানে যে পত্রিকাগুলি বেরোচ্ছে এখন সেগুলি হলো, নান্দীমুখ (বর্তমান সম্পাদক (ত্রিদিব চৌধুরী নমিতা চৌধুরী), আধুনিক কবিতা, কবিকণ্ঠ, কেতকী ও জিগীষা।

হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর জেল হয়েছিল কবিতা লিখে। ১৯৬২ সালে বুলিটিন প্রকাশে মাধ্যমে এর শুরু। এদের মতে জৈবিক, মানবিক বিতৃষ্ণা সার্বিক যন্ত্রণার শরীরই ভাষা। ভাষা শব্দে কোন শুচিমাগিতা থাকবে না, যতটা আক্রমণাত্মক করা যায় তাই হবে। আমার মুক্তি ও সৃষ্টির যন্ত্রনাই বড় কথা।

শ্রুতি আন্দোলন শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনেরই অঙ্গ। প্রথমে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছিল না। প্রবক্তা ঃ পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রকাশক ঃ মৃণাল বসু চৌধুরী এঁদের মতে মোন রকম ব্যাখ্যা বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব, রাজনীতি প্রচারিত সমাজিকতা, যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান কবিতায় নেই। কবিতার একমাত্র অবলম্বন করি বিশেষ মানসিকতা ও অভিজ্ঞতা।

ধ্বংসকালীন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৬ সালে সাম্প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে এঁদের মতে 'আমরা যা তাই আমাদের কবিতা, অমারা যা নই তা আমাদের কবিতায় নেই। অকৃত্রিমতাস আমাদের উপাস্য।

আর একটি আন্দোলন শুরু হয় ৬-এর দশকের শেষে প্রকল্পনা সর্বাঙ্গীন কবিতা আন্দোলন (১৯৬৯) ভট্টাচার্য চন্দন, দিলনী গুপ্ত ও শুক্লা মজুমদার স্বতোৎসার কবিমেলা

পত্রিকার মাধ্যমে এই কবিতার আন্দোলন শুরু করেন। এদের বিশ্বাস সাহিত্য স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য প্রবাহের (Stream fo cosciousnes) যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing)।

সুশীল রায় সম্পাদিত 'ধ্রুপদী' মাইকে মধুসূদন দত্তকে কেন্দ্র করে নানা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। কবিতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে মূল্যবান প্রবন্ধ। শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা কবিতা'র মনীশ ঘটক সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতা প্রতি সংখ্যায় নির্ধারিত কবির পরিচিতি প্রকাশ করতেন কবির স্কেচ সহ। 'বাংলা কবিতা'র তরফে প্রথম আধুনিক কবিদের নিয়ে লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশ পায়। 'গঙ্গোত্রী' পত্রিকাটি অঙ্গসজ্জায় ?ছিল চমৎকার। এরা নিয়মিত বিভিন্ন অঞ্চলে কবি সম্মেলনের আয়োজন করতেন। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি ও কবিতা নির্বাচিত কবির কবিতাগুচ্ছ প্রকা করেছেন নিয়মিত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ পেত 'কবি ও কবিতায়' বণিক রায় সম্পাদিত 'লা পয়েজি'র মিথ অস্তিবাদ, প্রতীক বিদেশী কবিতা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এরা রোমান হরফে বাংলা কবিতার উচ্চারণকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন অ-বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যা টি এস এলয়িট, এজরা পাউন্ড, শঙ্খ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা। কবিতা পরিচয় বিভিন্ন কবিদের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছিল তীব্র। নকসালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের জন্ম, প্রেসে ছাপাখানার মূল্যবৃদ্ধি, কাগজের দাম বেড়ে যাওয়া জরুরী অবস্থা, পঃবঙ্গে বামফ্রন্টের পত্তন, কেন্দ্রে কংগ্রেস রাজত্বের অবসান, ঘটনাগুলি একে একে ঘটতে থাকে।

পত্রিকা স্টলগুলি ভরে যেতে থাকে মিনি পত্রপত্রিকায়। কবিতার মিনি ম্যাগাজিন ও বেরোতে থাকে। ৩-এর দশকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতার লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হলো আশিষ সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্যদিন' (১৯৭০) বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্বিষ্ট' (১৯৭০) অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত মাসিক বাংলা কবিতা, (১৯৭০) শান্তিকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'কবিতা এবং কবিতা' (১৯৭০) গৌতম মুখোপাধ্যায় ও কল্যান চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সত্তরের কবিতা' (১৯৭০) সত্যরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' (১৯৭০) পলাশ মিত্র সম্পাদিত 'জীবনানন্দ (১৯৭০) মনীন্দ্র গুপ্ত ও নরেন্দ্র দাশ সম্পাদিত 'পরমা' (১৯৭০), প্রদীপ বসু সম্পাদিত প্রতিভা (১৯৭০) বাপী সমাদ্দার প্রদীপ বসু সম্পাদিত 'আজকাল' (১৯৭০) শম্ভুরক্ষিত সম্পাদিত 'মহাপৃথিবী' (১৯৭০), শৌলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেলা অবেলা (১৯৭০), কার্ত্তিক মোদক সম্পাদিত সময়ানুগ (১৯৭১), কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সাহিত্যচিন্তা' (১৯৭২) প্রত্যুষপ্রসুন ঘোষ সম্পাদিত 'সংরাগ (১৯৭২) পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 'অন্ধযুগ' (১৯৭৩) সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শায়ক' (১৯৭৩) বেণু সরকার সম্পাদিত 'কবিতা পাক্ষিক' (১৯৭৩), ওয়াজেন আলি সম্পাদিত 'ধ্বনি তরঙ্গ

(১৯৭৩) অঞ্জন সেন সম্পাদিত 'গাঙ্গেয়পত্র (১৯৭৪) গৌতম চৌধুরী সম্পাদিত অভিমান (১৯৭৪), দীপক কর সম্পাদিত 'ধানসিড়ি (১৯৭৫) শ্যামলবরণ সাহা সম্পাদিত বাল্মীকি (১৯৭৫) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও নিখিলেশ গুহ সম্পাদিত অন্তরীপ (১৯৭৫) গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তৃণাঙ্কুর (১৯৭৬) মুকুল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জিরাফ' (১৯৭৬), বৃন্দাবন দাস সম্পাদিত 'আমি' রফিক উল আলম সম্পাদিত গ্রামনগর (১৯৭৮) নিরঞ্জন মিশ্র সম্পাদিত 'সুচেতনা' (১৯৭৮) অজিত দেব সম্পাদিত 'এবং এবং' কবিতা (১৯৭৯) প্রভৃতি।

'অন্যদিন' পত্রিকায় বাংলা কবিতার পাশাপাশি প্রকাশ পেত ভারতীয় ও বিদেশী কবিতার নিয়মিত অনুবাদ। 'অন্বিষ্ট'র উল্লেখযোগ্য সংখ্যার বিষয় জীবনানন্দ দাশ, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পট রবীন্দ্রসঙ্গীত, মৃত্যু। 'মাসিক বাংলা কবিতা'য় কবিতার পাশাপাশি প্রকাশ পেত কবিতা বিষয়ক নিবন্ধ, কবি বিষয়ক আলোচনা। 'পরমা'র নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিশেষ। ৭-এর দশকে প্রকাশিত কবিতার লিটল ম্যাগাজিনর মধ্যে যেগুলি আজো প্রকাশ পেয়ে চলেছে সেগুলি হলো কণ্ঠস্বর, আজকাল (বর্তমানে আজকাল টাইটেনিডি'), মহাপৃথিবী, সীমান্ত সাহিত্য, গাঙ্গেয়পত্র, ধানসিড়ি, অন্তরীপ, তৃণাঙ্কুর, জিরাফ, আমি, গ্রামনগর, সুচেতনা, এবং।

৮-এর দশকের গোড়ায় কবি সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত উত্তরসুরি, পত্রিকার প্রচ্ছদে লিখলেন 'তরুণ তরুণতর কবিদের প্রতি অরুণ ভট্টাচার্য আবেদন জানাচ্ছেন ১৯৩০-৮০ পঞ্চাশ বছরের অস্থির দিনগুলি পার হয়েছে। বন্ধুগণ এবার আপনারা রব্যাঁ বেদল্যের অথবা এলুয়ার মায়কভঙ্গি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক আর নিধুবাবুর গানে। ৮-এর দশকে 'কবিপত্র প্রকাশ (পূর্বনাম 'কবিপুত্র) থার্ড লিটারেচার আন্দোলন শুরু করলেন। 'অন্ত্রী' পত্রিকার মাধ্যমে শুরু হলো মালোভী কাব্য আন্দোলন। অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন ও বীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ উত্তর আধুনিকতা তত্বটি নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করলেন জনপন, আলোচনাচক্র, সাম্পত, লালনক্ষত্র, গাঙ্গেয়পত্র, ক্যাকটাস প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন সংখ্যায়।

৮-এর দশকে কবিতার লিটল ম্যাগাজিন কম প্রকাশ পায়নি। বেরোতে লাগল দুফর্মা তিন ফর্মার কবিতার চটি পুস্তিকা এবং নানান ধরনের কবিতার সংকলন। এই দশকের উল্লেখযোগ্য কিছু লিটল ম্যাগাজিন ব্রজ চট্টেপাধ্যায় সম্পাদিত ঋত (১৯৮০) ভস্বতী রায়চৌধুরী সম্পাদিত অহঙ্কার (১৯৮০) ধীমান চক্রবর্তী সম্পাদিত 'আলাপ' (১৯৮০), দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'সময়গ্রন্থী' (১৯৮০), সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা কলকাতা (১৯৮০), উজ্জ্বল সিংহ সম্পাদিত 'ঘোড়সওয়ার' (১৯৮০), রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আনন্দম' (১৯৮১) কাজল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সাংস্কৃতিক সংবাদ পেরে 'সাংস্কৃতিক খবর (১৯৮১), শতরূপা সান্যাল সম্পাদিত 'অ' (১৯৮১)নির্মল বসাক

সম্পাদিত 'ইন্দ্রানী' (১৯৮২) মন্দিরা রায় সম্পাদিত একালের বোধিসত্ত্ব (১৯৮২) উত্তম দাশ ও মৃত্যুঞ্জয় সেন সম্পাদিত 'মহাদিগন্ত' (১৯৮২) নীলাদ্রি ভৌমিক সম্পাদিত 'অভিষেক' (১৯৮৩) নিতাই জানা সম্পাদিত 'কালবেলা' (১৯৮৩) অসিত সিংহ সম্পাদিত আকরিক (১৯৮৩), প্রণব পাল সম্পাদিত 'অ্যান্টি' (১৯৮৩), কাশীনাথ বসু ও রমেন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পাদিত শব্দের কারুকাজ (১৯৮৩) স্বপন নন্দী সম্পাদিত শম্পা (১৯৮৩) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত একলব্য (১৯৮৩) তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত কলকাতায় হ্যামলেট (১৯৮৩) অমলেন্দু বিশ্বাস সম্পাদিত নৌকা (১৯৮৩), গৌতম সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'জনপদ' (১৯৮৪) সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত তমসুক (১৯৮৪) কুনাল মন্ডল সম্পাদিত মরীবি (১৯৮৪) তারাপদ ধর সম্পাদিত সক্রেটিক (১৯৮৪), রূপম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নির্জন (১৯৮৪) অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত দহন (১৯৮৫) মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শিপ্রা ঘোষ সম্পাদিত 'শ্লোক' (১৯৮৫) অরুনাংশু ভট্টাচার্য সম্পাদিত পান্ডু (১৯৮৫), দীপেন রায় ও অজিত বসু সম্পাদিত 'কবিতা সীমান্ত' (১৯৮৬) গৌতম হাজরা সম্পাদিত প্রতীতি (১৯৮৬), নবীন সাহা সম্পাদিত ক্যাকটাস (১৯৮৬) সন্তোষ সিংহ সম্পাদিত ঋষ্যমূক (১৯৮৬), শ্যামলকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত পাললিক (১৯৮৭) বীজ (১৯৮৭) স্বপনকান্তি ঘোষ ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পুনর্বসু (১৯৮৭) রণজিৎ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মনিপুষ্প (১৯৮৭), মলয় আদক সম্পাদিত অন্ত্রী (১৯৮৮০ মানস কুমার যিনি সম্পাদিত মোনালিসা (১৯৮৮) সুজিৎ সরকার সম্পাদিত কবিকৃত (১৯৮৮) গৌতম ঘোষ দস্তিদার সম্পাদিত 'রক্ত মাংস' (১৯৮৮) সৈয়দ সমিদুল আলম সম্পাদিত মধ্যরাত্রি (১৯৮৯) বুবুন চট্টোপাধ্যায় মল সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সোঁতা (১৯৮৯) সিদ্ধার্থ সেন ও শংকর দাশ সম্পাদিত 'বাতিস্বর' (১৯৮৯) জামিল সৈয়দ সম্পাদিত এমাসের কবিতা (১৯৮৯) প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য কবিতার আরো অনেক কাগজ এই সময় বেরিয়েছে। বর্তমানে এরমধ্যে অনেক কাগজই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলি প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলি হলো কবিতা কলকাতা, আনন্দম, সাংস্কৃতিক খবর 'অ' বিহান, ইন্দ্রানী, একালের বোধিসত্ত্ব, মহাদিগন্ত, নৌকা, জনপদ (বর্তমান সম্পাদক বিকাশ শীল), তমসুক, সক্রেটিস, কবিতা সীমান্ত, প্রতীতি, পাললিক, কবিকৃতি, রক্তমাংস, সোঁতা।

৯-এর দশকে ছাপাখানায় এলো নতুন প্রযুক্তি DTP পুরনো লেটার প্রেসের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির ডিটিপি তে ছাপা কবিতা পত্র শুধু বেরোলেই না, সংখ্যায় বাড়তে লাগল। বেরোতে লাগল লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনারা নানা কবিতা গ্রন্থ।

৯-এর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিনগুলি হলো প্রভাত কুমার মিশ্র সম্পাদিত প্রতিমা (১৯৯০), সৈয়দ খালেদ নৌমান সম্পাদিত অকেষ্টা (১৯৯০) অজিত বাইরা সম্পাদিত 'প্রতিমুখ' (১৯৯০), দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভাষাপৃথিবী' (১৯৯০), কবিতা ক্যাম্পাস (১৯৯০), স্বরূপ চন্দ সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর'

(১৯৯০), অনির্বান ধরিত্রীপুত্র সম্পাদিত 'অনুবর্তন (১৯৯১), কুমারেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত মধ্যদুপুর' (১৯৯১), বিদ্যুৎ পরামাণিক ও চঞ্চল দুবে সম্পাদিত অন্নজল (১৯৯২), বিজন রায় সম্পাদিত 'উত্তরাধিকার (১৯৯২), সনাতন ঘোষ ও তনিমা সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সনাতনী' (১৯৯২), নন্দন দত্ত সম্পাদিত ঋত্বিজ (১৯৯২), গৌতম সাহা সম্পাদিত ফিনিক্স (১৯৯৩), স্বপন শর্মা সম্পাদিত 'মমী' (১৯৯৩) প্রভাত চৌধুরী সম্পাদিত কবিতা পাক্ষিক (১৯৯৩) দীপঙ্কর বাগচী ও সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শব্দযাপন (১৯৯৩) পঙ্কজ মন্ডল সম্পাদিত 'নীলাঙ্কর' (১৯৯৩), সুমিত তালুকদার সম্পাদিত কয়েকটি কণ্ঠস্বর (১৯৯৪) সোমনাথ হাজরা সম্পাদিত 'হিমযুগ' (১৯৯৪), পার্থপ্রিয় বসু সম্পাদিত 'চিত্রক' (১৯৯৪), বিজয় মাখাল সম্পাদিত পুনর্মুদ্রণ (১৯৯৪) দরগারেজ (১৯৯৪), জগদীশ মন্ডল সম্পাদিত 'ময়ূখ' নবপর্যায় (১৯৯৪), অয়ন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'গঙ্গার' (১৯৯৪) চিরঞ্জীব বসু সম্পাদিত 'কবিকথা (১৯৯৪), প্রসূন ভৌমিক সম্পাদিত বিকল্প (১৯৯৪), সংবর্তিকা ১৯ দিনে (১৯৯৩) স্বরূপ মন্ডল সম্পাদিত 'যু গন্দর' (১৯৯৫) অজয় নাগ সম্পাদি সুন্দর (১৯৯৫) উৎপল মন্ডল সম্পাদিত মাতৃভাষা (১৯৯৪) সন্দীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পরশু (১৯৯৫) হরপ্রসাদ সাহু সম্পাদিত 'লোককৃতি' (১৯৯৫) প্রদীপ কর সম্পাদিত সমাকৃতি (১৯৯৫) কমল কুমার দত্ত সম্পাদিত 'দোহাপত্র' (১৯৯৫) সুশান্ত মুখোপাধ্যায় কবিতা যাপন দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এখন কবিতা' (১৯৯৬), জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কর্ণ (১৯৯৬), সমরেন্দ্র মন্ডল সমুদিত 'অন্তরীক্ষ' (১৯৯৬), রাজকল্যান চেল সম্পাদিত 'কবিতা দশদিনে' (১৯৯৬), অরূপ আশ সম্পাদিত 'তাঁতঘর (১৯৯৬), দুর্গাদাস মিদ্যা সম্পাদিত আরত্রিক (১৯৯৭), বোধিসত্ত্ব রায় সম্পাদিত 'অধরামাধুরী (১৯৯৭) বিশ্বনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'বিষয় কবিতা' (১৯৯৭) বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস (১৯৯৭), সংগীতা মিশ্র সম্পাদিত যুগাদ্যা (১৯৯৭), তরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রথম আলো' (১৯৯৮), ধ্রুবন সরকার সম্পাদিত অতিথি (১৯৯৮) বণিক রায় সম্পাদিত পৃশ্নি (১৯৯৮) গণেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত প্রিয় সঞ্চয়ণ (১৯৯৮) কবিতা কালপুরুষ (১৯৯৯) অতীশচন্দ্র ভাওয়াল সম্পাদিত কবোক্ষ (১৯৯৯), অঞ্জলি দাশ সম্পাদিত ক্রমমুক্তি (১৯৯৯), গৌতম দাস সম্পাদিত ক্রীত দাস ক্রীতদাসী (১৯৯৯) অজিত ঘোষ সম্পাদিত 'প্রান্তিক' (১৯৯৯), অরিনিন্দম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৃষ্টিদিন' (১৯৯৯), সমসুল আলম সম্পাদিত 'অভিভব' (১৯৯৯),জমিল সৈয়দ সম্পাদিত 'পদ্যচর্চা' (১৯৯৯) কাশীনাত মন্ডল সম্পাদিত 'কবিতা পোষ্টার' (১৯৯৯) অনীক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা ও সমাজ' (১৯৯৯) শ্যামল শীল সম্পাদিত কবিস্বর (১৯৯৯) নিতাই জানা সুকান্ত সৎপতি সম্পাদি 'কালবেলা' (১৯৯৯), অশোক ঘোষ সম্পাদিত 'অনুভব' (২০০০), নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিমন (২০০০), শ্যামলেন্দু মজুমদার বিজয় সিংহ সম্পাদিত 'রাত্রির কোরাস' (২০০০)।

পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে পঁচিশে বৈশাক, বোশেখ পঁচিশ, বিদগ্ধ বৈশাখ, মাঝি,

চন্দ্রিমাস প্রভৃতি নানা কবিতাপত্র প্রকাশ পেয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এর বাইরে রয়ে গেল আরো কবিতাপত্র।

শুধুমাত্র কবিতা প্রকাশ নয় কবি ব্যক্তির ও কবিতার বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে নানা লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সমসাময়িক রবীন্দ্রোত্তর জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র নাথ, দত্ত অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, রাম বসু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অলোক সরকার অমিতাভ দাশগুপ্ত মণিভূষণ ভট্টাচার্য, মনীন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কবিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা যেমন বেরিয়েছে তেমনি দীর্ঘ কবিতা, কবিতার ভাষা, বিভিন্ন কবিতার ওপর স্বতন্ত্র আলোচনা, ছন্দ, কবিতায় সমাজভাবনা, কবিতার শৈলী প্রসঙ্গে নানা নিবন্ধ, সংখ্যা ছড়িয়ে আছে কবিতার লিটল ম্যাগাজিন। টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, সেক্সপীয়র উইলিয়াম ব্লেক লোরকা গ্যোটে প্রমুখ বিদেশী কবিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা নানা সময় প্রকাশ করেছে কবিতার লিটল ম্যাগাজিনগুলি। প্রতিবেশী ও বিদেশী কবিতা অনুবাদের কাজ নিয়মিত হয়ে থাকা এইসব লিটল ম্যাগাজিনেই। সন্দেহ নেই কবিতা চর্চায় বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও প্রতিরোধ্য।

উপনিবেশবাদ, বিশ্বকবিতা ও বাংলার কবিতার ধারা

তরুণ সান্যাল

বিশ শতকের গোড়াতেও এদেশে যথেষ্ট সাহেব সুবোয় ভক্তি ছিল তা রবিঠাকুর কথিত 'বড় ইংরেজ ছোট ইংরেজ' বিচার করে নয়। ছিল নির্বিশেষে। ফ্রিডরিশ ম্যাক্সমুলার বিশাল এক ভাষা পরিবারের মধ্যে উত্তর ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে স্থাপন করে বলেছিলেন। এসব ভাষা আর্যভাষা। অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক সেই জার্মানবিদরা কিন্তু কখনও ভারতে আসেনি। কিন্তু আবেগে আপ্লুত হয়ে বারাণসী - গঙ্গা নদীর কথা বলতেন। আমরাও তক্ষুণি 'মোক্ষমুলার বলেছে আর্য' জেনে, ইংরেজ ও সাদা মানুষজনকে আত্মীয় জ্ঞান করে স্বদেশী কালোদের প্রতি একটু নাম কুঁচকিয়েছি। শোনা যায়, বারাণসীর সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা তাঁকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করে উপবীত উপহার পাঠিয়েছিলেন। গৌরব বোধ করেছি আমরা 'রণধারা বাহি জয় গান গাহি, যারা এসেছিল', সেই শুভ্রত্বক, দীর্ঘনাসা, কৃষ্ণ বা হিরণ্যচক্ষু, বভ্রু বা স্বর্ণকেশ অভিযাত্রীদের বংশধর বলে। শেষ জীবনে অক্সফোর্ডপ্রবাসী, ম্যাক্সমুলারের জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা এবং বিশেষভাবে একদা 'দ্য কনটিনেন্ট অব সার্সি' প্রণেতা নীরদ সি. চৌধুরীর তো ধারণাই ছিল, ইংরেজরা এদেশে এসে নিত্য ঋতু ও পরিবেশের কারণে সার্সি-সুন্দরীর দ্বীপে ওদেসিয়ুসের সহনাবিকদের মতো অকেজো-অকর্মণ্য গাড়ল হয়ে পড়েছে। আর হাজার দু-তিন বছর ধরে শুভ্রত্বকের মানুষজন আমরাও যে নৈসর্গিক প্রকৃতি-বৈপরীত্যে চরম অকেজো হয়ে গেছি ভারতে, আমরা মানে 'উঁচু বর্ণের' হিন্দুরা ইংরেজ ও আমরাতো স্বজাতিই। দুগোষ্ঠী শুধু শীত ও গরমের দেশে বসবাস করে দু-ধরনের হয়েছি। শ্রী চৌধুরী রাডিয়ার্ড দি পলিং-এর "প্রাচী প্রাচী আর প্রতীচী প্রতীচাই - দু-দিক কখনো মিলবেনা'র প্রশাস্তিও গেয়েছেন। কি পলিং-এর বহু পংক্তিই তো উদ্ধৃত হয়ে রয়েছে 'East is East, and West is West ; The white man's burden, East of Suez. The female of the species is more deadly than male, of lesser breeds without the law' এর ইত্যাদি। আমরা যারা ভারতীয় উচ্চবর্ণের কি 'আর্য' হিন্দু কি মুসলমান আশরাফ পূর্বপুরুষদের আমরা চিহ্নিত করতে ভালোবাসি এদেশে জয়ী হিসাবে। তাঁরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন বা এলেও বঙ্গদেশতো ঢের পরেই তাঁরা আর্যশুদ্ধই করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এনে। বর্ণাশ্রম গড়ে, জাতপাতের বিভাজন সৃজন করে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে উত্তরের মেরু অঞ্চল থেকে, কেউ বলেছেন মধ্য-উত্তর এশিয়ার তৃণভূমি থেকে, কেউ বলেছেন বর্তমান য়ুক্রেনের নীপার তীর থেকে আর্যরা এসেছিলেন। তা যেখান থেকেই আসুন, 'আমরা রণধারা বাহি জয়গান গাহি'দেরই পূর্বসূরী জ্ঞান করি। কোল ভিল মুণ্ডা বা

দ্রাবিড়দের নয়। অথবা হিমালয়-পাদপীঠবাসী কিরত মোঙ্গলরা ও নয়। আমরা বাঙালিরূপে আবার বহু শোণিতের মিশ্রনে ধ্বনিত রেখেছি আক্রমণকারীদের জয়গানের বিচিত্রসুর। একসময় মান সিংহ হিন্দুস্থানের পাতশাহর সিপাহি সাহিলার হিসাবে এই জনগোষ্ঠীর বংশনাম ধরে 'ত্রিপুর-মগ বাঙালি কাকুলি চাকুলি সকল পুরুষমেতদ ভাগ নাও পলায়ী।' তখনতো আর ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত নামের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ছিল নানা অঞ্চলে স্বাধীন রাজশক্তি। তবে, যারাই ভারতে এসেছিলেন, তারা সময় ধরে এই উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা এদেশকে প্রথমাবধি উপনিবেশ হিসাবে দেখেছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের সাংস্কৃতিক ও শোণিত চরিত্রের মূল শিকড় ছিল ভিন দেশে। এক সময় এদেশের আকাশ মাটি রমণী আপন হলো, এদেশটা তাদের মাতৃভূমি হলো (পিতৃভূমি নয়)। এই যে মাতৃভূমি হলো, তার পেছনে রয়েছে সম্ভবত এদেশের মোহিনী মায়া, অঢেল মাতৃদুগ্ধের মতো অন্নসম্ভাব। টি. এস, এলিয়ট কিপলিং-এর একটি নাতি বৃহৎ সঙ্কলনের পরিচয় লিখতে গিয়ে, লক্ষ করেছিলেন, দুই কিপলিংকে। ভারতে জন্মেছিলেন কিপলিং, শিশু ও বালক বয়সে তাঁর মন যে প্রভাব ফেলেছিল, তা তাঁর ভারতকে ভালোবাসার নিদর্শনমূলক রচনা বিশেষভাবে কিম (Kim) বইটিতে ধরা আছে। কিন্তু সতেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ভারতেই জীবিকা অর্জন করা কিপলিং 'Wrote the rather cocxy and acid tales of Delhi and Simla, but it was the former (অর্থাৎ বালক বেলা) who loved the contry and its people. In his Indian tales .... the Indian characters who have the greater reality, because they are treated with the understanding of love'' T.S. Eliot; of poetry and Poets, Faber & Faber P 242 বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতিনিষ্ঠ ধারক ইংরেজ কবি ও কথাশিল্পী কি পলিং-ও তাহলে ভারতে ভালোবেসেছিলেন! এমন ভালোবাসা বিষয়ে, এলিয়টের ঐ ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, 'We all live by robbing Asiatic Coolies, and those of us who are enlightened' all maintain that those Coolies ought to be set free ; but our standard of living, and hence our 'enlightenment', demands that the robbers shall continue''. ... He (Pipling) sees clearly that men can only be highly civilized while othermen, inevitably less civilized, are there to guard and feed them.'' (Introductor, The works of Rudyard Kipling, The wordsworth Poetry Library, 1994 PP XIX, XX)

এই যে 'guard and feed' করার জন্যে রয়েছে যারা জানা দেশে বাহির ভিতরের উপনিবেশের মানুষ বাহির-উপনিবেশিক মানে ভিন্ন দেশের মানুষ, যারা পুরনো দিনে অভিবাসন করতো বিদেশে, বৌ-বাচ্চা-গোরু-বাছুর, সব কিছু নিয়ে স্থায়ী ভাবে বসত

করার জন্য। মার্কিন দেশের আদি বাসিন্দাদের ফৌত করে, যারা রিজার্ভে তাদের নির্বংশ করার প্রায় শেষাশেষি ঢুকিয়ে দিয়ে, 'চলো পশ্চিমে' 'Westward Ho' যাদের ধ্বনি ছিল, তারাই আদিকাল থেকে উপনিবেশিক। এমনি পেলোপনেসীয় উপদ্বীপ থেকে বহু মানুষ এশিয়া মাইনরে বসত গড়েছিল, যেমন ইলিয়মে বা ট্রয়ে। কিংবা আলেকজান্দারের সঙ্গে প্রবাসে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়ার মতো বহু জায়গায় নিজেদের এবং তাদের ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শোণিতের মিশ্রনে গড়ে উঠেছিল জলপদ। রোমান সৈন্যবাহিনী ও তাদের প্রধান এবং রোমান ব্যবস্থাপকেরা নেটিভ জনগোষ্ঠীর আয়ত্তের বাইরে গড়তো তাদের কলোনি। প্রাচীন রোম থেকে ইতালিয়ার একদল মানুষ ভূমধ্যসাগর পার হয়ে লিবিয়ার এক কোনে গড়েছিল কার্থেজ। কতই-না এই বাইরের থেকে এসে বসত করার উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভিতরেও এক ধরণের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আগন্তুক বিজয়ী ও দেশের আদি বাসিন্দা বিজিতদের মধ্যে। বিজিওদের শ্রমের উদ্বৃত্ত, জমি জিরেভ এখন কি জানমান সবই আগন্তুকদের অধিকারে এসে যায়। এ বসবাসের উপনিবেশ নয়, অন্য জনজাতিকে দলিত রেখে, তাদের ঘাড়ে। চড়ে জীবনযাপন। 'মানুষ মানুষকে জীবিকা করে'। নিয়মে বেঁধে তাদের শ্রম উদ্বৃত্ত আগন্তুকদের ও তাদের বংশধরদের দিতে বাধ্য করে। যেমন, ভারতে শূদ্র সমাজে, স্পার্টায় হেলটেরা, এথেন্সে দাসরা, রোমে প্লেবিয়ান ও দাসরা, লাতিন আমেরিকায়, বিজয়ী এনকুইজেটদের উল্টো দিকে পুয়েরলো বা নেটিভ আদিবাসীরা। বর্তমানে এইসব নানা দেশের আদিবাসীদের সম্মানিত অভিধা দিয়েছে জাতি সংঘ, ইনডিজেগস পিপল। পৃথিবীর ছশো কোটি জল সংখ্যার মধ্যে এদের সংখ্যা নাকি হ্রাস পেতে-পেতে দাঁড়িয়েছে ত্রিশ কোটিতে। কালো আফ্রিকার, বিশেষভাবে সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে এক সময় আরব, পরের যুগে ইংরেজ-হিস্পানি প্রভৃতি দাস ব্যবসায়ীরা গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করেছে শিশু-নারী নির্বিশেষে কালো মানুষ তাদের ছাগল-গোরুর মতো বেচেছে লিভারপুলের বাজারে, রিও ডিজেনিরো বা এমনি নানা নামের দাস-হাটে। প্রথমে মানুষ, তারপর নানা খনিজ-অরণ্য ও পশুসম্পদ লুঠ করে নেবার জন্য, এক একটি অঞ্চল সৈন্য দিয়ে দখল করেছে নানা ইউরোপীয় রাষ্ট্র আফ্রিকায় এবং তাদের চালিকা ছিল বণিককূল। এই অঞ্চলগুলি আদি বাসস্থান থেকে চলে এসে বসতি স্থাপন নয়। এই অঞ্চলগুলি এক এক দেশের অধিকৃত অঞ্চল। যেমন ভিন্নদেশে অভিবাসিতের বসত, এসব দেশের সব সম্পদ সম্ভারের অধিকার তখন দখলকারী দেশটির। আবার, শুধুমাত্র পণ্যকেনাবেচার জন্য এসে ইংরেজ ভারতের মতো এতবড় দেশটাই দখল করে বসলো। এটাও বৃটেনের সম্পদ নিষ্কাশনের উপনিবেশ। ১৯১৬ সালে লেনিন লিখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর বইটি। তাতে লিখেছিলেন, কোনো পুঁজিপতিদেশ ভিন্ন দেশের সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুর, বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজ দেশ থেকে পুঁজিতে কাজে লাগায় রপ্তানি কম সেই

ভিন্নদেশটিকে বলা হবে পুঁজিরপ্তানিকারী দেশের উপনিবেশ। এই রপ্তানি করা পুঁজি নিজ দেশের অতিরিক্ত শিল্প মুনাফা নেমে পাওয়া উদ্বৃত্ত ও ব্যাঙ্কের ঋণপুঁজি দিলে ফিনান্স পুঁজি গড়া। কোনো দেশ দখল করে, নানা সম্পদ লুঠের জন্য বড় লাটের ছোট লাটের শাসন কার্যকর করা দেশটি হলো ধ্রুপদী উপনিবেশ। এই লগ্নিপুঁজির আধিপত্যজনিত উপনিবেশ অর্থনৈতিক উপনিবেশ। এই উপনিবেশ নামে স্বাধীনও থাকতে পারে। কাজে বিদেশী পুঁজির প্রায় পাহারাদারে রূপান্তর হয় এই 'স্বাধীন' প্রশাসন। বর্তমানে আবার বিশ্বায়নের যুগে, উদারনীতি, বেসরকারী মালিকানা ও সীমান্তভাঙা বিপনন ও পুঁজির গমনাগমন দুর্বল দেশগুলিকে শক্তিশালী ধনীদেশের অনুগত বা মিত্র (crony) বশংবদ করে ফেলছে। এ আরেক ধরণের উপনিবেশ রচনা। আমাদের দেশ কেন, নানা দেশে ও একদল বিদ্বান আছেন, যাঁরা বলছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পরই ধ্রুপদী দখলদার সাম্রাজ্যবাদ শেষ হয়েছে। ফলে উপনিবেশ ও ব্যবস্থাও শেষে হয়ে গেছে। তখন এই 'স্বাধীন' দেশগুলিতে উপনিবেশ উত্তর সৃষ্টি ও সাধনার সময়। বিদেশী দখলদাররা এসব দেশ দখল করার আগে, এসব দেশের নিজ বিকাশের ধারা ছিল। প্রায় দুশো বছর বিদেশী আধিপত্য ঐ বিকাশধারাকে ঢেকে দিয়েছিল। যেন এক মজা জলা হয়ে, হয়ে পড়েছিল জীবন্মৃত মৃত। কিন্তু স্বাধীনতার পর, ঐ দুশো বছরের প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু, বাদ দিয়ে, আবারও আবহমানতায় ফিরে যাবো আমরা। যেন এ দুশো বছরে দু ব্যবস্থায় কোনো মিথস্ক্রিয়া ঘটেনি।

আমাদের বিচারে, এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ঠিক নয়। উপনিবেশ এখন আরো প্রবল নব্য উপনিবেশের রূপ নিয়ে এসেছে।

ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস তাঁর নিরক্ষীয় অঞ্চলে নৃতাত্ত্বিক সমীসরে প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন, মানব সমাজের অতি প্রচলিত সমাজ উদ্বর্তনের ধারণাটি সঠিক নয়। উর্দ্ধতন নাকি সব সময় ভালোর দিকেই চলে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা শিখিয়েছে। কালো-হলদে মানুষগুলিকে সুসভ্যতার, মানে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতায় উত্তীর্ণ করাই The White Man's burden. লেভি-স্ট্রাউস বলছেন, আধুনিক দ্রুতগামী যানবাহন বা বহু গ্যাজেট ব্যবহার না করেও পশ্চিমী বিলাস-ব্যসন বিবৃত যে কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে ঐ নিরক্ষীয় আদিবাসী সমাজ যথেষ্ট বেশি কল্যাণ পেয়ে থাকে। কোন সমাজ ভালো কোন সমাজ খারাপ, এসব বিচার করা যায় না। কি নিরিখে করা হবে? কত ধরনের কত বেশি পণ্যভোগ করছে বলে? শ্রম লাঘবের জটিল যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে বলে? নতুন নতুন খাবার পোষাক পাচ্ছে বলে? বরং, যারা তথাকথিত পিছিয়ে থাকা উপজাতীয় ব্যবস্থা বাতিল করে তাদের আপন স্তরে নিয়ে আসতে চায়, তারাও ঔপনিবেশিক মানস ঔপনিবেশক। বরং, যারা তথাকথিত পিছিয়ে থাকা উপজাতীয় ব্যবস্থা বাতিল করে, তাদের আপস স্তরে নিয়ে আসতে চায়, তারাও ঔপনিবেশিক মানস-ঔপনিবেশক। ট্রাইবাল সমাজে বাইরের ছাপ পড়ে, সে সমাজ

বিকৃত করে দেয়। ঐ বিকৃতিটা দূর করা মানে, নানা সংস্কারের কাজ। তার যারা 'ইতিহাসের স্তর' বিভাগ করে। বিশেষ স্তরে পৌঁছে দেওয়া যারা সামাজিক দায়িত্ব মনে করে, একে আধুনিকোত্তরবাদী দর্শনিকরা বলেন গ্যাণ্ড ন্যারেটিভ। তা 'গণতন্ত্রবাদী পশ্চিমীরাই হোক, বা সাম্যবাদী প্রাচীই হোক। আমাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস যেমন শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, তেমনি বিপরীতভাবে বলা তা যায় উপনিবেশিকতার ইতিহাসও। পৃথিবীর প্রতিটি এপিকই ঐ উপনিবেশিকতাকে তুলে ধরে। তা ইলিয়াস বা ওডিসি, এনিদ বা গিলগামেশ-কাহিনী, রামায়ণ বা মহাভারত - এ সবইতো উপনিবেশবাদকে চিনির মোড়কে ঢেকে দেখানো। এমন কি ব্যক্তির যেমন স্বপ্ন, নৃ-গোষ্ঠীর তেমনি রূপকথা। রূপকথা শ্রেণীটির দৃষ্টিভঙ্গী। ইলিয়াসের রাজপুত্র প্যারিস। দেবরাজ জিউস ও লেদার অবৈধ মিলনে জন্মেছিল ক্লাইটেনমেনস্ট্রা ও হেলেন। দুভাই, আগামেমনন ও মেনেলাসের সঙ্গে যে দু'বোনের বিয়ে হয়েছিল। ফিনেলাসের রাণি হেলেন প্যারিসের সঙ্গে ট্রয়ে চলে গেলেন। তার পুরনো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রিক নানা দেশের রাজা-রাজপুত্ররা জাহাজ ভাসিয়ে চললো ট্রয় ধ্বংস করে হেলেনকে ছিনিয়ে আনতে। নাকি, লক্ষ্যছিল হেলেন উদ্ধারের সুযোগ গিয়ে সম্পদশালিনী নগর রাষ্ট্র ট্রয়কে ছারখার করে বন সম্পদ দামী দামী সংগ্রহ করা। রানি-চোরদের ধ্বংস যারা করণে এসেছে, সেই আগাতেমনন ও একিলিণ ও তো একটি তরুনীর উপর অধিকার নিয়ে পরস্পরের শত্রু হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, উপনিবেশকারীদের ন্যায়নীতি তাদের সুযোগ সুবিধা মতো বদলায়। এমনি ওদেস্যাস। তারও কোনো ন্যায়নীতি নেই। এক চক্ষু সাইক্লোপস, মায়াবিনী মাসি, চমৎকার তরুণী নসিকা - সবাইকেই সে প্রতারণা করে উপায় একটাই। চাকরি। এনিদওতো স্বচ্ছন্দে দিদোকে পথে বসিয়ে তাইবার তীরে পৌঁছবার জন্য জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে কার্থেজের রাজবাড়ি পুড়ে যাওয়া দেখেও। এমন রামায়ণ মহাভারতেও। রামায়ণের ইক্ষাকু বংশীয় রামচন্দ্র আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সীতা চুরির বাহানাকে ব্যবহার করে বালী ও সুগ্রীব, বিভীষণ ও রাবণদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলের কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এমনি ভারতের নানা রাজ্যকে এক সাম্রাজ্যশক্তির অধীনে আনতে কি ভারতীয় এপিক সাহিত্য - দুই-ই নানাভাবে নানা বিদ্বান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন অদ্যাবধি। আদ্রে জীদ ও টমাস মান লিখেছেন। ওয়াদিপৌস নিয়ে, সার্ত লিখেছেন, ওরেস্টেসের পিতৃহত্যার শোধ নিতে 'মাছি', এমনকি গ্যয়টেওতো 'ইফিগেনিয়া লিখেছেন। এইতো সেদিন গ্রীক কবি কাজান্তাকিস লিখলের নতুন করে ওদিসি, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নির্ভর জনগোষ্ঠী নিকর্ডানের মধ্যে ধরে রেখেছে ঐ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ইত্যাদির আইকনগুলি। প্রতিটি গ্রন্থ পুরাকথা, লেজেণ্ড, মিথলজি ঐ উপনিবেশিকতার জন্মদাতা বহন করে। একদা যা ছিল জনজাতির জীবনসত্য, শ্রেণীবিভাজনের পর, সে সব করে নেয়

নিজেদের, স্বার্থ রক্ষার প্রাধান্যবাদীরা। ঐ প্রতীক, ইমেজ, আইকনগুলি যুগে যুগে একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিকে একই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় reflex-এ নিয়ে যায়। বিশিষ্ট হাঙ্গেরীয় নন্দন তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী জর্জি লুকাচ তাই বলেছিলেন, কোনো জনজাতির মধ্যে ঘুমন্ত বহু প্রতীকই গণতান্ত্রিক উপলব্ধিকে উজ্জীবিত করে নতুন সৃষ্টিতে। আবার বহু মানববিদ্বেষী প্রতীককে জাগিয়ে তুলে ফ্যাসিবাদের মতো ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। আমাদের দেশে টিভি, থিয়েটার, যাত্রা, চলচ্চিত্রতো নিয়মিত মীথ নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমানেতো আবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানরা প্রত্ন ট্রাইবাল আগ্রাসকদের মূল্যবোধ আমদানি করতে, মীথগুলির নিজ স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন। এজন্য ইতিহাসে 'মানসিক উপনিবেশের' একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

ভারতের সবচেয়ে পুরনো বই, ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলে ১০৮ সূক্তে সরমা ও পণিদের কাহিনী রয়েছে। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলচেন বেদ রহস্যের সমস্ত মূল তত্ত্ব বর্তমান সূক্তে ব্যক্ত হইয়াছে।" যাইহোক কাহিনীটিতে বলা হয়েছে, সরমা ইন্দ্রের দূতী হয়ে 'রসা'র জলরাশি পার হয়ে পণিদের দেশে এসেছে। কেন? "ইন্দ্রের দূতী আমি, হে পণিবৃন্দ! তাঁহার প্রেরণায় ফিরিতেছি কোমাদেরই মহান গুপ্তধনের অভিলাষে"। পণিরা সরমাকে বলে, ইন্দ্রকে তারা মিত্র করে রাখবে "সে নিজেই আসুক না, তাহাকে আমরা মি্তর করিয়া রাখিব। সে আমাদের গো যূথের হইবে গোপাত"। সরমা ভয় দেখায় ইন্দ্রের অস্ত্রশস্ত্রের, ভয় দেখায় অগ্নিবৎ অঙ্গিরা স্মষিদের, যারা ইন্দ্রের সঙ্গী। পণিরাও প্রত্যুত্তরে জানায়, তারাও বলহীন নয়, তাদেরও আছে নিশিত আয়ুরাজি। সরমা ক্ষিপ্ত হয়ে শাপশাপান্ত করে পণিদের, "ভাতৃত্ব ভগ্নীত্ব আমি কিছু জানিনা - জানে ইন্দ্র আর দারুন অঙ্গিরা ঋষিরা ... ভালো চাওতো, পালাও এখান থেকে পণির দল" (বেদমন্ত্র, পৃ. ৭, নলিনীকান্ত গুপ্ত। মনে হয় আগন্তুক আক্রমণকারী আর্যদের আগ্রণী বাহিনীর প্রতিনিধি সরমা (কুকুরীর প্রতীক) অনার্য সম্পদশালীদের ভয় দেখাচ্ছে ।

দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্‌গাবো যন্তু মিনতী ঋতেন।

ধর্মব্যাখ্যা তারা যাই বলুন না কেন, উপনিবেশবাদীদের অগ্রবাহিনীর ভূমিকা সরমা চমৎকারভাবে পালন করছে। শোনা যায় নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতারা অসভ্য নরখাদকদের কাছে খৃষ্টের মহিমা প্রচারের জন্য পাদ্রি-যাজকদের প্রথমে পাঠায়। নরখাদকেরা তাদের খেয়ে ফেলে। তখন 'ধর্ম সংস্থাপনায়' অসভ্যদের টিট করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। দেখছি এই ব্যাপারটা পণিদের সময় লেকে 'পরিত্রাণায় সাধুনীয় বিনাশায় চ দুষ্কৃতায়' আঠারো-উনিশ শতকের opening of Africa পর্যন্ত খুবই চলেছে। পণিদের কাহিনীতে দেখছি, পণিরাও তাদের জেদ ছাড়বেনা। যুদ্ধ একটা হবেই।

এইটি হলো উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইঙ্গিতবাহী। স্বদেশ স্বভূমি আপন সম্ভ্রম ও সম্পদ রাখবার সঙ্কল্পের দিক। নিগ্রোত্ত্ববাদী সেনেগালের কবি লিওপোল্ড নেদার সেংঘর লিখছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে জুলু-বিদ্রোহের নায়ক শাখাকে (চাকা) নিয়ে এক কাব্যনাট্য। ঐ নাটকটিতে রয়েছে উপনিবেশবাদী 'শাদা কণ্ঠস্বর' বনাম চাকার কথোপকথন। উপনিবেশবাদীরা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলের পথে জুলু বিদ্রোহ শেষ করে দেয়। চাকা গ্রেপ্তার হন। আজও হয়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন। এই কাব্যনাট্যটিতে রয়েছে শিল্প, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম ও এখন যাকে সাহিত্যে মাত্রা দেওয়া হচ্ছে, সেই সেক্স বা আমাদের পুরনো অভিধারক প্রেম। চাকাকে দেশমুক্ত করার কাজে, ব্যক্তিক প্রেমের আবেগ থেকেও মুক্তি পেতে হয়েছে, যৌনপাত্রী বা স্ত্রী নোলিভেকে খুন করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে চাকা গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার অজস্র উপজাতিকে সংহত করেন। উপনিবেশবাদীদের হিংসা, প্রেম ইত্যাদি শেষের বিপরীতে মৃত্যুপথযাত্রী চাকার মতামত আমাদের কাছে স্পষ্ট হলে বুঝব, কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষদের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্তঃমূল। সেই উদাহরণটি তখন ট্রয় থেকে, লঙ্কা থেকে, বঙ্গদেশে থেকে সব দেশেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

..... যে নোলিভে মধুমতী,
প্রেয়সী তোমার, বধু
স্তন যায় মাখনে তৈরি চোখ নীলপদ্ম পাপড়ি
মধুর মর্মর উৎসমূলে কণ্ঠস্বর।
চাকা, তাকেই খুন করলে, সেই মধুর রমণীকে
এখন বিবেক থেকে মুক্তি পেতে তার নাম মুখে নিচ্ছ কেন!

চাকা। চমৎকার! বাহবা বাহবা! তুমি বলছো বিবেকের কথা ....
আমিই করেছি, আমি খুন করেছি .....
সে তখন শোনাচ্ছিল সুনীল দেশের গল্প।
ঠিক তখনি খুব করলাম তাকে - এই হাতে, না হাত কাঁপেনি
ধারালো ইস্পাত গেল দুরন্ত বিসুৎলাকে
বাহুমূলে সুগন্ধী আতুর গুল্ম ঝোপে।

সাদাগলা। .... তুমি মেনে নিচ্ছ অপরাধ
কেবল তোয়ারি জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে?

গর্ভভার মন্থর নারীরা, দুধের শিশুরা?
শকুন হায়নার জন্য মড়া যোগানদার তুমিই,
ভেবেছিলাম তুমি যোদ্ধা, দেখছি তো কশাই .... ওহে জুলু
তুমি মারী মড়কের চেয়ে ঢের ঢের ভয়ঙ্কর
তুমি গর্জে ওঠা দাবানল।

চাকা। পাছদুয়ারে হাঁস-মুরগির ডাক
মস্ত এক খাঁচা বর্তি মুরগি খাচ্ছে ঠাকরে ঠুকরে জোয়ারের দানা,
চমৎকার বড়ো চমৎকার সেই মাজাঘসা ভেলভেট চিক্কন
রেশমি পাখনা, তেল চকচক লাল তামাটে দেহ?
আমি সেই মরা বনে কাঠুরের কুড়োল চালাই
বাজা এই বলে আমি আগুন দিয়েছি
আমি এক হিসাবি মালিক
ছাই জমেছে শীতভর বীজ রুইব বলে।
নোলিভের প্রেম লেকে
গেলাম আমার কালো জনতার প্রেমের দাবির কাছে
সংবাদবাহীরা বলতো
ওরা সমছে টাউস জাহাজ লেকে
হাতে গজকাটি হাস্কাটি স্কয়ার কম্পাস সেক্সটান্ট
দেখলাম। এদেশ ওদেশ সবদেশ
হাঁটু মুড়ে বসেছে ঐ গজকাঠির স্কোয়ার কম্পাসের সামনে
বনভূমি করে উঠলো শিটরে উঠলো পাহাড়-পর্বত
গুঁড়িয়ে গেল উপত্যকা, নদীদের পায়ে জুলো লোহার পায়েল,
দেখলাম দুনিয়ায় শব্দ দিকে নানা দেশ
জোড়া জোড়া রেল পথের লোহার হাতকড়া বন্দী
দেখলাম দক্ষিণদেশী লোকজন
পিপড়ের ঢিবির ভদ্দতায় মগ্ন পিঠবাঁকা কাজে,

কাজ? সেতো চড়ই পবিত্র, কিন্তু
ওদের কাজের শুরু কিংবা সারা মাদল জানেনা
...কি করে একটির পর একটি মাস ঋতুচক্রে ঘুরে আসে
সে সবও দেখলো না।
দক্ষিণদেশীয় বড় কাজে ব্যস্ত ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে
খনিতে বন্দরে কারখানায়। আর
রাত্রি এলে বন্দী দশা ব্যারাকের পিঁজরাপোলে
..ভিনদেশীরা জমায় কালো কিংবা রাঙা সোনা, পাহাড় পাহাড়
একদিন সকালে দেখি
ভোরে কুয়াশার মধ্যে কোঁকড়ানো চুলের বন
শুকনো বাহু পেটপিঠে ঠেকা
চোখে আর ঠোঁটে তাদের ভাষাহীন প্রার্থনা, চলেছে তারা
কোনো এক অসম্ভব ঈশ্বরের কাছে
তখন আমার আর চুপচাপ অকেজো হয়ে বসে থাকা চলে?
সাদাস্বর। সমস্ত দক্ষিণদেশ জুটিয়ে আনলে তুমি
শাদাদের বিরুদ্ধে
চাকা। আহ্, —এইতো চেনা কথা ফুটেছে, শাদা কণ্ঠস্বর...
ও স্বরতো সাগরপারের মালিকের বিবেক...
..এক সময় ঈশ্বরের দূত বলে আমরা তাদের মেনে নিয়েছিলাম
..তারা চেয়েছিল মানপত্র। আমরা তা দিয়েছি
মশলাপাতি সোনা দামি পাথর
বাঁদর বা কাকাতুয়া কি দিইনি বলো...
...বিনিময়ে মরচে পড়া পহার, সস্তা কাচ, পুঁতি
... হাঁ তাদের কামানের এল জেনেও
হয়ে উঠলাম দুঃখী মানুষের নেতা।
যন্ত্রণাই হয়ে উঠলো নিয়তি আমার
আত্মায় ও হৃদপিণ্ডে নিয়তি।...
(কৃষ্ণ আফ্রিকার কবিতা। অনুবাদ তরুণ সান্যাল।। সারস্বত, পৃ. ৮-১০)

ওপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কবিই কি টাকার কণ্ঠস্বরে আসার তো মনে হয় সংঘরের মতো কবিকে নোবেল পুরস্কার দিলে পুরস্কার চাই সম্মানিত হতো মনে পড়বে, তাঁকে এক সময় ভারত থেকে এক বড়ো পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পণিদের তিনহাজার সাড়ে তিন হাজার বছর আগে গাভীকুল (গবাম) ছিল সম্পদ। তখন "রসা" পার হয়ে এসেছিল সরমা (এক সময় ঈশ্বরের দূত আমরা পদের মেনে নিয়েছিলাম—চাকা), তখন 'ইসা গাব : সরসে যা ঐচ্ছ : পরি দিবো অন্তান্‌ৎসুভগে পতন্তী। কস্ত এনা অবসৃজাদযু ধ্যু তাস্মামকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা।। (এই-যে গোযূপে তোমার অভিলাষ। সরসা সুন্দরী! যাহাদের জন্য তুমি স্বর্গের প্রাপ্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছ, বিনাযুদ্ধে কে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? আমাদেরওতো আছে নিশিত আয়ুধ রাজি। নিশ্চয়ই সেই হাজার হাজার বছর আগে ইন্দ্র ও তাঁর সঙ্গী অঙ্গিরাদের সঙ্গে পণিদের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত গোরাজী দখল করেছিলেন আগন্তুকরাই ('ঐ দেখ, সোমরসে প্রদীপ্ত আসিতেছে ঋষিরা, —আসিতেছে অঙ্গিরা, অয়াস্য। নবগ্ববৃন্দ। গোরাজীব এই বৃহৎ সম্পদ তাঁহারাই বাঁটিয়া উপভোগ করিবেন। তখন আর পণিদের মুখে এমন কথা সরিবে না। ৮.ঐ) বোঝা গেল ঋষিরাও 'সোমণশত্তা' (সোমপানে বা রসে শাণিত) হয়ে এসেছেন। 'চাকা'র কাহিনীটি অনুসরণে কি আধুনিক নাম করণ হবে অয়াস্য, অঙ্গিয়া সন্তাতদের, এবং নবগ্বা ঋষিদের, ওলন্দাজ (যারা পরে বৃয়া হবে,) ইংরেজ, পর্তুগিজ-বেলজিয়ান-ফরাসি ইত্যাদি? বলা হয় বহিরঙ্গে বেদের যা অর্থ, অন্তরঙ্গে তা নয়। "উহা একটা রূপকের আবরণে ঢাকা।" কবিতার গুনইতো তার শব্দের অর্থ ছাপিয়ে যায়ো, এবং থাকে নানা অ্যামবিগুইটি। রূপকও ধরা থেকে পারে যে কোনো কবিতাই, যে কোনো কনসীটই কবিকে দ্রষ্টা বলে ধরে নিতে পারে। বেদের ঋকগুলি অবশ্যই কবিতা। কবিরা তা চর্মচক্ষে বা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ হয়ে কল্পনায় মানস চক্ষে দেখেছেন। সেই স্মৃতি বংশ পরম্পরায় শুনেছেন, সেই আবার স্মৃতিতে ধরা আছে। কবিতাগুলি স্থান হবার বহু-বহু বছর পর তা লিখিত রূপ নিয়েছে। ঐ কবিতার ছন্দ, শব্দ তার উৎস ছাপিয়ে যাওয়া, অজস্র শব্দের বিরোধা ভাস, কবিদের নানা সুখচ্ছন্দ-সব নিয়ে এক অতিনৈসর্গিক ঘটনা হয়ে পড়েছে এক একটি ঋক। কবিতো স্বয়ংই বলতে পারেন 'কিমিদং ব্যাহৃতংময়া'। 'আমার দ্বারা কি উক্ত হলো?' যেমনটি বাল্মীকি মুনি 'মা নিষাদ : ... ' আবেগমন্ডিত কণ্ঠে শব্দ, ছন্দ, যতি ইত্যাদির তাৎপর্যে প্রকাশ করে নিজেই চমৎকৃত হয়েছিলেন।

ইয়োরোপ কেন্দ্রিক ইতিহাসই বেশ কশো বছর হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো দিনের মিশর, চিন, ইনকা-পেরু ও আজটেক-মেক্সিকো, দ্রাবিড়-সিন্ধু অববাহিকার ইতিহাস নিয়ে ভাবনা শুধু প্রত্ন-গবেষকদের বিষয় হয়ে রয়েছে। এমনি আক্কাদ-কুখের দেরও ইতিহাস। প্যাপিরাসের কিছু পারা, কিছু মাটিতে কিটনিকর্ম লিপিতে আঁচড়, ইহুদিদের ওল্ড

টেস্টামেন্টের কিছু লেখা—এমনিই রয়েছে পুরনো দিনের ইতিহাসের লিখিত রূপ। নেপোলিয়ান নাকি মিশরের রণক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদের বলেছিলেন, 'ঐ পিরামিডগুলির আসা থেকে চার হাজার বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে চেয়ে আছে'। পিরামিডগুলিকে দাসশ্রম দিয়ে তৈরি দাসেরা বীতঅশ্ম মরু অঞ্চলে বয়ে এনেছে দূরদূরান্ত থেকে পাথর। সে পাথর মাপ মতন কেটেছে। ঠিকঠাক মাপ মতন সেগুলি বসিয়েছে। একেকটি পদানত জনজাতির-নারী পুরুষ নির্বিশেষে-মানুষকে বন্দী করে দাস বানানো হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের এসোভাসে ইহুদি দাস, মুশা ও ইহুদি ঈশ্বর জেহোভার নির্দেশ নামা সব লিপিবদ্ধ রয়েছে। এক এক প্রত্নমিশরীয় শাসনতন্ত্রের উপনিবেদবাদের ফলিত চিত্র।

রোম সাম্রাজ্যর আধিপত্যর তলায় ছিল প্রাচীন জুডিয়া। এই জুডিয়া থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল খৃষ্টধর্ম। পরাধীন ইহুদি যুবক ঈশার চিন্তা এবং স্বাধীন রোমক পলের সাংগঠনিক চিন্তা এবং সমাজের তলানি দলিতদের বিনীত অভিব্যক্তি—এই দিনে মিলে জন্ম নিয়েছিল আদি খৃষ্টধর্ম। এই ধর্ম রোমেও ছিল দাসদের ধর্ম। নিপীড়িত মানুষ হয় পণিদের মতো। চাকার মতো সশস্ত্র প্রতিশব্দ করে মরে বা বাঁচে, নইলে ভারতীয় শূদ্রদের মতো, ইউরোপীয় দাস ও পরের সার্কদের মতো নিপীড়নের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করে তৃণের মতো। ঘাস পায়ে মাড়িয়ে গেলেও তা বেঁচে থাকে। ঈশা বলেছিলেন দুর্বল ও বিনীতের জন্যেই রয়েছে স্বর্গ রাজ্য। ইহজগতে যে শুদ্ধ চিত্ত ও আচরণে একদিকে ভগবানে আত্মনিবেদন অন্যদিকে বিনীত নিরহঙ্কার ও নিবেদিত দাসত্বে আত্মপরিচয় বিনষ্টি দুর্বলকে এক সময় স্বর্গ পাইয়ে দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো দাসরাও এক সময় ভাবতো এই বিনীত সারল্য খৃষ্ট সাধনা বলে। বেদনার্ত আর্ত দাসত্ব তারা ভুলকে চাইতো ঈশ্বরের করুণা মনে করে। তারা তখন গাইতো নিগ্রো স্পিরিচুয়াল, গাইতো ব্লুজ।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে, যুদ্ধে শহীদ হলে স্বর্গ পাবে।' কোরানেও বলী হয়েছে, ধর্মযুদ্ধে যে-বীর 'গাজী' হয়েছে, যে শাহাদাত পেরেছে তার জন্য রেহেস্তবাস সুনির্বাচিত হয়েই আছে। যে বিনীত জন্য বেহেস্তবাস সুনির্বাচিত হয়েই আছে। যে বিনীত 'meek' সেও যেমন, শহীদ যে হবে সেও। সবার সামনেই স্বর্গের টোপ রাখা হয়েছে। এই স্বর্গ চিন্তা, 'ওপারেতে উপবনে। কত খেলা কত জনে। এপারেতে ধূ-ধূ মরু বারি বিনারে' —এ চিন্তা প্রতিরোধী যোদ্ধাদেরতো বটেই। বিশেষ ভাবে নিবেদিত-চরিত্র দুর্বলেরই। উনিশ শতকে শারীরিক বেদনা নিরায়ের একমাত্র ওষুধ ছিল আফিম-নির্যাস। মার্কস তাই বলেছিলেন 'ধর্মমত আফিমের মতো...ধর্মমত এ পৃথিবীতে নিপীড়িতদের দীর্ঘশ্বাস...।' ঈশাতো শুধু meek হবার উপদেশই দেননি। দিয়েছিলেন দলিতদের কমিউন গড়বার প্রতিরোধী ধারণা, বলেছিলেন এমনকি, এক সময়ে নিপীড়নের

উৎসাদনে আসবেন তিনি 'তরবারি ও অগ্নি' হয়ে।' এখনকার লাতিন আমেরিকায় 'লিবারেশন থিওলজি'র অন্তঃসার ঐ 'তরবারি ও অগ্নি'র খৃষ্ট। তাঁরা রাইফেলও ধরেছেন লাতিফুন্দিয়া, খনি ইত্যাদির মালিকদের আশ্রয়দাতা মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে। যেমন ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মপথক টমাস মুনজার তাঁর বাহিনী নিয়ে অস্ত্র ধরেছিলেন নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এমনি রেনেশাঁসের সূত্রপাতে ফ্লোরেন্সে ফাক সাভারো নেলা মেদিচি পরিবারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

ইয়োরোপ কেন্দ্রিক ইতিহাসকে বহু বিদ্বান বুঝতে চান, গ্রীক-রোমক প্রাচীন সমাজ, জুডীয়-গ্রীক খৃষ্টতন্ত্র প্রভাবিত মধ্য যুগ। রেনেশাঁস, ধর্ম সংস্কার ও প্রতি-ধর্ম সংস্কার, শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মহাযুদ্ধ, উপনিবেশ-বিপ্লবের ধারা বাহিকতায়।

এক সময় গ্রীকরা আগ্রাসক পারশিকদের পরাস্ত করেছিলেন পরে রোম জয় করেছিল গ্রীসকেই। পরাস্ত গ্রীস জয় করেছিল এথেন্স-স্পার্টার বহুবিধ জ্ঞান ও শিল্প সৃষ্টি দিয়ে বিজয়ী রোমকে। আধুনিকোত্তরবাদীদের মতে দাসও কখনো প্রভুকে তার মতে আসতে বাধ্য করে। যেহেতু প্রভু দাসদের উপরে ক্রমে ক্রমে নিরঙ্কুশ নির্ভরতার চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদী রোমকেও প্রভাব করেছিল প্রাচীন গ্রীস। আবার মধ্যযুগ ভেঙে দিয়ে ইয়োরোপে রেনেশাঁস উদ্ভবের পেছনেও রয়েছে সোলোন পেরিক্লিসের এথেন্সের ইহবাদী (মানবতাবাদী) চিন্তা প্রাচীন গ্রীসের ভাস্কর্য-স্থাপত্য-সাহিত্য আদর্শ ইত্যাদি। এভাবে দুবার গ্রীস ইয়োরোপীয় ধ্যান-ধারমায় প্রভাব ফেলেছে। করেছে 'মানসিক উপনিবেশ'। এমন উপনিবেশ হওয়া অগৌরবের নয়।

শোনা যায় অগাস্টাস সীজার তাঁর বহুদেশ বিজয়কে সদাজাগর রাখার উদ্দেশ্যে ভার্জিলকে বলেছিলেন, তাঁর কল্পিত পূর্বপুরুষ ঈনিয়াসের অভিযান কাহিনী লিখতে। ভার্জিল তা লিখেওছিলেন লাতিন ভাষায়। যেমন—কালিদাস লিখেছিলেন সমুদ্রগুপ্তর ভারত সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনাবলী, রঘুবংশের মুখচ্ছদে। সেওতো উপনিবেশ বণিকের কাহিনী জানা যায়। রোম সম্রাট অক্টাভিয়াসকে নিজেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করার আকরগ্রন্থ হিসাবে ঐ বইটি ব্যবহার করবেন জেনে। তিনি বইটি পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। পোড়ানো যায়নি। এনিয়াদ ইয়োরোপীয় রোমক 'শিষ্ট' জীবনের মহাকাব্য হয়ে আছে। উপনিবেশ জয়ের মহাকাব্য হয়ে। ইলিয়াদ ও ওদিসিতো 'অশিষ্ট' আদি উপজাতীয় সমাজের, যখন ক্রনোসের বিশ্ব শাসনের নৈরাজ্য পার হয়ে জিউসের আপাত নিয়ম কানুনের অন্তর্গত হয়েছেন জননী ধরিত্রী গায়া।

হোমার-এসকিলাস-সোফোক্লেস-ইউরিপিদিস-আরিস্তফানিস-ভার্জিলদের সময়ের পর যে ইয়োরোপ, সেই ইয়োরোপ মহিমায় চিহ্নিত হয়ে আছে আলেসরি দান্তে, উইলিয়ম

সেকসপীয়র ও গুলফগাং গ্যয়টের অবদানে। এমনি বলেছেন টি.এস. এলিয়ট। এলিয়ট বলছেন "The great poets of greece and Rome, as well as the prophets of Israel, are ancestors of Europe, rather than European in the mediaeval and ueodera sense. If is because of our Common background, in the literatures of Greece, Some and Isral, that we can speak of 'European literature' at all : and the survival of European literature, ... dependion our conntinual veneration of our ancestors." [T.S. Eliot. Goethe as the Sage : on poetry and poets, p.211, বিশিষ্টতা চিহ্নিত করতে এলিয়ট ধরেছেন প্রথমে Permanennce ও Universality এবং তারপর Abundance, Amplitude and Unity. এই দান্দে, শেকসপীয়র ও গ্যয়টের যুগ বিচার করা থাক। করে খুন করা হয়েছে রে ইণ্ডিয়ানদের। রেড ইণ্ডিয়ানরা ' যা চেয়েছো তার কিছু বেশি দেবো, বেনীর সঙ্গে মাথা'র মতো না খুন হয়ে বেণীটি কাটতে দিতো না। উপনিবেশের গভর্ণর বলেছিলেন, 'এক এক রেড ইণ্ডিয়ান বিনুনি কেটে আনলে এক এক পয়সা পাবে।' 'A sou for a pigtail' সেই পয়সাপাবার জন্য উপনিবেশের ডাকাবুকোরা নির্বিচারে না হত্যা করেছে। অবশ্য ঐ 'নরে'রাতো আর খৃষ্টান ছিলনা। দান্তের সাহিত্য কৃতি অবশ্য এই অতিখৃষ্টানি সলিল করতে পারেনা। সেকসপীয়রের সবচেয়ে পরিণত বয়সের লেখা নাকি 'দ্য টেমপেস্ট'। প্রসপেরো-সিরান্দা-ফার্দিনান্দের মূল চরিত্র সেখানে। তাছাড়া আছে অশরীরী মৎসর এরিয়েল এবং অতিশরীরী ক্যালিবান। ক্যালিবান কালো। স্থূলদেহী, অবিকশিড মন ও মনন। শুধুই সে সেবক। ক্যালিবানের মা সিকোরাক্স। ক্যালিবানকে এত দেখভাল করে, কথা শিখিয়েও প্রসপেরো তাকে পুরোপুরি বশ মানাতে পারেনি। এখানে ভার্জিল হয়েছেন যেন প্রসপেরো, বিয়াত্রিচে হয়েছেন মিরান্দা। সিরান্দা কিন্তু মানুষ দেখেছে তার বাবা প্রসপেরোতে আর জন্ম জন্তুসদৃশ ক্যালিবানে। কার্দিনান্দকে দেখে সে জানলো, Man, what a beautions thing কোন মানুষ? শাদা চামড়ার। আর 'O brave New world'. এ brave new world-এ ক্যালিবানরা পৃথিবী জুড়ে থাকবে উপনিবেশের মানুষ, আর প্রসপেরোর 'অদৃশ্য' আইনের মতো এরিয়েল তাকে নানা ভাবে শাসন করবে। কিউডাল ও স্লেভ সোসাইটিতে শাসন ও শোষণ প্রদ্যক্ষ, দণ্ডধারীর চণ্ডতায় তার প্রকাশ। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুঁজির অদৃশ্য শোষণ-শাসনে মানুষের শ্রমসৃষ্ঠ সম্পদ পুঁজির মালিক 'আইন সম্মত' ভাবে পেয়ে যায়। শেকস্পীয়রের ঐ কাহিনীকে এখন ঘুরিয়ে ধরছেন আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীরা। তাঁরা বলেছেন, প্রসপেরো-কার্দিনাদ-সিরান্দাদের সমাজ সভ্য ভাবে ধরে আছে পিল সুজ হয়ে ক্যালিবানরাই। অর্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতি বিচারে প্রতিবাদী স্বর শুনছি। শেখসপীয়য়ের যুগে আফ্রিকার থেকে লুঠ করে আনা দাসদের নিয়ে জাহাজ ভিড়ছিল লিভারপুল বন্দরে। তখনতো সব মঙ্গল ভালো করতে

পারতো টাকাই। টাকার দামই হয়ে উঠছে প্রবল হয়ে তকন ক্যালিবানরাই সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের শ্রম দিয়ে। সেই সৃষ্ট সামগ্রী বাজারে বিনিময় হয়ে টাকা আনতে সক্ষম। দ্বীপে নির্বাসিত প্রসপেরোদের উপনিবেশ জোটে ক্যালিবানদের মধ্যে। যেমন রবিনসন ক্রুশের ফ্রাইডেতে। কিন্তু সভ্যসমাজে ফিরলেই ক্যালিবানের শ্রম আনতে পাবে সোনা। মানে টাকা। 'Gold ? Yellow, glittering, precionsgold? No, gods, I am no idle votarist!... Thus much of this will max block white, foul fair, wrong right, base noble, old young, coward valiant (Timon of Athens)

গ্যয়টের শীলার, বিঠোভেন প্রভৃতিকে গটফ্রিড হের্ডার বলেছিলেন, লোকজীবনে ধরা রয়েছে অজস্র মানবিক প্রতীক, লোকমুখের ভাষায় আছে জীবন্ত দিনচর্চা তা ছাড়া পূর্বদেশ—ভারত-ইরান থেকেও আনা চাই সে সব দেশের মানবচর্চার মহিমা। গ্যয়টের কাউস্টের রয়েছে প্রসপেবোর যাদুবিদ্যা নয়, বিজ্ঞান চর্চা। কাটস্টের সাধনা অমৃত উপার্জনের জন্য। সে আপন আত্মা বন্ধক রেখেছে শয়তান সেকিস্টোফেলিসেরকাউ। সে নীতিহীন ভাবে খুঁজেই নানা সুখের অভিজ্ঞতা রয়েছে মার্গারেট-গ্রেটচেনের মতো সরলা শকুন্তলা। বিয়াত্রিচে-সিরাদারা রূপ নিয়েছে স্বর্গবাসিনী (বিয়াত্রিচে), নবীন ভূস্বামীর প্রেমাসুদা (মিরান্দা)। সম্পদশালিনী হয়ে নয়। হয়েছে প্রতারিতা প্রেমিক-কর্তৃক গ্রেটচেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা অপব্যধিনী, আপন শিশুকে খুন করার অভিযোগে। স্পউস্ট এখানে শুধুই বিজ্ঞানী, তার পরানা সমাজের উপরে বিষ না অমৃত বর্ষণ করবে, সে বিষয়ে সেনিস্পৃহ। 'ends' এবং 'means' বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। 'ends'-ই সব। গায়টে দেখাতে চেয়েছেন, প্রেসময়ী সরলা মার্গারেটরাই স্বর্গে যায়—তাদের জন্যই মহৎ জীবনের সিংহদ্বার খুলে যায়। ফটেসদের জন্য নয়। কাউস্ট হলো শিল্পবিপ্লবের শয়ক নীতিহীন ও সুখলোভী বুর্জোয়া।

এই যে ইয়োরোপীয় মূল গ্রীক-ইসরাইনীয়—খৃষ্টীয় ধারা, তার বিপক্ষেই চলে যান গায়টে। রেনেশাঁসকে ছাপিয়ে গিয়েছিল যে জার্মান, ফরাসী আলোকপ্রাপ্তি—তা শেষ পর্যন্ত বৃটেনের রোমান্টিক আন্দোলন হয়ে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে। বিকশিত হয়েছে। এধারাতে বিশেষ ভাবে ফরাসীরাই বুর্জোয়া ঘৃণ্য লোভ ও লাভ পিচ্ছিল সমাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, লোভ ও লাভ পিচ্ছিল সমাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, যেমন শার্ল বোদলেয়র, যেমন আর্তুর র‍্যাবো উনিশ শতকের শেষে। বোদলেয়রতো বলেই ছিলেন, 'আমি (বুর্জোয়া) জঞ্জাল-ক্লোজ-অসুন্দর থেকে সুন্দরকে ছেঁকে নিতে চাই।' এইভাবে জন্মেছিল 'আধুনিক কবিতা'। কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশ বাংলায় যে ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিতা পৌঁছেছিল, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ভুবনের পংউজিবাদের সঙ্কট মানুষের জীবনে যা নোওতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটুকু। পৃথিবী হয়ে পড়েছিল এলিয়টের কাছে 'পরিত্যাদ

ভূমি' কবিও সেখানে রাজতন্ত্রী, অ্যাংলো-ক্যাসলিক—সে অর্থে ঔপনিবেশিকেই। এ জরা পাউণ্ড তো খোলাখুলি ক্যাসিবাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন। তবে, যুদ্ধ বিরোধিতা হিস্পানি গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে মনের যোগ রচনা ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন এক আধুনিক ধরা সৃষ্টি হয়েছিল বৃটেনে। আমাদের ভাষায় বিশ-ত্রিশ দৃশদের কয়েকজন ইংরাজি ভাষা ও পশ্চিমী সাহিত্য সজাক সাহ্যিতের অধ্যাপক, আধুনিক কবিতার পত্তন ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশরই বাঙালি সাহিত্যর প্রাপ্তবাসী ও মূলধারার পরস্পর বিরোধী চরিত্রটা ঠিক ঠাওর হয়নি। এঁদের মধ্যে স্বদেশী ভাবনা চিন্তার চেয়ে জীবিকা ও আলোকিত বৃত্তে আলাপ চারিতার প্রযোজনে যা যা ইংরাজি সাহিত্য ও মধ্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য পড়তে হতো, তাঁরা তা পড়তেন। কিছু প্রমান আছে (১৯৩১ সালে আগস্টে প্রথম প্রকাশিত) 'পরিচয়' পত্রিকায়, ইংলন্ডে কয়েকজন কবি ছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে। তাঁদের সেটা ফিজিক্যাল কবি বলা হতো। কোনো অর্থেই তাঁরা অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স চর্চা করেননি। কিন্তু তাঁরা খুব পণ্ডিত ছিলেন। লেখা লেখিতেও তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেতো। তবে, তাঁদের বইপত্র তেমন ছাপা হতো না। জন ডানের মতো কবিরও কবিতা বাছাই করে তাঁর বন্ধুরা কবির বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের চাঁদার টাকায় ছেপেছিলেন। আমাদের তিরিশের দশকের আধুনিক কবিরাও অমনি মেটাফিজিক্যাল। তাঁদের বইপত্র ঐদশকে নিজেরাই ছেপেছেন দু-তিনশো করে। অথচ এঁদের নিয়েই এখনও এত হৈ-চৈ। এ-হৈ-চৈ কেন? আসলে এঁরা আবিষ্কৃত হয়েছিলেন পশ্চিমী অর্থনৈতিক সঙ্কয়ট থেকে যে রাজনৈতিক সঙ্কট সাহিত্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি মানুষকে থাকবে তুলেছিল অর্থহীন শূন্য সেই শূন্যতার বর্ণনাকারী হিসাবে। রাষ্ট্র ও দেশে নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান, বাজারে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য চক্র অবদমন এবং সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদির দায় নিচ্ছিল। অথচ যুদ্ধের দামামা বাজছিল। ফ্যাসিবাদ নখ দাঁত বের করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল—এসময়ের সেইনমীয় অর্থনীতি ছিল সঙ্কট নিরাসয়ের তত্ত্ব। ফ্যাসিবাদ এই সঙ্কটের দায় দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কোনো কল্পিত শত্রুর (যেমন জার্মানিতে ইহুদি) ঘাড়ে চাপিয়ে, যুদ্ধের ভেতর দিয়ে উপনিবেশ বাণীবার প্রস্তুত করা হল। এসব ছিল অর্থনীতির সঙ্কটে দেশের যুদ্ধ বিষাক্ত হয়ে ওঠায় এ অঙ্গে ও অঙ্গে বিস্ফোট। আমাদের দেশ ছিল বৃটেনের উপনিবেশ। এই সঙ্কটের দায় ভারতেও এসে পড়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আধুনিক কবিতায় ভারতীয় জীবনের সঙ্কট ধরা পড়লোনা। দু একটা 'উট পাখী' কবিতায় দায় নেবার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু 'হেলেনের বুকে সোনার বাটি' দেখল তপশীরা শুধু নিরাময় ভাবলেন কেউ সেকসে, কেউ বা অনির্দেশে মানস ভ্রমণে বোধ নিয়ে খুব আর্ত হয়ে, রুশ বিপ্লবের পক্ষে 'অঙ্গে অঙ্গীকার' খুঁজে। কিন্তু লোগোপিয়া, মেলোপিয়া, ইসেজিসকে এঁরা পাঠকদের কাছে সুদূরই রেখে গেলেন। এই

বাঙালি আধুনিক ও 'মেটাফিজিক্যাল' কবিরা কার্যত দেশের জনগণের কাছে দীর্ঘ অনাদ্রিত রইলেন। এঁদের ভেতরে সংখ্যায় সবচেয়ে ফলন্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি কবিতায় এমনসব আধুনিকবার চিহ্ন ধারণ করার সুপারিশ করলেন, তার অনেকগুলি বাতিল করেছ আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে। এই ত্রিশের 'আধুনিক লক্ষ' কে একটু সরিয়ে রেখে বাঙালি কবিতার আবহমানতার কথা ভাবা যাক।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির উপর ঔপনিবেশিক চাপ বারবার এসে পড়েছে। প্রাচীন যুগে বিশেষ ভাবে আর্যীকরণ, মধ্যযুগে হিন্দি-অবধী-পারশিক চাপ এবং আধুনিক যুগে পশ্চিমী দাপট। মিথস্ক্রিয়া ঘটেচে। তবু মূল আবহামান তা বাঙালির উপনিবেশ বিরোধী মনোসঙ্গীই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব দশম শতক থেকেই। বাঙালির কৌ জীবন, নদীনালায় বিভক্ত অজস্র গ্রামে ছড়ানো সংসার যাত্রা একীকরণ করে, ভাষাকেই মূল ভিত্তি করে একটি 'জনগণের' (People) পত্তন হতে চলেছিল তখন এই বাঙালিদের বড় অংশটাই ছিল ধর্ম আচরণে নাথপন্থী বৌদ্ধ। ড. শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যর উদ্ভব ঘটেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। অর্থাৎ পদ্মা নদী বেয়ে যে দেশ যাওয়া যায়। যে অবাঙালি ভুসুকু 'বাঙালি' হয়েছিলেন, তংার একটি চর্যার দেখছি ঃ

বাজ-ণাব পাড়ী পউআঁ খালে বাহিউ ।

অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।

অর্থাৎ বজ্রখান নৌকায় পদ্মাপাড়ি দিয়েছিলেন ভুসুকু। যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃজিত হয়েছে উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতির বাহন 'রাখারই' ও 'মহাভারত', ড. শহীফুল্লাহর মতে চর্যাগুলির উদ্ভব তেমনি 'বঙ্গালে।' আর্থিকরণের বিপরীত প্রবাহ ছিল হৈ চর্যাগুলির ধারা।"

"পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা-সাহিত্য এবং নাম পন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎসেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্র দ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবত থাকে সন্দীপ বলে। ৬৫৭ নেপালে উপস্থিত হন।... মৎসেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জানু পা, কুচ্ছুরী পা, ডোম্বী, সরহ শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচার্য চর্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্বপদের শেষে ভণিতা। (নীচে দাগ উদ্ধৃত কারের) যেমন ধরুন।

সরহ ভঁণন্তি বর সুত্র গোহালী কি সো দুঠ বলদেঁ।

একেলে জগা নাসিঅ রে বিহরঙ্গে সুচ্ছন্দে।

'এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতি যায়। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে। **সমস্ত মহাজন পদাবলী চর্যাগীতির বৈষ্ণব সংস্করণ**। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতির রীতি পঞ্জাবি পর্যন্ত উত্তর ভারতের পরমার্থিক গানে চলতে তাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারশ্যে যায়। **পারসী গজল আরবীর অর্নুকরণে নয়। তা চর্যাগীতিরই অনুকরণে।** আবরীতে ক্লসিদা আছে গজল নাই।

ত্রিপুরার মেহেরকূলের রাজা গোপীচন্দ্র গুরু জালন্ধরী পা-র নিকট নাথপন্থে দীক্ষিত হয়ে বৈরাগী হয়ে যান। নাথপন্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যান ভারতময় বিভিন্ন ভাষার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, ভাষণ ১৯৪৮ ডিসেম্বর)

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতির একটিই লক্ষ, উত্তরভারতের আর্থিকরণের ধারার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবাসী বাঙালির বিপরীত ধারা সৃজন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, উপনিষদের যদি কোনো আর্থিকরণের **ঔপনিবেশিক** ভূমিকা থাকে। এই **প্রতিধারাটি** তার বিরুদ্ধে উপনিবেশ-বিনাশক ধারা। শুধু তাই নয়। বিভিন্ন দেশের লোক উপাসনা ও লোকপ্রেমগীতির ভনিতায় রয়েছে ব্যক্তিস্রষ্টার নাম। এইটিকে আমরা ব্রাহ্মন্য জাত পাঁত বর্মধর্ম আশ্রমধর্ম বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপরীতে, ঔপনিবেশিকের বিপরীতে লোক প্রতিরক্ষা ও লোক প্রতি আক্রমণ বলছি। পাণিদের ধারা বলছি। জুলুবিদ্রোহের ধারা বলছি। রঘুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা বহিত্র নিয়ে লড়াই করেছিলেন, কাশ্মীরে পরিহাস কেশব মন্দির যারা ভেঙেছিলেন পদের রাজার সঙ্গে কাশ্মীররাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্ধিশর্ত ভাঙবার জন্য—যেমনটি রাজতরাঙ্গীলীতে রয়েছে। এঁরা সবাই সমাজের সাধারণ মানুষ, ভারতীয় উচ্চবর্গের চোখে হীন, পক্ষীর ভাষায় যারা কথা বলে, অক্ষরের আড়ম্বর অক্ষরভম্বর গৌড়ীয় রীতিতে রয়েছে, পাণ্ডববর্ণিত তাদের দেশ, সেই প্রান্তদেশ বঙ্গ, সাবালটার্নদের দেশ। এই সাবালটার্ন বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ, বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে আদি বামপন্থা বলব। শিষ্ট সমাজের, ব্রহ্মাচর্চার শয়ভদের লক্ষ্য ছিল "বেদাধ্যয়ণ, ব্রতানুষ্ঠান (মধু সংসাদিবর্জন) সায়ং প্রাতঃকালে হোমালুষ্ঠান, বেদত্রয় অধয়ন, দেবলোক ঋষিলোক পিতৃলোকের তর্পণ, গার্হস্থাশ্রমে অপত্যোৎপাদন। পঞ্চমহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোস প্রভৃতি অপরাপর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাতে এই দেহান্তর্লীন আত্মা ব্রহ্মপদ লাভের উপযুক্ত হয়।" ৮ - মনুসংহিতা-দ্বিতীয়খণ্ড। এই ব্রহ্মপদ লাভ, পুরুষ প্রকৃতি বিচারে 'বেদাহসেতদ পুরুষ'। মহান্তন কিন্তু বঙ্গভূমি ছিল দেবী উপাসক। প্রকৃতি বলতে শুধু নারীশক্তিই বোঝায় না, প্রজাসক্তিও বোঝায়। তাই বলছিলাম বঙ্গীয় ধর্মপ্রতিক্রিয়া যা আদি বৈষ্ণব, সাক্ত প্রভৃতি ধর্মে দেখছি, অজস্র লোকধর্মে যা দেখছি—নারী শক্তি উপাসনাই সেখানে প্রধান। বৈষ্ণব মহাজনপদ, শাক্তমালশী এবং বাউল ও নানা সহজিয়া ধর্মের গান—প্রথার চেয়ে সমষ্টি আচরণ ও গানকেই বড় করে তুলেছিল। এমনকি মুসলিম ধর্মও বঙ্গদেশে

মারকাত সুফি পীরপন্থী। সুফীধর্মও প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতাকেন্দ্র আল্লাহর তুলনায় প্রেমময় খোদার কাছে আত্ম নিবেদনে অলঙ্কৃত। বাঙালি কাব্য ছন্দে ছড়ার চন্দ বা স্বরবৃত্ত শূদ্রছন্দ। অক্ষরবৃত্ত পয়ার ব্রাহ্মণছন্দ। বাঙালি রমনীকূল। গ্রামের চাষা ভূষা ও সমাজের নিম্নবর্গীয় অংশগুলি নিত্যব্যবহৃত জ্ঞান ভাষ্যে স্বরবৃত্ত ব্যবহার করে। বাঙালির রাম একান্ত বাঙালিই। এমনি মহাভারতের নায়ক-নায়িকারাও। এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লেখেন যখন 'তেল বিনা কৈনু স্নান উদক করিনু পান, শিশু কাঁদে ওদনের তবে'—তখন ঔপনিবেশিক নিপীড়নের চিত্র পাই। প্রসঙ্গত ভাসান গানের লক্ষ্য বলা যেতে পারে, লোকদেবীকে স্বর্গের প্রথম শ্রেণীর দেবদেবীদের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠা। অধ্যক্ষ সাবলিহীন দেবদেবীর এমত প্রতিষ্ঠা প্রায় সবগুলি মঙ্গলকাব্যেরই মূল বিষয়। এমনি চরিত সাহিত্য ও প্রথা অনুসারী পাষণ্ডীদের ভূমিকার বিরুদ্ধে, এবং প্রবল কেন্দ্রীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 'তৃণাদপি সুনীচেন তবোধর সহিষ্ণুন্না হওয়ার তত্ত্ব দিয়েছেন চৈতন্যদেব। যেন খ্রীষ্টীয় বিনয়।

আমাদেরতো মনে হয়, গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে যাকে রেনেশাঁস বলা হয়, সেই কাল জুড়ে প্রতিবাদের সাহিত্যই জন্মেছে। স্বদেশ অভিমান কি ইংরাজি কি বাংলায় ভাবাষাতেই বাঙালিরা কবিতা লিকুক না কেন, তা ছিল ইংরেজকে বা পশ্চিমকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। ডিরোজিও, তরু দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র রঙ্গলাল এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ এমনিই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে শিলাইদহে বাউল লোকগীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেই বদলে গেছেন। ১৯৩০ সালের অক্সফোর্ডের হিবার্ট বক্তৃতায়' মানুষের ধর্ম' নিয়ে বলতে গিয়ে লালন ও হাছন রাজার গান উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পত্রপুটের একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'আমি ব্রাত্য' বলে।

এই উপনিবেশ বিরোধী বিস্তৃত প্রবাহে স্বচ্ছ ধারা এসে মিশেছে। হাজী নজরুল ইসলাম বিপ্লবী কণ্ঠস্বর তাতে যোগ করেছিলেন। চল্লিশ দশকে এই বাঙালি মূলধারায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অন্তর্বর্তী সময়ে রামধনু। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরো অনেকে।

পঞ্চাশের দশকে বিশেষভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ছাপ এসে পড়েছিল পশ্চিমের নানা অনুবাদ এবং কিছু কিছু ভিন্নতর কাব্যবোধ বাংলা কবিতায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলে। ও বাংলায় আবার ইসলামিকরণ ও বাংলাভাষা উৎপাদনের চেষ্টা চলে। এসবের বিপক্ষে কবিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছিল এবং তারা ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল—যার পরিণতি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা দেশ অর্জন। যে অঞ্চল নিয়ে একদা ছিল ভুসুকুর

বঙ্গাল—ড. মহীদুল্লাহ সেই বাঙ্গীলদেশকেই ১১৪০ সালে স্বাধীন দেশ বলে মন্তব্য করেছিলেন। এদেশে পরিবর্তনের করানোর প্রচেষ্টা পথটি ছিল ভিন্ন। বেদলেয়রকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েই, বিকৃত অর্থে, যৌন অভিব্যক্তির মূল হিসাবে। রিলাকেও অনুবাদ করা হয়ে জন বিযুক্ত রূপ সন্ধানী কবি বলেই। এমন কি ক্যাসিও নাৎসী গটফ্রিড বেনকেও এরাজ্যে পরিচিত করার চেষ্টা চলে। অর্থাৎ কি ভাবে বাংলা কবিতার মূল ধারা থেকে কবিদের সরিয়ে নিয়ে সঙ্কীর্ণ মজা খাতে তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে। ইরাকে বোমা পড়ে, সিয়াটেল—জেনোয়ায় মানুষ প্রতিবাদ করে, নানা ধর্মীয় লাঞ্ছনা চলে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ গুজরাট উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্রে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিজ্ঞানহীন বিষয়কে বিজ্ঞান বলে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়, বহুভাবে গো-বলয়ের মূল ধর্ম ও দর্শনের ধারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ঘাত ঘটাতে চায় যখন—আমাদের তরুণ কবিরা অনেকেই এসব না বুঝে, হাল্কা চালে তখন পদ্য লিকছেন, বিষয় একটাই—দুর্বল ও সহহায় এক পুরুষ বা নারী বিপরীত লিঙ্গকে প্রত্যাশা করে ব্যর্থ হয়েছে। তবু মূলধারাটি প্রতিবাদী। বামপন্থীই থেকে গেছে। শুধু রাজনীতি নয়। সংস্কৃতিতেও এবাংলায় বাসাস্থাই এখনো মূল বিষয়। কেউ যদি সদর্থক ভাবে সমালোচনা করে। তার কোথায় কোথায় রয়েছে ব্যর্থতা, তাতে বাংলা কবিতার অবস্থান উপনিবেশ বিরোধিতা সমালোচিত হয় না। সমালোচিত হয় অসিধারা ব্রতে নিযুক্ত কবিদের যারা পথ ভ্রষ্ট করে। তাঁদের চারিত্রে চ্যুতি ঘটাতে চায় যারা, তারাই।

'চিলেকোঠার উন্মাদিনী' ঃ নব্য নারীর কলমে

ঝর্ণা সান্যাল

'তাহলে প্রথমে সব ছোট ছোট কথাদের লিখি।
ছোট ছোট জিনিষের কথা। .....'

যে সব 'ছোট ছোট কথা' এতকাল প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল, উত্তর আধুনিকতার উন্মুক্ত পরিবেশ আজ তাদের আত্মপ্রকাশ। আজ নিম্নবর্গের — নারীর, দলিতের, প্রান্তবাসীর কথা —, সব কথাই আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের কথা। সে কথা অনভ্যস্ত শ্রবণে পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই।

'দেশ' পত্রিকার ২৭শে মার্চ, ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিলেকোঠার উন্মাদিনী' এমনই একটি কথা, যার বিষয় 'নারীসখ্য'। কবিতাটি কেন্দ্র করে উত্তর আধুনিক নন্দনতত্ত্বের দুটি দিক নিয়ে আমার আলোচনা (প্রবন্ধ নয় - কারণ বাংলা সাহিত্যে এই ভাবনা এখনও এত সংহত হয়নি যে প্রবন্ধের দাবী মেটাতে পারে) ঃ পাঠের আন্তগ্রন্থি বা Intertextuality এবং শব্দের/অর্থের বহুমাত্রিকতা বা তার অনন্ত দ্যোতনা।

আন্তগ্রন্থি ঃ কবিতাটির নাম আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ The Mad Woman in Alice Walken he color purple (1979) এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ। ১৯শ শতক থেকেই ইংরেজী কবিতা বাংলা কবিতাকে অণুপ্রাণিত, সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বিদেশী সমালোচনা গ্রন্থের নামে যখন কবিতার নামকরণ হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গ্রন্থটির তাত্ত্বিক ভঙ্গী সংযুক্তার কবিতার বক্তব্যকে সংহত করতে সাহায্য করেছে, সেই সঙ্গে কবিতাটিকে বাংলা কবিতার অঙ্গণ থেকে একটি বৃহত্তর পরম্পরায় স্থাপিত করেছে। বাংলার কাব্যপরম্পরার ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে কবিতাটি আন্তর্জাতিক নারীকথার ভুবনে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছে।

The Mad Woman in the Aliic এর আলোচ্য বিষয় ১৯শ শতকের ইংরেজ ও আমেরিকান লেখিকাদের সাহিত্য কল্পনা। স্যান্ড্রা এম শিলবার্ট ও সুসান গুবার, এই গ্রন্থটির দুই লেখিকা, ১৯শ শতকের কিছু বিখ্যাত উপন্যাস, কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ঐ সময়ের পরিমণ্ডলের সামাজিক নির্মাণে, পিতৃতান্ত্রিক অবরোধের ঘেরাটোপে নারীর মুক্তিবাসনা, আশা, যৌনচেতনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা, এমন কি তার সৃষ্টিশীলতা — সামাজিক বিচারে যা অ'স্বাভাবিক', অ-'সামাজিক', ডাকিনীসুলভ — তা প্রকাশিত হয়েছে এক দ্বৈতসত্তার

কল্পনায়। প্রথম সত্তাটি 'স্বাভাবিক', 'সামাজিক', 'সাংসারিক' যেমন শার্লট ব্রন্টের 'জেল ত্রয়ার' উপন্যাসের নায়িকা জেন এবং তার 'অন্ধকার' দ্বৈত সত্তাটি ক্যারিবিয়ান মেয়ে বার্থা, যে চিলেকোঠায় বন্দিনী উন্মাদিনী, অ'স্বাভাবিক', অ'সামাজিক', অ'সাংসারিক', সমাজে তার জায়গা নেই — অতএব একদিন বাড়ীতে আগুন লাগলে বার্থা পুড়ে মরে।

এই গ্রন্থটির আরো একটি রচনা, ক্রিষ্টিনা রসেটির কবিতা 'গবলিন্ মার্কেট' যা এখনও শিশুপাঠ্য হিসেবে কবিতা সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত। এটি দুটি বোনের গল্প ঃ একজন চপল, প্রলোভনে দুর্বল, নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ পাবার জন্য প্রায় উন্মাদিনী, অন্যজন তার বোন, যে নিজে প্রায় ধর্ষিতা হয়ে তার বোনকে সর্বনাশের পথ থেকে সরিয়ে আনে। কবিতাটির শেষ লাইন কটি উদ্বৃত করছি ঃ

"For there is no friend liek a sister

In calm an stormy weathers;

To cheer one on the tedious way,

To fetch one if one goes astrary,

To lift one if one totters down

To strengthen whilst one stand."

সংযুক্তার কবিতায় এই পুড়ে মরা এবং ভগ্নী / সখীর হাত ধরে বাঁচার সম্ভাবনা — এই দুই ভাবনাই আছে। যে তন্ত্রে পুরুষ 'প্রভু' যেখানে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে, প্রতিরোধের চিন্তা আছে যেমন মল্লিকা সেনগুপ্ত বা কৃষ্ণাবসুদের মত কবির কবিতায়। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে 'মনোচিত্রিত স্বামী শব্দটি অতি আশালীন,' তাঁর প্রার্থনা 'বন্ধুকে দাও বন্ধুর হাত' (দেশ, ১৮ জুন, ২০০১)। 'পুরুষবন্ধুটি যাতে সংসারের প্রভু হয়ে না — বসে কখনও, সেই বর দাও', লিখছেন সংযুক্তা ('নাচ', ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা)। একই আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা ভারতীয় নারীদের লেখা ইংরেজী কবিতায়, সরোজিনী নাইডু, কমলা দাশের কোন কোন রচনায়।

নারীসখ্য এই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মনে হয়েছে সংযুক্তার মত হয়তো আরো কারুরএর মধ্যে তাঁরা দেখেছেন প্রতিষেধকের সম্ভাবনা, ক্রিষ্টিনার রসেটির ভাষায় 'fiery antidate' (গবলিন্ মার্কেট)।

সময়ের মানচিত্র ঃ 'কথা'র অবস্থান / চরিত্র

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত চিলেকোঠার উন্মাদিনীর কথা, যার কথক 'আমি' পরিচয়ে এক মানবী-ব্যক্তিত্ব। কথার শুরু - 'তাহলে দিয়ে, — যেন হঠাৎ কোন সংলাপের মাঝখাণে থেকে শুনতে পেলাম নারীর সেই কথা যা যুগ যুগ ধরে নৈঃশব্দে প্রবাহিত

হচ্ছিল, যা শব্দে ব্যক্ত হলো তখনই যখন 'অক্ষরহীনা' পা রাখলো শব্দের শরীরে 'তাহলে' সেই সময় - চিহ্ন ঃ অচেতন আর সচেতন সময়ের মধ্যে, অব্যক্ত আর ব্যক্ত কথার মধ্যে একটা 'হাইফেন'।

১৯শ শতকে বাংলায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বাসনা ও আগ্রহ, তার যৌনচেতনা, তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস প্রতিবিম্বিত কবিতার অবয়বে। একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত কবিতাটির প্রতি-কথা চরিত্র ঃ পিতৃতান্ত্রিক 'প্রভু-বাক্য' এককাল রূপকথা, লোককথায় বলেছে ডাইনী, রাক্ষসী, সৎমা, সর্পিণী নারীর কথা ('আমার দ্বিধার জিভ থেকে ঝরা আলোক কুয়াশার রূপকথা/আড়ি পেতে শুনে নিয়ে পৃথিবীতে ছড়ায়েছে চারণ পুরুষ', 'কথা', ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা'। এরই উত্তরে আজ এই 'ছোট ছোট কথা'।

সেই অস্ফুট সময়ের আপাত তুচ্ছ, ছোট, 'গুঁড়ো গুঁড়ো' কথা, প্রায় অ-দৃশ্য 'পিঁপড়ে অক্ষরে dispesable কাগজকুমলে লেখা স্বীকারোক্তি, রোজনামচা, অ'দৃশ্য' বা অ-'পাঠ্য' হলেও মৃত নয়। সে কথা 'শীতঘুম' শেষ করে সঠিক ঋতুতে প্রাণবন্ত হওয়ার প্রতীক্ষায়। মেয়েদের সেই সব কথা 'আজ হঠাৎ' অতীত থেকে ভেসে আসে বর্তমানের জগতে ।

সময়ের তিনটি ক্ষেত্রকে কবি বুনে দিয়েছেন সুকৌশলেঃ বর্তমানের দর্পণে অতীত প্রতিবিম্বিত তার 'অতীতত্ব' নিয়ে ; বর্তমানের —যা অতীতের ভবিষ্যৎ—স্বীকৃতির আশায় ('তোমরা আমাদের চিনবে না ?') বর্তমানের সচেতন সময় সেই অতীতের কথাকে পুনরুদ্ধার করেছে : সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণ শুরু হয়েছে নিম্নবর্গের দৃষ্টিতে ; পিতৃতন্ত্রের সমাজরক্ষকদের পাপপুণ্যের বিচার কর্তাদের মুখোশের নীচে উদঘাটিত 'জল্লাদ' এর মুখ।

ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে, লোককথার ঢঙে, কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, অনুষঙ্গে, উপমায়, রূপকে কবি দুটি 'অকাল বিধবা' পিসি ভাইঝির বঞ্চিত জীবনের আবরুদ্ধ বাসনা, কামনা, আকাঙ্খার আভাস দিয়েছেন, —যার কথা অনবদ্য ভাবে প্রকাশ করেছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বৈধব্য সংক্রান্ত ছোটগল্পে, বিশেষ করে 'বাসনার নেশা' বা নেশা'র মত গল্পে, আশালতা সেন বলেছেন তাঁর কবিতায় এই 'অকাল বিধবা পিসি ভাইঝির 'বরফজীবনে' 'গ্রীষ্মের দুপুর' আছে, আছে চিলেকোঠার নিভৃতি : তারা মনের কথা বলে, পরস্পরের কাছাকাছি আসে :

অকাল মানে যে ঘোর গ্রীষ্মের দুপুর, একাদশী—

তুমি তো জানতে সব, কেন আগে বলে দাওনি পিসি ?

তোমার গায়ের ঠাণ্ডা, তোমার বুকের ঠাণ্ডাখানি

সেই গায়ে জড়িয়েছি, শুনেছ বুকের ধক্‌ধকানি।

গল্পটি নারীর 'চূণ খয়েরের গণ্ডী' লঙ্ঘনের, 'আঁশবটির পাহারা' ফাঁকি দেওয়ার শাস্তির কথা ঃ অবধারিত ভাবেই যেন ইতিহাস আর পুরাণকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে কবিতার প্রথম লাইনে সীতার প্রসঙ্গে।

দুটি নারীর শরীরীচেতনা—'আমি কি শুধুই একা ? অক্ষরহীণার স্তব্ধ প্রাণে / শরীর লেগে যে কী কী ডাক ওঠে, দুপুরই তা জানে'—। সাক্ষর ভাইঝি এর পরেও 'শব্দের শরীর' নিয়ে মেলা করে। যে অভিজ্ঞতা 'ডাইনী গোপণতা'য় হারিয়ে যাওয়ার কথা তাকে সে লিপিবদ্ধ করে, —এও যেন আর এক নেশা ('না লিখে পারিনা, পিসি ....)। নারীশরীর আর শব্দের শরীর যেন এক বীণার ঝঙ্কার ('সরস্বতী অক্ষর না জেনে/নিজে যদি নিজেকে বাজান/দেবীমূর্তি ঝোলাও দড়িতে/বীণা ভেঙে করো খান্ খান্)। সুতরাং, সমাজের উচ্চারণ—'এক পাপে কুথোয়ণি ওদের /লিখতে শেখা আরও এক পাপ'।

পাপের বেতন মৃত্যু : ডাইনি সন্দেহে খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা যেমন এক সময় পুড়িয়ে মেরেছে অনেক অ-'স্বাভাবিক' মেয়েকে তেমনি 'শুধু তোমাকেই নয়, পিসি/কথাকেও পুড়িয়েয়ে ওরা /জীবনে, জীবন-বিবৃতিতে/আছে নিষেধাজ্ঞা জারী করা।' আবার ক্ষেত্রান্তরে, ভিন্ন stage setting এও একই ঘাতকের আবির্ভাব : '.... গায়ে থুতু দিয়ে/জল্লাদ পশুকে টেনে আনে/পশুর পরণে সাদা থান/চোখে জল নেই, শুধু ধোঁয়া/ভরহীন মাথা হাঁড়িকাঠে/মাথাভরা কদম্বের রোঁয়া ....'।

এর পরের কথা : ছোট ছোট কথা জমতে জমতে ইস্তেহার হয়ে ওঠার কাহিনী ; 'ভীষণ উন্মাদাগার থেকে/ কোনমতে পালিয়ে এসেছি/কাগজকুড়ুনি সেজে আজ/লিখে রাখ্ছি চোরা ইস্তেহার'। ইংরেজী আমেরিকান বা ইউরোপীয়ান সাহিত্যে যে female-friendship, sisterhood-এর ভাবনা সেই নারীসখ্যের বা নারীসংহতির আহ্বান এই 'গুপ্ত ইস্তেহারে'—এ আহ্বান সব নিগৃহীতাকে :

যে তোমাকে কয়েকটি কড়িতে
বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা
যে তুমি প্রভুর মারে ম'রে
উপপত্নী থেকে হলে দাসী
আর যে-তুমি ঠিক আমার মতো
দু'চোখে লুকোনো রক্ত ভরে
এক গাড়ি লোকের সামনেই
হাত থেকে রুমাল খসে গেলে

ভ্যাবাকান্ত হয়ে বসে আছ

আর যে-তুমি ঠিক আমার মতো

প্রতিরাতে মৃত্যু বেছে নিয়ে

রোজ সকালে পুনরুত্থিতা —

নারীজীবনের এই সব বি-সম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সব ছন্দ, সব প্রতিষ্ঠান অর্থহীন : 'আজ আমি থুথু ফেলব/সব আলো আর উৎসবের গায়ে /যেখানে ফ্লুরোসেন্ট হরফে লেখা থাকে/বিবাহার্থী আর উদ্যোক্তাদের নাম'

অতীতের এই বঞ্চিত নারীরাই—'যারা মেঘ দেখবে বলে মাটি খুঁড়ে জল আনতে গিয়েছিলো—আজকের নিগৃহীতা মেয়েদের 'প্রত্নমাতামহী'। কবিতাটির প্রান্তিক প্রশ্নে 'তোমরা আমাদের চিনবে না ? — উত্তরআধুনিকতার সংশয় ও বিপন্নতার আভাস, কিন্তু দাবীর দৃঢ় স্বরক্ষেপণে উচ্চাকিত।

এই কবিতাটি তাই গন্তব্যে পৌঁছে শেষ হয় না—গন্তব্যে পৌঁছোয়-না,—তার সন্ধানে বা প্রতীক্ষায় থাকে ঃ 'হাওয়া একটু তীব্র বইলে, আলো স্বচ্ছ হলে/জাগে দ্বীপ, সে-করুণ খোঁজা লেসবস্।'

এই কবিতা-কথা দু'টি স্থানোল্কে বিস্তৃত : শুরুর চিলেকোঠা' এবং শেষের 'লেস্বস্'—দুটিই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ ঃ একটি বন্দীদশার, উন্মাদাগারের ; অপরটি মুক্তির, শুশ্রূষালয়ের ।

পুরোনো দ্বীপ /না নতুন দ্বীপমালা : শব্দের বহুমাত্রিকতা :

কবিতাটির শুরু তার নামকরণের বিদেশী অনুষঙ্গে, শেষও তাই গ্রীস্মের লেস্বস দ্বীপের উল্লেখে। এই দ্বীপের সঙ্গে জড়িত কবি, বীণাবাদিনী, সঙ্গীতজ্ঞা, আফ্রোদিতি পূজারিণী স্যাফোর নাম। এই স্থান ও পাত্রীর নাম থেকে এসেছে ইংরেজী 'lesbian' ও 'sapphic' শব্দ দুটি — নারীপ্রেমিক নারী বা 'woman loving woman' অর্থে।

ইংরেজীতে এই শব্দদুটির, বিশেষ করে 'lesbian' শব্দটির (যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'সমকামী' বলে) একটি সাধারণীকরণ বা অতিসরলীকরণ করা হয় যদি শুধুমাত্র দেহজ আকর্ষণ সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্যাফোর লেখায় একটি মায়াময়তা, আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ ছিলো। তাঁর লেখা বলে যে একটি কবিতা পাওয়া যায় তা ভাষান্তরে এ রকম :

Come to me now again, deliver one from

> the appressive anxieties ; fulfill all that my heart longs to fulfill, and you yourself will be my fellow fighter.

'সহযোদ্ধা' এখানে প্রতিরোধের ভাষা। স্যাফোর লেস্‌বস্ এক প্রতীকী অর্থে 'an island of artistic perfection where lovers of ancient beauty ... may yet find foothold and ... dream of yet unexplored continents and realms of future artistic achievement :

উত্তরসুরী কবির কাছে স্যাফো 'Sister - mother/free souled, fire hearted'. আমেরিকান কবি এ্যাড্রিয়ান রিচ্ তাঁর কবিতায় জুডাইক ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, সংস্কারের সঙ্গে মিশেছে নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। ফরাসিনী জর্জ স্যাণ্ড নারীর কামনাকে স্থাপন করেছেন বন্ধুত্বের বৃহত্তর আঙিনায়, কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে লেস্‌বিয়ানিজমের যে একটি সামাজিক, আধ্যাত্মিক দিক আছে — তা বহু যুগ ধরে চেপে রাখা হয়েছে। আর এক ফরাসী কবি কোলেত্ তাঁর lesbian প্রতিমাগুলিকে নির্মাণ করেছেন বোদলেফার এর 'femme demnee' বা 'demned woman' এর প্রতিরূপ হিসাবে। তাঁর কাছে নারীসখ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার "healing effect its maternal overtone which functions as an antidote to man's harsh treatment of women.'

পরিশেষে ঃ বাংলার মুখ

ঐতিহাসিক বা ধারবাহিক ভাবে বিশেষ কিছু দেখে উঠতে পারিনি। তবে তবে ভিন্ন ব্যঞ্জণায় তিনটি উদাহরণ at random হাজির করতে পারি বিচারের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ : 'স্ত্রীর পত্র' — মৃণালের জবানীতে, "আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙ্‌লো তখন ওকে আর এক পেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে, ভালোবাসার এমন মূর্তিতে সংসারে দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, জেন ও মেয়েপুরুষের মধ্যে .... আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ মিটতো না।' জীবনানন্দ ঃ 'কল্যাণী', নবম পরিচ্ছেদে কল্যাণী ও মিনুর অন্তরঙ্গ কথোপকথন। 'দেশ' পত্রিকার ২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৮, 'জীবনানন্দ ১' সংখ্যায় ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ২৯শে মে, ১৯৯৯ সংখ্যায় এক পাঠক 'বিস্ময়ে হতবাক' হয়ে লেখেন 'এখনকার কোন লেখক এই ধরণের কথোপকথন লিখ্‌লে তাঁকে লেখায় সমকামিতা প্রদর্শনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত।' চিঠিটির সম্পাদকীয় শিরোনাম—'কল্যাণী আর মিনু—ওরা কি সমকামী ?' (এই চিঠির এবং

শিরোনামে ব্যবহৃত, সাধারণ প্রচলিত 'সমকামী' শব্দটি ইংরেজী homosexual বা same sex love-এর অনুবাদ বলে —আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত —'লেস্‌বস্‌' শব্দের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনারহিত। একারণে আমি 'নারীসখ্য' কথাটি ব্যবহার করছি 'সমকামী'র পরিবর্তে।)

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, 'দেশ' ৪ এপ্রিল ২০০১ এ প্রকাশিত যশোধরা রায়চৌধুরীর 'দুই বোন'। এমন একটি সুন্দর কবিতা সবটা উদ্ধৃত করতে পারলে খুশী হতাম ; পাঠককে অনুরোধ করবো পড়তে। শেষ লাইন দুটি উদ্ধৃত করছি 'তবে কি গোপনে দিদির সঙ্গে আমারই / প্রেম ছিলো কোনও একদিন, কেউ জানিনি ?'

তিনটি উদাহরণে নারীসাম্যর তিনটি ব্যঞ্জনা, 'চিলেকোঠার উন্মাদিনী তার আন্তগ্রন্থিক, বহুমাত্রিক চরিত্র নিয়ে, ইতিহাস, পুরাণ ব্যবহার করে নারীসাম্যর/সংহতির আরো একটি দ্যোতনা সংযোজন করেছে।

ভারতে, দীপা মেহেতা প্রযোজিত, শাবানা আজ্‌মী অভিনীত 'ফায়ার' (১৯৯৮) ছবিটি এ প্রসঙ্গকে প্রকাশ্য প্রতকোর /বিতর্কের বিষয় করে তুলেছে,—সে ছবির ব্যঞ্জনাও ভিন্নতর। পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের negotiation ও power relation এর বিপর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত, পরিবর্তিত, বিস্তৃত হবে নারীসাম্যের সংজ্ঞা।

কবিতাই তো সংস্কৃতির এক চিহ্ন ঃ আরো হয়তো কবিতা লেখা হবে, হয়তো বা কেউ লিখ্‌বেন অশোকবনে সীতা সরমার সখ্য নিয়ে।

কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা ঃ

বাণী রায় ঃ স্যাফো

সংযুক্ত বন্ধোপাধ্যায় ঃ ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা ; আরব্য উপন্যাসের বা মেয়েদের ব্রতকতা ; অবিদ্যা।

রমা ঘোষ ঃ কালো মেয়ের ডানা ; জলের উদ্ভিদ।

Gilbert & Guber : Mad Woman in the Attic : The Woman writer and the Nineteenth Century Imagination (1979)

Taderman, Lilian : Surpassing the Love of Men : Romantic friendship and Love between Woman from Renaissance to Present 1981.

অস্তিত্বের সংকট ঃ কবিতার সংকট

রাম বসু

অস্তিত্বের সংকট বলতে আদি কবির বিস্ময়ের কথা মনে পড়ে যায়. সময়ের তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে বিস্ময় তাঁকে বিদ্ধ করেছিল। এই প্রসারিত বিশ্বে তিনি নিজের পরিচয় জানতে চান তখন প্রশ্ন সেই আইডেনটিটির, আত্ম আবিষ্কারের, নিজেকে চেনা ও জানার। শুধু কবির নয়, এ সেই নিখাদ সমস্ত মানুষের প্রশ্ন কে আমি? কেন আমি? কোথায় আমি? উত্তর পেতেই হবে বাঁচার জন্য। এই উত্তর বিজ্ঞানের অথবা অধিবিদ্যার আওতায় নেই। এর উত্তর খুঁজতে হয় অভিজ্ঞতায় পুড়তে পুড়তে নিজেকে পোড়াতে পোড়াতে। যে যার মতো উত্তর খুঁজে পেতে চায় তার সত্তার পূর্ণতার জন্য। এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন আমার ভাল-লাগা এবং আমার যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবিকে। তাঁর নাম পাবলো নেরুদা। "Solitude and multitude will go on being the primary obligations of the poet in our time. In solitude, the bottle of The surf on the Chileon coast made my life richer. I was intrigued by and loved the pasoiowately bottling waters and the roche they bottled against, the teeming occan of life, the impecable formation of the "wandering birds," the splender of the sea's foam".

কিন্তু এই পর্যন্ত যদি হতো তবে বলা যেত ঐ তো শুদ্ধ নিসর্গ প্রেম। এটুকু হলে আমি বলতাম, - এতো নিসর্গ নয়। মৃত নিসর্গের স্তুতি। নিসর্গ তখনই প্রকৃত নিসর্গ হয়ে ওঠে যখন সে যুক্ত হয় বাস্তব মানুষের বাস্তব সংগ্রামে। নিসর্গ এবং মানুষ, এই যে দুটি আপাত পৃথক অস্তিত্ব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক এবং এতেও বিভিন্ন হয়ে অন্য মহিমায় দৃপ্ত। তাই ঠিক তার পরের অনুচ্ছেদে নেরুদা বলেন ঃ "But I learned much more by the luge tide of lives, from the tenderner I Saw in thousands of eyes wataching me together. This masage may not come to all poets, but anyone who has felt it will keep it in his heart, will work it into his poems." (Memoirs, Pable Neruda, A condor Book, Souvenir press, (E & A) ltd. 1977, P-335-6)

এই আমি, একও অনন্য। যুক্ত বিশ্বের সঙ্গে এবং ফলত, সে নিত্য জীবনের স্ফীত স্রোতের মত্ততায়।

আমি মানুষ এবং কবি। আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিই মানুষ এবং পৃথিবীকে এবং চির অতৃপ্তির আশ্লেষে তাকে আবার শুষে নিই। এই মানুষটি সামাজিক মানুষ। বিশেষ আর্থ-সামাজিক

পরিস্থিতিতে আছে তার সক্রিয় ভূমিকা। তাই বিচার বিশ্লেষণের মাপকাঠিও বাস্তব। সে শুধু অহং নয়। এই মানুষ নায়ক বা Subject। সে বেঁচে থাকে নিজস্ব শক্তির জোরে, বাঁচার তাগিদে, এটাই তার 'Subjectivity of objective power' Economic and Philosophic Manvoeript-এ মার্কস খুবই শিল্পীত ভাবে কথাটা বলেছেন-Man as an objective sentient being is a suffering being and since he fals his suffering, or passidnate being. Passion is man's faculties striving to altoin their objects (ঐ, মস্কো পৃ ১৫৭) কিন্তু মানুষ পাথর নয়। অন্য মানুষ তার "নীড"। সে সেন সুয়াস। To be Sensous is to suffor এই আছি, আমার অস্তিত্ব, অস্তিবাদীদের মতো নিছক আত্মসচেতনতা এবং ক্ষণ ভঙ্গুরতার আত্মসচেতনতা নয়। এই অস্তিত্ব সার্বিক সামাজিক বা সোস্যাল ম্যবান-এর অস্তিত্ব। মার্কসের মানব চিন্তা আমার কাছে সব চেয়ে ব্যাপক ও অর্থবহ মনে হয়। কারণ সম্পূর্ণ মানুষ বলতে তিনি তিনটি গুণের কথা বলেছেন - "টোটাল" "পারসোনাল" আর "অটো এ্যাকটিভ"। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মে স্বমুখীনতা ও বর্হিমুখীতার সকর্মক সহযোগে মানুষের গভীর সংযোগের কথা বলেন তখন অস্তিবাদীর অহং মুছে গিয়ে আমাদের সামনে জাগে এক গভীর ও একান্ত বিশ্ববোধ। সে তখন হয় 'এক মানুষ', 'মহামানব', 'বিশ্বমানব', যে The Eternal Man। এই মানুষ হল মানবতা বোধ। শুদ্ধ চেতনা ও পার্থিব রজঃ-তে ধৃত চেতনার রূপ। রবীন্দ্রনাথের মানুষ পরিজিত এবং অপরিজিত। দ্বৈতা দ্বৈত্যে নিত্য। কোথায় এই নিত্য ও অপরিমিত? সমাজে। সেই সমাজটাই বা কি? "Above all we much avoid postulating, soceity, again as an abstraction vis-a-vis the individual. The individual is the social being (Marx, EPM. International Publishers, New York, P. 137-138) রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য আর মার্কসের মানববত্ব মেল মহামানবের পারাবারে।

কিন্তু এই মানুষ তার সামগ্রিকতা পেল না ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা থাকার জন্য। সে হয়ে পাড়লো অনম্বিত বা atianated। বিশ্ব প্রকৃতি হল বিমুক্তি। সমাজ থেকে হল বিভাজিত। সে যে উৎপাদন করে তা আর তার থাকলো না। সর্বোপরি সে হল বিচ্ছিন্ন নিজের মত থেকে। অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী সংকট হল এখানে।

এই যে সংকট, সে হল সার্বিক সংকট। পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় তার জন্ম। এই সার্বিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি জনিত আর এক সংকট। পরাধীনতার সংকট। উপনিবেশের সংকট। প্রথম যুগে ছিল উপনিবেশের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। পরে পশ্চিমী ভাব ধারার বিরোধী প্রবনতা। নানা ঘাত প্রতিগাতে উনিশ এখনো বিতর্কিত অধ্যায়। ব্রাহ্মান্য সংস্কৃতি, উচ্চকোটিতে পাশ্চ্যাত্যায়ন এবং নিম্নবর্গীয় সমাজের ক্রম দূরত্ব — এই সব যেন বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন ভুবন। ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীল এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকার কথা মার্কস

বলেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে মার্কসের মধ্যে পশ্চিমী উগ্রতার যে কথা উঠেছে, তা আপাত দৃষ্টিতে গ্রহনীয় বলে বিবেচিত হলেও, বলা যায় যে মার্কস পশ্চিমের কথা নয়, পশ্চিমের যন্ত্র সভ্যতার মুস্কিলের কথা বলেছেন। পরবর্তী কালে মার্কস তাঁর এই মতও সংশোধন করে নেন।

কিন্তু অনিল শীল এই সময় সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই সত্য। "Between Brahmins, Kayastha and Baidyas an the one hand, and the rush of the Hindu Society on the other, there was a considanable gulf in social Status and ranking ...... for all their squabbles among themselves they still had a common interst in preventing arrivistes from arriving" (nationalism without a Nation in India, G. Aloysios, Oxford, P. 49 -এ উদ্ধৃত)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি উনিশ শতকের মনীষাদের অর্ন্তলোক এবং বর্হিলোক ও সামাজিক জীবন কত মারাত্মক ভাবে বিভাজিত ছিল। কিন্তু তা সত্বও ওঁদের সময়েও আধুনিকরণ ও পাশ্চত্যায়ন ছিল সমার্থক এই অর্থে যে তারা পশ্চিমের প্রতিপক্ষ হতে চেয়েছিলেন পশ্চিমের ভাবাদর্শকেই গ্রহণ করে। পশ্চিমী ইডিয়মে পশ্চিমের প্রতিরোধ — আদপে এই ধারনাই সত্তার নিটোল ঐক্য নষ্ট করে, ফলে আংসে আত্মিক সংকট। সমগ্র অস্তিত্বই হয়ে ওঠে বিপন্ন। ঔপনিবেশিক মনস্তত্বের ক্রিয়া বড় সূক্ষ্ম।

অন্যদিকে উপনিবেশ আনলো ভিন্ন ভারতবর্ষকে। প্রাক-উপনিবেশের ভারত আর উপনিবেশের ভারত— দুটি ভিন্ন জগৎ।

ইংরেজীওয়ালাদের চিনতে ভুল করেননি নইপুল। আমাদের চেয়ে অনেক পরে হলেও নইপুল বুঝেছিলেন, "We pretended to be real, to be learning, to be preparing ourselves for life, we mimic men of the New World, one unknown earner of it, with all its reminder of the corruption that came so quickly to the new." (The Mimic Men, N. S. Naipul, Panguin, P. 146) আফ্রিকার কবি aimécéssire নিগ্রোবাদকে তুলে ধরতে বলেন ঃ

To leave

As thereare hyena-men and panther-men

So I shall be a gew man

or Kaffir man

or Hindu-from-Calcutta Man

or man-from-Harlem-sho-wan't-got-the-Vote.

(Return to my Native Land, Aimé Céssire Paenguine, P. 23)

এ কি উগ্রজাতীয়তাবাদ? রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব বোধ এই ধারনাকে সমর্থন না করলেও সভ্যতার সংকটের ক্রোধের কথা মনে পড়ে। শক্তি মদমত্তদের তিনি ধিক্কার হেনেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —সমস্যা কিন্তু পূর্ব পশ্চিমের নয়। সমস্যা হল সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতার। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নয়। সংস্কৃতিক স্বী-স্বাধীনতাই প্রশ্ন যেখানে কবি ফিরে পান যুদ্ধ বিবেক, যুক্ত হতে পারেন দেজে সংষ্কৃতিক মধুমূলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে জাতীয় মর্যাদার ওপর দাঁড়িয়ে বিবেকবান, মানব মুক্তির জন্য আর্তি-ধ্বনিত বিদেশী সাহিত্যের সারাংসার অনুকরণে নয়, মিমিক ম্যান হয়ে নয়, সত্যিকারের মানুষ হয়ে সোস্যাল ম্যান হয়ে। কিন্তু আমাদের ত্রিশ দশকের আধুনিক কবিতার পুরোহিত ও প্রণম্য কবি কুল কোন দর্পন ও অস্তিত্ব প্রশ্নের সমাধামের জন্য লরেন্স এলিয়টদের দোরে দোরে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরলেন দেশ যখন মুক্তির জন্য উত্তাল ? শুধু নতুন ভঙ্গির জন্য ? ভঙ্গি আর সন্ধান এক কথা নয়।

অক্তাভিও পাজ একটা চমৎকার কথা বলেছেন— প্রত্যেকটা রাজনৈতিক সংকট আদপে একটা আত্মিক সংকট। আজ আত্মিক সংকট থেকে মুক্তির পথ সম্ভবত বিযুক্ত বা এ্যালিয়েনেশন থেকে মুক্তির জন্য অন্তরে বাইরে নিরন্তর সংগ্রামের ফলে নতুন মানুষ হবার প্রচেষ্টা। জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া এবং নিজেকে বিশ্বলোকের সঙ্গে গ্রতিত করা। প্রসঙ্গক্রমে, সিঞ্জ নিজের কবিতার ভূমিকা থেকে শিক্ষা নিই ।—"Even if we grant that exalted poerty can be kept successful by itself, the strongthings of life are needed impoerty also, to show that what is exalted or tender is not made by feeble blood. It may almost be said that before a verse can be human again it must learn to be brutal again" (Plays, Poems, and Prase, ghon M. Synge, London, Every Man's Library, Ed. Ernest Rhys, 1946, P. 219)

উত্তর-উপনিবেশিক জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে ষাটের বাংলা কবিতা

গণেশ বসু

সূর্যোদয়ের আগে যেমন আকাশ গভীরভাবে লাল হয়ে ওঠে তেমনি উপনিবেশ বিনাশের আগেই উত্তর-ঔপনিবেশিক কবিতা যা হওয়া উচিত তা আধুনিকতার তাৎপর্যে জন্ম নিয়েছিল আমাদের ভাষায় চল্লিশের দশকেই। সে সময় লক্ষ্য করেছি উপনিবেশবাদের ছিন্নমস্তা চেহারা, ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের নগ্নরূপ। বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের ধুমধুমা। সেই ঘনঘটার দিনে বিষ্ণু দে, সমর-সুভাষ-সুকান্ত-মণীন্দ্র-মঙ্গলাচরণ-রাম বসু প্রমুখ কবিরা, উপনিবেশবাদ বদলে দিয়ে কী ব্যবস্থা আমরা অর্জন করতে পারি, তারই সৃষ্টিহীন ভূমিকা নিয়েছিলেন। কবিতা ও জনগণের সৃজনশীল ভূমিকা মিলে মিশে ভাষা পেতে চেয়েছিল তাঁদের রচনায়। এই দশকটি ছিল বিশ্বের শাপমুক্তির দশক। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল পৃথিবীময় উপনিবেশ ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার ঝড়-ঝঞ্ঝা। সেই ছাপ আছে বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্টে, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার-এ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিকোণ-এ, রাম বসুর তোমাকে, মঙ্গালাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড়ে, তরুণ সান্যালের মাটির বেহালা-য় সুকান্তের ছাড়পত্র তো ছিলই।

স্বাধীনতার পরে উদ্বাস্তু প্রবাহ, কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানা আন্দোলন, ভারতের সংবিধান রচনা, প্রথম পরিকল্পনা, প্রথম সাধারণ নির্বাচন—সব মিলিয়ে ভারতের অর্থনীতি স্থির লক্ষ্যে অবিচল থাকবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা হল না। খাদ্য সংকটের সুযোগ নিয়ে ও পি এল ৪৮০-র নিয়মানুযায়ী কুলি-ঋণের সহায়তায় নয়া উপনিবেশবাদের নতুন প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার ছায়াবিস্তার ঘটায় এদেশে। মার্কিন প্রচার দপ্তর ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল নিপুণতায়। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হল ভারত-চিন সংঘর্ষের কালে ও পরে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র মুখচ্ছদে। শুধু তাই নয় ১৯৬৪ সালে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিধা বিভাজন ও ১৯৭০ সালে ত্রিধা হয়ে যাওয়া—আমাদের উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যকর্মটি পথভ্রষ্ট হতে শুরু করে, অন্যদিকে কসমোপলিটান সাহিত্য কর্ম মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

উত্তর-উপনিবেশিক উজ্জ্বল কবিতা মানবিক স্বভাবকে প্রাধান্য দেয় এবং জাতপাত গাত্রবর্ণ দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে মানুষকেই প্রাধান্য দেয়। এই কবিতার শিকড় থাকে স্বদেশি জনমৃত্তিকার মধ্যে। অর্থাৎ জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, লোকস্মৃতি, লোকপ্রতীক ও আইকনগুলি এই কাব্যরচনায় উপমা প্রতীক রূপক চিত্রকল্প ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে মুহূর্তের স্মৃতিলাঞ্ছনা বিপুল মানবিক ভূমি জাগিয়ে তোলে। উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যচিন্তা লেভি স্ট্রস, ফ্রঁসোয়া লাকা এবং বিশেষভাবে স্যসুরকে মনে রাখে।

উত্তর-উপনিবেশিক সুস্থ জীবনবীক্ষায় অন্তর্গত রয়েছে—

১. স্বদেশ, তার ঐতিহ্য, ইতিহাস ও শিল্পকর্মের মানবমুখীনতা।

২. কবিতার সাধারণ দিকটি হল শব্দকে বাহন করে মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রম-বিজ্ঞান প্রকৌশল, নান্দনিক বিষয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

৩. প্রকাশের উপায় হিসেবে স্বদেশি প্রকৃতি, প্রতীক, আইকনগুলি ব্যবহার করে ; নিছক চিহ্ন বা উপকরম হিসেবে ব্যবহার নয়।

৪. সমস্ত ক্ষেত্রে এই কবিতা শোষণ বিরোধী, সন্ত্রাসবিরোধী ও আর্ন্তজাতিক।

৫. ভিন্ন দেশ থেকে মানবমুখীন সাহিত্য-শিল্পের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে। পক্ষান্তরে বিশ্ববিরুদ্ধবোধ বা কসমোপলিটানিজম।

১. অত্যন্ত সহজ সরলভাবে যৌনতা ও তার উপর ভিত্তি করা মানসভঙ্গিক কাজে লাগায়

২. মানুষের সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বদেশ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিক বিযুক্তকে মুখ্য করে তোলে

৩. মৃত্যু, বীভৎসতা এবং কখনো কখনো মানুষের অধঃপতিত জীবন দেখানোর জন্য ঘৃণ্য প্রতীক ব্যবহার করে।

বর্তমানে উত্তর-উপনিবেশিক কবিতার জগতে যেমন রয়েছেন আর্ন্তজাতিক, তেমনি রয়েছেন কসমোপলিটান কবি। যাঁরা বিশ্বশোষণ ও শাসনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ভূমিকা নেন, জাতির শিকড় বিষয়ে সজ্ঞান থাকেন, জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর লক্ষ্য কার্যকর করেন, অর্থাৎ শোষণশূন্য মুক্ত মনুষ্যত্বের লক্ষ্যে স্থিত তাঁরা আন্তর্জাতিক। পক্ষান্তরে, যাঁরা রাষ্ট্রের সব কিছু নির্দ্বিধায় মানেন, যে পুঁজির শক্তি গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এক অদৃশ্য বিশ্বরাষ্ট্রে তৈরি করার কাজ করে চলেছে তাদের ভাবাদর্শ ও ভূমিকা নির্দ্বিধায় যাঁরা মানেন, জীবনে প্রয়োগ করেন এক কবিতায় তা দ্যোতিত করেন তাঁদের আমরা বলি বিশ্ববিরাজবাদী।

উভয় ধারারই প্রতিফলন দেখা যায় ষাটের বাংলা কবিতায়। উত্তর-উপনিবেশিক আন্তর্জাতিক কবিতার বিপ্রতীপে বিশ্ববিরাজবাদীদের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল পঞ্চাশের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' সহ সেই সাপ্তাহিকটি (বর্তমানে পাক্ষিক) যেখানে থেকে একদা মুদ্রিত হত 'আমেরিকান রিপোর্টার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বহু ওয়ার্কশপের ভিতর দিয়েও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে বাংলা কবিতায় বিশ্ববিরাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে পুঁজির প্রকট বিকাশ এবং তা থেকে সৃষ্ট ব্যক্তিক বিযুক্তি ষাটের কবিদের মধ্যেও কখনো কখনো সংক্রমিত হয়েছে সন্দেহ নেই। অলক্ষ্যে বিশ্ববিরাজবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায়, বা তাঁদের প্রশ্রয়ধন্য হবার মানসে, বা স্রেফ চটকদার হবার প্রলোভনে বিভ্রান্তি যে আসেনি তা নয়। শুদ্ধ কবিতা, ক্ষুধার্তদের কবিতা, ধ্বংসকালীন

কবিতা আন্দোলনের মধ্যে কেউ কেউ সেই বিভ্রান্তির রকমফের দেখতে পারেন, বা দেখে থাকেন। কিন্তু তাতেও ধরা পড়ে সময়ের কণ্ঠস্বর।

ষাটের বাংলা কবিতা আলোচনায় আমি ১৯৬০ থেসে ১৯৭১—এই বারো বছরেরসময় বিস্তৃতিকে মান্য করছি। এই সময়বৃত্তে যাঁরা কবিতা লেখা শুরু করেছেন, বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন কম-বেশি, যাঁরা ক্রোধী, অভিমানী, নিরাশ্রিত, ভালবাসার প্রার্থী বা সমাজ-বদলানোর স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে পবিত্র মুখোপাধ্যায় আশিস সান্যাল, মলয় রায়চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু দে, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তুষার রায়, শান্তনু দাস, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মন্ডল, অনন্ত দাশ, মৃণাল বসুচৌধুরী সহ অনেকেই রয়েছেন। কবিপত্র, এই দশক, শ্রুতি, সম্প্রতি, দৃশ্যপট, সীমান্ত (নব পর্যায়), বহ্নিশিখা প্রভৃতি পত্রিকা এই কালবৃত্তে বিশেষে ভূমিকা নিয়েছিল কবিতা আন্দোলনে। মিনি পত্রিকা, কবিতা সাপ্তাহিকী, দৈনিকী, ঘণ্টিকী ইত্যাদিও বের হয় চমক দিতে। আশিস সান্যাল বের করেন বেঙ্গলি লিটারেচর, কার্যত কলকাতার হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া, কবিদের শৃঙ্গ সম্পর্কভিত্তিক কবিতায় ভারতীয়দের দিক প্রকাশ পেতে থাকে এতে। মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী প্রমুখ হাংরি আন্দোলনের নেতারা নানা ছোট ইশ্‌তেহার, ছোট ছোট সংকলন প্রকাশ করেন। এঁদের সম্পর্ক ছিল মার্কিন দেশের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠান বিরোধীর সঙ্গে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবস্থান আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে। এঁরা ব্যক্তিগত যৌন সম্পর্কের প্রতীকে দেশীয় ও বিশ্বরাজনীতি ধরতে চাইতেন। দীপেন রায়, শিশির সামন্ত প্রমুখ পরিচয়, সীমান্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে উত্তর-উপনিবেশিক আন্তর্জাতিক ধারাটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভিন্নতর তাৎপর্যে এই ধারারই কবি গোপীনাথ দে। দ্রোণাচার্য ঘোষ তো অকালেই পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন।

ষাটের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে যাঁরা কসমোপলিটান তাঁদের স্মার্টনেস, চালটুস ভাবভঙ্গি, যৌনতা ইত্যাদি এই সময়ের দু-একজন কবির মধ্যে ভুল করে উঁকি-ঝুঁকি দিলে তা ষাটের কবিতার চরিত্র নয়। আসলে, যখন লেখা হত 'চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা', কিংবা কম্যুনিস্ট। পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষনুক্রমে যজমানি', কিংবা, 'একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা। নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কীরকম আশ্চর্য করল', কিংবা 'ভালোবাসা ততদুর যতদুর লিঙ্গে র প্রহার', কিংবা 'ধ্যান ও অস্থিরতা / এক জীবনে, উরুর সামনে উরু, উরু নয়, যোনি সামনে লিঙ্গ', কিংবা 'কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে' কিংবা কেউ যখন ছোট মাসির বুকে মুখ লুকিয়ে প্রথম যৌন আস্বাদ পাওয়া অনুভব করে বলে জানায় তখন সেইসব কবি দেশের ঐতিহ্য, লোকস্মৃতি ইত্যাদি অস্বীকার করেউত্তর-উপনিবেশিক বিরাজবাদের প্রস্থানভূমিই বাংলা কবিতায় নির্মাণ করে দেয়। এভাবেই পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি যখন তিন জোড়া লাথির

ঘায়ে রবীন্দ্র রচনাবলী লুটোয় পাশে বলে হুংকার ছাড়েন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না মার্কিন বিরাজবাদীদের কাছে কীভাবে এসব কবি আত্মসমর্পণ করে আমাদের মনীষীদের চরিত্র হননে গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকা নেন। ষাটের কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষ দেখা যায়নি বলে এই সময়ের কবিরা ব্যবসায়ী পত্রিকাকুলেরও আনুকূল্য তেমন পান নি।

যাইহোক, ষাটের কবিদের মূল ঝোঁকটাই ছিল স্বদেশি মর্মবস্তুকে বিশ্বভাবনায় সংযুক্ত করা, ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। অন্বয় ও অনন্বয়ের দোলাচলও ছিল। কারো কারো মধ্যে অবস্য এই দুই ভাবনাই রয়েছে, কারো মধ্যে আবার অন্বয়ের সাধনাই বেশি। যাঁরা অন্বয় ও অনন্বয় দুটি বিষয়ই কবিতায় অন্তর্গত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। আমরা মনে হয় পবিত্রর মতোই অনেকের নিয়তি ছিল এক, যাঁদের জন্ম পূর্ববঙ্গে? এবং অবস্থা-বিপর্যয়ে যাঁদের শুধু বেঁচে থাকার সমস্যাকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে। এঁরা বাল্যে দেখেছে ঐ বাংলার স্মৃতিময় মানবিক ভূগোল, অন্যদিকে হঠাৎই অন্য দুর্গত সমাজ ও ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাওয়া। এই মানস-সঘর্ষে পবিত্র অবশ্যই বিনষ্ট হতে পারতেন কিন্তু তাঁর ভিতরে স্পর্শপ্রবণতা ও তাঁর কবিত্ববোধই তাঁকে বাঁচিয়েছে এবং সফল কবিব্যক্তিতের রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমার যতদূর জানা পবিত্র, রত্নেশ্বর, আশিস, তুলসী, এমনকি আমিও ঐ সময়েই তাড়িত হয়ে এই বাংলায় এসেছিলম। পবিত্র উত্তীর্ণ-কৈশোরে কালীঘাটের বাসিন্দা ছিলেন। নিত্যই সেখানে শবযাত্রা দেকতেন। দেখেছিলেন চারদিকের সংগ্রামী অজস্র মানুষের মুখাবয়বও। জানিনা কবির ব্যক্তিজীবন কবিতার ভরকেন্দ্রে থাকে কিনা, নাকি বাস্তব জীবন দূরে সরিয়ে কবিজীবনই গড়ে তোলা যায়! পবিত্র তাঁর কবিতায় তরুণ বয়সে, বাল্যে চেনা বরিশালের প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতার সংগ্রামী অথচ ভাসমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বেঁচে থাকতে থাকতে জীবনকে বহু ক্ষেত্রে বাজিও ধরতে চেয়েছিলেন। অনেক পরে তিনি 'আগুনের বাসিন্দা'য় তাঁর যে শ্রেণীদ্বন্দ্বময় দেশে বালক বলেও ক্ষমা ছিল না 'অভিমন্যু' কবিতায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। লেখেন—

লড়ছি তো আমি প্রাণপণে নেই অস্ত্র
ধনুকের ছিলা সারথী অশ্ব রথের চূড়া
মাটিতে লুটিয়ে রক্তের নদী পায়ের তলে
সূর্য এখন অস্তাচলে
নিরস্ত্র আমি (শিশু বলে কোনো ক্ষমা নেই!

পবিত্র পুরাণ বিষয়ে যথেষ্ট মনস্ক। দহন বিষয়ে ত্রস্ত হয়েও আসক্ত। বরং তাঁর কাছে মনে হয়েছে,

আমি স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন ব্যথিত গোলাপ

অশান্ত অতৃপ্ত এক দেবশিশু পরম সুন্দর,

কোথায় এলাম? এই শাপদগ্ধ প্রাচীন প্রান্তরে?

এবং দেখা গেছে ঐ পতন শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যায়

মিলিয়ে যাবো ঐ শূন্যে অবিরল শূন্যে,

বাতাসে অগ্নিতে ছড়াবো দেহ-শেষ ভস্ম,

মাটিতে রেখে যাবো শয়তানের শেষ শান্তি,

দেবতা নয়, আমি নারকী চুল্লিতে দগ্ধ।

এবং বারবারই তিনি এক সুন্দরের সাধনা করেন যে সাধনা সুন্দরকে কোনো অভিজ্ঞান দেয়না। সুন্দর এক নিরাকার মানবিক অস্তিত্ব যার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা।

বিযুক্তি ও সংযুক্তির দুই অভিজ্ঞানই পবিত্রের কবিতার অন্যতম দিক। আবার তিনি সুন্দরকে জয় করে নেওয়ার অস্ত্র ভেবেছেন শিল্পকেই। পুরাণ তাঁর রচনায় নতুন মাত্রা সংযোগ করে। অন্যতর তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। পুরাণের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক রচনা এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সুন্দরের স্বপ্নকল্পনা তাঁকে এক বিশেষ কবিচারিত্র্য দিয়েছে। এই প্রবাহমানতাই তাঁর উত্তর-উপনিবেশিক চরিত্র। তিনি পশ্চিমের সহযোগী ভারতীয় ক্রমি-পুঁজিবাদের সমালোচক। তাঁর ধ্বংসকালীন কবিতা বা তৃতীয় সাহিত্য কার্যত বামপন্থাকেই গ্রহণ করে। কিন্তু পবিত্রর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং যৌথ জীবনচারণা বিষয়ে সপ্রশ্ন সন্দেহ, বিশেষ ভাবে বারবারই মানুষের ক্লিন্ন মৃত্যু অসহায়তাবোধ 'তাকে বোধহয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী করে তুলতে পারে নি।

পবিত্র মুখোপাধায়ের পাশাপাশি রয়েছেন আশিস সান্যাল। তিনি বামপন্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও পবিত্রর সংশয়িত অভিব্যক্তিসমৃদ্ধ কাব্যকলার কাছাকাছিও পৌঁছন নি। পবিত্রর রচনায় যে কাব্যময়তা রয়েছে তাতে মনে হয় পবিত্রর জীবন কবিতার জন্য সমর্পিত, আসিকের তেমটি নয়। সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে তিনি অনেক সচেতন। তাঁর কাছে আধুনিক জীবন হল—

অতীত জেনেছি তাই সময়ের পরাভূত স্মৃতি আর শ্রুতি।

গতিময় শুধু বর্তমান—

আমাদের এই জন্ম অন্য এক জন্মের প্রস্তুতি।

তবু রোজ চেয়ে দেখি আমি

বাড়ছে বুকের ক্ষত।

চতুর্দিকে স্ফীতমান আমাদেরই প্রভূত নষ্টামি।

এরকমই বলা যায় রত্নেশ্বর হাজরাকে। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম 'বিষণ্ণ ঋতু'। তাঁর কাছে সময়কে মনে হয়েছে বিষণ্ণতায় আবৃত। ইতিহাস যেন—

দীর্ঘায়ু মানুষ মারা গেলে

জনশূন্য প্রান্তরে একলা আমি

হাঁটি কিছুক্ষণ—ব্যবহৃত নয় এমন ভূমণ্ডলে

তোমার অথবা কোনো সম্রাটের নয়

তার দেহ এবং বিষাদ খুঁজে হাঁটি

সমস্ত মিছিলে একা—

অল্পবেতনের নিচে অবাঞ্ছিত শিশু

দুহাতে খেলা করেছে দেখি।

এই পংক্তিগুলি যেন তাঁর কবিতার মূল বিষয়। অর্থাৎ পুরনোকে ত্যাগ করে অল্পবেতনের নিচে অবাঞ্ছিত শিশুর মতো জীন নিয়ে খেলা করা। এমন কি ভুল রাস্তায় হেঁটে যেতেও সীমারেখা মুছে ফেলা মানচিত্র দেখেন তিনি। রত্নেশ্বর অনেক বেশি একাকীত্বের মধ্যে থাকেন এবং নতুন করে নির্মাণ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিজেকে। আসলে মরেও বারবার বেঁচে ওঠাই তো জীবন। —

আমাকে আর ধরিত্রীকে পেল বলেই বেঁচে গেছে—

সেই যে জীবন।

রত্নেশ্বর কবিতায় প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙেছিলেন মনে হয়। কিন্তু তণার পংক্তিবিন্যাস আপতদৃষ্টিতে নিয়ম অ্যাপোলনীয়-র মতো মনে হলেও আদতে তা খুবই সুনিয়মিত পংক্তিতে রচিত। তাঁর অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের পংক্তিগুলি খাঁটি ছন্দোস্পন্দেই রচিত, শুধু পংক্তিগুলি ভেঙে দেওয়ামাত্র। তাঁর কবিতায় প্রতিটি পংক্তি এক-একটি খণ্ড চিন্তার অভিজ্ঞান। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসায় আছে একা হয়ে যাওয়া বা যৌথ জীবনে বাঁচা-যাই হোক না কেন, সব মিলে কোনো পরমজীবনকে আকাঙ্ক্ষা। —

ঘুগুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছি ঘুমের নামে—

স্রোতের জন্য জল এবং জলের জন্য স্রোত

বাঁচার নামে উৎসর্গ করলাম আয়ু

আমি আমার জন্য আমাকে রোজ

বিলিয়ে দিই—

রত্নেশ্বর সব সময়েই চেয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান সত্ত্বেও একটাই মানুষ হয়ে ওঠা।

রবীন সুর আমৃত্যু মানুষের জন্য পৃথিবী রচনার স্বপ্নই দেখে গেছেন, দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর চরিত্র 'অন্তর্গত নদী'তেই উজ্জ্বল। তিনি সব সময়েই ছিলেন অন্বয়-সন্ধানী। এই বাংলার এক শিল্পাঞ্চলে বসবাস করে তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা ছিল মানুষের অপরিমিত প্রকৃতি, সমাজ ও প্রজাতি থেকে বিচ্ছেদ। যে পাটকলের জগতে তিনি জীবনপঞ্জীকার জন্য একদা শ্রমিকদের সামান্য মজুরির ছবি দেখেছিলেন সেই জীবনটা ছিল তাঁর কাছে প্রবল অনন্বয়িত। —

শোণিত লোলুপ যারা
সকলেই বাঘ নয়,
মশা আর ছারপোকার অসামান্য কামড়েও
বহু রক্ত খরচ হয়েছে ঃ

তার জন্য কোনোদিন কোনোক্রমে পৃথিবী মানুষহীন নিশ্চিত হবে না। উত্তর-উপনিবেশিক জীবনে, পুরনো আত্মসম্মানহীন ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের স্বাদ ও স্বপ্ন তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল উপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিত সমাজ অর্থনীতির সংঘর্ষে বিশ্বপ্রক্রিয়ায় এক নিষ্ফলা ব্যবস্থারই প্রবর্তন ঘটেছে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে। —

গণতন্ত্রে কার কতখানি কপট নির্মোহ
এখন ভারতবর্ষে কেউ তা জানে না।

কিংবা

অস্তিত শূন্যতা এক মানসিক পক্ষাঘাত প্রাণান্ত প্রদাহ,
ফানুসের মতো ফাটে মানুষের শেষ ভালোবাসা।

তাঁর প্রার্থনা, ঐতিহ্যের স্বীকরণে—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
উদয়াস্ত অস্তোদয় স্বেদরক্তে জীবন জোনাকি
ভোজালি প্লুরিসি দাঙ্গা অতিক্রান্ত এবার সহসা।

অনিকেত জীবনে ছিল তাঁর সুস্থ নিকেতন পাবার সাধ। এই সাহিত্যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জীবনবিতৃষ্ণার দিকেও কখনো ঠেলে দিয়েছে, আবার কখনো জীবনমুগ্ধ ঋদ্ধিমান পুরুষে রূপান্তর ঘটিয়েছে। ষাটের কবিদের এই একটি বড়ো দিক, তাঁদের পায়ের তলায় যেন ছিল সর্ষে, কোথাও দাঁড়াতে পারাই ছিল অসম্ভব, থিতু হওয়া তো দূরবস্থান।

পরেশ মন্ডল, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় খন্ড খন্ড চিত্রকাল্পের নিরিখে যুদ্ধ কবিতার সাধনা করেছেন। এঁদের হয়তো মনে হয়েছিল চারদিকে অভিজ্ঞতার বলি চিহ্নিত অস্তিত্বের উর্ধ্বে আছে মানুষের যুদ্ধ ও অন্তর্গত জীবন, যে জীবন কিছু কিছু শব্দের অনুষঙ্গেই ধরা পড়ে। শব্দব্যবহারে এঁরা প্রত্যেকেই মিত, আঙ্গিকের নতুনত্বে আস্থাবান চিত্র নির্মাণেই মগ্ন। যেমন—

১. বললুম যাও

গেল না

পর্দায় ছাপা পাখির চোখে জল

বললুম থাকো

পাখিটা উড়ে গেল (পরেশ মন্ডল)

২. প্রথমে ১

তারপর ২

তারপর ৩

তারপর অসংখ্য কড়া নাড়ার শব্দ

শব্দ ১

শব্দ ২

শব্দ ৩

শব্দ শব্দ শব্দ [পুষ্কর দাশগুপ্ত)

৩. 'ভাল আছি' বলতেই

থার্মোমিটার দেখতে পাই—

'চললুম' আর সঙ্গে সঙ্গে

দরজা বন্ধ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

কংকালটাকে প্রশ্ন—

কে বেঁচে আছে?

মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কবিতার বিশিষ্টতা শিষ্ট কিশোর জীবনে বেড়ে ওঠা স্মৃতিময়তায় মেদুর। শব্দ প্রয়োগে খুঁতখুঁতে, সচেতনতা বহুমাত্রিক। অনায়াসে তিনি বলেন,

তোমার মুখের গাঢ় লাবণ্যকে ভেঙে বলতে গিয়ে
'সুন্দর' শব্দটি আমি বহুবার ব্যবহার করে
করেছি মলিন কত। 'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি' বলে
চিৎকারে ভেঙেছি আমি শব্দের নিখুঁত নীরবতা।

মনুষের মধ্যে আঙ্গিক-প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়।—

শব্দ তুমি হাত ধরো
মৃত্যুর
নিঃসঙ্গতার
রক্তাক্ত হৃদয়ের
এবং
অসহায়তার

অনন্ত দাশ ছিলেন যুদ্ধ ও স্পষ্ট জীবনবিষয়ে সংগ্রামবিধৃত কবির দুইধারার ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। লিখেছেন

সময়, আসার কণ্ঠে বিষ হয়ে আছে
আমি তার উৎকণ্ঠিত নীলে
একরাশ দুঃখশোক ঘৃণা ও ব্যর্থতা নিয়ে
যন্ত্রণাজর্জর হয়ে ঘুরি।

ব্যক্তিজীবনে নিরূপিত সুশৃঙ্খল কর্মে যুক্ত থাকার জন্য তাঁর কবিতাতেও এক ধরনের সুশৃঙ্খল শব্দবিন্যাস আছে। রাঢ়বঙ্গে গ্রামীণ জীবনের স্মৃতি তাঁকে যদিও টানে, তবু যেহেতু তাঁর বাল্যে দেশবিভাগজনিত যন্ত্রণার ছাপ নেই, তাই বলেন,

না, আমি নদী হতে চাইনি
সমুদ্রও নয়
আমি এক শিউলি ফুলের শান্ত স্নিগ্ধতা মুখে মেখে
শরতের হাল্কা নীল নির্মল কুট্টিমে

গাংচিল হয়ে ভেসে বেড়াতে চেয়েছিলাম
চেয়েছিলাম মানুষের বিসালতাকে
রক্তে ধরে রাখতে।

তিনি লিখছেন,

ধমনীর প্রতিটি স্পন্দনে
পাইনি কি বিচ্ছিন্নতার কাতর যন্ত্রণা?
আমি সেই পাপড়িগুলো
একে একে সাজাতে গিয়ে দেখি
আগাছায় ভরে গেছে ফুলের বাগান
এক অর্থহীন জীবনের বোঝা কাঁধে নিয়ে
হতাশায় ভেঙে পড়ছে অসংখ্য মানুষ।

বলা যেতে পারে, অনন্ত তাঁর বাল্যের দেখা শান্ত স্নিগ্ধ জীবন বিদীর্ণ করা বিশ্বে আধুনিকার পদক্ষেপে আর্ত-ই হয়েছেন। সুস্থ জীবন ও বিপ্লব মনস্কতা দুই-ই তাঁকে কবিতায় বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে।

তাঁর সমবয়সী কবি করুণাসিন্ধু দে। তিনিও পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে বরাক উপত্যকায় কৈশোর কাটিয়েছেন। অহমিয়া ও বাংলা ভাষাভাষীদের উপরে আসাম সরকারের চাপও তিনি দেখেছেন। কৈশোরে বাস্তুভূমিচ্যুত হয়ে যে দেশে বসবাস করতে এসেছিলেন সেখানে মৌলবাদী চাপ সহ্য করেও ভাষা-বৈরকরে চাপের তলায় পড়েন। তাঁর ও তাঁর অগণন সহযোগীর বাঙালিত্বের অভিমান তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল। স্বদেশ, স্বভাষা এবং , তৃতীয় জনের চেতনায় তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে অনীহা থাকায় যন্ত্রণার্ত তিনি 'হাজারদুয়ারি ঘরে' দেখিয়েছেন। যেমন,

তোমার দুয়ার তুমি খোলা রাখো কিংবা রুদ্ধ করো
বিকল্প ইচ্ছায়—তাতে তৃতীয়জনের চেতনায়
আর কতটুকু ক্ষতি, শুধু একা মৃতকল্প ধরো
শব্দের বাহিরে স্তব্ধ অন্য এক অন্ধ রিক্ততায়
হৃৎপিণ্ডে স্বগত কান্না তুমি যার নিরালম্ব শ্রোতা

কেউ নেই সমভোগী, ভয়ংকর আর্তির সোজানে

কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছা যায়?

অবশেষে তিনি বলেন,

হৃদয়ে চলেছে যদি জোড়ামাটি বিমূঢ় বিলাপে

নিসর্গ তখনো স্নিগ্ধ আঙিনার আনন্দ আরতি।

করুণাসিন্ধু বাঙালি লৌকিক বহু আইকন কবিতায় ব্যবহার করেছেন এবং এভাবেই শিকড় থেকে স্বাদ নিয়েছেন।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে। কৈশোরে বসবাস করেছেন ভাটপাড়ায়। তিনি পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় প্রতি বৈরিতা দেখেছেন, দেখেছেন ধর্ময় মৌলবাদ এবং এপার বাংলায় এসে দেখেছেন গণতন্ত্রের নামে বিকলাঙ্গ পুঁজিবাদের বিকাশ, হনন ও বীভৎসতা। চট্টগ্রামের নদী-সমুদ্র- পাহাড়ের প্রকৃতির এক আশ্চর্যস্থ মিলনস্থল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন পাটকলে ফেঁসো জড়ানো মাথার চুল দেখার-ও অভিজ্ঞতায়! এই বিপুল বিযুক্তিই তাঁর কবিতার বিষয়। তিনি স্বাধীন ভারতে গান্ধীমূর্তির আইকনকে উর্ধ্বে তুলে ধরে গান্ধিজীর গণ ও মানবিক মহিমাকে চূর্ণ করার জন্য রাজনীতিককের ব্যভিচার দেখেছেন। এবং ক্রুদ্ধ তরুণদের হয়ে এই পুরনো উপনিবেশেকে নতুন উপনিবেশের রূপান্তর করার জন্য বন্ধু-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি কবিতায় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি আমাদের দেশে ভোট-ব্যবসায়ীদের বিষয়ে চমৎকার তাঁর মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর স্পষ্ট চরিত্র দেখা যায় সত্তর দশকে তরুণ বিদ্রোহীদের সহযাত্রী হতে।

"নজর রাখতে হয়,

কারা কখন কীভাবে কেন লিখছে এবং কী লিখছে

কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে

আবার লিখছে, সবই আমাকে মুখস্থ করতে হয়।

এই যে ক্ষোভ, তা সেই গান্ধিনগরে এক রাত্রির অনুকরণ যেন।—

অধ্যাপক বলেছিলো ঃ 'দ্যাট্স্ র-ঙ্, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'

মাস্টারের কাশি ওঠে 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'

উকিল সতর্ক হয় ঃ 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'

চটকলের ছকুমিএরা 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও.সি-কে।'

মণিভূষণ পুরোপুরি পথ চলতি শব্দ নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং কার্যত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্বও করেছেন যেন। রবীন্দ্রনাথকে বিপ্রতীপে রেখে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটে শ্রেণী রক্তধারা,

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।

দুর্গত বালক শ্রমিক নিয়েও তাঁর লেখা 'মন্টুর জীবন' একটি ইঙ্গিতবহ কবিতা।—

কিন্তু পাঁউরুটি কেটে দু'টুকরো করে দুজনকে দিয়ে দিলেও তার হাতে আর একটা জিনিস

থাকে—ভারতবর্ষের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে-ওঠা বিদ্যুতের মতো

আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একখানা ছুরি।।

এই সময়ের শেষ দিকে কবিতায় ছাপ ফেলেছিলেন দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, গোবিন্দ ভট্টচার্য, অজিত বসু প্রমুখ। দীপের এক দুঃখী বাল্য-তারুণ্যকে স্মরণে রেখে সুন্দরবন থেকে শুরু করে কলকাতায় বস্তি ও অবহেলিত জীবনকে সমাজ পরিবর্তনের তাৎপর্যে তুলে ধরেছেন। তিনি যেমন রাখাল বালকের সঙ্গে হেঁটেছিলেন তেমনি হিমালয়ের কল্পিত হরিণের পায়ে পায়ে হেঁটে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানুষের রূপ দেখেছেন। তাঁর রচনায় মেলে দুঃখী ও ক্ষুধিত মানুষের ধৈর্যবান সংগ্রামী অভিযাত্রা। তিনি অনায়াসে বলেন,

মানুষের যে চেতনা মৃত্যুসীমা ছুঁয়ে

গাছের ডালের ওপর নির্ভরতায়

শুয়ে থাকে শিশু মা-র বুকের ওপর

কলকাতা কি তাকে ছুঁতে পারে।

বানভাসি অভিজ্ঞতা।

শিশির সামন্ত অনেক বেশী বুদ্ধিবাদী। তাঁর রচনায় আছে আমাদের ক্লিষ্ট মুহূর্তগুলিকে শব্দের সম্মোহনে আর্দ্র করে নির্জন ব্যবহার করে জাতীয় অভিব্যক্তি তুলে ধরতে।

রাজা চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তবে তা কবিতার শর্ত মেনেই। সহজ উচ্চারণ তাঁর—

কে বলে ভয় নেই, পতাকা লাল রঙ, গোলাপে কাঁটা আছে

তবু সে সুন্দর

তবুও ঝড় আসে, তবুও ছায়াগাছ, তবুও রোদ্দুরে

একলা পড়ে আছে

তবুও প্রতিবাদ, তবুও ধুলো ওড়ে, সোনার মেঘে মেঘে

ব্যাকুল ছায়াগাছ।

পার্থ রাহা সমাজমনস্ক। দার্শনিকতায় উজ্জ্বল। মননদীপিত। তবে আঙ্গিক সচেতন। তাঁর উচ্চারণে মাত্রা পায়—

তোমার হৃদয়

হয়তো আমার জন্য কোন ঘর

স্থির করা নেই

হয়তো আমার জন্য তোমার চোখের শিরায়

জ্যামিতিক রেখায়

কোন স্বর্গ নেই

হয়তো আমার জন্য

মৃণাল বসুচৌধুরী পরেশ পুষ্কর সজলের মতো বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষপাতি এবং আঙ্গিকেই দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত খন্ড খন্ড চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে কবিতায় আনেন বিকুল ব্যঞ্জন। তিনিও সমাজমনস্ক।

কালীকৃষ্ণ গুহ রোমান্টিক, বিষণ্ণ, বিশুদ্ধ কবিতায় আস্থাবান। শব্দ সচেতন এই কবির মধ্যে বিষয়ের চেয়ে আঙ্গিকেরই প্রাধান্য লক্ষিত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সামসুল সমাজমনস্ক। প্রতীক ও চিত্রকল্পের অভিনবত্বে তিনি স্বাতন্ত্রের দাবি রাখেন।

সান্তনু দাস সপ্রতিভ, ঝকঝকে। তাঁর মধ্যে অতৃপ্তির জ্বালা তীব্র। তাঁর রচিত 'জটায়ু' কবিতাটি আজো অনেক পাঠকের চেতনাকে চাবুক মারে।

তুলসী মুখোপাধ্যায় ক্রোধী, অভিমানী। সমাজ সচেতন এই কবি ব্যঙ্গবিদ্রূপে অসামান্য। মানুষের প্রতি সীমাহীন মমতায় তিনি ফালা ফালা করে দেখেন সুবিধাবাদের, ভন্ডামি, রাজনৈতিক নেতাদের চালটুসগিরি। তিনি তীক্ষ্ণ, তীব্র, ঝকঝকে খোলা তরোয়াল।

তুষার রায় ছিলেন প্রবাদের মতো। স্পষ্ট। দীপ্ত অনুভব ছিল বেশি ক্ষিপ্ত।'ব্যান্ড মাস্টার'। গ্রন্থে ধরা পড়েছে এমন উদ্দাম মুহূর্ত—যে মুহূর্তগুলি চল্‌তি জীবনধারণাকে গুঁড়িয়ে দেয়। যেমন—

পেশী ভ্যানাটনি শিরাতন্ত্র দেখাতে মশায়

আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া

নিজেই শরীর থেকে টেনে,

তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ

গনগণে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার

রুমাল নাড়ছি

নিভে গেলেই ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন

পাপ ছিলো কিনা।

তুষার স্বভাবোক্তি উচ্চারণকে কবিতা করতে চেয়েছিলেন আর তাঁর এই ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি পদ্যগদ্যের একধরনের সমীকরণ ঘটায়-যা অনেক বেশি তত্ত্বসমূহ হয়ে ব্যক্তিজীবনের প্রতীকের সঙ্গে সমাজ জীবনকে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন ক্ষুধার্ত আন্দোলনকারীরা, বিশেষ ভাবে মলয় রায়চৌধুরীর। যাইহোক ষাটের দশকে তো কম কবি কবিতা লেখেন নি। তবু বলব-উত্তর উপনিবেশিক কবিদের সেই গুরুত্বের দিক যা কার্যত সুভাষ-সমর-মনীন্দ্র-সুকান্ত-বাস-তরুণ-যুগান্তর প্রভৃতিরই সৃষ্টিশীল ধারার নিজ সময়কে আপন মহিমায় বিশ্লেষণ।

বাংলা কবিতার ধারা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিবাদী। সেই চটাপদের সময় থেকেই তা পরিলক্ষিত। তবে বিশ শতকের তিরিশের যুগের আধুনিকেরা যেখানে যুরোপকে মনে করেছিলেন কলকাতা পরবর্তীকালের কবিরা তা থেকে হন মুক্ত। ষাটের কবিদের প্রধান প্রবাহই স্বদেশে গেয়েছিলেন আন্তর্জাতিকতার স্বাদ, মুক্ত মানবিকতার মুখাবয়ব।

বাংলাদেশের কবিতা ঃ প্রতিবাদে, প্রেমে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

কবিতার কোনো দেশ-কাল ভেদ নেই। কবিতা স্বরমাগতা, কবিতা সর্বত্র গামিনী। তবু রাজনৈতিক, কূটনৈতিক কারণে, জাতি বিদ্বেষের দরুণ কবিতারও জাত-বিচার, শ্রেণী বিভাজন ঘটে। বাংলাদেশের কবিতা এমনই শ্রেণীভাগের ফসল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হয়ে। বঙ্গদেশও হলো দু টুকরো—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। দুই দেশের মানচিত্র আলাদা হলো বটে, ভাষা একই। বাংলা ভাষা। আর সেই ভাষার জন্য ওপার বাংলার দামাল ছেলেরা প্রাণ দিলো—যা আজ ইতিহাস। রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটা তারিখ মাত্র নয়, ঐতিহাসিক তথ্য নয়;; তা ভাষার প্রেমে আত্মদানকারী বাঙালির গর্বের, গৌরবের দিন। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের নতুন জন্ম ১৯৫২ তে। বাংলা ভাষার নতুন শক্তি ও দীপ্তিও এইসময়। পাকিস্তানে বসবাসকারী কবিরা কবিতা লিখেছেন ঠিকই। কিন্তু তা যতকানি প্রথানুগ, ততখানি প্রাণবস্তু নয়। ইসলামী দর্শন, ধর্মপ্রাণতা বা গোঁড়ামি এঁদের বিচারমূঢ় করে রেখেছিল। তাই "পূর্বপাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের কবিদের আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু যে-বস্তুর অভাব ছিল যে হচ্ছে প্রজ্ঞা।" (দ্র. আমাদের সাহিত্য / সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত / বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯)। এই প্রজ্ঞা ও প্রেমের 'যুগল মিলন ছাড়া ভালো কবি হওয়া সম্ভব নয়। ভালো কবিতারও জন্ম হয় না। অন্যদিকে আমরা এও জানি 'অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে' যা জীবনানন্দ দাশ ঈষৎ অন্য স্বরে বলেছেন—'কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।' অনন্ত দ্বন্দের কোলে আন্দোলতি হতে হবে। আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে—"১৯৫২, ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—বাংলাদেশের কবিতাকে এক সম্পূর্ণ-নতুন বাঁক দিয়েছে" যাকে আমি অশান্তি বা আঘাত বলেছি, তা এই-ই। বাংলাদেশ নিজেকে চিনেছে ও প্রতিষ্ঠিত করেছে এই দুটি ঘটনায়। কবিরাও সেই কালের দংশনে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠেছে বিষানৃতময় অনুভূতি। যার কেন্দ্রে আছে বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ। অথবা দুইয়ে মিলে একটি সত্তা। কবি শাসসুর রহমানের ভাষায়

> তোমাকে উপ্‌ড়ে নিলে
>
> বল তবে
>
> কি থাকে আমার?
>
> বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

বাংলাদেশের কবিরা পরম যত্নে ও মমতায় এই দুঃখিনী বর্ণমালা গেঁথেছেন। সেই মণিহার দুলিয়ে, দিয়েছেন তাঁদের সোনার বাংলার গলায়।

তবু একথা ঐতিহাসিক সত্য, এপার বাংলার কবিরা ওপার বাংলার কবিদের প্রভাবিত করেছেন। বিশেষ ভাবে তিরিশ ও পঞ্চাশের কবিরা ভাষা-ভক্তিতে বাংলাদেশের কবিদের উজ্জীবিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং জীবনানন্দকে বাদ দিলে কল্লোল গোষ্ঠী থেকে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিকুল নানাভাবে বাংলাদেশের কবিতায় ছায়া ফেলেছেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাই কবি শামসুর রাহমানকে বলতে হয়— শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায়

আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে

অবরাম।

যদিও "আমাদের সাহিত্য" গ্রন্থে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এই অভিমত জানিয়েছেন, পঞ্চাশের বা পাঁচের দশকের কবিরা 'পাকিস্তান আন্দোলননের কবি' এবং ষষ্ঠ বা ষাটদশকের কবিরা 'ভাষা আন্দোলনের কবি' ওই একই সংকলনে বোরহানউদ্দীনখান জাহাঙ্গীর মন্তব্য করেছেন, আবুল হোসেনের কথ্যরীতি অমিয় চক্রবর্তী অনুসারে। আহসান হাবীবের সমাজ সচেতন কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রেরঐতিহ্য দেখেছেন। আর ফারুক আহমদের ঐতিহ্য চেতনা যে এপার বাংলার তিরিশ বা তিন দশকের কাব্যদর্শ থেকে এসেছে, তাও জাহাঙ্গীর লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং দু'পার বাংলার কবিতা সংকলন "কালের কবিতা" প্রকাশ করতে গিয়ে কবি শান্তনু দাস ভূমিকায় যথার্থ বলেন, "সালে তৎকালীন পূর্ববাঙলা অধুনা বাঙলাদেশের কবিদের তথাকথিত অর্থে আধুনিকতার শুরুই হয় আমাদের পঞ্চাশের কবিদের সময়কার শাসসুর রাহমান, আলমাহসুদ, শহীদ কাদরী প্রমুখ কবিদের সময় থেকেই, "যদিও মূল সূত্র রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিরা। তুব বাংলাদেশের কবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে প্রেমে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে। একই সঙ্গে যা অভিন্নভাবের সুর রচনা করেছে।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে। "উর্দু মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা। যে এই ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলিবে সে কাফের" এমন ফতোয়ার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশের বাংলাভাষা প্রেমিকেরা। দাঙ্গা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। ' আমরা শক্তি আমরা বল / আমরা ছাত্রদল' এই বিশ্বাসে ভাষার মান বাঁচাতে 'প্রাণ দেয় আবদুল বরকত। নিহত হন আরো অন্যান্য বৃত্তির মানুষও। মুস্তাফা সারওয়ারের ভাষায় 'মাতৃভাষার ডাকে আজ বাংলাদেশ জাগে' হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় লেখা হয় —

বরকতের রক্তাক্ত শার্টের জ্বল জ্বলে রঙ

অবিনাশী সূর্য

আর শামসুর রাহমানের কলমে পাই—'আমাদের সার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা' কিংবা তিনি লেখেন, 'সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা' এই ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিতে দশ ফুট উঁচু ইঁটের শহীদ মিনার তৈরী হয়—'একটি রক্তপদ্ম, বাঙালীর আত্মোৎসর্গের প্রথম শহীদ মিনার'। শাসকশক্তি একে ভেঙে দিলে আলাউদ্দিন আলআজাদ লেখেন—

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু,

আমরা এখনো চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো।

আবদুর গফ্ফর চৌধুরীর গান ধ্বনিত হলো সর্বত্র—

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি?

এই ভাষাপ্রেমই দেশপ্রেম হয়ে উঠেছে সত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। ফরহাদ মজহারের চোখে মাতৃভূমি মা ও প্রিয়া। তাঁর লেখা মাতৃভাষা / মাতৃভূমি' কবিতায় আম্মা ও প্রিয়াকে তিনি এই আশ্বাস দেন—তোমার পতিত জমি এবার আবাদ করবো ফলবে সোনা।

১৯৭১ এর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান বাসীদের সঙ্গে খান সেনাদের প্রবল যুদ্ধ হয়। নিজের দেশ, স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্নে এই লড়াই। স্বাধীনতার এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওপার বাংলার বহু বুদ্ধিজীবি, কবি, শিল্পী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। সে আজ ইতিহাস। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত ১২ ডিসেম্বর (১৯৭১) স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এই যুদ্ধ ও স্বাধীনতা কবিদের কাব্যে গভীর ছায়াপাত করেছে। যেজন্য কবীর চৌধুরী বলেছেন, "বাংলাদেশের কবিতা আলোচনা সম্পূর্ণই হতে পারে না মুক্তি যুদ্ধের কবিতাবলী বাদ দিয়ে।" কিছু মুক্তিযুদ্ধের কবিতা উদ্ধৃত করে দেখা যেতে পারে কবিরা সমকালস্পৃষ্ট কতখানি।

১. আলাউদ্দীন আল-আজাদ ঃ

আকাশপাতাল

জুড়ে নবরূপী দানবের হুঙ্কার

শুনছি এবার। (আত্মচিত্র)

২. শামসুর রাহমান ঃ

অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ

ক. আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার? (টেলেমেকাস)

খ. স্বাধীনতা তুমি

উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ীর কাঁপস। (স্বাধীনতা তুমি)

৩. শহীদ কাদরী ঃ

বেরিয়েছি ২৭শে মার্চের সকালে

কান্নাকে কেন্দ্রীভূত করে

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলায় (নিষিদ্ধজনাক বেড়ে)

৪. নির্মলেন্দু গুণ ঃ

আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

আইয়ুবখান এখন কোথায়?

শেখমুজিব কি ভুল করছেন?

আমার নামে কতদিন আর এরকম হুলিয়া ঝুলবে ? (হুলিয়া)

৫. মহাদেব সাহা ঃ

দূতাবাসে উড়ছে পতাকা

অর্থাৎ স্বাধীন আমরা একথা মানতেই

হয়, রাষ্ট্রীয় সনদ আছে দেশে

দেশে আমরা স্বাধীন ; (ফিরে দাও রাজবংশ)

৬. আল মাহমুদ ঃ

আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে

দাঁড়িয়েছে পাশে। (পালক ভাঙার প্রতিবাদে)

৭. আবুজাকর ওবায়দুল্লাহ ঃ

আমি প্রার্থনা করেছি

আমি প্রদোষকাল থেকে রক্তিম প্রত্যুষ অবধি

প্রার্থনা করেছি।

আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি।

(বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা)

ভাষা আন্দোলন আর মুক্তি যুদ্ধ কবিদের যে দুঃসময়ের মুখোমুখি করেছিল, তাতে তাঁরা

ভেঙে পড়েন নি। "আগ্নেয়াস্ত্র' কবিতায় নির্মলেন্দু গুণ জানিয়েছিলেন, পুলিশ স্টেশনে সব অস্ত্র জমা দিলেও তিনি 'হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র' জমা দেন নি। রফিক আজাদ স্পষ্টই বলেছেন, "সমস্ত ধ্বংসের পরেও জেগে থাকে শুধু প্রেম।" এখানেই লুই আরাগর সঙ্গে তুলনা করেছেন ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর "বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়" গ্রন্থে। বলেছেন, 'প্রতিরোধের সংকল্প থেকে জন্ম নিয়েছিল অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতা' রফিক আজাদ এইজন্য স্বীকার করেন—

তোমার ওষ্ঠের স্পর্শে জেগে উঠি ঘনিষ্ঠ জীবনে,
শাদা দেয়ালের গায়ে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস্য
রঙের বাহার (তোমাকে কাছে পেয়ে)

কিংবা সানাউল হক লেখেন—

সন্ধ্যায় তুমি আসবে বলে
একটি সম্পূর্ণ বিকেলকে আমি
কাঠের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম (অষ্ট প্রহরিকা)

চমৎকার চিত্রকল্পে প্রেমের ব্যাকুলতা, ইচ্ছা, বাসনাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন আবু কারসার—

তোমাকে দেখব বলে জানালায় একখণ্ড শশব্যস্ত মেঘ
হঠাৎ বাড়ালো গ্রীবা, যেন এক দলভ্রষ্ট ক্ষুধার্ত জিরাফ
পেয়েছে গুল্মের ঘ্রাণ। (আশ্বিনের ক্ষুধার্ত জিরাফ)

কিংবা হুমায়ুন কবিরের সংবেদনাশীল অনুনয়—

তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলনি তো কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতলার টবে
নিরিবিলি কটা ফুলে তুমি ছিলে একা
(পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে)

আবদুল মান্নান সৈয়দের মরমী অনুভব—

সহসা তোমাকে দেখে ভেসে যায় দিন অনুদিন,
ইস্পাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছো প্রজাপতি,
বস্তুর ভিতরে থেকে উড়ে চলো ভিতরে আমার

উড়েছো পাথরে তুমি, উড়েছো অগ্নিতে।

(একটি জাগরণ)

মেটাফিজিক্যাল কবি ডানের মতো কল্পনার অভিনবত্ব দেখিয়েছেন সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। তাঁর 'ঈর্ষা' কবিতায় যন্ত্রযুগের অনুষঙ্গে প্রেমিকার সান্নিধ্য খুঁজেছেন। ব্যক্তির সঙ্গে নারীর সংযোগ নেই অথচ জড় পদার্থ-তাকে পাচ্ছে, এমন আশ্চর্য কল্পনায় কবি বিরহী ; ঈর্ষাতুর। তাঁর প্রেমিকাকে টেলিফোন করে কাছে ডেকে নেয়, টি.ভি. দখল করে রাখে। তারপর

কবিতার বই মুগ্ধতার ধরে রাখে তোমার দুচোখ

চায়ের পেয়ালা সকাল বিকাল প্রায়ই তোমাকে চুমু খায়

আমার খুবই হিংসে হয়

আমার খুবই হিংসে হয়।

"মহিলা কবি' শব্দটি নিয়ে ইদানীং আপত্তি উঠেছে। নারীবাদী কবিরা ক্ষোভ জানিয়েছেন। তবু যেসব মহিলারা কবিতা লেখেন, তাঁদের কিবাবে চিহ্নিত করা যায়, জানি না। বাংলাদেশে মুসলমান মেয়েরা প্রথা বা সংস্কার ছেড়ে কলম তুলে নিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার কথা তো সবার জানা। একালের বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের মধ্যে তসলিমা নাসরিন প্রচুর খ্যাতি-অখ্যাতির মধ্যমণি। প্রেমের বদলে তিনি দেখেছেন মেয়েরা অনুশাসনে ও নিষেধে বন্দিনী—

বোধোদয় হবার পর সে যখন পৃথিবীর

রূপরসগন্ধ ও বর্ণ দেখবে বলে

চৌকাঠ ডিঙোতে চাইল,

তাকে বলা হল-না এই দেয়াল দিগন্ত রেখা

এই ছাদ তোমার আকাশ। (সীমানা)

অন্যদিকে জরিনা আখতার লিখেছেন বেদনায়, প্রেমে—

এতো পদ্ম হয়ে কবে ধরা দিলে!

মুঠো আল্‌গা করতে ছড়িয়ে পড়ল সব

যেন অবুঝ শিশুর কলহাসিতে ভরে উঠলো ঘর। (পঙ্কজ)

আর সুরাইয়া খানম্‌-এর অনুভূতি দ্বন্দ্বে-ছন্দে ভরা—

তুমি আমার বিশুদ্ধ জল, তুমি আমার পাপ

তোমায় ফেলে কলসী ভরে রাখবো মনস্তাপ?

তুমি আমার সোনার খনি, তুমি বিষের ঘড়া,

তোমায় পেলে দুয়ার খুলে আনবো মৃত্যু জরা?

(অমর পূর্ণিমা)

সব দেশের প্রেমের কবিতায় বিষাদ, যন্ত্রণা যেমন মিশে থাকে, তেমনি প্রকৃতি, নারী ও প্রেম একাকার হয়ে যায়। বাংলাদেশের কবি ও কবিতা তার ব্যতিক্রম নয়।

১. তোমার বুকে আমি পাহাড়ি ঝর্ণার
এক অজ্ঞাত শব্দ শুনেছিলাম,
তোমার চোখে দেখেছিলাম, বন্য হরিণীর চঞ্চলতা; (অসীম সাহা)

২. আমার ঠোঁট তৃষ্ণার্ত তটরেখার মতো ডাকছে
—তুমি এসো। (শোনসুর রাহমান)

৩. তুমি জানো, পাড়া প্রতিবেশী জানে
পাই নি তোমাকে,
অথচ রয়েছে তুমি এই কবি সন্ন্যাসীর ভোগে আর ত্যাগে। (হেলাল হাকিজ)

৪. এই তো সরজমিন তাপিত প্রান্তর, খরদাহ
অরণ্যায়ন করো হে নারী,
দ্রাবিড় মাটির কণা পাললিক জলবায়ু দাও
অনন্য উঠোন ঘরবাড়ি। (আল মুজাহিদী)

৫. মধ্যরাতে অপাঠিত পুস্তকের পাতার মতন
রহস্যময় তোমার অবাণীবদ্ধ অবয়ব (ফারুক আলমগীর)

৬. সুলতা জানে, সুলতা জানে ভালো,
আকাশে মেঘ—দীঘিতে কেন হাঁস,
সুলতা জানে, সুলতা জানে ভালো
কবিরা কেন নারীর ক্রীতদাস! (সিকদার আমিনুল হক)

৭. তোমার জন্যে লোকালয়
হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি,

তোমার জন্যে করি জয়

অভাবের ক্ষিপ্ত তরবারি। (আলমাহম্মদ)

৮. নিবিড় শরীর গভীর করে দাঁতে কাটি

বুকে পিষি ঘাসের শরীর—আঁসাটে গন্ধ

শরীর দিয়েই শরীর থেকে শব্দ এবং আগুন। (বেলাল চৌধুরী)

এবাবেই ওপার বাংলার কবিরা রচনা করেন তাঁদের ভাষার মুদ্রা। অনুভবের অভিজ্ঞান। এপার বাংলায় এসে লাগে সেইসব শব্দের তাপ ; হৃদয়ের উষ্ণতা। অসাধারণ কোনো ভাঙচুর ভাষায়, প্রকরণে হয়ত নেই। কিন্তু আছে মমতামেদুর নির্মাণ। বাংলাদেশের জল-মাটি-ঘাস-হাওয়া এসে কবিতাগুলিকে লালন করেছে। তুব সেখানে ও পাই সেই একই ক্রোধ, আনন্দ, শোক, সুখ শিহরণ। ভাষার জন্য, প্রিয় মানবীর জন্য তারা একই দাহে, দ্রোহে দীপ্তিমান্। একালের সব কবিই দেখা যায় উপমা ও চিত্রকল্পে ঈর্ষণীয় দক্ষতা দেখান। বাংলাদেশের কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন। 'লাল পাগড়ীপরা পুলিশের মতো কৃষ্ণচূড়া' 'স্টেনলেস ব্লেডের মতো ধারালো দৃষ্টি' 'ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ' ইত্যাদি পাখির নজরে চোখে পড়ে। যা আরো বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা শুধু বাংলাদেশের কবিতায় খুঁজেছি কবিদের বিখ্যাত হৃদয়—যা প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল। আর প্রেমে করুণ-রঙিন এবং স্পন্দমান। সেই হৃদয়ের নাড়ীতে হাত রাখার জন্যই এই কবিতা পড়া।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ পুনর্পঠন

দীপেন্দু চক্রবর্ত্তী

সুকান্ত কিশোর কবি, সুকান্ত যুগের কবি, সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কবি, সুকান্ত আদৌ কবি নন, শুধুই পদ্যকার ; অথবা সুকান্ত কালোত্তীর্ণ এক মহান কবি, তাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের সঙ্গে তাঁরও জন্ম-জয়ন্তী পালন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই রকম কয়েকটি পরিচিত ছকে সুকান্ত এখনও বন্দি হয়ে আছেন, পুনর্পঠনে তাঁর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে হয়। যেহেতু ক'দিন আগেই সুকান্তের পঁচাত্তরতম জন্মদিন পালিত হল। তাঁর শতবর্ষ পালনের আগেই বাংলা কাব্যে তাঁর স্থান নির্ণয়ের একটি নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত ও নিবিষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিপথ সেদিকে।

প্রথমেই ধরা যাক 'কিশোর কবি' কথাটা।' 'কিশোর-বাহিনী'র সঙ্গে যুক্ত থাকায় বোধহয় সুকান্তর পিঠে এই 'কিশোর' ছাপটি লেগে গেছে। কিশোর কবি বলতে কোন বয়সের কবি বোঝায়? সুকান্ত মারা গেছেন একুশ বছর বয়সে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র'ও প্রকাশিত হয় একই সময়ে। ১৯৪৭ সালে। একুশ বছরকে কী করে কিশোর বয়ঃসন্ধিকাল, বাল্যকাল ও যৌবনের মাঝামাঝি ; অভিধান অনুসারে বারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত। শাস্ত্রে আছে ষোল বছর হলেই পুত্রের সঙ্গে পিতা বন্ধুবৎ আচরণ করবেন। ইংরেজিতে 'টিন-এজার' কথাটা ধরলেও সুকান্তকে কিশোর কবি বলা যাবে না আজকের নিরিখে। যদিও শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন বয়সের এই পর্ব সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা কখনই সহজ নয়। এবং সর্বজনস্বীকৃত কোনো মাপকাঠি পৃথিবীর সর্বত্র প্রয়োগ করা হয় না আমাদের দেশে এখন ১৮ বছর বয়সে ভোটদানের অধিকার থাকায় 'কিশোর' কথাটার সাবেকি ধরাণাটা বাতিল হয়ে গেছে। আসলে 'কিশোর' কথাটা যতটা না বয়সের ব্যাপার তার চাইতেও বেশি একটি বিশেষ সংস্কৃতির ধারক, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় culture-specific।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনা মূলত পাশ্চাত্যধারার অনুবর্তী হলেও আমাদের সংস্কৃতির নিজস্ব কিছু প্রবণতা যে তার গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকটাই, সেটা এই উত্তর-উপনিবেশিক যুগে আমাদের ভরসা জাগায়।

তবে স্বদেশী সংস্কৃতির সব অভ্যাস আচরনই যে-নিরাপদ এমন বিশ্বাসেরও কোনো ভিত্তি নেই। যেমন সাহিত্য বিচারে বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক বৃত্তে অতীতের বাঙালি সাহিত্যিকেরা বরাবর বিশেষ বিশেষ উপাধিতে এমন চিহ্নিত হয়ে গেছেন যে তাঁদের মূল্যায়নের সীমানা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ 'কবিগুরু', শরৎচন্দ্র 'অমর কথা শিল্পী' বঙ্কিম তো

একেবারেই 'ঋষি', নজরুল সারাক্ষনই 'বিদ্রোহী কবি', সুতরাং সুকান্ত যে 'কিশোর কবি' হবেন তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। গালভরা কোনো উপাধি যখন তাঁর উপযুক্ত নয়, তখন একমাত্র তাঁর অকালমৃত্যুই অ্যাকাডেমিক সমালোচকদের উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অজুহাত। যাঁরা এই বয়স দিয়ে কবির জাত নির্ণয় করার খেয়ালীপনা কেই সুকান্তর যোগ্য স্বীকৃতি বলে মান্য করে, এসেছেন তাঁরা ভেবে দেখেন নি যে এই নিয়মে 'কিশোর কবির' মত 'যুবক কবি', এমন কী 'বৃদ্ধ কবি'ও তো বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে তাহলে বিশ্বকবির সঙ্গে 'বৃদ্ধকবিই বা বলা হবে না কেন ?

ইংরেজ কবি চ্যাটার্টন ১৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কিশোর কবি বলে কখনই আলাদা করা হয় নি। খেলার মাঠে জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপ বলে যে পৃথকীকরন করা হয় সাহিত্য বিচারে কি তা সম্ভব ? তা হলে তো কীটসের সঙ্গে ইয়েটসের তুলনাই চলে না। সাহিত্যের ইতিহাসে স্বল্পায়ু কবি ও দীর্ঘায়ু কবির পৃথক মূল্যায়ন হলে অবশ্য মন্দ হত না। তাতে অন্তত অন্য অর্থে একটা সুবিচার হত সুকান্তর প্রতি। আবার এমনও যদি হত যে সুকান্ত একুশ বছরে কবি হিসেবে যে স্তরে পৌঁছেছিলেন বিখ্যাত বাঙালি কবিরা একই বয়সে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যাই সুকান্ত অনেককেই ছাড়িয়ে যাবেন, যেমন ছাড়িয়ে যাবেন কীটস। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ঠিক এই পদ্ধতিতেই ঘায়েল করেছেন সেইসব সমালোচকদের যাঁরা একুশ বছরের এক কবিকে অনুকম্পামিশ্রিত বাহবা দিয়েছেন। (নতুন সুকান্ত, গণশক্তি ১২,৮,০১)। তিনি দেখিয়েছেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, এমন কী রবীন্দ্রনাথও এই বয়সে যা লিখেছেন তা সুকান্তর তুলনায় অনেক বেশি অপরিণত। সুকান্ত যুগের কবি —এ আর একটি সংস্কার। যুগের কবি বলতে বোঝায় তাঁর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা শুধু তাঁর সমকালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, তাঁর যুগোত্তীর্ন হবার যোগ্যতাও নেই। মহৎ কবি সমকালের সন্তান হয়েও কালোত্তীর্ন হন—এই ধারণাটি আমাদের সাহিত্য-বিচারের একটি অন্যতম স্তম্ভ। যদি কেউ বলেন, এখনও সুকান্তসমগ্র বিক্রি হয়, এখনও তাঁর স্মরণে নানান অনুষ্ঠান হয়, তবে তার উভয়ে আমাদের জানা। সুকান্ত একটি প্রভাবশালী বামপন্থী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এখনও বেঁচে আছেন ; তা যদি না হত দবে তাঁর খ্যাতিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মতই স্বল্পায়ু হত। এ যুক্তি অনেকাংশে ঠিক, তবে তা শুধু সুকান্তের ক্ষেত্রেই এমন ভাবটা অযৌক্তিক। শাশ্বত, চিরন্তন, সার্বজনীন ইত্যাদি ধারণাগুলো কখনই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এদের পেছেনে প্রায়শই দেখা যায় এক ধরনের সাংস্কৃতিক রাজনীতি (politics of culture) খোদ ইংলন্ডেই শেকসপীয়রের চিরন্তনতায় যা দিয়েছেন আজকের তাত্বিকেরা। অ্যাকাডেমিয়া বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রকাশনা সংস্থা, বেতার-দূরদর্শন এবং সর্বোপরি একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা এসবের প্রভাব ও মধ্যস্থতায় কিছু কিছু লেখক অবশ্য পাঠ্য হয়ে ওঠেন। এই ক্যাননের আধিপত্যই আজ নানান প্রতিরোধে বিপন্ন। শুধু তো post-

structuralist, post-modermist, post-colonialist— রাই নয়, সনাতন মার্কসবাদও চিরন্তন ও বিশ্বজনীন বলে কোনো ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় নি ; আধুনিক মার্কসীয় তত্ত্ব তো আরো বেশি আরো বেশি আক্রমণাত্মক এই ক্ষেত্রে।

সুকান্তকে বাঁচিয়ে রাখার যে-প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন তা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা হয়। এমন যে অর্ন্তমুখী ব্যক্তিক বিষন্নতা কবি জীবনানন্দ তিনিও নবজীবন লাভ করেছেন বাংলাদেশে প্রধানত রাজনৈতিক তাগিদেই। যেটা দেখা দরকার তা হল এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক মধ্যস্থতার বাইরে পাঠক তাঁর নিজস্ব ভুবনে সুকান্তকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন বা করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আমার অনেক অনেক আগেই সেই পঞ্চাশের দশকেই একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যার নাম এইচ. এম. ভি, বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল সুকান্তের কবিতায় এখন কিছু আছে যা মানুষের চেতনাকে খুব আন্তরিকভাবে ছুঁয়ে যায়। আই পি টি এ সাংস্কৃতিক চেতনা বিস্তারে যেটুকু সাফল্য পেয়েছিল তার সম্ভাবনাময় বিপণনে এইচ এম ভি সুকান্ত সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সমন্বয়কে অপরিহার্য মনে করেছিল। ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল 'রানার', 'অবাক পৃথিবী', 'বিদ্রোহ চারিদিকে'। শুধু সলিলের অনন্য সুর ও হেমন্তর স্বর্ণকণ্ঠ একটা সফল হত না যদি তার সঙ্গে সুকান্তর মর্মস্পর্শী ভাষা যুক্ত না হত।

সুকান্তর ভাষা বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই সাধারণের ভাষা হয়ে উঠেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে-কবির সংজ্ঞা দিয়েছেন (man speaking to men) তার যথার্থ রূপায়ন শুরু হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসীয় মতাদর্শের প্রেরণায় । বাংলায় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের অভিঘাতে তারই অনুকৃতি ছড়িয়ে পড়ে চল্লিশের দশকে। এ এমন সময় যখন সদ্যজাত শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম বাঙালি লেখকদের রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রবিরোধী মডানিস্টদের অবক্ষয়ী বাস্তবতা এই দুটি ধারার বিপরীতে জনমুকী সাহিত্যের তৃতীয় একটি পথ খুলে দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা এমন একটা টালমাটাল সময়েই বলা উচিত। প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, অথবা 'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না ?' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই উচ্চারণ ইস্তেহারের মত শোনালেও সময়ই তাতে সমর্থনের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দেয়। 'রোম্যান্টিক কবিতায় সুভাষ 'কাব্যের প্রতিপক্ষে' থাকার অঙ্গীকার করে ঘোষণা করেছিলেন, 'সেই কথাটা বাধে না নিজেকে বলতে/শুনবে যে-কথা হাজার জনকে বলতে ।'

সুকান্তও সেই কথাটা বলতে চেয়েছেন, এবং হাজার জনকেই তাই তাঁর ভাষায় এসেছে গদ্যের সরলতা। কবিতাকে তিনি ছুটি দিয়েছেন গদ্যের কাছে এনে, তাই কবিতা দিয়েই কবিতার বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। এটি একটি প্যারাডক্স বটে, কিন্তু কবিতা এখানে দুটি ভিন্ন ঐতিহ্য ও

সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিপরীত অর্থ বহন করে। কবিতার স্নিগ্ধতা নয়, প্রয়োজন গদ্যের কড়া হাতুড়ি, কারণ এ তো ক্ষুধার রাজ্য স্বপ্নের বা কল্পনার রাজ্য নয়, 'পূর্ণিমার চাঁদ তাই ঝলসানো রুটি।' চাঁদ নিয়ে কবিদের মত না কল্পনা বিলাস, সুকান্তর ভুবনে চাঁদ যদি উঁকি দেয়, তবে তা হয়ে যায় ঝলসানো রুটি। উপমা হিসেবে প্রথমপাঠে তা খুবই সরলমনে হয়। আকারে ও রঙে পূর্ণিমার চাঁদ তেমনই দেখতে লাগে। তাই বলে ক্ষুধার্ত লোক চাঁদকে রুটি হিসেবে দেখবে ? অনেক সমালোচকই কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা দেখেছেন এ ক্ষেত্রে, এবং তাঁরাই চ্যাপলিনের গোল্ডরাকে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে আর একজন মানুষকে টার্কি জাতীয় প্রাণীর চেহারা ধারণ করতে দেখে বলেন, 'এসেই বলে মহৎ আর্ট'। টি এস এলিয়ট সন্ধ্যার বর্ণনা দেন অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান করা এক রোগীর সঙ্গে —ওটা কৃত্রিমতা নয়। মায়াকভাস্কি লেখেন—ট্রার্ডহার্স পরা মেঘ, বেশ লাগে ভাবতে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয় যখন সুকান্ত (১লা মে-র কবিতা '৪৬) কুকুরের শেকল-চিহ্নিত ঘাড়ে 'সিংহের কেশর' দেখতে চান।

সুকান্তর সরলতা অনেকের কাছেই কিঞ্চিৎ শিশুসুলভ লাগে ; তা যদি ব্লকের নায়েভিটি হত তবে নিন্দনীয় হত না, কিন্তু এ যে রাজনীতির কথা সরলভাবে বলা ।

ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে।

ধর্মীয় মিস্টিসিজমের সরলতা, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় প্রকৃতি প্রেমের সরলতা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষাগত সরলতা, এ সব সহনীয় ; সহনীয় নয় শ্রেণীসংগ্রামের সরলতা। 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন'—এমন অহংকারের সরলতা কি সমর্থনযোগ্য ? শুধু রাজনীতি বিরোধী বিশুদ্ধ-কাব্যের মুখমাত্রই নয়, পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অনেক বামপন্থী কবিও এই সরলতা, এই গলা-ফাটানো চিৎকার এসব কাব্যের অপরিপক্কতার লক্ষণ হিসেবেই দেখে থাকেন। তাঁরা অবশ্য মায়াকভস্কির সেই কবিতাটির শিরোনামটিই মান রাখেন না 'At the Top of My Voice', যেখানে তিনি বলেন, 'আমি আমার গানের গলা গোড়ালি দিয়ে চেপে রেখেছি' অথবা 'আমি চাই আমার কলমটা বিয়নেটের সমান সমান হয়ে উঠুক।'

ইতিহাস দেখায় যখনই পালা বদলের সময় আসে, যখনই ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ হয়, তখন কবিতা আর শ্লোগানের সীমারেখা মুছে যায়। ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বা আটষট্টি দুনিয়া জোড়া ছাত্র ও শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের লড়াই পর্যন্ত কবিতা সেই ভাষাই খুঁজে গেছে যা শোষিত মানুষের যন্ত্রনার কথা যেমন দরজা দিয়ে ফোটাতে পারে। তেমনি সংগ্রামের

ডাক দিতে পারে শোচ্চারে। উচ্চারণের স্পষ্টতা যেমন দেখি পল এলুয়ারের 'স্বাধীনতা' কবিতায় তেমনি দেখা যায় 'বিদ্রোহ আজ' উক্তিটির পুনরাবৃত্তিতে সুকান্তর নানান কবিতায়।

তাই বলে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে সুকান্ত 'আগে আমি কমিউনিষ্ট তার পর কবি' এমন বিবৃতি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কবিতার গতিপথ ছিল সরলরৈখিক। বৈচিত্রের সন্ধান তাঁর বিভিন্ন কবিতায় চিহ্ন রেখে গেছে। 'ছাড়পত্র' ও 'ঘুম নেই' ভাষায় ও ভাবে একরকম নয়, পূর্বাভাসও অনেকটাই ভিন্ন এ দুয়ের থেকে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর ছড়া যেন সুকুমার রায়ের পরিপূরক। যেহেতু ছোটদের তিনি সমাজ-সচেতন করার দায় গ্রহণ করেছিলেন। 'রানার' কবিতাটি পড়লে মনে হয় সত্যেন দত্তর মোড়কে এক আধুনিক সমানসচেতনতার দলিল। তাঁর নানান কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি, নজরুলের প্রতিধ্বনিও পাওয়া যায়, সুধীন্দ্রনাথের মত আভিধানিক শব্দের মিশ্রণও লক্ষণীয় (সর্বগ্রামী প্রলুব্ধ চিতার অপবাদে/সভয়ে সন্ধান করে ইতিবৃত্ত দগ্ধপ্রায় মান/ প্রেতাত্মার প্রতিবিম্ব বার্ধক্যের প্রকম্পনে লীন/ অনুর্বর জীবনের সূর্যোদয় ; ভামশেষ চিতা। (পরিশিষ্ট)

শুধু আহ্বান, বিবৃতি, আর ভবিষ্যৎ বানীর গুরুগম্ভীর ভাষা নয়, সুকান্ত তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন অন্য অনেক আঙ্গিক ও তার উপযুক্ত শব্দচয়ন। প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট তুচ্ছ বস্তুর আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তিনি শোষিতের আর্তি ও আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন, যেমন সিগারেট, সিঁড়ি কলম, দেশলাই কাঠি। আক্ষরিক অর্থে যা নিতান্তই হাস্যকর তা-ই হয়ে উঠেছে এক একটা বৈপ্লবিক মিথ। ভারতবর্ষকে অহল্যার মিথ দিয়ে তিনি যেভাবে তাঁর বর্তমান প্রতিকৃতি এঁকেছেন তার চেয়েই বেশি আকর্ষনীয় এই সব নতুন নতুন মিথ-রচনার দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে সবচেয়ে 'একটি মোরগের কাহিনী'। সুকান্তর এই মিথ-রচনায় যে-সরলতা লক্ষনীয় তা যেন আর এক মার্কসবাদী কবি বিষ্ণুদের কাব্যরীতির প্রত্যুত্তর। সুকান্তর পাঠককে আর্টেমিস বা ক্রিমিডাকে চিনতে হয় না, তাঁর পাঠক বড় জোর খবরের কাগজ পড়ে দুনিয়ার হালচাল বোঝেন, আর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির কথা মিলিয়ে নিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুদের রচনাকে 'দুর্ভেদ্য কেল্লা' বলে মনে করেছিলেন ; সুকান্ত বিষ্ণুদের অনুগামী না হয়ে চেয়েছিলেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথের জন্ম। বোধহয় তাঁর আকাঙ্খাই ছিল নতুন যুগের রবীন্দ্রনাথ হওয়া—'যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ।।' (পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)

তা না হলে কেনই বা সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে রক্তকরবী-শ্যামা-চন্ডালিকার উপাদান নিয়ে 'অভিযান' রচনা করবেন। কবিতা, গান, গীতিনাট্য, গল্প, ছড়া ব্যঙ্গ-কবিতা সব কিছুতেই হাত দিয়েছিলেন সুকান্ত, যার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ; কিন্তু উৎস এক হলেও তাঁর ঠিকানা রবীন্দ্র অনুযায়ী কবিদের মত হয় নি, তাঁর মার্কসীয় দীক্ষা অন্য এক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্র-বিরোধীদের মত হ্যারল্ড ব্লুম কথিত 'প্রভাবজানিত দুশ্চিন্তায়' (auxiety of

influence) তিনি আক্রান্ত হয়ে পাশ্চাত্যের মডার্নিজমে আশ্রয় নেন নি। সাধারণ মানুষের মাঝখানে স্বস্তি পেতেন বলেই তাঁর কাব্যের শরীরে কমিউনিষ্ট পার্টির স্পর্শ থাকলেও তত্ত্বকথার অনুপ্রবেশ ঘটে নি। তিনি মহাত্ম গান্ধীকেও শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে নি ; আবার এই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবিতার সেতুবন্ধনে আগ্রহী ছিলেন বলেই তিন তাঁর কবিতার পিঠে বৈদগ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেন নি।

আজ সমাজতন্ত্রের পশচাদ অপসারণের সময়েও সুকান্ত একুশ বছর বয়সে যা বলে গেছেন তা এই একুশ শতকেও বাতিল হয়ে যায় নি — আজকের বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যাঁরা জঞ্জাল সরানোর কাজে নেমেছেন। সেই পরিবেশবাদীরা কমিউনিষ্ট নন, কিন্তু তাঁদের হাতেই সুকান্তর 'ছাড়পত্র' গচ্ছিত আছে।

কবিতার উত্তরণ ঃ শিল্পিত পাঠ

অরুনকুমার বসু

পুনশ্চ কাব্যের একটি কবিতায় (পত্র, ১০ ভাদ্র ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ একালের মুদ্রিত কবিতার সঙ্গে পাঠকের নীরব শীতল সম্পর্কের জন্য ক্ষোভ জানিয়েছিলেন এইভাবে ঃ

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে
কেবল পারে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা
সেই টেই পড়ে রইল পিছনে।

হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই আক্ষেপটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, কবিতার উত্তরণ তার উচ্চারণে, তার শিল্পিত পাঠে, উচ্চারিত আবৃত্তিতে। নিঃশব্দ নীরব পাধে কবিতা তো কফিনের পোরা শবদেহের মতো। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি আরও কিছুটা স্মরণ করি ঃ

বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয়নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হায় রে, কানে শোনার কাবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে।
নিত্যকালের আদরের ধন
পা ব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল ডাঙার অগ্নিবাণে চড়ে।

মন চলছে নিশ্বাস ফেলে
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে ।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য ।
আর আমি যদি হতেম কী হবে বলে ।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে ।
তোমরা আধুনিক মালবিকা
কিনে পড় কবিতা
আরাম - কেদারায় বসে ।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস ।

একালে সাহিত্যের পঠনপাঠনে হাজার বছরের বাংলা কবিতাই মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েদি হয়ে পাঠকের নীরবতার স্তব্ধপ্যারেডে পরিণত । আমাদের শ্রেণীকক্ষে সে কবিতা উচ্চারিত হয় কোনোমতো তা অভ্যাসবশত পঠিত হয়, তবে ধ্বনি গৌরবে আবৃত্ত হয়ে ওঠে না । তাই তা শেষ পর্যন্ত কবিতাও হয়ে উঠে না, ঋজুপাঠের পদ্য হয় মাত্র । তাই আমাদের অ্যাকাডেমিক কাব্যচর্চায় ও ব্যাকরণচর্চায় ও ব্যাকরণচর্চায় কোনো পার্থক্য থাকে না । তা শেষ পর্যন্ত 'ওঁ তট তট তোতয় তোতয় সঙ্কট সফট স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসত্বানি' এই অচলায়তনিক উপন্যাসে নিঃশেষিত হয়ে যায় । অথচ গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর এই দীর্ঘ সমুদ্রমুখিতায় কত ঘাট কত নদীসংগম কত জনপদ কত রোদবৃষ্টির পদাবলি মিশছে - তা যেমন স্থির চিত্রে বোঝানো যায় না, তেমনি ভুসুকু থেকে জয় গোস্বামী এই হাজার বছরের বাংলা কবিতাকেও নিছক সময়-সমাজ-সমস্যা-সন্ধিসমাস চিরে চিরে ব্যাখ্যা করা যায় না, যদি-না দে শ্রোতার শ্রবণে-মনে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে ঘনগৌরবে নবযৌবনা হয়ে আবিভূত হয় । প্রাগাধুনিক যুগের কবিরা তো শ্রোতাদের জন্যেই লিখতেন । পাঠকের জন্যে হয় । মৌখিক সাহিত্যেরও মাঝখানে দরমার বেড়া ছিল না । মেয়েলি, ব্রতকথা পাঁচালিতে ছিল গলাগালি ভাব । চণ্ডীপাঠই চণ্ডীমঙ্গলে ভাসন গানই মনসা মঙ্গলে শিবের গাজনই শিবায়নে পরিণত হয়েছে তাদের পরিবেশন-পদ্ধতি অক্ষুন্ন রেখে । সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে বিহল বাংলা কাব্য আমাদের সাহিত্য-পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত, তা আমাদের পঠন-পাঠনের বিকৃত ব্যবস্থায় নিছক টেক্স্ট হয়ে পড়ে থাকে, তাদের কন্টেক্স্টুয়াল আবেদন সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায় না । দস্যু কেনারামের পালায় মনসার ভাসান শুনে দস্যু কেনারামের যে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ঐতিহাসিক সত্যতা আমাদের সন্ধানের বিষয় নয় । কিন্তু

সঠিক সুরতাললয়ে কাব্য পঠিত ও আবৃত্তি হয়ে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, এ কাহিনী তারই রূপক ।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রেরণায় বাংলায় নবযুগের যে সাহিত্য-ইতিহাস শুরু হল, সেখানে মুদ্রণের বৈপ্লবিক প্রবর্তন লেখক-পাঠকের মধ্যে-দুরত্ব গড়ে দিল । তবুও মধুসূদন অন্তত কবিতাকে ধ্বনিত আবৃত্তির শিল্পে পরিণত করতে চেয়েছিলেন । ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের পাঠ নিতে বাঙালি তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিও-র কণ্ঠে কিংবা ডিএল রিচার্ডসনের কণ্ঠে ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুনে অভিভূত হতেন । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ওভাবে আবৃত্তি করা যেত না । রিচার্ডসন উচ্চাঙ্গের আবৃত্তিকার হিসেবে সেকালে সম্মানিত হয়েছিলেন । যেকলে নাকি বলেছিলেন, আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলতে পারি, কিন্তু আপনার শেক্সপিয়ার আবেত্তি ভুলতে পারি না । রাজনারায়ন বসু তার স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, "তাঁহার রি চার্ডশনের এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা-আবৃত্তিবিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যলয় । তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিকগে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন । তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশগ্রহণ করিত ।" মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও আবৃত্তিকার হিসেবে রিচার্ডসনের এই প্রতিষ্ঠার কথা লিখে গেছেন এই ভাষায় ঃ

"যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা কবিতেন, তাহার দুরূহ অংশসমূহ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ, করিতে পারিতেন যে, তাহার একবার আবৃত্তিমাত্র ছাত্রদিগের অনেকস্থলে অর্থগ্রহ হইত । সে সময়কার অনেক প্রসিদ্ধ রঙ্গশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার নিকট শেকসপিয়র আবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন ।"

সুতরাং কবিতারঅর্থবোধ ও রসগ্রহণের সামর্থ্য যে তার মননশীল স্বাদু পাঠ বা আবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় । উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি কবিরা শেক্সপিয়র-থিলটনের কবিতা থেকে শিক্ষকদের আবৃত্তি শুনেই তা বুঝতে পেরেছিলেন । রিচার্ডসন নিজে তাঁর ছাত্রদের বলতেন ।

"কবিতা-আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে তুলে দিতে পারে । জগতের পরিচিত সাধ-আহ্লাদের অতীত এক চিরন্তন অভিনব আনন্দ স্বর্গে উন্নীত করতে পারে । এ যেন এক ধরনের ধর্মই - কবিরাই প্রকৃতির পুরোহিত ।"

আবৃত্ত অর্থাৎ কণ্ঠে সুশ্রাব্যতায় উচ্চারিত কবিতাই যথার্থ কবিতা, এই সংজ্ঞা ও শর্ত নিয়েই মধুসূদনের হাতে আধুনিক কবিতায় নবজন্ম হল । এতে কোনো সংশয় নেই যে, কবিতা আবৃত্তি করার উৎকন্ঠিত আকাঙ্খা থেকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন মধুসূদন । অমিত্রাক্ষর নিঃশব্দ আত্মমন পাঠের ছন্দ নয়, বাংলার প্রথম আবৃত্তির ছন্দ । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা মদনমোহন কাব্যালঙ্কার পাঠ্য কবিতার পদ্যাকার ছিলেন । ইংরেজি কবিতার আবৃত্তির আদর্শে

তাঁরা বাংলা কবিতা লিখতে শেখেননি । তাদের কাব্যের যমক-পান-অনুপ্রাস-শ্লেষ-শব্দালঙ্কার, কুরুচি-গ্রাম্যতা কুৎসা-উত্তেজনা-রসিকতা প্রায় সর্বাংশেই ছিল দৃষ্টিসুখের, অংশত শ্রুতিসুখের । দ্বারকানাথ দীনবন্ধু এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা কবিতায় সেই মধ্যযুগীয় পাঠ্য কবিতার স্টাইলই অনুসরণ করেছিলেন । তাঁদের কবিতায় কণ্ঠস্বর ছিল না । রঙ্গলাল ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না ।

মধুসূদনই তাই একালের কবিদের মধ্যে প্রথম আবৃত্তিসচেতন কবি । আবৃত্তির আদর্শেই তিনি নাটকে প্রথম আবৃত্তির ছন্দ ব্যবহারের কথা চিন্তা করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করেছিলেন । অর্থাৎ এমন ছন্দ যা অভিনেতারা শ্রোতাদের সম্মুখে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করবেন, যে ছন্দের উচ্চারিত ধ্বনি সম্পদের উচ্চাবচতায় মনোভাবের বিচিত্র তরনীগুলি দোল খাবে । এইভাবেই রিচার্ডসনের আবৃত্তি শেখানোর অভিপ্রায় সার্থক হল । মধুসূদন বুঝে গেলেন কবিতা কাকে বলে ঃ

অন্ধ যে কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যায়
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,সম-ভাব তার ।
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন ? দয়া করি নরে
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীমাপাণি এ নর-নগরে । (কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

এ কবিতা নীরবে পড়ার নয় উচ্চার্থ ভাষায় আবৃত্তিযোগ্য বলেই স্বগত কবিকণ্ঠ সহসা ভারতীকে সম্বোধন করেছে শেষ তিনটি চরণে । আর কবির সংজ্ঞা রচনা করলেন মধুসূদন সেই অবিস্মরণীয় ভাষায় ঃ

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যায় মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে । (কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এই অর্থেই বৈপ্লবিক যে এই ছন্দই বাংলা কবিতাকে পাঠের ভূমি থেকে আবৃত্তির আকাশে মুক্তি দিয়েছিল । মিলগ্রথিত, চরণে সমাপ্য, বাক্যে-বন্দী পদ্য কেবল

পাঠ যোগ্য কবিতা ছিল আবৃত্তি যোগ্যতার সম্ভাবনা তাতে ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দই নিছক একঘেয়ে পাঠের দাসত্ব থেকে কবিতাকে মুক্তি দিল। সে মুক্তি চরণের শৃঙ্খল ভেঙে ক্রীতদাসকে স্বাধীনতা দেওয়ার মতোই ছিল সমাজবিদ্রোহসূচক। এবং বিহারীলাল। ইংরেজি-সংস্কার থেকে দূরে তাঁর অবস্থান, সংস্কৃত কলেজের ধ্রুপদী শিক্ষায় তাঁর মেধাগঠন - কিন্তু তিনিও কবিতাকে মনে-মনে-প ড়ার আগল ভেঙে ধ্বনির জগতে মুক্তিদানের দিশারি ছিলেন। তাঁর সারদা মঙ্গলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত এই পত্রাংশ অন্ত তাই প্রমাণ করে ঃ

"সর্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ আবৃত্তি অথবা গান, দুই শিল্পরীতির যোগেই কবিতার উত্তরণের তত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা পায়।

সুতরাং কবিতার স্তিমিত অপরিশীলিত অনভ্যস্ত পাঠ যে কবিতার উত্তরণ ঘটায় না, কবিতাতে কবিতা হ তেই বাধা দেয়, তা প্রমাণের দাবি রাখে না।

একালের লিরিক কবিতা কেমনভাবে পড়তে হবে, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি অরুণ মিত্র। তিনি লিখেছেন ঃ

"এ কবিতায় [অর্থাৎ লিরিক কবিতায়] রূপ নেয় জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবির অব্যবহিত একাগু প্রতিক্রিয়া। এই কারণে লিরিক কবিতা বিভিন্ন কবির প্রস্তুতিগত বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। ঘটনার বিবরণ নয়, কাহিনী নয়, নাট্যভাষণ নয়। যে কবিতায় কবির ব্যক্তিতা প্রকাশ পায় তার সংবেদনা ও অনুভূতির রূপায়ণ তাকে, তার মানবীয় উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, এ সেই কবিতা। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এখন একেই বুঝি। এই কবিতার জন্যই সমস্যার উদ্ভব। অন্য কোনো কবিতা পাঠের ধরন এর উপর চাপানো চলে না। এ কবিতা কেউ নিজে পড়ার সময় তার সে বক্তব্য, তা-সে ভাবই হোক আর অনুভবই হোক, বা আর কিছু, তাঁকে নাড়িয়েছে, অন্যের সামনে পড়ার সময় সেটাই শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করবেন, এই হল আসল কথা এ কবিতার ক্ষেত্রে।"

বিশিষ্ট কবি অরুণ মিত্রের এই কথাগুলি মনে রেখে উপস্থাপন করা যাক শঙ্খ ঘোষের "যমুনাবতী" কবিতাটিকে ঃ

নিজস্ব এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে নন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।
বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়
ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়!
যাসনে ও হামলায়, যাসনে।
কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না
চলল মেয়ে রণে চলল।
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।
পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।
নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দুর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি।
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে ।
নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফেলেছে ?

একমাত্র পরিশীলিত কবিতাপৃষ্ঠের কণ্ঠেই এই কবিতার বেদনারস নিংড়িয়ে আনা সম্ভব । স্থুল পঠনে কবিতাটির অপমৃত্যুই ঘটবে, উত্তরণ তো দূরের কথা । এই জন্যই কবি অধ্যাপক নরেশ গুহ বলেছেন ঃ

"আবেগশিষ্ঠ শিক্ষিত গলায় আধুনিক বাংলা কবিতায় ধ্বনিভাষ্য শুনে একথা উপলব্ধি করা অনায়াস হবে যে সার্থক কবিতা মাত্রেই তার বিষয়বস্তু শব্দ চেতনা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ছন্দসৌকর্য পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বনিসম্ভব এক অলোক সামান্য রূপের জন্ম দেয় ।"

কবিতার এই "আলোকসামান্য রূপ" শুধু এক আবৃত্তিকারের কণ্ঠেই সম্ভব, এক কথা বলা কবির প্রতি অনাস্থা-প্রকাশ । অন্তত আমি কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের নিজের কণ্ঠে 'ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ' শুনে যে গভীরতায় তালিয়ে যাই, কোনো আবৃত্তিশীলিত কণ্ঠেও তার সমধ্বনি পাই না ঃ

ওর মা মরেছে আটষট্টির বানায়
বাপ এ সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ
ও যে যমের অরুচি ।
চরায়-বড়ায় খই ফুটছে তপ্ত খোলা
পাথর মাটি পাথর,
গোয়ালে গাই বিইয়েছে
তার দুধ বাঁটে নেই একপো
পুকুর-নদীর জল শুকিয়ে বাষ্প,
কোলে কলসি, কাঁধে কলসি, কাতার কাতার
ছা, বৌ, জোয়ানমদ্দ ভাতার
চলছে চলছে—
এমন মুকাভিনয়
তাল খেজুরের মাথার ওপর খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে দ্যাখে
অলপ্পেয়ে সময় ।
আমি এনেছি টি-আর, জি-আর,

সেচ-প্রকল্প, সার, গরু,
আমি ছ'হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু ।
এ্যাই আমিন, এদিকে এসো,
ওরা যা বলে সবটা টোকো,
খুব ভালো ক'রে মাপো জোঁকো
যত দাবি আছে মোটা সরু
আমি ছ'হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু ।

হাড়ের ওপর মাই কামড়ে টিংটিঙে প্যাকাটি
ফটো খিঁচুন প্রেস ।
মজা পুকুরে পেট ফুলে ঢোল শ্যামলী, ধবলী
ফটো খিঁচুন প্রেস ।

এমন মাটি-মায়ের আঁচল
গর্ত খোঁদল ফাটল
ছাতিফাটার মাঠ
হা হা খিদে দিচ্ছে ঝাঁট
মুখে মুখোশ এঁটে নিস্
হিস্ হিস্ হিস্ হিস্
জমি-জিরেত জ্বালিয়ে ধা ধা
কাল কেউটের বিষ ।

হট্ যা হট টিয়েটা
এই সিরিঙ্গি মেয়েটা

ওর মা মরছে আটষট্টির বানায়
বাপ ও সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ
ও যে যমের অরুচি ।

এ কবিতা যেমন নির্বাক দৃষ্টিতে দেখার নয়, তেমনি এর শব্দে ও শব্দের খোঁজে যে শ্লেষ বিদ্রূপ বেদনার বিচ্ছুরণ। তাকে অনুভব করতে গেলে কবিই হন তার শ্রেষ্ঠ পরিবেশক। তাই বিশ্বাস করতে হয় যে কবির কণ্ঠেই কবিতার যথার্থ উত্তরণ ঘটে, ঘটা উচিত। নইলে কৃত্তিবাস কেন তাঁর আত্মপরিচয়ে লিখবেন ঃ

রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে।
পঞ্চদেব অধিষ্ঠার আমার শরীরে
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়।
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল
খুশি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান।

আদি-মধ্যযুগীয় কবির কাব্যপাঠ-শ্রবণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার এই বিবরণটিকেই রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত কবিতায় প্রায় পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। সোনারতরী কাব্যের পুরস্কার (শ্রাবণ ১৩০০) কবিতায় কাব্যরসমুগ্ধ কোনো নৃপতি অখ্যাত এক কবির কণ্ঠে স্বরচিত কাব্যপাঠ শুনে কী পরিমানে অভিভূত হয়েছিলেন। তার বর্ণনা এই রকম ঃ

এত বলি কবি থামাইল গান,
বশিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ন,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীনাঝংকার সম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিল ভূতল
দুবাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, ধন্য, কবি গো ধন্য

আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি বাহিব অন্য
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে
করি পরিতোষ কোন উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দুনয়ন কবি তাঁরে বলে,
"কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ঐই ফুলমালাখানি।"

কবিদের নিজের কণ্ঠে কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি শুনে কাব্যপ্রাণিত উক্ত সম্রাটের মুগ্ধতাই রচনাটির কবিতায় উত্তরণের প্রমাণ। ভারতচন্দ্রও নিশ্চয় তাঁর কবিতা এমনিভাবেই পাঠ করতেন। অন্নদামঙ্গলের এই অনবদ্য কবিতাটি কবিকণ্ঠ ছাড়া কে ফোটাতে পারেন? কারণ কেনা স্বীকার করবেন যে, কবি ছাড়া জয় বৃথা? ভারতচন্দ্র লিখেছেন?

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধরে মধুরহাসি বাঁশিটি বাজাও হে।
নবজলধরতনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়নচাকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকরহাসি-সুধায় বাঁচাও হে।
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভালো নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাইনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে সেইমতো চাও হে।

কবিরাই চিরকাল তাঁদের কবিতা নিজকণ্ঠে পড়ে এসেছেন। সুতরাং ধরে নিতেই হবে যে তাঁদের অনেকেরই পড়ার স্বভাব তাঁদের কবিতার স্বভাবের স্বরলিপি হয়ে ওঠে। শঙ্খ ঘোষ একবার লিখেছিলেন যে, বিনয় মজুমদার একবার কফি হাউসের এক কোনে তাঁর কবিতা পড়ছিলেন, "ভারি যত্নে আলাদা করে উচ্চারণ করছিলেন এক-একটি শব্দ, একটু জোর দিয়ে, আর

হঠাৎ কখনও যে থেমে থাকছিলেন অনেকক্ষণ ।" শঙ্খ ঘোষের মনে হয়েছিল, "এই পড়াটা আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা বোঝাপড়া মাত্র, তার বেশি কিছু নয় । ওর [বিনয় মজুমদারের] কবিতাও ঠিক তাই, ওর কবিতাও তো একেবারে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা ।"

তবে সব কবিই নিজের কবিতার পাঠে সুবিচার করতে পারেন না । এমনকী একবার সিনেট হলে জীবনানন্দের নিজের কবিতা পাঠ শুনে আমরা অনেকেই চমকে উঠিনি - মনে আছে । বড়োই সাদামাটা ছিল সেই পাঠ, অন্তত পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের পাঠের তুলনায় । কিন্তু বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতাপাঠ শুনে মনে হতেই পারে, তাঁরাই তাঁদের কবিতার ভাষ্যকার । শঙ্খ ঘোষকে শখ্য মানা যেতে পারে । তিনি লিখে জানিয়েছিলেন ঃ

"অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে বিষ্ণুদের কবিতা পড়া যে আবেগ বা সুরের বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রতিবাদ , সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না । এদিক থেকে হয়তো বোঝা যায় কেন তাঁর কবিতা পড়বার ধরনাটা একটা বিশেষ ছাঁদে বাঁধা । ছন্দের মধ্যে রেখেই কবিতার যে গদ্যতান তিনি তৈরি করতে চান, তাঁর অনেকটা অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক গলায় সেটা ধরা পড়ে ভালো । বুদ্ধদেব বসুর সুরেলা কবিতা পাঠের সঙ্গে বিষ্ণুদে-র এই ছেড়ে -ছেড়ে দেওয়া কবিতা পড়ার ধরন তুলনা করে দেখলে মনে হয় যে দুজনেরই কবিতাবোধের সঙ্গে সংগত তাদের কবিতা-পড়ার গলা ।"

তাহলে সাধারণ একজন কবিতাপাঠক, ঘটনাক্রমে যিনি শুধুই পাঠক, অথবা কবিতার অদিষ্ট শিক্ষক, কর্তব্যে টীকাকার কিংবা কুন্ঠায় ভাষ্যকার, পদ্যপাঠকে কবিতায় উত্তীর্ণ করতে পারবেন কেমন করে ? গোরা উপন্যাসে তার একটি ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । লিখেছিলেন ঃ

"কবিতা-আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে । সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে মহিমাদান করে - সেটা যেন তাহার কণ্ঠস্বর , তাহার মুখশ্রী তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয় । ফুল যেমন গাছের শাখায়, তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে ।"

এই সতর্ক সচেতনার শিক্ষা নিয়ে একটি কবিতাকে শ্রোতার কাছে, এমনকী সরবে নিজের কাছেও পেশ করতে গেলে কবির সেই কণ্ঠস্বর, মুখশ্রী ও চরিত্রকে খুঁজে পেতেই হবে । তবেই একটি পরিত্যক্ত চড়িভাতির মাঠে, আবর্জনার মধ্যে খুঁজে-বেড়ানো খাবারের টুকরোর জন্য, ওই শীতার্ত হতভাগাদের ঠিকমতো ফোটানো যাবে, যেমন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের এই চড়ুইভাতির গল্পে হয় ঃ

সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে ; তখনো
বিকেলের যাই-যাই রোদ তিরতির করে কাঁপছিলো

ঘাসের ডগায়, কাঁপছিলো
গাছের পাতায়, ডোবার জলে ; নদীর
বুক নিংড়ে উঠে আসছিলো
বিষাদজড়িত বাতাস, তখনো
একটা বুকনিঙড়ানো ঠান্ডা হাওয়ার ঘূর্ণি
ধানকাটা মাঠের মধ্যে পাক খাচ্ছিলো
উড়ছিলো শুকনো পাতা, ছেঁড়া ঠোঙা
সোনালী রিবণ, ছাই
সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে ; তখনো
শালপাতা, মাটির গ্লাস, মুরগীর পালক, রক্ত
ওলটানো মাটির গ্লাস, মদের বোতল, সিগারেটের
পোড়া টুকরো, প্যাকেট
ওরা রেখে গেছে মাটির কলসি, তাড়ির
উগ্র গন্ধ, মাছি
ল্যাংটো কালো ছেলের দল খুঁজছে উচ্ছিষ্ট
পোড়া সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে টান, ফেলছে
থুথু নৈরাশ্যে
কেউবা তাড়ির খালি কলসি ঢালছে গলায়
ওরা খুঁজছে যদি কিছু পড়ে থাকে, যদি
একটা উত্তুরে হাওয়ার হল্লা এলো ধেয়ে
হাড়কাঁপানো শীতে কেঁপে উঠলো মাঝমাঠের শূন্যতা
কয়েকটা হলদে বাঁশপাতা উড়ে এলো, কিছু
ছেঁড়া কাগজ
একটা ক্ষুব্ধ কুকুর চীৎকার কোরে উঠলো কেঁদে
নির্জনতা লাফিয়ে পড়লো ডালপালার আড়াল থেকে
ঝুপঝুপ মাটিতে
মাটিতে থেকে উঠতে লাগলো ধোঁয়া
ঘনীভূত শ্মশান উঠলো জেগে
হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে

বিশ শতকের একটা সময়ে শিশির কুমার ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ অতিশয়-জগতের কয়েকজন প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের কবিতা দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতেন। এঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজাতীয় উত্তরণ নিশ্চয়ই ঘটত। তরুন শ্রোতাদের দ্বারা এঁরা বিপুলভাবে সংবর্ধিত হতেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁদের কবিতাপাঠকে নাট্যদুষ্ঠতার কারণে অভিযুক্ত করেছেন। তবে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাব্যপাঠ বা আবৃত্তি সম্প্যর্ক এই অতিনাটকীয়তার অপবাদ খণ্ডন করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিমত ছিল ঃ

“মঞ্চের উপর মঞ্চের উপযোগী মাপে যখন উনি [শিশির কুমাব] রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল বৈষ্ণব কাব্য সংস্কৃত কাব্য কি শেক্সপিয়র আবৃত্তি করতেন। তখন শ্রোতার কাছে সেটা, অবিস্মরনীয় অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াবে। শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে তাঁর অসামান্য কন্ট ও সুন্দর উচ্চারণ তো কাজ করতই, তার ওপর যে ব্যাপারটা শ্রোতাকে উদ্বেল করত সেটা হল তাঁর আবৃত্তির মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা। রোমান্টিসিজমকে যে অর্থে বিস্ময়বোধের নবজাগরণ বলা হয়েছে। খানিকটা সেই রকম বিস্ময়বোধ তাঁর আবৃত্তিকে ক্ষণে ক্ষণে অভাবনীয়ের অপ্রত্যাশিতের চমকে উজ্জ্বল করে তুলত। তাঁর প্রখর মননশীলতা ও সুগভীর সাহিত্যবোধ আবৃত্তির সময় কবিতাটির যেন নতুন সব অর্থ। অভিনব কিছু কিছু ব্যঞ্জনা অবিষ্কার করতে থাকত। এর মধ্যে নাটকীয়তার যে উচ্ছ্বাস ছিল তা কিন্তু কখনই খেলো শস্তা নাটু কেয়ানার চাতুরি নয়।

এই প্রচ্ছন্ন নাটকের দিকে এলিয়টও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ এলিয়টের প্রগাঢ় কবিতাপাঠ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছিলেন ঃ

“কবিতা যেমন বাচনমাত্র নয়, বাচন আর গুঢ়তর সুরের বুলুনিতেই যেমন কবিতা - তেমনি পড়ার মধ্যেও চাই প্রচ্ছন্ন এক সুর এবং নাটক। কিন্তু সর্ত থাকতে হবে যেন কোথাও এই সুর বা নাটক আলগা হয়ে মাথা না তোলে, শ্রোতাদের মন যেন এমনি মনে হতে থাকে যে, গোটা ব্যাপারটাই প্রতিদিনরে কথাবার্তার সন্নিহিত। যেমন কবিতায় তেমনি কবিতা পড়ায়, এ দুটিকে মিশিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত কথা - কিন্তু এই মিশিয়ে নেওয়াই হল সত্যিকারের পথ।”

পড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই সুর ও নাটক নিয়ে বাচনকে কবিতায় উত্তীর্ম করার শেষ উদাহরণটি এখানে নিবেদন করি। কবিতার নাম খাজনা কবি অজিত বাইরি ঃ

দলিলে সব নিকা আছে, দেখে দেন গো বাবু
খাজনা মুকুব হবে কিনা।
কৌচড়ে কি এনেছিস ? ঘুস নিই না,

তা ব'লে তো এমনি এমনিও হয় না ।
বড় গরীব গো বাবু, নুন আনতো পানতা ফুরোয়
তোমরা বাবু লোক, বড় লোক, দেখে দেন গো বাবু,
দেখে দে
খাজনা মুকুব হবে কিনা ? জলে নামি গো বাবু
কলমি-তুলি, গায়ে হেলে দুলে ওঠে সাপ—
কোমরে জড়ায় ঢ্যামনা ।
—ঘুস নিই না ; কিন্তু দিবি, কিছু ভেট তো দিবি ।
ঘরেতে আছে একখানি ঘড়া, ছেঁড়া কাঁথা, আধ ফালি
কাপড়ঘা আছে শয়নে ।
কিছু দিবার লাই গো বাবু ।
—তুই, তুই-ই তো আছিস
মহাজনের মত তোর ওই দেহেয় জমিন—
তাও দিবি না ?

কবিতার উত্তরণ পরিমার্জিত পরিচ্ছন্ন অনুশীলন -স্বচ্ছ পাঠ ও আবৃত্তির ভূমিকার পাশে আর-এক পদ্ধতি হল, কবিতায় সুরারোপ - কবিতাকে গানে পরিণত করা ।

কিন্তু সে অন্য এক বিস্তার । স্বতন্ত্র তার ইতিহাস - ভূগোল ।

১৬ আগষ্ট ২০০১

বর্তমান প্রবন্ধে কবিদের কবিতার সবটুকু উদ্ধৃত করা সম্ভব হলো না পৃষ্ঠা-সংক্ষেপের কারণে । এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী । — সম্পাদকদ্বয়

তিন দশকের রাজনৈতিক চেতনা ঃ বাংলা কবিতা

(ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

।। এক ।।

কবি টিকে থাকেন তাঁর কবিতার জন্য, রাজনৈতিক চেতনার জন্য নয়। তাঁর সময়ের রাজনীতিকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়তো কবির পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু কবিতায় তাকে আনতেই হবে এমন কোনো দায় তাঁর নেই, একেবারে সরাসরি যাঁরা আন্দোলনের অংশীদার তাঁদের কথা আলাদা। সেই সব কমিটেড লেখকদের রচনায় আন্দোলনের তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক, অবশ্যই তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী। যে কোনো রাজনীতিই তাদের মতো করে সমাজ বা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবর্তনের কথা ভাবে, আর কবিরা ভাবেন নিজেদের মতো করে, /তবুও কবিতার ওপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারও নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবি মানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলি ভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোধিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। জীবনানন্দ এই সমস্ত কথা লিখেছিলেন প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সংকলনে লিখিত প্রবন্ধে। সংগঠনটির নাম ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'। সংকলনটির নাম 'কেন লিখি'। হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সংকলনের মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল, 'একথা আজ স্বীকৃত যে সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তরলোক থেকেও নয়।* এই সংগঠনটির পিছনে কোন রাজনৈতিক দলের পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে তা জীবনানন্দের না জানার কথা নয়। তাই এটি হচ্ছে কবিতার রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে একজন সৎ কবির প্রতিবাদ। অবশ্য জীবনানন্দের এই সমস্ত মতামত আকস্মিক ছিল না। 'কেন লিখি' (১৯৪৩) লিখবার অনেক আগে লেখা তাঁর বিখ্যাত 'কবিতার কথা' (১৯৩৮) প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে এই মনোভাবের কথাই তিনি জানিয়েছিলেন, /অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পর্ক সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই ধর্মও নেই— কিম্বা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর, এ সমস্ত জিনিসের সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন-কবির হাতে আর নয়।* (কবিতার কথা)

'কবিতা' পত্রিকার যে সংখ্যায় জীবনানন্দের এই প্রবন্ধ বেরিয়েছিল (বৈশাখ ১৩৪৫) তার প্রথম রচনাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'। সেখানে রবীন্দ্রনাথ

রিয়ালিজম্-এর দোহাই দিয়ে সস্তা-কবিত্বের আস্ফালনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, /বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাকেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করল, রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক বলে নয়। কবিতা বলেই।* 'কবিতা'-র এই সংখ্যাতেই আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছিলেন, 'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য'। সেখানেও কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্কের কথা, /অবশ্য যুগসন্ধিকালে এমন অবস্থা-বিপর্যয় ঘটতে পারে যাতে বেঁচে থাকার তাগিদই সকলের পক্ষে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠবে। যেমন যুদ্ধের সময়ে শিল্পী তার তুলি রেখে, বৈজ্ঞানিক তার গবেষণা ছেড়ে, হাতে বন্দুক ধরতে বাধ্য হয়। আজকে পৃথিবীর সর্বত্র সে দুর্দিন এসেছে এটা সম্ভব, হয়তো সত্য। আর্টিস্টরা তাদের সমস্ত শক্তি সমস্ত সাহস নিয়ে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা-বাহিনীর সম্মুখীন হবেন, এটা তাঁদের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। কিন্তু রণপ্রাঙ্গনে সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের হাতে যে কাজ দেবেন তাকে আর্ট বলবার নির্বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। সাম্যবাদের উর্বর ভূমিতে হয়তো সোনার ফসল ফলবে, কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের যন্ত্ররূপ সাম্যবাদী শিল্প হচ্ছে আমাদের পরিভাষায় 'বন্ধ্যাপ্রসূতি।*

বোঝাই যায় যে, এই সময়ে বিশেষ করে কবিতায় রাজনীতির প্রয়োগের স্বরূপ নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে জাতীয় রাজনীতি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামান নি প্রায় সবটাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি তখন প্রাধান্য পাচ্ছে। পরাধীন জাতির নিজস্ব রাজনীতি থাকতে পারে না — আপাত সত্য এই বাক্যটি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়। ত্রিশের দশকের সূচনাপর্ব থেকে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনও তো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩০-এর ১২ মার্চ লবণ-আইন অমান্য শুরু হল। গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের সময় সমগ্র ভারতবর্ষই যেন তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে থাকে। এই বছরেরই আইন অমান্য আন্দোলনেও অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থান চূড়ান্তপর্বে ওঠে ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের মাধমে। এই বছরই রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিনয়-বাদল-দীনেশের বিখ্যাত যুদ্ধ। ১৯৩১-এ প্রীতিলতা ওহ্‌দেদার-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় চট্টগ্রাম এবং ঘটনাস্থলেই প্রীতিলতার আত্মহত্যা, ডিসেম্বরে শান্তি ও সুনীতির হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হলেন। মেদিনীপুরে ১৯৩৩-এর মধ্যে বিপ্লবীদের হাতে মারা পড়লেন পরপর তিনজন জেলাশাসক পেডি, ডগলাস এবং বার্জ। বাংলার সরকারী আমলাদের মনোবল তখন প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে। ১৯৩২-এর ৩রা জানুয়ারী গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা হয়। পরের দিনই ওয়ার্কিং কমিটি, এ.আই.সি.সি. সহ সমস্ত স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গান্ধীজীকে গ্রেফতার করে বারবেদা জেলে পাঠানো হয়। উনিশশো চৌত্রিশের ৬ জুন কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এরপরে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় আন্দোলন ১৯৪২-এ।

আগস্ট-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন ১৯৩৩-এই প্রায় শেষ হয়ে যায়। সত্যি কথা স্বীকার করাই ভালো। গান্ধীজীর আন্দোলন, অনশন বা অনশনভঙ্গ, গান্ধী-সুভাষ বিরোধ, বন্দীশালায় নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর গুলিচালনা-এ সমস্ত বিষয়ের দিকে রবীন্দ্রনাথের যতটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের তেমন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচ্য নন, আমরা ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের দিকে তাকাতে পারি। ১৯২৮ সালে ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধনী বিল পাশ করালেন তাতে দখলদার- রায়তী স্বত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হল। এর ফলে অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থা ও অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এরপরে ১৯৩৮-এ প্রজাস্বত্ব আইনের আবার সংশোধন, গ্রামে গ্রামে ঋণসালিশী বোর্ড গঠন, ওই সালেই Bengal Money-lenders Act পাশ করা — গ্রামজীবনে এর প্রতিক্রিয়া তারাশঙ্করের উপন্যাসে পাওয়া গেছে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন নিয়েও সেরা কবিরা মাথা ঘামান নি। অথচ জাগরী বা ঢোড়াই চরিতমানসের মতো উপন্যাস এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের অসামান্য দলিল হয়ে গেছে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রবল মন্দার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের কৃষিজাত পণ্য প্রচণ্ড মার খেল। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদাও কমে গেল। ভূমিনির্ভর শ্রেণী তো সংকটে পড়লেই কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকরিতে টান পড়ল সবচেয়ে বেশি। মধ্য শ্রেণীর চাকরির সংকট মানেই তাঁর অস্তিত্বের সংকট। ১৯২৯-এ লেখা জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতায় পরোক্ষভাবে এই সংকটেরই চেহারা। চারপাশের রাজনৈতিক বা সামাজিক আলোড়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার পর হঠাৎই নিঃসঙ্গতা বোধে পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক, তখন এই আত্মানুসন্ধানও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে —

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা।
আমার চোখেই শুধু ধাঁধাঁ
আমার পথেই শুধু বাধা? (বোধ)

জীবনানন্দ নিজেই একদা জানিয়েছিলেন যে, /আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'-র ব্যবহার করা হয় — যেমন 'ইতিহাসযানে' একটু-আধটু করেছি— সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যে-ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূসত্তা- আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা মনে রাখেন না (আলোচনা, পূর্বাশা, আষাঢ় ১৩৫৩)।* এই যুক্তিতেও 'বোধ' চারপাশের জনসমুদ্রের জোয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন একক মানুষের আর্তনাদ। সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখি' কবিতাতেও বাস্তবকে অস্বীকার করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের (নিজেকে সহ) প্রতি তীব্র শ্লেষ — 'তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি / অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? / আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি / ভ্রান্তিবিলাস সহে না দুর্বিপাকে।' সমর সেনের নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণার কথা তো সকলেরই জানা —

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ। (মুক্তি)

'পদধ্বনি' কবিতাতে বিষ্ণু দের হাহাকারের মধ্যেই এই অক্ষমতার বিষণ্ন বিলাপ —

পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার।

প্রয়োজনের সময়ে গাণ্ডীবের এই ব্যর্থতা সত্যিই ভয়াবহ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের দিকে তাকানো বন্ধ রেখে ত্রিশের দশকের প্রধান কবিরা আশ্রয়ের জন্য সময়ের দিকে তাকাতে শুরু করেন। অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না — এই নির্মম সত্যটি ইতিহাস ইতিমধ্যেই তাদের জানিয়ে দিয়েছে।

ব্যক্তিচেতনাকে সমাজচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কল্লোলযুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দ্বন্দ্ব - থেকে উত্তরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন — 'আমি যত ইতরের' অথবা 'বিলাস-বিবশ মর্তের যত স্বপ্নের তরে ভাই / সময় যে হয় নাই'। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তবতাকে মিলিয়ে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন, রাত্রির সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলার জন্য তিনি পলাতক জীবনবিমুখ মধ্যশ্রেণীকে যেন ডাক দেন —

এখনো ফেরারী কেন?
ফেরো সব পলাতক সেনা।
সাত সাগরের তীরে
ফৌজিদার হেঁকে যায় শোনো;
আলো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
ফৌজের এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হোলো ফেরারী। (ফেরারী)

তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের আশ্রয় নেন নি। ওয়াল্ট হুইটম্যান বা কার্ল স্যাণ্ডবার্গের মানবতাবাদই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি।

ত্রিশের প্রধান কবি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীদের। সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ত্রিশ এবং চল্লিশের সন্ধিক্ষণের কবি। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বামপন্থীদের কাছের লোক। ১৯৩৭-এ প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশিত Towards Progressive Literature এবং 'প্রগতি' নামক সংকলনের অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশনে বুদ্ধদেব Bengali Literature Today : Position of Modern Writers শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েছিলেন। কবিতা পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৬) 'সাম্যবাদী শিল্প' রচনায় বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের অপূর্ব সাফল্যের কথা বলেছিলেন তিনি। অভিভাষণে বুদ্ধদেব সাহিত্যের সমাজ নির্ভরতার কথা বলেছিলেন এবং 'শোষণমুক্ত

নবীন সমাজের' স্বপ্নও দেখেছিলেন। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সোমেন চন্দের নিষ্ঠুর হত্যা তাঁকে বিচলিত করেছিল। দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশন সোমেনের স্মৃতিতে যে 'প্রাচীর' পত্রিকা বের করেছিলেন তাতে 'প্রতিবাদ' নামক কবিতা লিখেছিলেন তিনি —

উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকের অস্ত্র যারা হানে,
মানুষের যে মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত যাদের বিক্রম
তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আগ্নেয় ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি ওঠে ধিক্ ধিক্ আমার বীণায়
তবে কেন কবিজন্ম-মনুষ্যত্ব, তাও তবে বৃথা,
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে
আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।

বোঝাই যায় তাৎক্ষণিক আবেগ এবং প্রবল ক্ষোভ কবিতাটির জন্ম দিয়েছে, এটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব কবিকর্মের প্রকাশ নয়। সময় তাঁকে দিয়ে এই কবিতা লিখিয়েছে। যেমন লিখিয়েছিল একই সময়ে গান্ধীবাদী, রাবীন্দ্রিক এবং আধ্যাত্মিক কবি বলে পরিচিত অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়ে —

গড়ি প্রাচীর।
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
গান ধর গো প্রাণ ঘড়গ।
ঐ কালো পন্থী কেউ টিকবে না, না, না।

কিন্তু বুদ্ধদেব বা অমিয় চক্রবর্তী কবিতাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা মতবাদের প্রচারের হাতিয়ার করতে রাজি ছিলেন না। বুদ্ধদেব যত দ্রুত প্রগতি লেখক সংঘ বা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন প্রায় ততটা দ্রুততার সঙ্গেই তাদের থেকে দূরে সরে যান। ১৩৫৩ আশ্বিনের কবিতা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি সরাসরি সাহিত্যের রাজনীতিকরণের বিরোধিতা করেন, /দেশে আজ সাহিত্যিক দল বলে কিছু নেই, লেখার আবহাওয়া তাই চলে গেছে। তার বদলে আছে পলিটিকাল পার্টি, দল কথাটা শুনে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী- কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতির চর্চার জন্য সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক — এই সব নিদারুণ

অপভ্রংশের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়।* কাদের সম্পর্কে তিনি একথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও তিনি এদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর মতে রাজনীতি নিয়ে এই বাড়াবাড়ির ফলে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। /যারা প্রবীন, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে অগ্রগণ্য তাঁরাই অনেকে সংক্রামিত, উদ্‌ভ্রান্ত, ধর্মচ্যুত।* এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন জীবনানন্দের। তাঁর মতো কবিও নাকি /হুজুগের হুংকারে আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন।* সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলার অন্তর্গত কবিতাগুলি বুদ্ধদেবের ভালো লাগেনি, তাদের সময় সচেতনতার জন্য। তিনি বামপন্থীদের যে গোঁড়ামির নিন্দা করলেন এখানে তিনি নিজেই তাঁর শিকার।

রাজনীতির জগৎ ছেড়ে বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত নিজের বিশুদ্ধতার জগতে চলে যান আর অমিয় চক্রবর্তী ঈশ্বর চেতনা বা রবীন্দ্রনাথে সান্ত্বনা খোঁজেন। তাঁর নিভৃত অন্তরের অসাধারণ আকুতি ঝরে পড়ে এইভাবে কবিতায় —

তোমার মন্দিরে, প্রভু, সারা সূর্যবেলা
সিঁড়িতে ধুয়েছি ধান, নীচের আঙন
নিকিয়েছি, কুয়ো থেকে জল
বাঁকে বয়ে দেবোদ্যানে দিয়েছি বিকেলে।
(খাণ্ডালার দেব মন্দিরের দূরযানী)

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান তাঁকে যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয় —

শান্তিনিকেতনে
স্ফটিক আকাশ রোজ প্রভাতী ছড়ায় দেহে মনে,
সুগন্ধি বেলায়
নীলাম্বর দিকে দিকে খুলে যায়।
শাল বীথিকায় বৈতালিক
চলন্ত সুরের মন্ত্র ঘরে ঘরে দেয় প্রাথমিক,
রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দের ভাষা
তাই দিয়ে সুরু হয় সমস্ত দিনের যাওয়া আসা। (উদয়ন: দূরযানী)

।। দুই ।।

জাতীয় সংকট বা রাজনীতি যাঁদের তেমন বিচলিত করে নি তাঁরাই কিন্তু আন্তর্জাতিক-সংকটে বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। ত্রিশের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিরা সবাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত। ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেই বিপন্ন করতে বসেছিল। তাই আমাদের কবিদেরও অনেকেরই মনে হয়েছিল যে তাঁদের উৎসাহ যেন বিপন্ন হতে বসেছে। কেউ কেউ একে কলোনিয়াল মানসিকতা বহতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস এইরকমই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ১৯২৫-এ ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টির প্রতিষ্ঠা

সাম্যবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে বাঙালি লেখকদের সচেতন করতে থাকে। তারও আগে রুশ বিপ্লব বিশেষ করে ম্যাকসিম গোর্কির রচনা বাঙালী কবিদেরও উদ্দীপিত করে। ১৯২৫-এর ২৫ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়েছিল, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়া সুরু হল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত গোর্কির 'মা'। ১৯২৭-এর মে-দিবস সংখ্যায় গণবাণী-তে নজরুলের ইন্টারন্যাশনাল-এর বাংলা প্রকাশিত হল। তাই আন্তর্জাতিকতাবাদের ঢেউ সাহিত্যের আঙিনায় আছড়ে পড়ছিল ত্রিশের দশকেরও একটু আগে থেকে। এর পুরোধা অবশ্যই নজরুল। কিন্তু নজরুল জাতীয়তাবাদের শক্ত ভিৎ-এর উপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার কথা ভাবেন। দেশের মানুষ, দেশের রাজনীতি এবং দেশের আন্দোলনের তিনি কেবল দ্রষ্টা নন, অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণকারী। বহু আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ফাঁকটি তাঁর চোখে ধরা পড়ে যায়। 'দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে' — অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এই রচনা।

বাকিরা ১৯৩৬ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সরাসরি রাজনীতিকে নিয়ে আসার কথা ভাবেন নি। রাজনীতি মানে মার্কসবাদ। দেশীয় কোনো মতবাদ নয়। অবশ্য ১৯৩১-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকা-কে কেন্দ্র করে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিছু এলিটিস্ট বুদ্ধিজীবীর দেখা মেলে। হিরণকুমার সান্যাল তাঁর 'পরিচয়ের কুড়ি বছর' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম পরিচয়-এর পাতায় শিল্পসাহিত্যে মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুশোভন সরকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচয়-এর লেখক-গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার ফলে, /পরিচয়ের পাতায় লালের আভা আর একটু গাঢ় হল।" তত্ত্বটি বাংলায় এনেছিলেন ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদ। আমাদের এলিটিস্ট কবিরা হয়তো পরিচয়ের পাতাকেই মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ ঘোরালো হয়ে না উঠলে তাঁরা এ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাতেন বলা শক্ত। ১৯৩৩ সাল থেকেই জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। এই বছরেরই ১০ মে বার্লিনের রাজপথে নাৎসী বাহিনী বিশ্বখ্যাত লেখকদের বই পোড়ানো শুরু করে। ইতালিতে মুসোলিনীর সাম্রাজ্য লালসা ও যুদ্ধপ্রস্তুতিও মানব সভ্যতার আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিস্ট-বর্বরতা ও বিশ্বশান্তির বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ১৯৩৫-এর সপ্তম অধিবেশনে এক নতুন রণনীতি ও রণকৌশল গৃহীত হয়। এখানেই ডিমিট্রোভের সেই বিখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট-থিসিস' পেশ করা হয়। অপরদিকে ১৯৩৬-এর ১৮ জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৩৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াশীল শাহি মুখোবদ্ধ হতে থাকে, স্প্যানিশ রিপাব্লিক আক্রান্ত হয়। আর যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড বিষণ্ন স্পেনের পাশে এসে দাঁড়ায়, হাতে বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নামে তার মধ্যে ছিলেন দেশ বিদেশের অনেক

খ্যাতিবান শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী।

র‍্যালক ফব্‌স, ফডওয়েল বা কর্নফোর্ডের মতো সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। স্বয়ং হেমিংওয়ে সাংবাদিক হিসেবে ইনটারন্যাশনাল-ব্রিগেডের সঙ্গেই ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট-কবলিত ফ্রান্সে যে আ'রগ্রাউ' সশস্ত্র প্রতিশোধ আন্দোলন শুরু হয় এলুআর অথবা আরাগঁ-এর মতো কবিরা তার প্রত্যক্ষ অংশীদার হন। স্পেন বা ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন আমাদের কবিদের অনেককেই উদ্দীপ্ত করে। তাছাড়া লড়াইটা যেখানে ফ্রেঞ্চে নয়, কলমে সেখানে তো বিপদের আশঙ্কাও নেই। ফ্যাসিবাদের আসল চেহারা সৌভাগ্যক্রমে এদের দেখতে হয় নি। ঘটনাও অনেক দূরের। একমাত্র সোমেন চন্দের হত্যা তার একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিদর্শন হয়তো রেখে গেছে। কিন্তু উভয়ের কোনো তুলনাই চলে না। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকও শিল্পীসংঘ এই উপলক্ষে গড়ে উঠল ঠিকই কিন্তু তার আগেই আসল ঘটনাটি ঘটে গেছে। ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলারের নাৎসীবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমন করে এতকাল যা ছিল কমিউনিস্টদের কাছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তা জনযুদ্ধে পরিণত হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মিত্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার কথাও বলা হয়। এটাই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। প্রগতি লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন ১৯৩২-১৯৩৫ সালের ল'ন প্রবাসী কিছু প্রতিভাবান ভারতীয় ছাত্র। এঁরা মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন বিদেশেই। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের দেখে। তাই এই সংগ্রামটিও আন্তর্জাতিকতার পড়িমিতেই থেকে যায়। জাতীয় জীবনের সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে ওঠে না।

একটি উদাহরণ দিলেই পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। ১৯৪১-এর ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিস্ট জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বিষ্ণু দে অনেক দূরের এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানান এইভাবে—

> শেয়ানে শেয়ানে হোক কোলাকুলি সঙ্গোপনে, তবু চীন, রুশ-
> দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
> স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
> জলে স্থলে যুদ্ধ চলে। ভারতেরও ভিত টলে, প্রাণের নির্দেশে
> কলকাতায় পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূরদেশে দেশে
>
> (২২শে জুন ১৯৪১। সাতভাই চম্পা)

স্তালিনগ্রাদ রক্ষার অমর সংগ্রামকে কবি বীর দেখেন এইভাবে —

> একাকার দেশ-বিদেশের গান, হারায় কায়া
> তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে
> বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়। (সাতভাই চম্পা)

আন্তর্জাতিক সংকটের সঙ্গে জাতীয় সংকটকে মেলানোর প্রচেষ্টা কবিরা এখন থেকেই সুরু

করলেন, স্তালিনগ্রাদের লড়াই সমর সেনের কবিতায় আসে তাঁর মতো করে —

এক অজানিত বন্য জানোয়ার
পাশবিক ঘুম থেকে ধীরে ধীরে উঠে
বহু পুরুষের সাজানো বাগানে লোলগর্বে আসে,
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে গর্বের ভ্রান্তিতে আচম্বিতে আসে। (স্ট্যালিনগ্রাড)

বোঝাই যায় এটা তাত্ত্বিক উপস্থাপক, দূরত্ব বজায় থেকেছে, স্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধবাহিনীর ঐতিহাসিক সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন —

প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী
দাঁড়ায় নগরদুর্গে (স্ট্যালিনগ্রাড)।

সুকান্ত জনযুদ্ধের তত্ত্বকে কবিতায় তুলে ধরাতে চান-জনগন হও আজ উদ্বুদ্ধ/শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ। জাপানী-বোমা বিধ্বস্ত চট্টগ্রামের কথা স্মরই করতে গিয়ে তাঁরও একবার স্তালিনগ্রাডের কথা মনে পড়ে—

এতগুলি উদাহরণ আপানদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এদের রাখা হয়েছে এদের বিপরীতে কয়েকটি উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরার জন্য। দূর থেকে দেখা এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ- এই দুইয়ের মধ্যে অনুভূতির অনেক পার্থক্য থাকে। ফ্রেঞ্চে রাইফেল হাতে বসে আরাগঁ-র মতো কবি যে যন্ত্রণার গান রচনা করেন আমাদের কবিদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবস্থানও এক্ষেত্রে কিছুটা বিচিত্র। পরিচয় পত্রিকায় তিনি মার্কসবাদীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট বন্ধুদের হাতেই পরিচয়-এর মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন, ১৯৩৮-এ প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলনের সভাপতিম' লীর সদস্য হতেও তিনি সম্মত হয়েছিলেন, প্রখ্যাত উর্দু কবি সমজাজ এবং তরুণ উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরিকে স্বগৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অপরদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠেরা জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ফিনল্যা' আক্রমণ তিনি পছন্দ করেন নি। (এটা অপরাধ নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে এই আচরণ পছন্দ করেন নি তার নিদর্শন টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে/ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে) শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছিলেন এম.এন. রায়ের অনুগামী। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে তখন তিনিও প্রবল আলোড়িত। কিন্তু জার্মান ফ্যাসিবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদকে তিনি সমদৃষ্টিতে বিচার করেন, ট্রটস্কির প্রতি আচরণকে ধিক্কার জানান। বস্তুত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে তার মত মোহমুক্ত দৃষ্টিতেআর কোন বাঙালি কবি তুলে ধরেন নি।

ত্রিশের দশকের কবিরা চল্লিশের দশকে এসে অনেকেই যেন নতুন করে ভাবতে থাকেন। রাজনীতির চেহারাটা এই সময় থেকেই পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। একদিকে প্রাক স্বাধীনতা পর্ব ১৯৪৪-৪৭। এই পর্বটি আজাদহিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট দাবী আদায়ের সংগ্রাম এবং বন্দী কৃষক আন্দোলনের সাক্ষী। ১৯৪৬-

এর ২১ থেকে ২৪ মে খুলনা জেলার সৌভোগে প্রাদেশিক কৃষক সভার নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিষ্ণু দের 'সৌভোগ' কবিতা রচিত। এই সম্মেলনেই তেভাগার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চল্লিশের যুগ নিশ্চয় মসৃণ স্বতন্ত্র নয়, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে। তবে এই যুগের অন্যতম প্রতিনিধি রামবসু জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা এই ধারাবাহিকতায় নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিলেন। এরা বিশুদ্ধতাবাদ এবং এলিটিস্ট মার্কসবাদ থেকে কবিতার মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন এবং লর্ডনারের ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে এংরা সমদূরত্বের অধিবাসী। এই কবিরা তেভাগা, ধর্মঘট ও দাঙ্গা তো দেখেইছেন তার সঙ্গে দেখেছেন দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়-এর রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া, কাকদ্বীপ তেনেদাঙার বিপ্লব, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংঘাত, লাঠি ও গুলি। এসব কিছুই চল্লিশের দশকের কবিতাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। তাই এঁদের কবিতায় সব কিছুরই প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাম বসুর বিখ্যাত 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে' অথবা 'একটি হত্যা'র মতো কবিতা, 'তোমাকে' এবং যখন যন্ত্রণা'র অনেক কবিতা এই সময়ের প্রতিনিধি। জোরালো ভাষায় সাম্যবাদী আদর্শের ঘোষণা আর তার সঙ্গে রোমান্টিক চেতনাকে মিশিয়ে দেওয়া -এই পর্বের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। মনীন্দ্ররায়, মঙ্গলাচরণ, রামবসু বা সিদ্ধেশ্বর সেনেরা এই সহৃদয়বানটিকে কবিতায় ধরে রাখতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্যের কথা স্মরণ করি — ইতিহাস যদি আমাদের স্বপক্ষে না থাকতো, যদি আমরা চট্টগ্রামে সোরগোল তুলতে না পারতাম, তবে স্পর্দ্ধার হলেও আমার স্থির বিশ্বাস, আমরা পেতাম না সাতটি তারার তিমিরের জীবনানন্দকে যা সত্যিকারের জীবনানন্দ। পেতাম না বিষ্ণু দের সাতভাই চম্পা, সন্দীপের চর বা সৌভোগের মত কবিতা। (চল্লিশের প্রেক্ষিত রাম বসু)। চল্লিশের কবিদের এই ঐতিহাসিক অবদানের কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। বিশেষ করে জীবনানন্দের 'ক্ষেতে প্রান্তরে', 'তিমির হননের গান', '১৯৪৬-৪৭', 'ইতিহাসযান' বা 'হে হৃদয়ের' মতো কবি তার চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের রাজনীতির অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের সময় ও মেজাজ আলাদা হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তা থেকে প্রত্যাহার, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কবির অংশগ্রহন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। সহ-অবস্থানের তত্ত্ব রাজনীতির চেহারা পর্যায়ের কবিতাও পাল্টায়। কবিতা সমষ্টিকে ছেড়ে ব্যক্তিগত হয়ে পড়তে থাকে।

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাজ্ঞ বিটগেনস্টেইন নির্ভুল মন্তব্য করেছিলেন — /যা কিছু ভাবি আমরা, তা অবশ্যই ভাবতে পারি স্পষ্ট করে। যা কিছু বলতে পারি তাও বলতে পারি স্পষ্ট করে। কিন্তু যা কিছু ভাবি তাই বলতে পারি না।" মানুষের বাসনার সবটুকু বাঙ্ময় হয় না বলেই মানুষের কবিতা লেখার প্রয়াস অন্তহীন এবং সেই কারণেই কবিতা অনাদি ও অনন্ত। অর্থবদ্ধ ভাষার কবিতা সীমাহীন ব্যঞ্জনা নিয়ে যাত্রা করেছে এক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এবং তার যাত্রার সীমান্ত এক অনৈতিহাসিক আগামী দিনে। এই যাত্রাপথে কবিতা বাঁক ফিরেছে বারে বারে কিন্তু তিনটি ক্রিয়া তার নিত্যপ্রিয় — arousing, manipulating and eventually fulfilling emotional expectations. কিন্তু মানুষের emotional expectations-এর সম্পূরণ সম্ভব কি? লেখিকা ও চিত্রপরিচালিকা সুসান সনতাগ বললেন সুন্দর করে : 'the art of our time is noisy with appeals for silence. কবির কাজই হল ভাষার উপর আক্রমণ যদিও শব্দ তাঁর প্রধান সহায়। শুদ্ধতম শিল্প হতে চায় বলেই কবিতা 'the most impure, the most contaminated, the most exhausted of all the materials out of which art is made' ভাষাকে চেষ্টা করে ভাষাতীতে নিয়ে যেতে। সনতাগ তাই বলেন যে, নৈঃশব্দ্যই শব্দের চরম পরীক্ষা। সুবিপুল নৈঃশব্দ্য আছে বলেই কবিতার অথরের সঙ্গে কাব্যতত্ত্বের মৃত্যুও ধ্রুব।

অথরের মৃত্যু যারা ঘোষণা করেছেন তাঁরা কিন্তু ভাষার বহুমাত্রিকতা এবং সুদূরে উড্ডীন হওয়ার সামর্থ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, কবিতার পাঠক আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কবিতাকে পরিণত করতে পারে সমুদ্রবিহঙ্গ অ্যালবাট্রসে; কবির কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই কবিতার ওপর। অথচ প্যারাডক্স এইখানে যে, শব্দ নইলে কবির ব্যবসা চলে না। শব্দই চিনিয়ে দেয় কবির শিক্ষা, পরিবেশ, মেজাজ, শ্রেণীপরিচয়, মুক্ত অথবা বন্ধনহীন আনন্দের বিশেষ মুহূর্ত। ১৯৬১ তে ফ্রানৎস ফ্যানন (Frantz Fanon) তাঁর 'The Wretched of the Earth'-এ লিখছিলেন, ভাষার মধ্যেই ধরা পড়ে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের বক্তব্যের ভিন্নতা। তাঁর মতে, কবিতার ভাষাতেই ধরা পড়ে 'Controller'-এর সঙ্গে 'Controlled'-এর পার্থক্য, 'wealth'-এর সঙ্গে 'poverty'র পার্থক্য এবং 'Self-denial'-এর সঙ্গে 'self fulfilment'এর পার্থক্য। কবিরা তো চিরকালই মানুষের কথা বলেন। সব দেশের কবিরাই মানুষের কথা লেখেন মানুষের দিকে তাকিয়ে। সেই কারণে একই সুতোয় বেঁধে দেওয়া যায় ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অথবা শঙ্খ ঘোষ এবং জয়গোস্বামীকে। সাদামাঠা ভাষায় যে-রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/ কে বাঁচিতে চায়' তাঁর

সঙ্গে 'অমর একুশে' কবিতার কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কালগত ব্যবধান কতটুকু? ব্যবধান ততটুকুই যাকে চিহ্নিত করা যায় ঔপনিবেশিক এবং নব্য-ঔপনিবেশিক শব্দ দুটো দিয়ে। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র এই পরিচায়ক শব্দ দুটির মধ্যে প্রথমটির দ্বারা চিহ্নিত হবেন এবং দ্বিতীয় শব্দটি এখনও সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে চলেছে সাতচল্লিশের পরেকার সব বাঙালি কবিকেই। এই দ্বিতীয় শব্দটি ত্রিপুরার অনিল সরকারের অসাধারণ কবিতা 'হীরাসিং হরিজন'কে চিনিয়ে দেয় যেমন, তেমনি বাংলাদেশের কবি আবু হাসান শাহরিয়ার-এর এমন একটি কবিতাকে ('একলব্যের পুনরুত্থান') যার দুটি পঙক্তি এই রকম 'ফিরেছি একাকী আমি একলব্য। ফিরে আসি সহস্র ধিক্কারে।/আমি নিম্নবর্ণ। আমি হরিজন। জাতিগোষ্ঠী যত সর্বহারা'। এখনও যাকে তৃতীয়বিশ্ব বলি দুই কবি সেই একই বিশ্বের এবং তাঁদের ভাষা-মাধ্যমও একই। বিস্ময় এখানেই শেষ নয় বোধ হয়। যাঁরা Don Lee, Nikki Giovanni, Roderick Panell-এর লেখার সঙ্গে পরিচিত তারা দেখবেন দুই পৃথক ভাষার কবিদেরও মূল কথা একই : 'directness', এবং ঔপনিবেশিকতার নানা মূর্তিতে আক্রমণ এঁদের কবিতাকে করেছে 'more direct, more angry, more lyrical, more vernacular and even more political.' যে-নব্য ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের তিক্ততা বর্তমান কালের দ্বিতীয় বিশ্বের অধিনায়ক কিউবা-র ফিদেল কাস্ত্রোকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে অনেক কথা, সেই নব্য ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা আমাদেরই কারুকে চিনিয়ে দেয় নারীবাদী বলে অথবা সন্ত্রাসন্ধানী বলে। উপনিবেশ-বাঙলার সেরা ফল অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ যাঁর কবিতার ভাষায় ছিল রাজনীতি-সংস্পর্শহীন যথার্থ মুক্তির সংকেত। পৃথিবীর অন্য কোনো উপনিবেশ কোনোদিন মাঝারি মাপের কবির জন্ম দিলেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিতে পারে নি। অদ্ভুত সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি তথাকথিত উত্তর-আধুনিক তো ননই। এমন কি পশ্চিমের আধুনিকদের মত তাঁর কবিতায় urbanism ছিল না; ছিল না Eroticism ছিল Dehumanization-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ছিল জাতির প্রাচীন 'মিথ'কে রোমান্টিক পদ্ধতিতে আত্তীকৃত করে তাকে সর্বজনীন করে তোলা এবং যাবতীয় ইজম্-নিরপেক্ষভাবে নির্বাক অতীতকে বাঙ্ময় রূপে দেখার আকুতি।

জীবনের অন্তিম লগ্নে মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন যে-বিচারককে রবীন্দ্রনাথ গভীর কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং নিজেকেই করে তুলতে পেরেছিলেন সেই বিচারকের সমতুল আজও মানবপ্রেমিকের কণ্ঠে সেই বিচারকের উদ্দেশে আহ্বান ঘোষিত; তবে সেই বিচারক collective man. 'আমি' আজকের কবিতায় প্রায়শ: 'আমরা'ই ; আর 'আমরা'? আমরা হলাম Ortega Y Gasset-এর ভাষায় "Crowd phenomenon"-এর শিকার। চতুর্দিকে আজ অজস্র খন্ড মানুষের ভিড়, অখন্ড মানুষ হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিস্রোতে। অজস্র ভোগ্যপণ্য, আকণ্ঠ ভোগেচ্ছা, গভীর বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ মুহূর্তের কাতর আর্তনাদের রূপকার জীবনানন্দ। তাঁর বিস্ময় ছিল, প্রশ্ন ছিল; একাকীত্বের বোধকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই

একাকী হয়ে যাওয়াটা অবশ্যই আপন মুদ্রাদোষে নয়। আমরা আজ বহুর মধ্যে থেকেও একার যাতনা ভোগ করছি, অথচ খুঁজে দেখলে বেদনাটা উন্নত প্রযুক্তির যুগে আর একার নেই। উইলিয়ম গোল্ডিং-এর 'Lord of the Flies'-উপন্যাসের এক ঝাঁক স্কুলবালক যারা কিনা পরিত্যক্ত দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছিল ভেঙে যাওয়া উড়ো জাহাজের বেঁচে যাওয়া যাত্রী হিসেবে তারা প্রথমে প্রথাবদ্ধতার তাড়না থেকে রেহাই পেয়েও শেষ পর্যন্ত violence-এ জড়িয়ে পড়ে। গোল্ডিং হয়ত বিশ্বাস করতেন যে আমাদের রক্তে রয়েছে violence এবং তার আকস্মিক বিস্ফোরণ অরোধ্য; কিন্তু এভাবে না দেখেও নানাভাবে দেখা যায় একালের বিচ্ছিন্নতাকে। Compunication-এর যুগে যখন Intellectual technology'রই গভীর বিস্তার, বিত্তবান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রমত্ত কলরোল চতুর্দিকে, তখন একটা মানুষ অখণ্ড না থেকে অজস্র ভগ্নাংশের সমবায়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এদেশের মানুষ আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম সকলের জন্যে, সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম সকলের জন্যে; কিন্তু নেই মৈত্রী, নেই সাম্য এবং নেই স্বাধীনতা। আসলে আজ যখন 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে তখন মিছিলের মুখও হয়ে যেতে পারে মুখোশ, তখন যদিও বারবার নিজের প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে পারে নিজের কাছেই 'যেতে পারি..... কিন্তু কেন যাবো? তখন জয়গোস্বামীর চরিত্র বলে (স্বর) 'আমি মৃত্যুর পরের অংশ লিখতে চাই; অথচ জয় আপন কথা বিভিন্ন চরিত্রের স্বরে নাটকীয় ভঙ্গীতে ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে যে-কমিটমেন্ট ঘোষণা করেন তা সম্ভব হতে পারে নব্য উপনিবেশের সচেতন কবিদের সম্মিলিত অঙ্গীকারে ঃ ...'তোরা সব বাছা আমার সোনা আমার কয়লা আমার/লোহা আমার উদ্ভিদ আমার প্রাণী আমার প্রাণ / সেই প্রথম দিন থেকে একসাথে লড়াই করছি একসাথে খাবার খুঁজছি/পাহাড়ে জঙ্গলে, আর/আকাশে বনবন ঘুরছে ঘড়ি চক্র ঘড়ি মস্ত ঘড়ি অগ্নি ঘড়ি দিগ্বিদিক/যতবার মেরে ফেলবে, জয় জয় সব উত্থান, ততবার বেঁচে, উঠব ঠিক' (ভুতুম ভগবান)। 'যেতে পারি, ...কিন্তু, কেন যাবো? এই প্রশ্ন এবং 'এসেছি যখন, খালি হাতে ফিরব না' এই প্রতিশ্রুতি আজকের কবিকে একাহে এবং আগামীকালে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই ব্যক্তি-কবি ঐতিহাসিক নিয়মে মরে যান, কিন্তু বারবার পঠিত হওয়া কবিতা কবিকে যতবার পাঠকের দ্বারা নিহত করে ততবারই কবি পুনঃপাঠের দ্বারা অনন্তের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেন। প্রতিটি মৃত্যুর পরই কবি মৃত্যুঞ্জয় এবং প্রতিটি নতুন পাঠের পর কবিতা অমরত্বের দাবিদার। কালের বদল হয়, বদল হয় রুচির ও ভালো লাগার। কবির কবি হিসাবে সার্থকতা জয়-এর ভাষাতেই বলি 'কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দ জলে।' কবি—বাঙালি কবি—চর্যাপদের যুগ থেকে আজ নব্য ঔপনিবেশিকতার কাল পর্যন্ত ব্যক্তি নাম বদল করলেও একটি বহমান স্রোতধারার নিয়ামক—আমাদের বাঙলা কাব্যপাঠ এই মন নিয়েই সার্থক হতে পারে।